606
ছোটদের
বিশ্বকোষ
দ্বিতীয় খণ্ড

ছোটদের

বিশ্বকোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক
অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ছোটদের বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড এই সঙ্গে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করছি। প্রথম খণ্ডে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে স্থানাভাবের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী সব ক'টি বিষয় ঐ খণ্ডে দেওয়া সম্ভব হয় নি এবং পরবর্তী খণ্ডে আরও নতুন কয়েকটি বিষয় সংযোজিত করা হবে। বলা বাহুল্য বইটি সুলভ ও সহজলভ্য করার জন্যই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

সেই প্রতিশ্রুতি মত দ্বিতীয় খণ্ডে আরও কয়েকটি বিষয় যোগ করা হ'ল,—যেমন চিত্র-শিল্পের কথা, জীবনী-বিচিত্রা, সংস্কৃত সাহিত্যের কথা, বাংলা সাহিত্যের কথা, সঙ্গীতের কথা, দেশবিদেশের রূপকথা, যানবাহনের কথা ইত্যাদি। এর ফলে প্রথম খণ্ডে দেওয়া হয়েছে এমন কয়েকটি বিষয় এই খণ্ডে প্রকাশ করা হ'ল না, সেগুলি আবার তৃতীয় খণ্ডে দেওয়া হবে। তা ছাড়া তৃতীয় খণ্ডে আরও কয়েকটি নতুন বিষয় সংযোজিত করতে পারব বলে আশা করি। শেষের দিকে কয়েকটি বিষয় একটু সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে, বারান্তরে সেগুলির জন্যও আবার পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

যাঁরা এই দু'টি খণ্ড ভাল করে উল্টেপাল্টে দেখবেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে আমরা কতকগুলি বিষয় (যেমন এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা, অঙ্কশাস্ত্রের কথা, চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা, চিত্রশিল্পের কথা ইত্যাদি) সম্পর্কে কাল অনুযায়ী ক্রমপর্যায়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছি। এই জন্যই ঐ সব বিষয়ের আধুনিক অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় নি। আমাদের পরিকল্পনা মত পরবর্তী খণ্ড দু'টিতে আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে-গিয়ে আধুনিকতম যুগে চলে আসব।

প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর আমরা বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী, অভি-ভাবক এবং বিশেষ করে এই বই-এর আসল পাঠক আমাদের ছোট্ট ছোট্ট পড়ুয়া বন্ধুদের কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ ও অভিনন্দন লাভ করেছি। কেউ কেউ নানা রকম সুপরামর্শ দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যও এগিয়ে এসেছেন। এই সুযোগে তাঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই। পরবর্তী খণ্ডগুলির বিষয়বস্তু, রচনা ও চিত্রসম্পদের মান যাতে পূর্বের তুলনায় অক্ষুণ্ণ থাকে সে চেষ্টা আমরা অবশ্যই করব।

প্রথম খণ্ডের মত এই খণ্ডটিতেও কলকাতার সোভিয়েৎ কনসুলেট তথ্য বিভাগ এবং ইউনাইটেড স্টেট্স্ অব্ আমেরিকার তথ্য বিভাগ মহাকাশ-অভিযান সম্বন্ধে নানা তথ্য ও আলোকচিত্র প্রকাশের সুযোগ দিয়ে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

এই সুযোগে প্রকাশক মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ—বিশেষ করে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়দের আর একবার ধন্যবাদ জানাই। নানা ব্যাপারে তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আমাদের গুরুভার লঘু করে দিয়েছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মহালয়া, ১৩৭৫

দ্বিতীয় খণ্ডের লেখক-পরিচিতি

চিত্রশিল্পের কথা
ইতিহাসের কথা

অধ্যাপক শ্রীসন্তোষ বসু, এম্. এ.
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা-বিজ্ঞানের (মিউজিয়লজী) অধ্যাপক ; ভারতীয় চারুশিল্প, লোকশিল্প ও সংগ্রহশালা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর লেখক ; প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা।

অঙ্কশাস্ত্রের কথা
সাধারণ বিজ্ঞানের কথা
যানবাহনের কথা

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস্-সি., এ. আই. সি.
শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক; কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারের ভূতপূর্ব রাসায়নিক গবেষক ; পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিল্পসংগ্রহ-শালার অধ্যক্ষ, শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে ফটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত (১৩৭২) ; বিজ্ঞানচেতনা গ্রন্থাবলীর সম্পাদক।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বি. এস্-সি, বি. ই., সি. ই.
খ্যাতনামা সাহিত্যিক ; প্রয়োগবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা ; কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং কমিশনের প্রধান এঞ্জিনীয়ার।

আমাদের শরীরের কথা

ডাঃ শ্রীননীগোপাল মজুমদার,
এম্. বি., ডি. সি. এইচ্. (লণ্ডন), সি. এ. পি.
শিশুসাহিত্যে খ্যাতনামা ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুচিকিৎসক; কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের শিশুচিকিৎসা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ; বয়স্কাউট-মুখপত্র 'যাত্রী'র ভূতপূর্ব সম্পাদক ; পশ্চিম বঙ্গ শিশুকল্যাণ পরিষদের মুখপত্র 'শিশুকল্যাণ'-সম্পাদক।

চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা

ডাঃ শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, এম্. এ., এম্. বি., ডি. টি. এম্.
প্রবীণ চিকিৎসক ; লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি; বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ভূতপূর্ব সভাপতি ; সুপণ্ডিত ও সুবক্তা হিসাবে সুপরিচিত।

দেশবিদেশের ছড়া (আংশিক)

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত, এম্. এ.
বাংলা শিশুসাহিত্যে ছড়া ও কবিতা-লেখক ও গ্রন্থকার হিসাবে খ্যাতিমান্। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত।

দেশবিদেশের রূপকথা

শ্রীসন্তোষকুমার দে, বি. এ.
শিশুসাহিত্যের সুপরিচিত লেখক ; কথাসাহিত্যিক এবং কবি হিসাবে খ্যাতিমান্ ; সাংবাদিকতা এবং বিজ্ঞাপন বিষয়ে সর্বপ্রথম বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা। রবিবাসরের সাধারণ সম্পাদক।

ধর্মের কথা

শ্রীঅমলেন্দু সেন, এম্. এ., বি. এল্.
শিশুসাহিত্যে সুপরিচিত; সদ্য সাক্ষরদের জন্য রচিত গ্রন্থের জন্য তিনবার ভারত সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত। কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

ভাষা ও লিপির কথা

শ্রীপরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বি. এস্-সি.
সাংবাদিক ; শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ও বিভিন্ন শিশু-পাঠ্য গ্রন্থ-প্রণেতা।

সঙ্গীতের কথা

শ্রীবুলবুল চৌধুরী, বি. এ.
লণ্ডনের সিটি অব্ ওয়েষ্ট মিন্‌স্টার বোরো কাউন্‌সিলের শিশু-কল্যাণ বিভাগের ভূতপূর্ব এক্‌জিকিউটিভ অফিসার ও রয়্যাল ফেষ্টিভ্যাল হলের প্রাক্তন অবৈতনিক সদস্য ; পাশ্চাত্য সঙ্গীতকার ও সঙ্গীতজ্ঞদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ; আকাশবাণীর পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ মনুজেন্দ্র চৌধুরীর সহধর্মিণী ।

বিশ্বসাহিত্যের কথা

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি. এ.
শিশুসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ; ভারত সরকার কর্তৃক সদ্য-সাক্ষরদের জন্য রচিত গ্রন্থের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত ; শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচয়িতা হিসাবে ফটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত (১৩৭১) ; শিশু-সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য মৌচাক পুরস্কারপ্রাপ্ত। বার্ষিক 'আনন্দ'-সম্পাদক; শিশুসাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি।

বাংলা সাহিত্যের কথা

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত, এম্. এ.
শিক্ষাব্রতী ও শিশুসাহিত্যের সুপরিচিত লেখক ; দেশবন্ধু মহিলা কলেজের ভূতপূর্ব বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ; দেশপ্রাণ বীরেন্দ্র-নাথ শাসমল ইনষ্টিটিউশনের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ।

মহাকাশের কথা
পৃথিবীর কথা
গাছপালার কথা
জীবজন্তুর কথা
মানুষের কথা
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা
সংস্কৃত সাহিত্যের কথা
জীবনী-বিচিত্রা
দেশবিদেশের সেরা বই
দেশবিদেশের ছড়া(আংশিক)
মহাশূন্যের পথে

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম্. এস্-সি.
ছোটদের সুবিখ্যাত মাসিক পত্র 'রামধনু'র সম্পাদক ও শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ; কলকাতা আশুতোষ কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ; ছোটদের বহু গ্রন্থের প্রণেতা ; সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস রচনায় খ্যাতিমান্ ; শিশুসাহিত্য-পরিষদের সহ-সভাপতি ; বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ১৩৬৯ (কৃষ্ণনগর) ও ১৩৭২ (জলপাইগুড়ি) অধিবেশনের শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি ; 'সায়ান্স ফর চিল্‌ড্রেন'-এর সহ-সভাপতি ; বাংলা শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদকপ্রাপ্ত (১৩৭৪) ।

শিল্পী-পরিচিতি

শিল্প-সম্পাদক

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী ; ভারত সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র-পুস্তকের রচয়িতা ও শিল্পী হিসাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত ; ছোটদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-প্রণেতা হিসাবে ফটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত (১৩৭৪) ; বহু সচিত্র গ্রন্থ-প্রণেতা ; শিশুসাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ।

সহকারী চিত্রশিল্পী

লালা শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাস ও শ্রীসিতাংশুনাথ সেনগুপ্ত
বিশিষ্ট চিত্রকর ।

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষ্ণুশর্মা বললেন " আমি বিদ্যা বিক্রি করিনা..........তবে আপনার ছেলে কটিকে আমার হাতে ছেড়ে দিন."

বিশ্বসাহিত্যের কথা : পৃঃ ৫৪৬

চিত্রশিল্পের কথা

দাগ, ঢ্যাঁড়া, ফুট্‌কি

আমাদের খোকনকে ছবি আঁকতে বললে সে খুব চটপট একটা মানুষ এঁকে দিতে পারে। কেমন করে জান? প্রথমেই সে মস্ত বড় একটা গোল্লা এঁকে ফেলবে—জ্যামিতির ভাষায় যাকে তোমরা বল 'বৃত্ত'। (অবশ্য খোকনের সেই 'গোল্লা' যে সব সময়ে বৃত্তের মতই দেখতে হয় তা ভেব না, কিন্তু খোকনকে তো তা বলা যায় না!) তার পর? তার পর সেই গোল্লার মধ্যে ঢ্যাঁড়া আর ফুট্‌কি দিয়ে নাক, চোখ, মুখ করে দেওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। এবারে নীচে কাঠি কাঠি দু'টো পা আর দু'পাশে কাঠি কাঠি দু'টো হাত—ব্যস্, হয়ে গেল দিব্যি একটা মানুষ। হাত-পায়ে পাঁচটা করে আঙ্গুল যুড়ে দিলে তো কথাই নেই!

খোকনের মানুষ আর রাজার বাড়ীর টিয়া

মনে পড়ে আমরা ছেলেবেলা একটা ছড়া বলে বলে খুব সহজে পাখীর ছবি আঁকতাম। 'দ-এর হ'ল মাথাব্যথা' বলে একটা 'দ' এঁকে ফেলতাম আর তার তলাকার দাগটা আর একটু টেনে ঘুরিয়ে দিতাম ওপরের দিকে। তার পর 'শূন্য এল দেখতে' বলে দ-এর মাঝখানে একটা শূন্য বসিয়ে দেওয়া হ'ত। এর পর 'বসতে দিল দু'খানা ছিয়া'। ছিয়া জিনিসটা ঠিক কি জানি না, তবে ঐ নাম দিয়ে তলায় দু'টো ২ অর্থাৎ ২২ বসিয়ে দিতাম। তার পর? তার পর দ-এর মাথার ওপর দিয়ে ধনুকের মত একটা লম্বা আঁচড় কেটে বলতাম, 'এক টানে হয়ে গেল রাজার বাড়ীর টিয়া।'
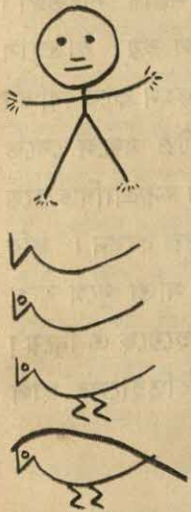
দেখা যেত সত্যিই একটা পাখী হয়ে গেছে।

উপায়টি কে প্রথম বার করেছিলেন জানি না, কিন্তু দেখা যাচ্ছে কয়েকটি টান অর্থাৎ সোজা কিংবা বাঁকা দাগ আর ফুট্‌কির সাহায্যে খানিকটা ফাঁক ভরাট করে নিতে পারলে মোটামুটি কোন একটা জিনিসের নকল করে দেওয়া যায়। একেই আমরা বলি ছবি —বা ভাল কথায় চিত্রশিল্প। মানব-সভ্যতার একেবারে প্রথম যুগে আদ্যিকালের মানুষেরাও ঠিক এই ভাবেই ছবি আঁকা সুরু করেছিল। সেই কাঁচা হাতের এবড়োখেবড়ো দাগ-টানা-

টানিই ধীরে ধীরে কি করে একটি সুন্দর শিল্পকলায় পরিণত হ'ল এবারে সেই গল্প সুরু করা যাক।

ছবির সরঞ্জাম

ছবি আঁকতে গেলে প্রথমেই দরকার তার সরঞ্জাম, আর শুধু সরঞ্জাম জোগাড় হলেই হ'ল না, সে ছবি আঁকবার জমিও ঠিক করতে হবে— অর্থাৎ কিসের ওপর আঁকা হবে সেই ছবি। আমাদের খোকন তার স্লেটেই তার যত ছবি আঁকে। খোকনের দাদা আঁকে তার ড্রইং বুকে। কিন্তু স্লেট আর ড্রইং বুক তো চিরকাল ছিল না, তাই আদ্যিকাল থেকেই মানুষকে এ নিয়ে ভাবতে হয়েছে এবং আঁকবার জায়গা হিসেবে তারা নানান্ রকম জিনিস বেছে নিয়েছে যুগে যুগে। পাহাড়ের গুহায়, পাথরের গায়ে, ঘরবাড়ীর দেয়ালে, বিশেষ ভাবে তৈরী করা পলেস্তারায়, মাটির বাসন-কোসনে, 'প্যাপাইরাস' নামে নলখাগড়ার ছালে, ভূর্জপত্রে, তালপাতায়, কাঠের পাটাতনের ওপর, তুলট কাগজে, কাপড়ে, ক্যান্‌ভাসে, জীবজন্তুর চামড়া থেকে তৈরী পার্চমেন্ট কাগজে—কত রকম জায়গায়ই না মানুষ ছবি এঁকে গেছে! তার পর এখনকার বৈজ্ঞানিক যুগে তো কথাই নেই! কেবল ছবি আঁকবার জন্যই কত বিচিত্র ধরণের কাগজ তৈরী হচ্ছে আজকাল! কে তার ফর্দ দেবে?

কিন্তু শুধু জমি হলেই হবে না, জমির পরেই ছবির জন্য চাই রঙ। এ রঙও নানান্ ধরণের হতে পারে। শক্ত, জমাট-বাঁধা রঙ— যেমন চক্ খড়ি, কাঠকয়লা বা পেন্সিলের শীষ; গোলা রঙ—যা চূণকাম করার মত করে বা দোয়াতের কালির মত নিয়ে ব্যবহার করা যায়; এ রঙ জল মিশিয়ে বা তেল মিশিয়ে তৈরী করা যেতে পারে। তেলে-গোলা রঙ শুকিয়ে গেলে চট্ করে উঠে যায় না জলে-গোলা রঙের মত। কলমের নিবের মত কোন ছুঁচোল জিনিস দিয়ে এই রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার তুলিতে রঙ মাখিয়েও সে রঙ জমির গায়ে মাখানো যেতে পারে। রেখা আঁকার পক্ষে প্রথমটি কার্যকরী, কিন্তু লেপা ছবির জন্য চাই তুলি।

কিন্তু এ সবের চেয়েও ছবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যার—সে কিন্তু জমিও নয়, রঙও নয়। সে হচ্ছে চিত্রকর বা শিল্পী। ছবির বিষয়বস্তু— অর্থাৎ কি নিয়ে ছবি আঁকব আর ছবি আঁকার পদ্ধতি—অর্থাৎ কি ভাবে ছবি আঁকব শিল্পীর কাছে এ দু'টিই হয়তো বড় কথা। ভাল বাংলায় আমরা একে বলতে পারি শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গীরও অদলবদল হয়। ইতিহাস খুললে আমরা দেখতে পাব কেমন করে বিভিন্ন সময়ে শিল্পীর দেখবার চোখটিও বদলে যেতে পারে। শিল্পী তখন নতুন বিষয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে সুরু করেন। ছবি আঁকার এই বৈচিত্র্য সত্যি সত্যি যুগে যুগে পালটেছে—কত রকম পরীক্ষা হয়েছে এ নিয়ে! তাই চিত্রশিল্পের কাহিনীতে ইতিহাসের ছাপ রয়ে গেছে পাতায় পাতায়।

আদিম মানুষের আঁকা ছবি

'ইতিহাসের কথা'র সঙ্গে 'চিত্রশিল্পের কথা' মিলিয়ে পড়লে কাহিনীটি বুঝবার সুবিধা হবে বেশী। স্বভাবতঃই তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে—মানুষ ছবি আঁকতে শিখল কবে থেকে?

তোমরা নিশ্চয়ই জান মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে, বুঝবার সুবিধার জন্য, কয়েকটি যুগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। যে যুগে মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানত না, পাথরের অস্ত্রশস্ত্র বা হাতিয়ার নিয়ে আত্মরক্ষা করত, শিকারও করত—সে যুগকে বলা হয় প্রস্তর যুগ। এর আবার তু'টি ভাগ আছে। যে যুগে এই সব অস্ত্রশস্ত্র খুবই এবড়োখেবড়ো ও অপটু হাতে তৈরী হ'ত সে যুগটাকে বলা হয় প্রাচীন বা পুরোনো প্রস্তর যুগ। তারপর ঐ অস্ত্রশস্ত্রও যখন মানুষ আরও নিখুঁত ভাবে—আরও মসৃণ—আরও ধারাল ভাবে তৈরী করতে শিখল, তখন তাদের সে যুগটাকে বলা হয় নব্য বা নতুন প্রস্তর যুগ। এই যুগে মানুষ মাটির পাত্র তৈরী করতেও শিখল, পশুপালন করতেও সুরু করল।

পণ্ডিতদের ধারণা প্রাচীন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে, অর্থাৎ এখন থেকে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বছর আগে মানুষেরা প্রথম ছবি আঁকার চেষ্টা করতে থাকে। মানুষ তখনও ঘরবাড়ী বানাতে শেখে নি, বেশির ভাগই বাস করত পাহাড়ের গুহায়। তাই কেউ কেউ তাদের 'গুহামানব' বা 'গুহা-মানুষ' নাম দিয়েছেন। গুহামানুষদের ব্যবহৃত এই ধরণের অনেক প্রাচীন গুহা ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে আর স্পেনের উত্তর দিকে পীরেনীজের পাহাড়ী অঞ্চলের নানান্ জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। তোমাদের হয়তো শুনে ভাল লাগবে যে এই সব গুহার কয়েকটি আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় তোমাদেরই বয়সী কয়েকজন অসমসাহসী তরুণের চেষ্টায়। তাদের পোষা কুকুর পাহাড়ী খাদে হারিয়ে যায়। কুকুরকে খুঁজে বার করার জন্য তারা ঐ তুর্গম জায়গায় ঢুকে পড়ে এবং তারই ফলে দেখতে পায় একটি গুহা। শুধু তরুণরা নয়, একটি ছোট্ট মেয়েরও কৃতিত্ব বড় কম নয় এই রকম আর একটি গুহা আবিষ্কারে। মেয়েটি তার বাবার সঙ্গে একটি গুহায় ঢুকেছিল। হঠাৎ তারই নজর পড়ে গুহার গায়ে আঁকা ঐ রকম প্রাচীন ছবির দিকে। তার বাবা কিন্তু প্রথমটা দেখতে পান নি।

আদিম মানুষের পরিত্যক্ত এই সব গুহা নিশ্চয়ই একটা দেখবার জিনিস, কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে ঐ সব গুহার দেয়ালে আঁকা নানা রকম ছবি। ঐ সব ছবি যে সেই আদিম মানুষ অর্থাৎ প্রথম যুগের শিল্পীদেরই হাতে আঁকা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।
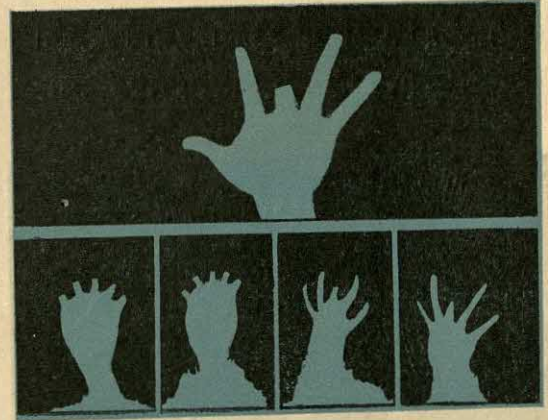
স্বাভাবিক আঙ্গুলবিহীন হাত (ওপরে)
আদিম মানুষের হাতের ছাপ ও ছবি (নীচে)

হাত

এই সব ছবির মধ্যে একটা মজার জিনিস হচ্ছে মানুষের হাতের ছবি। হ্যাঁ, হাতের চেটোর ছবি। পণ্ডিতেরা অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সে যুগের মানুষ হাতকে একটা অত্যন্ত কাজের জিনিস বুঝে

নিয়ে হয়তো তার গুণপনায় মুগ্ধ হয়েছিল। কারণ এই হাত দিয়েই সে অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করত, শিকার করত, আগুন জ্বালত, লড়াই করত বুনো জানোয়ার ও প্রকৃতির সঙ্গে দিনের পর দিন। শুধু তাই নয়, এই হাত দিয়েই সে প্রিয়জনকে আদর করত, সম্বর্ধনা জানাত, নানা ব্যাপারে সাহায্য করত। কাজেই ছবির বিষয়-বস্তু হিসেবে মানুষের হাতকে যে তারা প্রাধান্য দেবে এতে হয়তো অবাক্ হবার কিছু নেই। কি ভাবে আঁকা হ'ত এই হাতের ছবি? কতক ছবি আঁকা হ'ত হাতের চেটোকে গুহার দেয়ালের ওপর রেখে তার চার দিকে রঙ দিয়ে। আবার কতক আঁকা হ'ত হাতের চেটোতেই রঙ লাগিয়ে সে হাত গুহার দেয়ালে চেপে ধরে। হাতের চেটোর ছাপও বলা চলে এগুলোকে। তবে এর থেকেই আর

বাইসনের রঙিন ছবি : প্রস্তর যুগ,
আলতামিরা, স্পেন

একটা বড় অদ্ভুত জিনিস পণ্ডিতদের নজরে এসেছে। হাতের সব ক'টা আঙ্গুল প্রায় কোন ছবিতেই নেই। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? তখনকার মানুষের জীবনযাত্রা কি রকম কঠোর ছিল তাই ধরা পড়ে গেছে ঐ সব ছবিতে। শিকারে বা লড়াই করতে গিয়ে নিশ্চয়ই ঐ আঙ্গুলগুলো কাটা গিয়েছিল।

আবার এর চেয়ে উঁচুদরের ছবিও পাওয়া গেছে কোন কোন গুহার দেয়ালে। অবশ্য এগুলি নিশ্চয়ই কিছু পরের যুগে আঁকা। এর মধ্যে আছে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব বাইসন, অতিকায় লোমওয়ালা হাতী ম্যামথ, ছুটন্ত ঘোড়া প্রভৃতি সেকালের জীবজন্তুর ছবি। স্পেন দেশের আলতামিরা গুহায় একটি বাইসনের ছবি আঁকা আছে যা দেখলে অবাক্ হতে হয়। ফ্রান্সের গুহার মধ্যে 'লাস্কাউ'এর দৌড়-দেওয়া ঘোড়ার সারিও কম যায় না। এই গুহাগুলির দিকে তাকালে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে সে যুগের লোকেরা কি রকম খুঁটিয়ে চারিদিকের জগৎটাকে লক্ষ্য করত।

আদিম যুগে ছবি আঁকার পদ্ধতি

প্রাচীন কালের এই সব দক্ষ শিল্পীরা কি ভাবে ছবি আঁকতেন এ প্রশ্ন মনে আসা খুব স্বাভাবিক কিন্তু এর সঠিক জবাব দেওয়া একটু কঠিন। যে সব গুহার মধ্যে দেয়ালে ছবি পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগই বেশ অন্ধকার জায়গা। যতদূর মনে হয় ছবি আঁকার প্রথম যুগে পাহাড়ের গুহার একেবারে ভিতর দিকে মশাল জ্বালিয়ে সেই মশালের আলোতে বসেই আঁকতেন চিত্রকরেরা। স্পেনের পূর্ব উপকূলের দিকে যে সব ছবি পাওয়া গেছে তা কিন্তু এ রকম অন্ধকারে আঁকা নয়। স্বাভাবিক দিনের আলো এসে পড়ে এ রকম সুরক্ষিত পাহাড়ের গায়েই সে সব ছবি আঁকা হয়েছিল। ছবি

আঁকবার রঙ তৈরী করা হ'ত জানোয়ারের মজ্জা, চর্বি, কালিঝুলি আর লালচে বা কালো মাটি একত্র মিশিয়ে। ছবি আঁকবার তূলি বা কলম তৈরী হ'ত লতাপাতার কাঠি, থেৎলানো বা মুখে চিবোনো ডালপালা দিয়ে। অবশ্য হাতের আঙ্গুলও এ কাজে যথেষ্ট ব্যবহার করা হ'ত। তবে গুহার দেয়াল যদি অমসৃণ বা এবড়োখেবড়ো হ'ত তা হলে পলেস্তারার সাহায্যে তাকে মসৃণ করে নেওয়ার কৌশল এ যুগের শিল্পীদের জানা ছিল না। অনেক সময় দেখা গেছে একটা প্রাণীর ছবির ওপরেই আর একটা প্রাণীর ছবি আঁকা হয়েছে।

যুদ্ধরত তীরন্দাজ, পূর্ব স্পেন

নিশ্চয়ই একই সময়ে এটা করা হয় নি, করেছেন বিভিন্ন যুগের শিল্পীরা। মানুষের দেহকে সরু-মোটা করে তাতে নানা রকম গতিভঙ্গীর রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। আবার রঙ দিয়ে ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে সরু-মোটা খোদাই দাগ দিয়ে, আঁচড় কেটে অথবা ধীরে

শিকারী মানুষ, স্পেন দেশের গুহাচিত্র

ধীরে ফুট্‌কি বসিয়ে একটা সম্পূর্ণ ছবি গড়ে তুলতেও চেষ্টার ত্রুটী হয় নি। কোন কোন ছবি দেখলে মনে হয় সম্ভবতঃ মুখের মধ্যে গোলা রঙ নিয়ে পাহাড়ের দেয়ালে ছিটিয়ে ছিটিয়ে ঐ সব ছবিকে রঙ করা হ'ত। এই ভাবেই স্পেনের পূর্ব উপকূলের মানুষের কাজকর্ম নিয়ে ধীরে ধীরে উৎপত্তি হয়েছিল দৃশ্যচিত্রের।

প্রথম কৃষিভিত্তিক সভ্যতার ছবি

পুরোনো বা প্রাচীন প্রস্তর যুগ শেষ হলে দেখা দিল নব্য প্রস্তর যুগ। মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেকটা উন্নত হয়েছে, তাদের তৈরী অস্ত্রশস্ত্র, হাতিয়ার যদিও এখনও পাথর ঘষেই তৈরী হচ্ছে কিন্তু তার গড়ন অনেক মসৃণ—অনেক উঁচুদরের। বন্য জীবন ছেড়ে এদের অনেকে ঘরবাড়ী তৈরী করে চাষবাস সুরু করেছে, পশুপালন করছে। এক কথায়, মানুষ তখন নানা সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তাই ছবি আঁকবার অবসরও তাদের কমে

গেছে। অবশ্য ছবি আঁকা তারা ছাড়ে নি, কিন্তু এ যুগের মানুষের ছবিতে স্বভাবতঃই একটা নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যাবে এটা বোঝা খুব কঠিন নয়। এই নূতনতর বৈশিষ্ট্যের কথাই এবারে বলব।

এই সময়কার আঁকার যে সব চিহ্ন পাওয়া গেছে তা আগের যুগের মত চোখ-ঝলসানো বা জ্বল্-জ্বল্-করা বড় ছবি নয়, কিন্তু নৈপুণ্যের দিক্ দিয়ে উঁচুদরের। তা ছাড়া ছবি আঁকবার জায়গা বা জমি নির্বাচনেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। সারাদিন শিকার, আর শিকার পাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণের জন্য অখণ্ড অবসর তখন আর মানুষের ছিল না। তা ছাড়া প্রাচীন প্রস্তর যুগের অনেকটাই ছিল একটানা শীতের দিন। বাইরে বরফ আর তুষার-ঝড়ের মধ্যে গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়ে ছবি আঁকবার অবসর ছিল তখন। কিন্তু নব্য প্রস্তর যুগের লোকদের সে অবসর কমে গেল। কত রকমের কাজ তাদের, ছবি আঁকবার সময় কই? কিন্তু স্বভাব তো মানুষের যায় না, ছবি সে আঁকবেই। নতুন পরিবেশে ছবির ধাঁচটা গেল বদলে এই যা। এ যুগের ছবির আয়তন হ'ল ছোট। কোথায় সে ছবি আঁকা হবে? মানুষ গুহায় বাস করা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, কাজেই গুহার পাথুরে দেয়াল আর তার হাতের কাছে নেই; তার বদলে আছে শস্য আর খাদ্য রাখবার মাটির জালা, রাঁধবার বাসনকোসন। বেশ, তারই ওপর আঁকো ছবি, এবং তাই তারা আঁকতে সুরু করল। এই ভাবেই সুরু হ'ল মাটির পাত্রের গায়ে ছবি আঁকা। পণ্ডিতেরা মনে করেন এই নতুন চিত্রকলায় মেয়েরাও এসে যোগ দিয়েছিলেন।

একরঙা ষাঁড়, পাখী ও কুকুরের ছবি, পশ্চিম এশিয়া

মাটির পাত্রে ছবি

পৃথিবীর নানা অঞ্চলে—যেমন ধর মিশর দেশে প্রাচীন মানুষের থাকবার কেন্দ্রগুলিতে, পশ্চিম এশিয়ায়—বিশেষ করে ইরাকে ও প্রাচীন পারস্যে, পূর্ব ইয়োরোপে, চীনদেশে এবং আমাদের ভারতবর্ষে প্রাচীন মাটির পাত্রের অনেক নমুনা পাওয়া গেছে। বিভিন্ন যুগের মাটির পাত্রের গড়ন আর তার ওপরে আঁকা ছবি দেখে সভ্যতার অনেক ইতিহাসও আজ আমাদের জানবার সুবিধা হয়ে গেছে। মিশর দেশে প্রাচীন মাটির পাত্রে নানা রকম জীবজন্তুর ছবি আঁকা দেখতে পাওয়া যায়—জলহস্তী, হরিণ, হাতী ইত্যাদি। এমন কি পুরুত পূজো করছেন—এমন ছবিও আছে। পারস্য ও ইরাকের কোন কোন জায়গায় এই যুগে এবং এর কিছু পরের ব্রোঞ্জ বা তাম্রযুগে গড়া অতি সুন্দর সব পাত্র পাওয়া গেছে। তার কোনটার গায়ে পশুপাখীর ছবি আঁকা, কোনটার গায়ে আঁকা নদী, পাহাড় বা বন। ফিকে রঙের জমিতে গাঢ় কোন একটা রঙ দিয়ে সাধারণতঃ এই সব ছবি আঁকা হ'ত। এই সব শিল্পীরা এ কাজে যে কি রকম দক্ষ ছিলেন তা দেখলে অবাক্ হতে হয়।

কয়েকটা ছবির বর্ণনা শুনলেই আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবে। একটা ছবিতে কয়েক জন লোক গোল হয়ে নাচছে, নাচের ভঙ্গিমার সঙ্গে মাথার চুল উড়ছে। সে এক অপরূপ প্রাণবান্ ছবি। একটা ছবিতে পাখীর উড়ে চলেছে ; আর একটায় নদী বয়ে যাচ্ছে আর দু'পাশে বাঁকে বাঁকে দেখা যাচ্ছে গাছের সারি। কোন কোনটায় বা পাহাড়ী ছাগল, ভেড়া বা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে, সারি সারি সারস দাঁড়িয়ে আছে, গম্ভীর চেহারার বলিষ্ঠ ষাঁড় দাঁড়িয়ে আছে—শিল্পের তার কী বাহার!

এ সমস্ত ছবির মধ্যেই কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত। শিল্পী শুধু মাত্র গভীর এক-রঙা রূপরেখার মধ্যে জরাট ছায়া দিয়ে এই সমস্ত এঁকেছেন। মানুষের শরীর, জানোয়ারের দেহের গঠনের বিশেষ ভাবটি, দাঁড়াবার ভঙ্গীটি তিনি এত সহজেই ধরতে পেরেছেন যে খুঁটি-নাটির মধ্যে না গিয়েও ছবিগুলি বুঝতে কষ্ট হয় না। চারপাশের দৃশ্য ও জীবজগৎটাকে খুব গভীর ভাবে ও গভীর মনোযোগ দিয়ে না দেখলে এ রকম ছবি আঁকা যায় না।

ভারতের সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন ঘাঁটি বালুচিস্তানের পাহাড়ী গ্রামগুলিতে, সিন্ধুর মহেঞ্জোদাড়ো, চানহুদাড়ো, পাঞ্জাবের হরপ্পা ও গুজরাটের লোথালে এত বিচিত্র ছবির নমুনা পাওয়া গেছে যে দেখে আশ্চর্য হতে হয়। কোথাও দেখা যাচ্ছে একটি করে শঙ্খের শীষ আর একটি করে বড়-বড়-চোখে-চেয়ে-থাকা ষাঁড় দিয়ে অথবা শুধু মাত্র ষাঁড়ের মাথা দিয়ে ছবি তৈরী করা হয়েছে। কোথাও দেখা যায় সার-বাঁধা মানুষ, কোথাও বা ঝোপের মধ্যে

ষাঁড় আর গাছের ছবি : কুল্লী, বালুচিস্তান

পাখী, ময়ূরের দল, কোথাও শামুক, কোথাও বা অশ্বথ পাতার বাহার—ফুলের সমারোহ। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় পাহাড়ী গ্রামগুলি ছাড়া
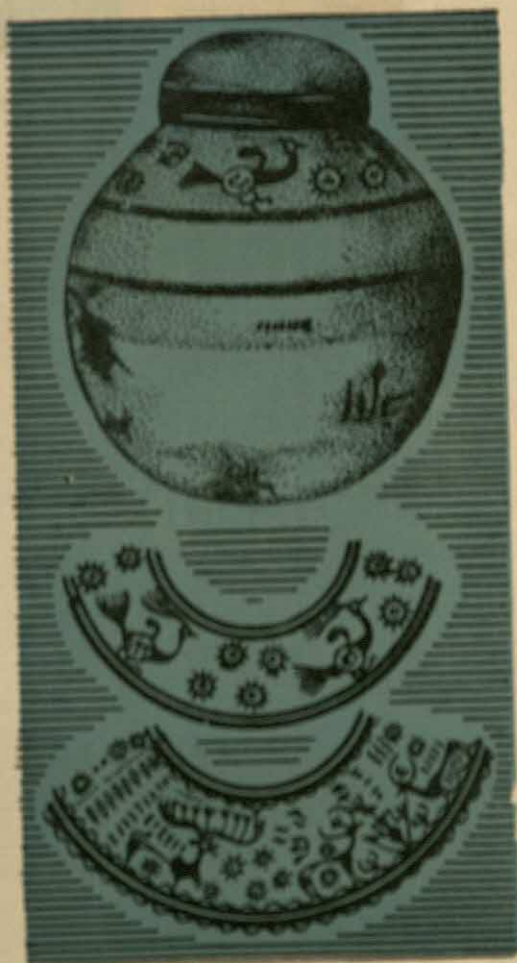
সিন্ধু সভ্যতার চিত্রিত মাটির পাত্র : মহেঞ্জোদাড়ো

প্রায় সর্বত্রই লালচে জমির ওপর কালো রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হ'ত। সিন্ধু সভ্যতার অবসানের পরেও পশ্চিম ও মধ্য ভারতের কোন কোন জায়গায় ঐ যুগের এবং ওর অপেক্ষাকৃত পরের যুগের সুন্দর সুন্দর ছবি-আঁকা মাটির পাত্র টুকরো টুকরো অবস্থায় পাওয়া গেছে। রাজস্থানে ও মহারাষ্ট্রে পাওয়া এ রকম কয়েকটি নমুনা খুবই উল্লেখযোগ্য।

কল্পনায় যেন দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

শুধু মিশর, পারস্য, ভারত ইত্যাদিই নয়, পূর্ব ইয়োরোপ ও সুদূর চীন দেশের মাটির পাত্রের গায়ে ছবির কাজও বেশ সুন্দর ছিল। এই দু' জায়গাতেই লতানে পাড়ের অফুরন্ত জট ও ঢেউ-খেলানো অলঙ্কার দিয়ে ঐ সব পাত্র সাজানো হ'ত। আবার সাইপ্রাস, ক্রীট ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে মাটির পাত্র সাজানো হ'ত নানা রকমের সামুদ্রিক মাছ, হাঙর, অক্টোপাস এবং শামুক-ঝিনুকের ছবি এঁকে।

মাটির পাত্রে ছবি আঁকার পদ্ধতি ছিল নানা রকম। কখনও কাঁচা পাত্র আগুনে পুড়িয়ে নেবার পর কোন শক্ত জিনিস দিয়ে আঁচড় কেটে ছবি হ'ত, কখনও আগে রঙ দিয়ে ছবি এঁকে তার পর পোড়ানো হ'ত। ফলে রঙটা হয়ে দাঁড়াত পাকা। তবে এই সময়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পোড়াবার পর ছবি আঁকার চলন ছিল বলে মনে হয়। অনেক সময়ে বিশেষ বিশেষ মাটির বা রঙের গুণে পোড়াবার পর পাত্রের এবং ছবির রঙ বেশ খানিকটা বদলে যেত।

একটু কল্পনা করলেই যেন দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মেঝেতে গাছের পাতা বা নলখাগড়ার মাদুর ; এক কোণে মাটির তাল পড়ে আছে। রঙ পেষা আর গোলা হচ্ছে। আর একদিকে পাত্র তৈরী করা হচ্ছে হাতে হাতে মাটিতে চাপ দিয়ে, চাকীতে বা একাধিক অংশ যুড়ে যুড়ে। তুলি দিয়ে একমনে রঙ করছেন কারিগর। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে। এ ছাড়া আর কি-ই বা হতে পারে বল ?

মিশরের চিত্রকলা

ছবি আঁকার সত্যিকার ধারাবাহিক ইতি-হাস যদি জানতে চাও তবে তোমাকে আসতে হবে মিশর দেশে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মাটির পাত্রের ওপর যে সব ছবি আঁকা হ'ত তা সবই হ'ত সাদা বা কালো রঙ দিয়ে। সে যুগের জীবজন্তু আর মানুষের চেহারাই এতে আঁকা থাকত। কিন্তু মিশরে যখন 'ফারাও' রাজারা রাজত্ব করতে সুরু করলেন তখনই সেখানে গড়ে উঠল এক অপূর্ব চিত্রলিপি—অর্থাৎ ছবির হরফ। এই হরফগুলিতে ছবির সাহায্যেই মনের ভাবকে

ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। ফলে শিল্পীরা রেখা দিয়ে মনের ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারতেন।

মিশরের এই সব প্রাচীন চিত্রকলার নমুনা দেখা যায় প্রধানতঃ রাজা-রাজড়া আর মন্ত্রীদের সমাধি 'মাস্তাবা'তে। এর পরবর্তী কালে এই জিনিসই দেখা যায় পিরামিডে এবং পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা মানুষের তৈরী গুহামন্দির-গুলিতে। এ সব ছবিতে কিন্তু বিশেষ কয়েকটা নিয়ম মেনে চলা হ'ত—যার ফলে বহুদিন ধরে ওখানকার ছবি আঁকার পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। যেমন ছবির হরফে লেখা, তেমনি ছবি আঁকা—ছু'টোই যেন আগে থেকে ভেবে নিয়ে ছক-বাঁধা ভাবে করা হ'ত।

ছবি আঁকার রীতিনীতি

মিশরীয় শিল্পীরা বরাবরই খুব চড়া রঙ ব্যবহার করতে ভালবাসতেন। ছবি ছাড়া সমাধিতে আরও যে সব অসংখ্য জিনিসপত্র, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি পাওয়া গেছে সে সবের মধ্যেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। রঙিন পাথর অথবা সেই পাথর থেকে ঘষে ঘষে তৈরী রঙ বা রঙের মণ্ড দিয়েও অনেক সময় জিনিসপত্র চিত্রিত করা হ'ত। মোটামুটি রঙ নির্বাচন করা হ'ত এই ভাবে: মেয়েদের রঙ গোলাপী-হলদে; পুরুষদের রঙ বাদামী, কালচে-লাল বা কালো; জমি বা পটভূমির রঙ সাদা বা হলদে। ছবির রেখায় শরীরের সমস্ত খুঁটিনাটিই ফুটিয়ে তুলতে পারতেন এই সব শিল্পীরা। তবে দূরের দৃশ্য ছোট করে এঁকে কাছের দৃশ্য বড় করে আঁকা— ছবি আঁকার এ সব নিয়ম তাঁরা মানতেন না। গোড়ায় গোড়ায় হয়তো এ সব শিল্পচাতুর্য তাঁরা আয়ত্ত করতে পারেন নি, তবে শেষের দিকে হয়তো ইচ্ছে করেই পুরোনো রীতি বহাল রেখেছেন। কেন না, আগেই বলেছি, এ সব ছবি আঁকা হ'ত সমাধির মধ্যে—আর তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মৃতের আত্মার সদ্গতি। কাজেই ছবি 'আঁকার' চেয়ে শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনে ছবি 'লেখার' দিকেই ঝোঁকটা যেন ছিল বেশী।

মিশরীয় সমাধিমন্দিরগুলির দেয়ালে আর প্যাপাইরাসের পুঁথিতে যে সব ছবি দেখতে পাওয়া যায় তাতে মানুষের মুখগুলোকে বেশীর ভাগ সময়েই দেখানো হয়েছে পাশ থেকে। শরীরের মাঝখানটা কিন্তু রাখা হ'ত একটু তের্ছা ভাবে। কদাচিৎ সামনের দিক্ থেকে দেখানো হ'ত। কিন্তু পায়ের দিক্টা আবার পাশ থেকে দেখানোই রীতি ছিল। রঙের মশলা সাধারণতঃ জল আর আঠাল গঁদের সঙ্গে মিশিয়ে লাগানো হ'ত। সাদা রঙ তৈরী হ'ত চূণাপাথর থেকে, হলদে ও লাল রঙ মাটি থেকে, আর নীল, সবুজ রঙ নানা রকম খনিজ পদার্থ বা দামী দামী
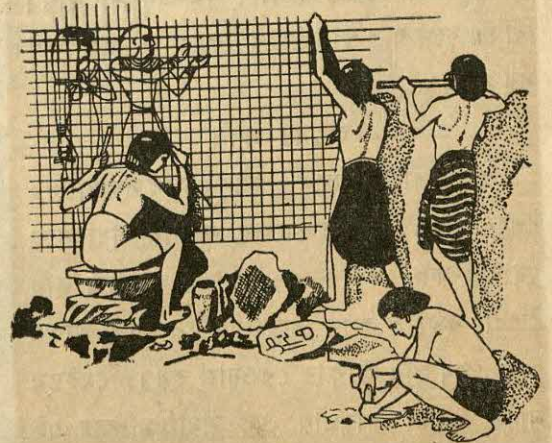
মিশরীয় চিত্রকরেরা কাজ করছেন।
(আনুমানিক চিত্র)

পাথর থেকে। পরবর্তী যুগে ছবির গায়ে একটা বার্নিশের আস্তরণ দেবারও চেষ্টা দেখা যায়। মোম-রঙ বা মোমের পলেস্তারা দিয়েও ছবি আঁকা সুরু হয়। শিল্পীরা ছবি আঁকার আগে জমিটাকে বিভিন্ন আকারের চৌখুপী ঘরে ভাগ করে নিতেন—যাতে ছবিটা মানানসই মাপে হয়।

রাজকুমারী আতেৎএর সমাধিতে আঁকা হাঁসের সারি : মেইডুম
খৃঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রারম্ভকাল

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এই সব ছবির কোন কোনটার মধ্যে নানা প্রতীকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ছবির বিষয়-বস্তুতেও ছিল প্রচুর বৈচিত্র্য। কোথাও চাষবাস হচ্ছে, রাখাল পশু চরাচ্ছে, শিল্পী বা ভাস্কর ছবি আঁকছে বা মূর্তি গড়ছে, শিকারী শিকারে বেরিয়েছে; কোথাও উৎসব হচ্ছে, জলসা চলেছে, গায়ক গান গাইছে, দেবতাদের কাছ থেকে রাজারাণী আশীর্বাদ নিচ্ছেন, রাজা যুদ্ধ-যাত্রায় রওনা হচ্ছেন ইত্যাদি কত রকমের ছবি! বিভিন্ন যুগে বার বার ফিরে ফিরে এসেছে এই সব দৃশ্য।

হাঁসের সারি

প্রথম রাজ্যের যুগে—খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষে ও তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনায় সাধারণতঃ খোদাই-করা কাজের ওপর রঙ লাগিয়ে ছবি তৈরী করা হ'ত। তারপর ধীরে ধীরে আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছবি আঁকার রেওয়াজ হয়। মেইডুম নামে একটা জায়গায় এক সমাধিমন্দিরে এই সময়ের আঁকা একসারি হাঁসের ছবি বিখ্যাত হয়ে আছে। চতুর্থ রাজবংশের সময়ে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম দিকে এই ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল। ঐ সমাধিটি রাজকুমারী আতেৎ-এর। কালো আর মেটে লাল দিয়ে আঁকা এই হাঁসের ছবি তখনকার শিল্পীদের আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়। ছবিতে এক দিকে যেমন হাঁসের সুন্দর রঙ আর দেহের নিখুঁত ভঙ্গীকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় দিয়ে এবং স্বাভাবিক কোন আলোছায়ার কাজ না দেখিয়েও একটা আলঙ্কারিক ভাবও যেন দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। কোন কোন ছবি আবার সবটা আঁকা হয় নি, আর ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে ওটা একজনের হাতের কাজ নয়। এ রকম প্রায়ই হ'ত। একই ছবি বিভিন্ন শিল্পীর মিলিত পরিশ্রমে তৈরী হ'ত। যেমন ধর, কেউ হয়তো ছক কেটে ছবির জমি খোদাই করত, কেউ তার ওপর পলেস্তারা লাগাত, শেষে আর একজন হয়তো রঙ দিয়ে সে ছবি শেষ করত। এ থেকে বোঝা যায়, সে যুগের চিত্রশিল্পীরা সম্ভবতঃ নিজের নিজের প্রতিভাকে স্বাধীন ভাবে ফুটিয়ে তুলবার সুযোগ পেতেন না।

এর পর প্রায় পাঁচশ' বছর হচ্ছে মধ্যবর্তী রাজত্বের যুগ। এরই মধ্যে এল ফারাও দ্বিতীয় মেন্টুহোটেপের আমল। এই সময়কার শিল্প-ধারার পরিচয় পাওয়া যায় থিব্ স্ শহরে এবং দীর-অল্-বাহ্ রীর সমাধি-মন্দিরে। ফারাও তৃতীয় সেসস্ত্রিস এবং তৃতীয় আমেনেমহেৎ প্রভৃতির আমলে চিত্রশিল্পের এবং বিশেষ করে মূর্তিশিল্পের আরও উন্নতি হয়। ছবির জমিনে চৌখুপী ছক কেটে 'গ্রাফ' কাগজের মত করে নিয়ে ছবি আঁকারও চল হয়। এর ফলে মানুষের দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনুপাতটি সঠিক থাকত। এ সময়ে কাঠের ওপর কোন প্রাথমিক আস্তর না দিয়ে আঁকা ছবিরও দু'-একটি নমুনা আমরা দেখতে পাই।

মিশরীয় চিত্রকলার স্বর্ণযুগ

খৃষ্টপূর্ব দেড় হাজার থেকে প্রায় হাজার বছরের মধ্যে মিশরে অষ্টাদশ থেকে বিংশ বংশীয় ফারাওরা রাজত্ব করেন। এটাই মিশরের চিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ। এই যুগেই শিল্পীরা সম্পূর্ণ ভাবে খোদাই করা ভাস্কর্য ছেড়ে স্বাধীন ভাবে ছবি আঁকার সুযোগ পান। অবশ্য এরও একটা ঐতিহাসিক কারণ পণ্ডিতেরা খুঁজে বার করেছেন। এই সময়ে যে সব গুহা-মন্দিরে ছবি আঁকার ব্যবস্থা হ'ত তার দেয়ালের পাথর ছিল এবড়ো-খেবড়ো, মোটা দানার। তাই তার ওপর ছেনি-বাটালি চালানো ছিল কঠিন ব্যাপার। কাজেই এই সব দেয়ালের গায়ে চূণ-মাটির পলেস্তারা দিয়ে সেগুলিকে আগে মসৃণ করে নিয়ে তারপর ছবি আঁকতে হ'ত। কাজেই শিল্পীরাও বাধাহীন ভাবে তাঁদের তূলি চালাতে পারতেন। এই সব ছবিকে কেউ কেউ 'ফ্রেস্কো' বললেও এগুলোকে ঠিক সত্যিকার ফ্রেস্কোর মত দেয়াল-চিত্র বলা চলে না। অন্ততঃ বিশেষজ্ঞদের তাই মত। কারণ এখানে রঙের
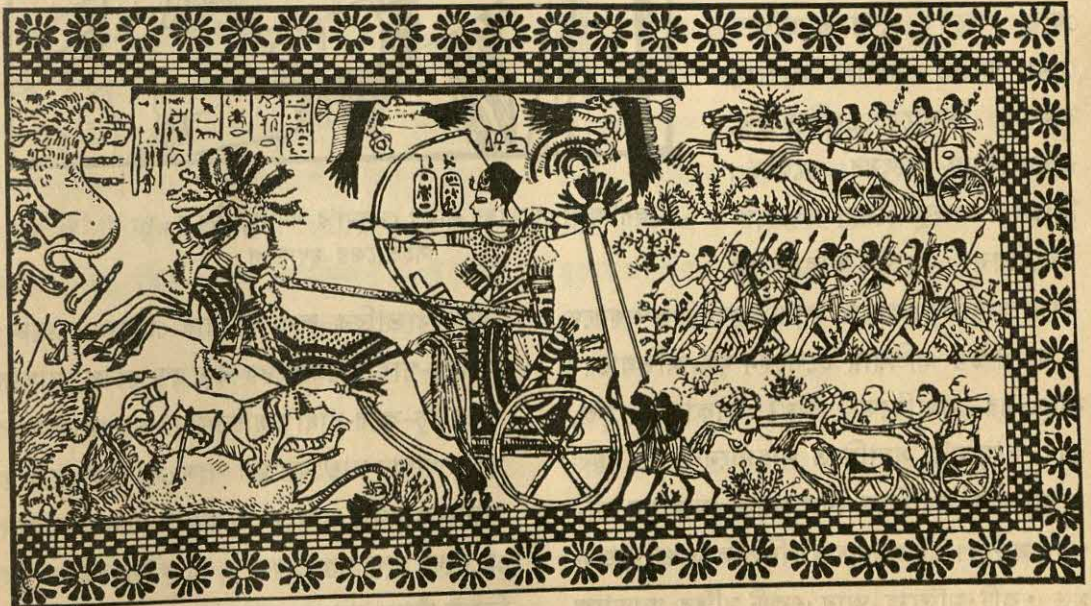
তুৎ-আন্খ্-আমেনএর সিংহশিকারের দৃশ্য : অষ্টাদশ রাজবংশ, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগ

সঙ্গে আঠাল জিনিস মেশানো হ'ত আর রঙ লাগানো হ'ত শুকনো জমিতেই।

এই সময় থেকে মিশর দেশের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা সম্পর্ক ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। মিশরের চিত্রশিল্পেও তার প্রভাব দেখা দেয়। অষ্টাদশ বংশের ইখ্নাতন ছিলেন একজন অতি বিজ্ঞ, বিদ্বান্ ও সংস্কৃতি-অনুরাগী রাজা। তিনি ছিলেন সূর্যের উপাসক এবং সত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। রাজার সেই ব্যক্তিত্বের ছাপ তাঁর রাজ্যের শিল্পকলাতেও এসে পড়েছিল। এই সময়কার কয়েকটি ছবির কথা এখানে বলা যেতে পারে। কোনও ছবিতে দেখা যাচ্ছে বন্দীরা আসছে, রাজা শিকারে বেরিয়েছেন, রাজপ্রাসাদে উৎসব চলেছে। সিরিয়ার রাজকুমারেরা উপহার-উপঢৌকন নিয়ে ফারাও-এর কাছে আসছে। কোথাও ফারাও থুৎমসিস অশ্বরথে চড়ে পশ্চিম এশিয়ায় চলেছেন যুদ্ধ-অভিযানে। নাখ্ৎ-এর সমাধিতে পাখী শিকারের দৃশ্য, নেব্-আমুনে'র সমাধিতে নাচগানের দৃশ্য এবং রামোসে'র সমাধিতে বিলাপরত মেয়েদের ছবি খুবই সজীব। এই সময়কার ছবিগুলিতে প্রয়োজন-মত একটি মূর্তিকে আর একটি মূর্তির আড়ালে রেখে স্বাভাবিক রূপ আনবার চেষ্টাও হয়েছে। নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়েদের বড় বড় চোখ, মাথার ওপর উঁচু-করে-বাঁধা সুগন্ধিদ্রব্যের আধার দেখবার মত। আবার মানুষের মুখ পাশ থেকে না দেখিয়ে অনেক জায়গায় সামনে থেকেও দেখানো হয়েছে। মেয়েদের সূক্ষ্ম বস্ত্র, দেহের সাবলীল ভঙ্গী—সব কিছুই আঁকা হয়েছে অতি নিপুণতার সঙ্গে।

সুসজ্জিতা মেয়েদের ছবি : মেল্না'র সমাধি, থিব্স্ ; খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যভাগ
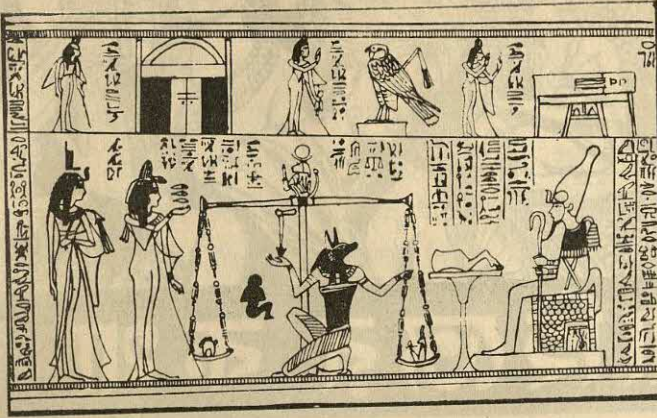
প্যাপাইরাসের পুঁথিতে মৃত আত্মার বিচারের দৃশ্য : দীর-অল্-বাহ্‌রী। একবিংশ বংশ ; খৃঃ পূঃ প্রথম সহস্রাব্দের সূচনায়

বিদেশীরা আসবার পর

মিশরের পরবর্তী রাজবংশে রামেসিস নাম-নেওয়া বিভিন্ন ফারাওদের সময়েও চিত্রশিল্পের স্রোতটি অব্যাহত ছিল। এর পর সেখানে ইথিওপীয়, পারসীক প্রভৃতি নানা জাতির রাজা রাজত্ব করেছিলেন। এঁরা প্রজাদের কাছে অপ্রিয় হবার ভয়ে সেকালকার কোন প্রথা বদলাতে চাইতেন না। ছবি আঁকার ব্যাপারেও তাই। ফলে প্রাচীন মিশরীয় চিত্রশিল্পের ধারা তখনও বেঁচে ছিল। তবে পোষাক-পরিচ্ছদ, কেশচর্চা ইত্যাদিতে বিদেশী ছাপও কিছু কিছু এসে পড়ছিল। এই সব ছবিতে রেখাঙ্কন নিখুঁত হলেও তেমন প্রাণ ছিল না বলে তা আমাদের মনকে তেমন আকর্ষণ করে না।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পারসীকদের হাত থেকে মিশর কেড়ে নেন গ্রীক যোদ্ধা আলেকজাণ্ডার। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সেনা-পতি টলেমী মিশর অধিকার করে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময় থেকেই মিশরের চিত্রশিল্পে একটু একটু করে গ্রীস ও রোমের প্রভাব দেখা দিতে থাকে। প্রাচীন কালের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্ররূপের বদলে যেন আচার-অনুষ্ঠানের দিকেই নজরটা দেওয়া হয় বেশী। তারপর খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রোমের অধিপতি অগাস্টাসের আমলে মিশর রোম সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে নেয়।

মিশরে এই সময়ে গ্রীস ও রোম থেকে অনেক লোক এসে থাকতে সুরু করে দেয়। চালচলনে তাদের অনেকে মিশরীয়দের অনুকরণ করতে থাকে। এমন কি মিশরীয়দের মত এরাও অনেকে মৃত্যুর পর শরীরকে মমি করে রাখার পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। এই সব মমির আধারে এক রকমের ছবি দেখতে পাওয়া যায় যাতে মনে হয় জীবিত মানুষটিকেই ঐ ছবির মধ্যে প্রাণবন্ত করে রাখার চেষ্টা হয়েছে। ফাইয়ুম বা ফেয়ুম মরূদ্যানে এই ধরণের কাঠের ওপর মোম-রঙে আঁকা ছবি পাওয়া গেছে। সে সব ছবিতে মুখের ছবিটাই ভাল করে আঁকার চেষ্টা হয়েছে। দেখলে মনে হয় ছবির মূর্তি পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। এখানেও বিষয় ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে প্রাচীন মিশরীয়ের চাইতে রোমান ভাবটিই যেন বেশী চোখে পড়ে।

পরবর্তী খণ্ডে আমরা একে একে অন্যান্য দেশের এবং আমাদের ভারতীয় চিত্রশিল্পের গল্প শোনাব।

সংস্কৃত সাহিত্যের কথা

সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে গৌরবময় ভাষা, আর এই ভাষায় একদিন এমন সব বই—এমন সব সাহিত্য রচিত হয়েছিল যার যুড়ি সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্যে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। সংস্কৃতকে এখন অবশ্য 'মৃত ভাষা' বলা হয়, তার কারণ এ ভাষায় এখন আর কেউ বড় একটা কথাবার্তা বলেন না। কিন্তু এখনও হিন্দুদের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম—ধর্মোৎসবে সংস্কৃত মন্ত্র ছাড়া চলে না। তা ছাড়া আমাদের দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ঠিকমত জানতে হলে সংস্কৃত জানতেই হবে। কাজেই এই ভাষার সঙ্গে খানিকটা পরিচয় না থাকলে আমরা নিজেদের কাছে নিজেরাই থেকে যাব অপরিচিত। দুঃখের বিষয়, এ যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তিও আজকাল সংস্কৃত শিক্ষার ওপরে তেমন জোর দিতে চান না, ফলে সাধারণের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চা ক্রমেই কমে আসছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের কথা। তবে সংস্কৃতে সুপণ্ডিতের এখনও অভাব নেই এ দেশে, এমন কি বিদেশেও অনেক জায়গায় পণ্ডিতেরা এর চর্চা করে আসছেন—নিজেদেরই গরজে। এ বিষয়ে জার্মান পণ্ডিতদের কথা সহজেই মনে আসে।

সংস্কৃত ভাষার আর একটা গুণ—এমন মিষ্টি, শ্রুতিমধুর ভাষা পৃথিবীতে খুব কমই আছে। সংস্কৃত ভাষায় অনুস্বর, বিসর্গ, সন্ধি ও সমাসের একটু বাড়াবাড়ি থাকা সত্ত্বেও যখন কেউ সুর করে বা আবৃত্তি করে সংস্কৃত উচ্চারণ করে তখন সংস্কৃত-না-জানা লোকেরাও মুগ্ধ হয়ে তা শুনতে থাকে। হয়তো অনেকটা এই কারণেই সংস্কৃত শব্দ দিয়ে অতি সহজে ছন্দ ও শ্লোক রচনা করা সম্ভব হয়েছে এবং যে কোন দুরূহ বিষয়কেই এই রকম ছন্দ বা কবিতায় প্রকাশ করা গেছে। নইলে, শুধু কাব্য, নাটক বা গল্পগাথাই নয়, অনেক নীরস জিনিষ—যেমন ধর অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, আইনকানুন, এমন কি ব্যাকরণের বইকেও যে ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে অর্থাৎ কবিতায় পরিবেশন করা যায় তা কি কেউ কল্পনা করতে পারত? কিন্তু সংস্কৃতে আমরা সেই অসাধ্যসাধনও দেখেছি। ভাষা কতখানি শক্তিশালী হলে তবেই না এ ব্যাপারটি

সম্ভব ? কোন বিষয়বস্তু যদি কবিতায় রচিত হয় তা হলে তা অনেক সহজে মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়—যা গদ্যে লেখা হলে অত সহজে হবার কথা নয়। হয়তো এ জন্যই ছন্দোবদ্ধ শ্লোকের সাহায্যে বেশীর ভাগ গ্রন্থ রচনার রীতি প্রচলিত হয়েছিল সংস্কৃতে। কিন্তু সব ভাষারই কি সে শক্তি আছে ?

'সংস্কৃত' নাম কেন হ'ল

'সংস্কৃত' শব্দটির মানে হচ্ছে যা সংস্কার করা হয়েছে। এ থেকে স্বভাবতঃই মনে হবে, যে, কোন প্রাচীন ভাষাকে নানা ভাবে সংস্কার করে এই ভাষাটি তৈরী হয়েছিল। বাস্তবিকই তাই। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা সেই সিদ্ধান্তেই আসব।

সেই ইতিহাস জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে আজ থেকে বহু সহস্র বৎসর আগে —সেই যেদিন আর্যেরা বাইরে থেকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পারস্যের ভিতর দিয়ে ভারতে এসে ঢুকল, তারপর এ দেশের আদিবাসীদের হঠিয়ে দিয়ে একের পর এক জনপদগুলি দখল করে বসল। তখন থেকেই তাদের নাম হ'ল ভারতীয় আর্য।

আর্যেরা প্রথমটা এসে পশ্চিম পাঞ্জাব আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে তাদের আড্ডা গেড়েছিল। এখন ঐ জায়গার সবটাই প্রায় পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে। কিন্তু আর্যেরা ঐ জায়গাটুকুর মধ্যেই নিজেদের গণ্ডী আবদ্ধ রাখল না—ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের আরও নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রথম দিকে তারা ছিল যাযাবর জাতি ; পশু-পালন ছিল তাদের একটা বড় পেশা, সেই সঙ্গে কিছু চাষবাসও।

আর্যেরা যখন এ দেশে এল তখন এদেশের সব লোকই যে অসভ্য ছিল তা মনে ক'র না। প্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার কথা তো বোধ হয় সকলেই জান। তা ছাড়া এখানে বাস করত সুসভ্য দ্রাবিড় জাতি। কোল ও অনুরূপ অন্যান্য জাতীয় লোকের সংখ্যাও কম ছিল না—যদিও তারা হয়তো অতটা সভ্য হতে পারে নি। তবে এদের সকলেরই নিজের নিজের ভাষা ছিল, ধর্ম ছিল, চালচলনেও ছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। আর্য নয়, তাই তাদের বলা হয় অনার্য। কিন্তু অনার্য হলেই যে সে অসভ্য হবে সে ধারণা ভুল। এই অনার্যেরা আগন্তুক আর্যদের প্রথম দিকে নিশ্চয়ই খুব বাধা দিয়েছিল। পাঞ্জাব অঞ্চলে আর্যেরা সহজেই জয়ী হ'ল, কিন্তু সিন্ধু দেশের সুসভ্য অনার্যদের কাছে তারা এমন বাধা পেয়েছিল যে বহুদিন আর ওদিকে যেতে পারে নি। তখন তারা ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতে—কাশী, কোশল, মগধ, বিহার, অঙ্গ, বঙ্গ, কামরূপ—একে একে প্রায় সবটাই তারা দখল করে নিল, আর এই গোটা জায়গাটার নাম হ'ল আর্যাবর্ত বা আর্যদেশ। দক্ষিণ ভারতে ছিল সুসভ্য দ্রাবিড় জাতি। সেখানে আর্যেরা বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। সেটা দাক্ষিণাত্য নামে অনার্যভূমি হয়েই রয়ে গেল।

ইতিহাসের এ সব ঘটনা আমাদের মোটামুটি সকলকারই জানা আছে। আর্যেরা যেমন নানা দিক্ দিয়ে অত্যন্ত সুসভ্য ছিল, তাদের ভাষাও ছিল তেমনি উন্নত। পরাজিত অনার্যেরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের রীতি-

নীতি, ভাষা—সবই ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে লাগল। কিন্তু সংখ্যায় তারাই ছিল বেশী, কাজেই আর্যদের পক্ষেও তাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়ে থাকা সম্ভব ছিল না। মেলামেশার ফলে তাদেরও অনেক চালচলন, তাদেরও ভাষার অনেক শব্দ আর্যদের ভাষায় মিশে গেল। বিশেষ করে এ দেশে এসে তারা বহু নতুন জিনিস—নতুন মানুষ, নতুন জীব, নতুন গাছপালার সঙ্গে পরিচিত হ'ল যাদের নাম এ যাবৎ অনার্য ভাষা দিয়েই বোঝান হ'ত। আর্য ভাষায় ধীরে ধীরে সে সব শব্দও ঢুকে গেল।

এখন, আর্যেরা ইতিমধ্যেই তাদের বিশুদ্ধ আর্য ভাষায় বেদ রচনা করেছিল, তাই আর্য ভাষার আর একটা নাম ছিল বৈদিক ভাষা। অনার্যদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে এই বৈদিক ভাষা আর আগেকার মত বিশুদ্ধ রইল না, তখন তার মধ্যে অনেক অনার্য শব্দ ঢুকে পড়েছে। অনার্যদের উচ্চারণ-ভঙ্গীও ছিল অন্য রকম। তারা যখন বৈদিক ভাষা উচ্চারণ করত তখন তাও অনেক সময় একটু বিকৃত ভাবেই করত। অনার্য ভাষার অনেক ধ্বনিও এই ভাবে আর্য ভাষা বা বৈদিক ভাষায় আমদানী হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের নিয়মকানুন,—যাকে আমরা বলি ব্যাকরণ,—তাতেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগল।

বৈদিক ভাষায় এই রকম অসংলগ্নতা এসে পড়ায় তখনকার পণ্ডিতেরা ভাবনায় পড়লেন। কেন না ভাষা যদি বিশুদ্ধ না হয়, তার মধ্যে যদি নিয়মকানুনের বাঁধন ভেঙ্গে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তা হলে সে ভাষায় সাহিত্য রচনা করা কঠিন। তখন ঠিক হ'ল এই মিশ্রিত অবিশুদ্ধ ভাষাকে সংস্কার করে শুদ্ধ করতে হবে। সুষ্ঠু ব্যাকরণ তৈরী করে ভাষা যাতে তার রীতিনীতি মেনে চলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

তাই করা হ'ল। ভাষাকে সংস্কার করা হ'ল। তাই এর নাম হ'ল সংস্কৃত। এই ব্যাপারে
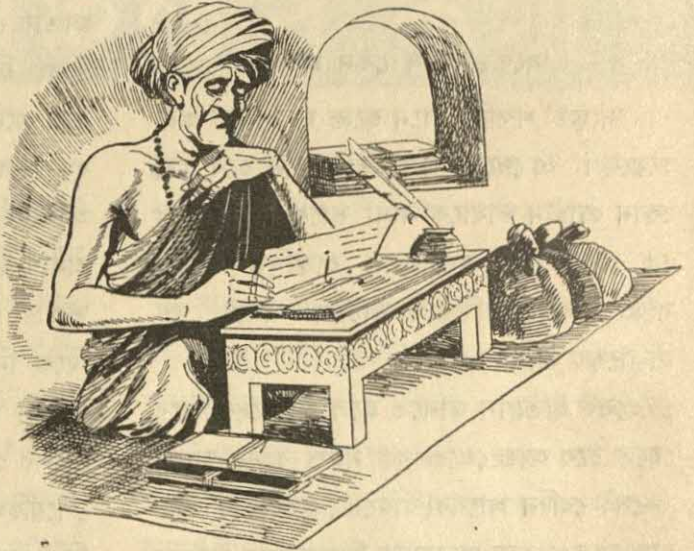
ভাষা সংস্কারে প্রধান ভূমিকা নিলেন পাণিনি

যিনি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন মহাপণ্ডিত পাণিনি। ধরতে গেলে তাঁরই চেষ্টায় —তাঁরই প্রতিভায় এই নতুন ভাষার সৃষ্টি হ'ল। অবশ্য পাণিনির আগেও যে ব্যাকরণ ছিল না এবং ভাষা সংস্কার সুরু হয় নি তা নয়। পণ্ডিতদের মতে পাণিনির আগেও সংস্কৃত অর্থাৎ সংশোধিত বৈদিক ভাষার অনেক নমুনা পাওয়া গেছে, তবে পাণিনিই যে তাকে একটা সুষ্ঠু এবং সম্পূর্ণ রূপ দেন সে বিষয়ে কারোই সন্দেহ নেই। পাণিনি ঠিক কোন্ সময়কার লোক এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, তবে অনেকেরই মত যে তিনি

খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার লোক।

বৈদিক ভাষা আর লৌকিক ভাষা

বৈদিক ভাষার সংস্কারের পর 'সংস্কৃত' ভাষা এই শব্দটির চলন হ'ল। কিন্তু বৈদিক ভাষাও তো আসলে একই ভাষা—সংস্কৃত তার রূপান্তর মাত্র। তাই দু'টোর তফাৎ বোঝাবার জন্য আদি ভাষাটার নাম 'বৈদিক ভাষা'ই রইল, আর সংস্কার-করা ভাষার নাম দেওয়া হ'ল 'লৌকিক ভাষা'। বেদ, উপনিষদ্—এগুলি বৈদিক ভাষায় রচিত। পরবর্তী কালে রচিত গ্রন্থগুলি—যেমন ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য ইত্যাদি লৌকিক ভাষায় অর্থাৎ 'সংস্কৃত' ভাষায় রচিত।

তা পরিবর্তন যথেষ্টই হ'ল। বৈদিক ভাষায় ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি অনেক কম ছিল, বিভক্তির চেহারাও ছিল অন্য রকম। তার ওপর শব্দের সংখ্যা ছিল প্রচুর। লৌকিক ভাষায় অনেক শব্দ ছাঁটাই করে দেওয়া হ'ল, অনেক শব্দের অর্থ বদলে গেল। ফলে দু'টি ভাষায় এত তফাৎ এসে গেল যে লৌকিক ভাষা জানলেই অপরটি বোঝা সম্ভব হ'ত না যদি না ওই ভাষায় দস্তুর মত শিক্ষা গ্রহণ করা হ'ত। বৈদিক ভাষায় শব্দ কত বেশী ছিল সে সম্বন্ধে পতঞ্জলির বলা একটি গল্প শোন ঃ

একবার বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে বললেন, তোমাকে ভাষার শব্দগুলি শিখিয়ে দিচ্ছি। বৈদিক ভাষা দেবভাষাও বটে। ইন্দ্র শুনছেন, বৃহস্পতি বলে চলেছেন। দেখতে দেখতে একদিন দু'দিন করে মাস, বছর পার হয়ে শেষে হাজার বছরও পার হয়ে গেল। বৃহস্পতি বলেই চলেছেন,

বৃহস্পতি বলেই চলেছেন…

ইন্দ্র শুনেই যাচ্ছেন। শব্দ আর ফুরোয় না। অতিরঞ্জন হলেও এর থেকেই বোঝা যায় বৈদিক ভাষায় কত রকম শব্দ ব্যবহার করা হ'ত। লৌকিক ভাষায় এই রকম বহু শব্দ আর তার প্রয়োগ বাদ দিয়ে দেওয়া হ'ল। বিভক্তি বদলে ভাষাকে আরও সুষ্ঠু রূপ দেওয়া হ'ল। ব্যাকরণের বিধিনিষেধের খুব বেশী কড়াকড়ি হওয়ায় ভাষা বিকৃত হবার সম্ভাবনাও কমে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, সেই সময় থেকে এই ভাষার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। নতুন শব্দ যা এসেছে তা নগণ্য। আজও পর্যন্ত যে সংস্কৃত আমরা ব্যবহার করি তা প্রায় সবটাই পাণিনির বিধান মেনে নিয়ে।

সংস্কৃত ভাষা সাধারণের মধ্যে চলল না

কিন্তু এরই ফলে আর একটা কাণ্ড ঘটল। সংস্কৃত ভাষা হয়ে দাঁড়াল বিদ্বান্‌দের—শিক্ষিতদের ভাষা। এই ভাষায় রাজকার্য চলত, নানা সাহিত্য রচিত হ'ল—জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ

সমৃদ্ধ হয়ে উঠল এই ভাষায়। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, নাটক কত কি রচিত হ'ল! কিন্তু সাধারণ লোকে কথ্য ভাষা হিসাবে এ ভাষা গ্রহণ করল না। তারা অত ব্যাকরণের ধার ধারত না। বড় বড় দুরূহ শব্দ উচ্চারণও করতে পারত না সকলে। তারা কথা বলত চলতি প্রাকৃত ভাষায়—: আর্য আর অনার্য ভাষা মিশিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে যা গড়ে উঠেছিল। এই জন্যই দেখা যায় সংস্কৃত নাটক লিখবার সময় নাট্যকার সাধারণতঃ দেবতা, ব্রাহ্মণ, রাজা বা শিক্ষিত লোকদের কথাবার্তায় খাঁটি সংস্কৃত ব্যবহার করলেও অশিক্ষিত বা গ্রাম্য লোকদের মুখে প্রাকৃত ভাষাই যুগিয়েছেন। এমন কি তাঁদের নাটকে মেয়েরা যখন কথা বলছে তখন তারাও কেউ সংস্কৃত বলছে না, বলছে প্রাকৃত ভাষা। বিদূষক ব্রাহ্মণ হয়েও কথা বলছেন প্রাকৃতে।

সংস্কৃত ভাষার এই বাঁধাবাঁধি এবং বাধা-নিষেধই সম্ভবতঃ পরোক্ষ ভাবে তার দারুণ ক্ষতি করেছে। কারণ কোন জীবিত ভাষাকে ও-ভাবে কড়াকড়ির মধ্যে রাখা যায় না—ভাষা নিত্য নতুন সম্পদ্ আহরণ করে আপনিই তার পথ বেছে নেয়। বাংলা ভাষাতেও তো আমরা আজ দেখছি সাধু ভাষার শিকল দিয়ে তাকে আর বেঁধে রাখা যাচ্ছে না, চলতি ভাষা এসে ধীরে ধীরে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে এবং দিচ্ছে—এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও।

কেবল মাত্র শিক্ষিত ও বিদ্বান্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে সংস্কৃত ভাষা সাধারণের ভাষা হয়ে উঠতে পারে নি—এবং ধীরে ধীরে, পরিবেশের পরিবর্তনের ফলে, মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে। এবং ঐ সংস্কৃত থেকেই সম্পদ্ আহরণ করে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন আঞ্চলিক ভাষা—বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, ওড়িয়া, অসমীয় ইত্যাদি ভাষা,—যারা 'সংস্কৃতকে' ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।

সাহিত্যের সুরু : বৈদিক যুগ

'বৈদিক' কথাটি এসেছে বেদ থেকে। বেদ হচ্ছে এই সাহিত্যের আদি গ্রন্থ এবং শুধু এই সাহিত্যেরই নয়, বিশ্বসাহিত্যেরও আদি গ্রন্থ বলা হয় একে। ছোটদের বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৮৫-১৮৯) তোমরা বেদের কথা ইতিপূর্বেই পড়েছ, এবং এও জেনেছ যে শব্দটি এসেছে 'বিদ্' ধাতু থেকে, যার মানে জানা। বিদ্ ধাতু বলতে যা দিয়ে কিছু লাভ করা যায় বা যা দিয়ে কিছু বিচার করা যায় এ রকম অর্থও হয়। পণ্ডিতেরা তাই তিনটি অর্থ মিলিয়ে বলেছেন "বিদ্যতে অনেন ইতি বেদঃ।" অর্থাৎ যে শাস্ত্র বা শব্দরাশি দিয়ে পরব্রহ্ম-স্বরূপ সুখকে বিচার ক'রে এবং জেনে লাভ করা যায় তাই হ'ল বেদ।

আর্য ঋষিরা ভারতে এসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে সৃষ্টিকর্তার অসাধারণ শক্তি ও রূপ দেখে কি করে বেদ রচনায় প্রেরণা পেলেন সে কাহিনীও তোমরা বিশ্বসাহিত্যের কথায় মোটামুটি পড়েছ। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—বেদের এই চারটি ভাগ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ কাকে বলে, সূক্ত কি, মণ্ডল কি—এ সব নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

বেদের পরে বৈদিক সাহিত্য বলতে আমরা বুঝি উপনিষদ্। কিন্তু উপনিষদ্‌কেও বেদেরই অংশ বলা যেতে পারে। এর কথাও তোমরা

এই বই-এর প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৮৯—১৯২) পড়েছ। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব আর ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই—এই হচ্ছে উপনিষদের মূল কথা। "তৎ ত্বমসি" অর্থাৎ তুমিই সেই—তোমাতে আর ব্রহ্মে কোন ভেদ নেই—এই কথাটিই বিভিন্ন উপনিষদে বার বার বলা হয়েছে। উপনিষদে যে ধরণের উচ্চাঙ্গের দর্শন নিয়ে আলোচনা হয়েছে সে রকমটা পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যে আছে বলে আমাদের জানা নেই।

উপনিষদের নানান্ শাখা, তাদের নানান্ নাম। সব যে এক সময়ে লেখা হয়েছে তাও নয়।

উপনিষদ্ হচ্ছে ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষদ্ কথাটার ব্যুৎপত্তি থেকে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে—যে বিদ্যার সাহায্যে খুব শীঘ্র এবং নিশ্চিত ভাবে নিজের স্বরূপ জানা যায়। এ ছাড়া আরও একটা মানে করা যায় কথাটার। শিষ্যেরা গুরুর কাছে (উপ) গিয়ে যেখানে বসতেন (নি-সদ্) সেই ছোট ছোট বৈঠকের নাম ছিল উপনিষদ্। কারণ বৈদিক যুগে গুরুরা এই ভাবেই শিষ্যদের ঐ শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।

বেদ কবে রচিত হয়েছিল

বেদ এবং উপনিষদ্ কবে রচিত হয়েছিল এ নিয়ে এ-দেশের এবং বিদেশের বহু মনীষী বহু গবেষণা করেছেন। একজনের সঙ্গে অপর জনের মত মেলে নি। সংস্কৃত সাহিত্যে ধুরন্ধর পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার সাহেবের মতে যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় হাজার খানেক বছর আগে ঋগ্বেদের রচনা শেষ হয়েছিল। জেকবির মতে আরও আগে, খৃঃ পূঃ ৪৫০৪ শতাব্দীতে। জার্মান্ পণ্ডিত ভিন্তেরনিৎজ্ বলেন যে বেদ রচনা সুরু হয় যীশুখৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ দু'হাজার থেকে আড়াই হাজার বছর আগে, আর শেষ হয় ৭৫০ থেকে ৫০০ বছর আগে। আমাদের দেশের তিলকের মতে কিন্তু বেদ রচিত হয়েছিল আরও আগে, যীশুখৃষ্টের জন্মের ৬০০০ বছর আগে।

১৯০৭ সনে এশিয়া মাইনরে বোঘোজোকোই নামে একটা জায়গায় একটা মাটির ফলক পাওয়া যায়। ফলকটির গায়ে কতকগুলি লেখা খোদাই করা ছিল, আর তারই মধ্যে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য ইত্যাদি কতকগুলি বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ করেছেন যে ঐ ফলকের লিপি লেখা হয়েছিল খৃঃ পূঃ ১৪০০ সালে। এ থেকে নিঃশেষে প্রমাণিত হয় যে বেদ রচনার কাল যত এগিয়েই আনা যাক না কেন, ১৪০০ খৃঃ পূঃ এর আগেই যে তা রচিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উপনিষদের কতকগুলি যে বেদেরই অংশ তা আগেই বলেছি। কাজেই সেগুলিও যে বেদেরই সমসাময়িক তাতে সন্দেহ নেই। তবে অনেক উপনিষদ্ পরবর্তী যুগেও লেখা হয়েছে। এমন কি বৌদ্ধ যুগে বা তারও পরে। এক শ্রেণীর পণ্ডিত তাঁদের মতবাদকে জনপ্রিয় করবার জন্য তাঁদের রচিত শাস্ত্রকে উপনিষদ্ নাম দিতে সুরু করেন। এমন কি মুসলমান আমলে সম্রাট্ আকবরের সময়ে আল্লাহ্‌র নাম থেকে অল্লোপনিষদ্ রচিত হয়। বলা বাহুল্য এ সব গ্রন্থের ভাষা বৈদিক ভাষা নয়, লৌকিক ভাষা—অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত।

মহাকাব্যের যুগ

বেদ ও উপনিষদের পরেই সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য দান হচ্ছে মহাকাব্য। অবশ্য এরই কাছাকাছি সময়ে আমরা ইতিহাস এবং পুরাণেরও দেখা পাই। বেদের শেষ ভাগের রচনায় দেখা যায় যে ইতিহাস আর পুরাণকে খুবই বড় আসন দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে এরাই হচ্ছে পঞ্চম বেদ এবং এগুলি পাঠ করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে মহাকাব্য রচিত হবার আগেই ইতিহাসবেদ বা পুরাণবেদ নামে আলাদা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তবে সবাই এ কথা স্বীকার করেন না। যাই হোক, আমরা আপাততঃ মহাকাব্যের কথাই আগে বলব।

সূত

কুশীলব

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য বলতে বিশেষ ক'রে দু'খানি অমর গ্রন্থকেই বোঝায়—রামায়ণ আর মহাভারত। রামায়ণের মূল বিষয় রাম-রাবণের যুদ্ধ। মহাভারতের--কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। রামায়ণ আদিকবি বাল্মীকির রচনা, মহাভারত ব্যাসদেবের। কিন্তু মূল আখ্যান ভাগ যাঁরই লেখা হোক না কেন, দুই মহাকাব্যের মধ্যেই এমন সব বিচিত্র কাহিনী, বিচিত্র গল্প ও বিচিত্র ঘটনা দেওয়া হয়েছে যা পড়লেই বোঝা যায় যে দু'খানি মহাকাব্যের কোনখানিই একসঙ্গে লেখা হয় নি, এবং নানা সময়ে নানা কাহিনী ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সে যুগে সূত নামে একটি আলাদা জাতি ছিল যাদের পেশা ছিল প্রধানতঃ রাজাদের সারথির কাজ করা। সর্বদা রাজাদের কাছাকাছি থাকার দরুণ তারা স্বচক্ষে যুদ্ধবিগ্রহ দেখবার সুযোগ পেত এবং তারাই মুখে মুখে রাজাদের বীরত্বের কাহিনী রচনা করত, রাজবংশের তালিকা মনে রাখত। আর এক শ্রেণীর লোক ছিল তাদের বলা হ'ত কুশীলব। এরা ছিল গায়ক। রাজা-রাজড়াদের ঐ সব কাহিনী গান গেয়ে বা আবৃত্তি করে তারা নানা জায়গায় প্রচার করত। মহাভারতেও আছে যে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সূত সঞ্জয় সমস্ত কুরুক্ষেত্র-কাহিনী শোনাচ্ছে।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র-কাহিনী শোনাচ্ছে

রামায়ণ

রামায়ণের গল্প তোমরা এই বই-এর প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৯৩—১৯৫) পড়েছ। হাজার হাজার বছর কেটে গেছে, কিন্তু এ গল্প যেন আর পুরোনো হয় না! পরবর্তী যুগে নানা ভাষায় এ বইএর অনুবাদ হয়েছে। যুগে যুগে হিন্দুরা এর আদর্শ থেকে নিজেদের জীবন গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছে। একটা সমস্ত জাতির ওপর একখানা বইএর যুগ যুগ ধরে এমন প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না।

কিন্তু রামায়ণের সবটাই যে এক লোকের লেখা এ কথা পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন না। রামায়ণে সাতটি অংশ। তাই তার নাম সপ্তকাণ্ড। কিন্তু আসলে মূল রামায়ণে ৫টি কাণ্ড ছিল বলেই মনে হয়। প্রথম কাণ্ড (আদিকাণ্ড) এবং শেষ কাণ্ড (উত্তর কাণ্ড) সম্ভবতঃ পরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১ম ও ৭ম কাণ্ডের সঙ্গে ২য় থেকে ৬ষ্ঠ কাণ্ডের ভাষা আর রচনা-ভঙ্গীর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। এমন কি ১ম কাণ্ডের কতকগুলি উক্তি পরবর্তী কাণ্ডের সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যহীন। বাল্মীকি হয়তো রামচন্দ্রকে 'মানুষ' হিসেবেই চিত্রিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাম যে ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার এ কথা প্রমাণ করবার জন্যই যেন ১ম ও ৭ম কাণ্ডে নানা অলৌকিক কাহিনী যুড়ে দেওয়া হয়। অনেক পণ্ডিতের মতে পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণরা তাঁদের নিজেদের স্বার্থেই এ কাজ করেছিলেন

মহাভারত

মহাভারত রামায়ণের তুলনায় অনেক বড় বই এবং মূল কাহিনী ছাড়াও সমস্ত বইখানির মধ্যে এত অসংখ্য কাহিনী, গল্প, রূপক ছড়িয়ে আছে যে সব নিয়ে বইখানিকে একটি গল্পের মণিভাণ্ডার বলা যেতে পারে। বাংলায় একটা কথা চলতি আছে—"যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।" অর্থাৎ 'ভারতে' কিনা 'ভারতবর্ষে' এমন কিছুই নেই যা 'ভারতে' কিনা 'মহাভারতে' পাওয়া যাবে না।

মহাভারতে ছড়ানো এই সব বিচিত্র কাহিনী দেখেও পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ব্যাসদেব মূল মহাভারত রচনা করার পর বহুদিন ধরে তার ভিতর নানা কাহিনী—নানা অলৌকিক ঘটনা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এ কাজও চলেছে বহু দিন ধরে। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, বৈদিক সাহিত্য ছিল ষোল আনা ব্রাহ্মণ-সাহিত্য। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতি, এমন কি ক্ষত্রিয়দের কথাও সে সাহিত্যে বিশেষ ছিল না। পরবর্তী যুগে রামায়ণ-মহাভারতে যখন ঐ সবের সূত্রপাত হ'ল তখন তা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

তখন ব্রাহ্মণেরা ঐ দু'টি মহাকাব্যকেও নিজেদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারের কাজে লাগাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং তারই ফলে তাঁদের কল্পনাজাত নানা ঘটনা ওই দুই কাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হতে লাগল। দেবদেবীর কথা, ধর্মের কথা, নীতির কথা—অনেক কিছুই এসে পড়ল ওর মধ্যে। আঠারো পর্বে রচিত বিরাট মহাভারত ভাল করে পড়লেই বোঝা যায় এ বই নিশ্চয়ই আগাগোড়া এক লোকের লেখা নয়। মহাভারতে কৌরবদের ওপর পাণ্ডবদের জয়কে যদিও অধর্মের ওপর ধর্মের জয় বলে চিত্রিত করা হয়েছে কিন্তু পাণ্ডবদের অনেক ক্রিয়াকলাপও ন্যায়ধর্মের দিক্ দিয়ে সমর্থন করা যায় না। এখানেও ব্রাহ্মণেরা কৌশলের সাহায্য নিয়েছেন। পাণ্ডব পক্ষের প্রধান সহায় কৃষ্ণকে ভগবানের অবতার রূপে চিত্রিত করে তাঁদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে সমালোচনার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা হয়েছে।

কিন্তু এ সব আলোচনার মধ্যে না গিয়েও আমরা কেবল মহাকাব্য হিসেবেই যদি মহাভারতকে বিবেচনা করি তা হলে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। এত অসংখ্য বিষয়বৈচিত্র্যে বইখানি ভরপূর যে এর সমকক্ষ বই বিশ্বসাহিত্যে দু'খানি খুঁজে পাওয়া কঠিন। এর মূল গল্প তোমরা অনেকেই হয়তো জান, কিন্তু এর আনুষঙ্গিক গল্পগুলোও, যে উদ্দেশ্যেই দেওয়া হোক, কম লোভনীয় নয়। এখানে আমরা তার ২।১টি গল্প খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করব।

দধীচির উপাখ্যান

দেবতাদের সঙ্গে দৈত্যদের একেবারেই বনত না। যখন তখন লড়াই বাধত। শত্রুপক্ষের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারলে দু'পক্ষই ছলে, বলে, কৌশলে যুদ্ধজয়ের চেষ্টা করত।

দেবতাদের বলা হ'ত সুর, দৈত্যদের বলা হ'ত অসুর। এই অসুরদের মধ্যে কালেয় নামে একদল অসুর ছিল ভীষণ দুর্দান্ত। তাদের রাজার নাম ছিল বৃত্র। বৃত্র ছিলেন মস্ত বীর আর স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের ওপর ছিল তাঁর ভীষণ রাগ। তিনি একদিন স্বর্গ আক্রমণ করে বসলেন। দেবতারা কেউই যুদ্ধে এঁটে উঠতে পারলেন না বৃত্রের সঙ্গে। বৃত্র স্বর্গ অধিকার করে সেখানকার রাজা হয়ে বসলেন। দেবতারা কোন রকমে পালিয়ে বাঁচলেন।

কিন্তু স্বর্গ ইন্দ্রের হাতছাড়া হয়ে থাকবে এই বা কি রকম কথা? তখন দেবতারা দল বেঁধে ইন্দ্রকে নিয়ে হাজির হলেন ব্রহ্মার কাছে। অনেক স্তবস্তুতি করলেন, তারপর বললেন, "এখন আপনি পরামর্শ দিন কি করা যায়।"

ব্রহ্মা বললেন, "আমি তো দেখছি তোমাদের এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার করতে পারেন পৃথিবীতে এ রকম লোক একটি মাত্র আছেন। তিনি হচ্ছেন দধীচি মুনি। অসাধারণ ধার্মিক ঋষি, আর তেমনি পরোপকারী। তিনি হয়তো এ ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য করতে পারবেন।"

সরস্বতী নদীর ধারে দধীচির তপোবন। সুন্দর, শান্ত পরিবেশ। দেবতারা দধীচির কাছে গিয়ে হাজির হলেন। দেখলেন শুধু যে তপোবনের শোভাই সুন্দর তা নয়, মুনির তেজও যেন সূর্যেরই মত।

দধীচি দেবতাদের অভ্যর্থনা করে বসালেন, বললেন, "বলুন আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি?"

দধীচি হাসিমুখে বললেন, 'এ আর কি কথা!'

ব্রহ্মার পরামর্শ মত দেবতারা বললেন, "আপনি যদি দেহত্যাগ করে আপনার হাড় ক'খানি আমাদের দেন তা হলে আমরা তা দিয়ে অস্ত্র বানিয়ে বৃত্রকে বধ করতে পারি।"

দধীচি হাসিমুখে বললেন, "এ আর কি কথা! আপনাদের কাজে লাগলে নিশ্চয়ই দেব।" এই বলে মুনি তখনই যোগাসনে বসলেন এবং পরমূহূর্তেই প্রাণবিসর্জন দিলেন।

দেবতারা তখন দধীচির সেই পুণ্য অস্থি নিয়ে চলে এলেন বিশ্বকর্মার কাছে। বিশ্বকর্মা স্বর্গের কারিগর, ঐ অস্থি দিয়ে তিনি অস্ত্র গড়বেন।

অস্ত্র গড়া হ'ল। দধীচির অস্থি দিয়ে গড়া সেই অস্ত্রের তেজও দধীচির মতই। অস্ত্রের মুখ হ'ল ছ'টা, আর তার গা দিয়ে তীব্র জ্যোতিঃ বেরোতে লাগল। এই অস্ত্রেরই নাম হ'ল বজ্র। দেবতারা সে অস্ত্র তাঁদের রাজা ইন্দ্রকে দিলেন।

নতুন অস্ত্রে বলীয়ান্ হয়ে দেবতারা গিয়ে স্বর্গ আক্রমণ করলেন। অসুরদের সঙ্গে তাঁদের ঘোরতর যুদ্ধ সুরু হ'ল। প্রথমটা অসুররাই মার মার করে এসে দেবতাদের তাড়া করে নিয়ে চলল। ইন্দ্র তো ব্যাপার দেখে ভয়েই মূর্চ্ছা। মূর্চ্ছা ভাঙ্গলে তিনি নারায়ণের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। নারায়ণ তাঁকে নিজের তেজ আর সাহস দিয়ে ফের যুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন।

এবার বৃত্র বেরিয়ে এলেন যুদ্ধ করতে; ভীষণ গর্জন করতে করতে ইন্দ্রকে তেড়ে এলেন। ইন্দ্র তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে বজ্র ছুঁড়ে মেরেই এক সরোবরের মধ্যে গিয়ে লুকোলেন।

এদিকে বৃত্র যতই তেজীয়ান্ হোন, দধীচির হাড়ে তৈরী বজ্র প্রতিরোধ করা তাঁর সাধ্য ছিল না। বজ্রের আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হলেন, আর উঠলেন না।

স্বর্গ আবার দেবতাদের হাতে ফিরে এল। বৃত্রের অনুচর কালেয় দস্যুরা দলপতির অভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে সমুদ্রে গিয়ে লুকাল।

পরের উপকারের জন্য মানুষ কি করে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে এই উপাখ্যানে তারই কথা বলা হয়েছে।

ব্যাধ ও কপোতের উপাখ্যান

আর একটি সুন্দর গল্প ব্যাধ ও কপোতের উপাখ্যান।

এক ব্যাধ ক্লান্ত হয়ে এক কপোত-কপোতীর বাড়ীতে এসে অতিথি হ'ল। ব্যাধ হচ্ছে কপোত-কপোতীর পরম শত্রু, কিন্তু আজ সে অতিথি হয়ে এসেছে, অতিথি পরম পূজ্য, তাকে আদরযত্ন করে তুষ্ট করাই হচ্ছে গৃহস্থের ধর্ম। কিন্তু সেদিন তাদের ঘরে কোন খাবারেরই যোগাড় ছিল না। অগত্যা কপোত ঠিক করল সে নিজেই আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে নিজের মাংসে অতিথিকে আপ্যায়ন করবে। আগুন জ্বালানো হ'ল। কপোত তাতে আত্মবিসর্জন করল। শুধু কপোতই নয়, সেই সঙ্গে কপোতীও তার অনুগমন করল। মৃত্যুবরণের আগে স্বামীস্ত্রীর মিলিত মাংস দিয়ে ব্যাধকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার অনুরোধ জানিয়ে গেল তারা।

নিজের মাংসে অতিথিকে আপ্যায়ন করবে

আত্মত্যাগের এই মহান্ দৃশ্যে ব্যাধের চৈতন্য হ'ল। জীবহিংসা যে কত বড় পাপ তা বুঝতে পেরে সে চিরকালের জন্য নিজের ব্যবসা পশু-শিকার ছেড়ে দিয়ে ধর্মচর্চায় মন দিল।

আরও অসংখ্য কাহিনী

ছোটদের বিশ্বকোষ ১ম খণ্ডে মহাপ্লাবনের গল্পটি (পৃঃ ৪৬-৪৮) তোমরা পড়েছ। এটিও মহাভারত থেকে নেওয়া। মহাপ্লাবনের সময় ব্রহ্মা মাছ হয়ে কি করে মানুষকে এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টিকে রক্ষা করলেন তারই গল্প সেটা। এ ছাড়া দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার গল্প, শ্রীবৎ-চিন্তার গল্প, সাবিত্রী-সত্যবানের গল্প, নল-দময়ন্তীর গল্প, কদ্রু ও বিনতার গল্প, ব্রাহ্মণ ও বকের উপাখ্যান, ইত্যাদি হাজারো গল্পে ঠাসা রয়েছে মহাভারত। যুধিষ্ঠির সহ পাণ্ডবদের কাহিনীই কি কম? ময় দানবের কীর্তিকলাপ, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, বিরাট রাজার গরু চুরি ও যুদ্ধ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভা, যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও ভীমের প্রতিজ্ঞা, ভীষ্মের শরশয্যা, কর্ণের বীরত্ব, অভিমন্যু-বধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণবধ, ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ, এবং শেষে মহাপ্রস্থানের পথে সবাইকে একে একে হারিয়ে কুকুরবেশী ধর্মকে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের একা স্বর্গে গমন—সমস্ত বইখানি পড়তে পড়তে বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে যেতে হয়। আবার আধ্যাত্মিক দিক্ থেকেও এর মূল্য কম নয়। উপনিষদের সমস্ত ভাগবদ্গীতাখানিই তো এর এক জায়গায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে—ভীষ্ম পর্বে।

কোন্‌টি আগে লেখা?

মহাভারত ও রামায়ণের মধ্যে কোন্‌টি আগে রচিত হয়েছিল এ নিয়েও তর্ক হয়েছে

অনেক। তবে শেষ পর্যন্ত রামায়ণই যে পূর্বে রচিত সে বিষয়ে সকলেই প্রায় একমত হয়েছেন, যদিও ঐ দুই মহাকাব্য রচনার সময়ের তফাৎ যে খুব বেশী নয় এটা অনেকেই অনুমান করেন। সত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি পর পর এই চার যুগ। রামায়ণ ত্রেতা যুগের কাহিনী, মহাভারত দ্বাপরের। রামায়ণের অনেক কাহিনীর উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে রামায়ণের কিছু কিছু অনুকরণও। তা ছাড়া রামায়ণের সমাজ আর মহাভারতের সমাজের পার্থক্যও রামায়ণই যে পূর্বে রচিত সে যুক্তির সমর্থন করে।

রামায়ণ কিংবা মহাভারত কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর নির্ভর করে রচনা করা হয়েছিল কিনা এ নিয়েও পণ্ডিতেরা কম মাথা ঘামান নি। দু'খানি গ্রন্থেই নানা ঐতিহাসিক স্থান ও ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু সে যুগে কোন কাহিনী ফুটিয়ে তুলবার জন্য তার ওপর এত রকম রং চড়ানো হ'ত যে তার মধ্যে কতটুকু খাঁটি আর কতটুকু কাল্পনিক তা খুঁজে বার করা এক রকম দুঃসাধ্যই বলা যেতে পারে। তবে, কোন নির্দিষ্ট ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা মানি আর না মানি, দু' খানি গ্রন্থেই সমসাময়িক যুগের যে সমাজ-চিত্র আঁকা হয়েছে তার ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নয়। এক কথায়, রামায়ণ ও মহাভারত যেন প্রাচীন জনজীবন-যাত্রার এক-একখানি নিখুঁত ছবি। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করলে সেই হাজার হাজার বছরের চলে-যাওয়া দিনগুলি যেন এখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মহাকাব্য কবে লেখা হয়েছিল

বেদ-উপনিষদের মত রামায়ণ-মহাভারতের রচনা-কাল নিয়েও কম গবেষণা হয় নি।

রামায়ণ-মহাভারতের অনেক উপকরণ খুব প্রাচীন যুগ—এমন কি বৈদিক যুগ থেকে সংগৃহীত হয়েছে বলে বিশ্বাস করার কারণ আছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, পণ্ডিতদের অনেকেরই মতে দু'খানি মহাকাব্যই খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক থেকে সুরু হয় আর শেষ হয় খৃষ্টাব্দ ৪র্থ শতকে। এর মধ্যে রামায়ণ সম্ভবতঃ কিছু আগে, খৃষ্টাব্দ ২য় শতকেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

পরবর্তী খণ্ডে আমরা একে একে সংস্কৃত পুরাণ, কাব্য, নাটক ও গদ্যসাহিত্যের কথা আলোচনা করব।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ

দেশবিদেশের রূপকথা

তোমরা সবাই গল্প শুনতে ভালবাস,—সব ছেলেমেয়েই বাসে। গল্পের মধ্যে আবার রূপকথার একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে ছোটদের কাছে। বয়স যাদের অল্প, মন যাদের কচি—বিশ্বাস করবার ক্ষমতাও তাদের অসীম। রূপকথার অগাধ কল্পনা-সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে তাদের মন অতি সহজেই কল্পলোকে উধাও হয়ে যায়। কবির ভাষায়—"কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা,—মনে মনে!"

রূপকথাকে বলা যায় মানুষের সভ্যতার আদিম সঙ্গী। পৃথিবীতে এমন দেশ নেই যেখানে রূপকথার চল নেই। এই সব রূপকথা সেই কোন্ আদ্যিকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে চলে আসছে—তবু কোনদিন পুরোনো হয় না। শুধু ছোটরা কেন, বড়রাও সে সব গল্প শুনে আনন্দ পেয়ে আসছে। এক দেশের রূপকথার সঙ্গে আর এক দেশের রূপকথার মিলও পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। কি করে এক দেশ থেকে বহুদূরে অন্য দেশে এ সব রূপকথা ছড়িয়ে পড়ল তা নিয়েও পণ্ডিতেরা কম গবেষণা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলার কাহিনীতে রূপকথা শোনার একটা চমৎকার ছবি এঁকেছেন। সন্ধ্যার পর সেজ জ্বালিয়ে ঠাকুমা, দিদিমা, কি নিদেন বুড়ী ঝিকে ঘিরে শিশুরা জমায়েৎ হ'ত। শুরু হ'ত রূপকথার গল্প। তখন সে যে কী অদম্য কৌতূহলের সৃষ্টি হ'ত তা বলবার নয়। বীরত্বের কাহিনী শুনতে শুনতে মন উঠত উদ্দীপ্ত হয়ে, দুঃখের কাহিনীতে মন গলে যেত সহানুভূতিতে, ভয়ঙ্কর কিছুর বর্ণনা শুনতে শুনতে মন শিউরে উঠত। তারপর সেই গল্প শুনতে শুনতে কে যে কখন ঘুমিয়ে পড়ত তার ঠিক নেই। ঘুমিয়েও কি পার ছিল? ঘুমের মধ্যেও দেখা হ'ত পরীদের সঙ্গে, রাজপুত্রের সঙ্গী হয়ে চলে আসতে হ'ত রূপমহলের রাজকন্যার খাস কামরায়, যেখানে—

"সোনার খাটে গা, রূপোর খাটে পা" রাজকন্যা ঘুমে অচেতন। শুধু রাজকন্যা কেন, রাজ্যশুদ্ধ লোক অচেতন হয়ে আছে ঘুমে। রাক্ষসপুরীর গা ছম্‌ছমানি। পুকুরে সাত হাত জলের তলায় স্ফটিকস্তম্ভ। সেই স্ফটিকস্তম্ভের

ভিতর ছোট্ট একটি সোনার কৌটোয় রয়েছে একটি কালো ভোমরা। সেটাই হ'ল রাক্ষস-রাজের প্রাণ। রাজপুত্র যদি ভোমরাটাকে তলোয়ারের এক কোপে কাটতে পারে তবেই রাক্ষসটা মারা পড়বে। আর যদি না পারে—? কাটবার আগেই যদি ভোমরা উড়ে পালায়—? উঃ, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! দূরে বুঝি শোনা যায়—

"হাউ মাউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।"

এসে পড়ল রাক্ষস, আর রক্ষা নেই। রাজপুত্র লুকিয়ে পড়ল খাটের তলায়। (এর থেকে নিরাপদ লুকোবার স্থান আর কি হতে পারে?)

এমনি কত কথা, কত কাহিনী রূপকথার মধ্যে ছড়িয়ে আছে! দেশে দেশে তার রূপ আলাদা, ছবিও আলাদা, কিন্তু মূল সুর একই।

এবারে আমরা নানা দেশের সেই সব রূপকথা সংগ্রহ করে তার কিছু কিছু তোমাদের শোনাব।

গ্রীস দেশের রূপকথা

পার্সিয়ুস আর গর্গনের গল্প

এক দ্বীপে পার্সিয়ুস নামে খুব সুদর্শন একটি ছেলে তার মায়ের সঙ্গে বাস করত। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে এল অসীম শক্তি আর মনে এল অদম্য সাহস। তার বীরত্বের কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। শেষে তা দ্বীপের শাসক—রাজার কানে গিয়েও পৌঁছল।

রাজা ভয় পেয়ে গেলেন। কি করে পার্সিয়ুসকে সরিয়ে ফেলা যায় তাই ভাবতে লাগলেন তিনি। শেষে মনে মনে স্থির করলেন পার্সিয়ুসকে এমন একটা বিপজ্জনক কাজে পাঠাতে হবে যা শেষ করে সে আর দ্বীপে ফিরতে না পারে। ঐ ভাবেই তাকে অনিবার্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে হবে।

রাজা একদিন পার্সিয়ুসকে ডেকে পাঠালেন এবং সে এলে তার সাহস ও বীরত্বের খুব প্রশংসা করতে লাগলেন। দুষ্ট লোকের স্বভাবই ঐ রকম; তারা মুখে মিষ্টি ব্যবহার করে আর মনে মনে সর্বনাশা অভিসন্ধি আঁটতে থাকে।

রাজা বললেন, তিনি পার্সিয়ুসের বীরত্বে মুগ্ধ হয়েছেন, তাই তাকে একটি কঠিন দুঃসাহসের কাজ করবার ভার দিতে মনস্থ করেছেন,—অবশ্য যদি পার্সিয়ুস যেতে সাহস করে।

যে কোন কঠিন কাজ করতে রাজী

বীর পার্সিয়ুস বিপদে ভয় পাবার ছেলে নয়, সে উৎসাহিত হয়ে বলল সে যে-কোন কঠিন কাজ করতে রাজী। রাজা বললেন, 'তিনটি রাক্ষসী আছে, তাদের নাম গর্গন। তারা

কোথায় থাকে কেউ জানে না ; তাদের খুঁজে বের করতে হবে। তারপর সন্ধান পেলে তাদের মধ্যে পালের যে সেরা সেই মেডুসার মাথাটি কেটে আনতে হবে।'

অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ। পার্সিয়ুস তা জেনেও সেই কাজ করতে স্বীকৃত হয়ে বাড়ী ফিরে এল।

গর্গন রাক্ষসীরা ছিল তিন বোন—তাদের শরীরের অর্ধেকটা ছিল ড্রাগনের মত, আর বাকি অর্ধেকটা স্ত্রীলোকের মত। তাদের দেহ রূপোর আঁশ দিয়ে ঢাকা, লেজ কাঁসার তৈরী। তাদের হাত ছিল না, ছিল থাবা। আর সবচেয়ে মারাত্মক ছিল তাদের মাথা ; সেখানে চুলের বদলে ছিল শত শত সাপ। আবার এই তিন রাক্ষসীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল মেডুসা। তার চোখের দিকে তাকালে আর কোন মানুষের রক্ষা ছিল না, তক্ষুনি সে পাথর হয়ে যেত।

এমন ভয়ানক গর্গন রাক্ষসীদের খুঁজে বের করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্করী মেডুসাকে হত্যা করে তার মাথাটি কেটে আনতে হবে ; তাও ভুলেও মেডুসার চোখের দিকে তাকানো যাবে না, তাকালেই তক্ষুনি পাথর হয়ে যেতে হবে—সুতরাং পার্সিয়ুস খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। গর্গনরা কোথায় থাকে তাই-ই কেউ বলতে পারে না। তাদের হদিস না পেলে তাদের সঙ্গে লড়াই করবার কথাই ওঠে না। পার্সিয়ুস কি করবে বুঝে উঠতে পারে না।

চিন্তা করতে করতে পার্সিয়ুস পথ দিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় তার সঙ্গে একজন বিদেশীর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। সে লোকটির চেহারা খুব সুন্দর আর তার পায়ের জুতোয় ছোট ছোট দু'টি পাখনা লাগানো। পার্সিয়ুস লক্ষ্য করে দেখল, তার শরীর থেকে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুচ্ছে। এই অপরিচিত লোকটি আসলে মানুষ ন'ন, তিনি হলেন দেবদূত মার্কারি।

পার্সিয়ুসের চিন্তার কারণ শুনে মার্কারি বললেন,—'আমি তোমায় সাহায্য করব। আমি যা বলছি তাই কর, তা হলে তুমি গর্গনদের দেশে যেতে পারবে।'

এই বলে তিনি তাঁর পাখনাওয়ালা জুতো জোড়া তাকে দিয়ে দিলেন—যে জুতো পরলে যেখানে খুশী উড়ে চলে যাওয়া যায়। আর দিলেন তাঁর মন্ত্রপূত তরবারি—যার ছিল আশ্চর্য ক্ষমতা। মার্কারি তাঁর বন্ধু প্লুটোর কাছ থেকে একটি মন্ত্রপূত টুপিও এনে দিলেন। সেই টুপিটি পরলে আর কেউ পার্সিয়ুসকে দেখতে পাবে না। তারপর দেবী মিনার্ভার কাছ থেকে এনে দিলেন একখানি সোনার ঢাল—যার চক্‌চকে পিঠ ঠিক আয়নার মতো উজ্জ্বল, তাতে যে কোন জিনিসের ছবি পরিষ্কার ফুটে ওঠে। সুতরাং মেডুসার দিকে না তাকিয়েও তার মাথাটি কেটে আনা যাবে—ঐ সোনার ঢালে তার ছায়া দেখে। মার্কারি তাকে একটি চামড়ার থলেও এনে দিলেন—যার মধ্যে মেডুসার মাথাটি ভরে আনা যাবে, কারণ মেডুসার কাটা মুণ্ডের চোখের দিকে তাকালেও মানুষ পাথর হয়ে যাবে। চামড়ার থলের মধ্যে থাকলে আর তার সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয় নেই।

মার্কারি তখন পার্সিয়ুসকে বললেন, প্রথমে একচোখো তিন বুড়ীর গুহায় যেতে ; কারণ

তারাই কেবল জানে গর্গনরা কোন্ দ্বীপে থাকে। এই বলেই মার্কারি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
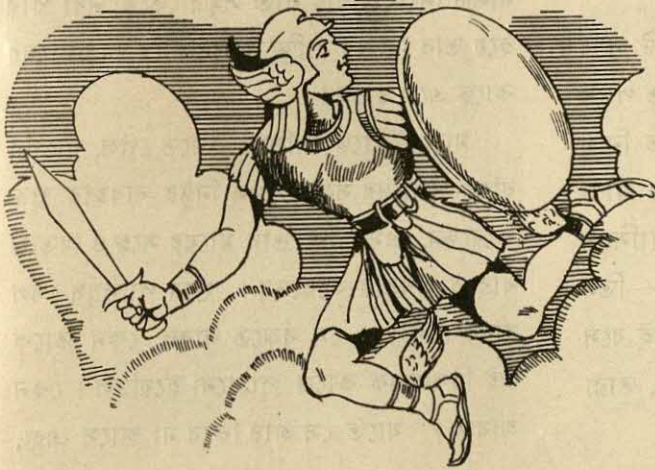
মাটি ছাড়িয়ে ক্রমশঃ আকাশে উঠল

পার্সিয়ুস তখন পাখনাওয়ালা জুতো পরল, মাথায় প্লুটোর টুপি পরল, হাতে মিনার্ভার সোনার ঢাল আর মার্কারির দেওয়া তরবারি নিল, তারপর চামড়ার থলিটি কোমরে বেঁধে সে একচোখো তিন বুড়ীর গুহায় যেতে চাইল। অমনি তার পায়ের পাখনাওয়ালা জুতো তাকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। মাটি ছাড়িয়ে সে ক্রমশঃ আকাশে উঠল; আকাশেও মেঘের মধ্য দিয়ে সে অনেক ওপরে উঠে গেল। তারপর উড়তে উড়তে উড়তে উড়তে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেখানে সেই একচোখো তিন বুড়ীর গুহা তার ঠিক সুমুখে সেই জুতো তাকে এনে নামিয়ে দিলে।

পার্সিয়ুস দেখল, গুহার মুখে তিন বোনের মধ্যে যে সবার বড় সে একটি চোখ পরে বাইরে তাকিয়ে দেখছে, আর দুই বোন অন্ধ হয়ে বসে আছে। তিন বোনের ঐ একটিমাত্র চোখ, তবে সে চোখ দিয়ে পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে সব দেখা যায়। বড় বোন যখন চোখটি নিয়ে দেখছে তখন ছোট দুই বোন কেবলই চোখটি চাইছে—'এবার আমায় দাও, এবার আমায় দাও।'

তিন বোনে তখন চোখটা নিয়ে কাড়াকাড়ি সুরু হ'ল। পার্সিয়ুস সেই সুযোগে চোখটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়েই আকাশে উঠে গেল এবং সেখান থেকে বলল,—'চোখটা আমার কাছে নিরাপদে আছে। গর্গনরা কোথায় থাকে সেই কথাটি যদি বলে দাও তবেই চোখটি ফিরে পাবে, নতুবা আমি চোখটি নিয়ে চললাম।'

গর্গনরা কোথায় থাকে সে কথা এই তিন বুড়ী ছাড়া আর কেউ জানে না। তারা সেই গোপন কথা কিছুতেই বলতে রাজী নয়। কিন্তু এদিকে তিন বোনের একটি মাত্র চোখ, তাও যদি পার্সিয়ুস নিয়ে যায় তবে তো তারা তিন জনেই অন্ধ হয়ে থাকবে। বুড়ীরা কিন্তু অন্ধ হয়ে থাকতেও রাজী তবু গর্গনদের হদিস জানাতে রাজী নয়। পার্সিয়ুস তখন ভয় দেখাল—যদি গর্গনদের সন্ধান তারা না বলে তবে চোখ তো নিয়েছেই, এখন বুড়ীদের দাঁতও সে খুলে নেবে।

এবার আর বুড়ীরা সইতে পারল না। তাদের ভয় হ'ল—এ লোকটির অসাধ্য কিছু নেই। তারা তখন গর্গনরা যে দ্বীপে থাকে তার সন্ধান পার্সিয়ুসকে বলে দিলে; পার্সিয়ুসও আর বাক্যব্যয় না করে বুড়ীদের চোখটা ফিরিয়ে দিয়ে গর্গনদের নির্জন দ্বীপের দিকে উড়ে চলল।

আবার সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে পার্সিয়ুস গিয়ে পৌঁছল সেই রহস্যময় দ্বীপে, যেখানে সেই গর্গন রাক্ষসীরা থাকে।

এবার পার্সিয়ুস প্লুটোর সেই টুপিটি পরে নিল, যা পরলে তাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। মিনার্ভার সেই সোনার ঢাল হাতে নিয়ে তার আয়নার মত চকচকে পিঠে অনেক নীচে কোথায় গর্গন রাক্ষসীরা রয়েছে তাও পার্সিয়ুস আকাশ থেকেই দেখে নিল। সে দেখল—তিন বোন পাশাপাশি বসে আছে আর মেডুসাই বসে আছে দুই বোনের মাঝখানে। মনে হ'ল, তারা তিনজনেই ঘুমে ঢুলছে।

পার্সিয়ুস কিন্তু নীচে নামল না। উজ্জ্বল ঢালে মেডুসার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সে ঢালের ছায়া দেখে আকাশ থেকেই লক্ষ্য স্থির করে মার্কারির দেওয়া সেই ধারালো তলোয়ারটা দিয়ে মেডুসার মুণ্ডুটি কেটে ফেলল। মুণ্ডুটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল আর তার চুলের সাপগুলি ফণা তুলে হিস্ হিস্ শব্দ করতে লাগল। তখনই ঢালের পিঠে ছায়া দেখে পার্সিয়ুস মেডুসার মুণ্ডুটি তলোয়ারের আগায় বিঁধিয়ে চামড়ার থলির মধ্যে পূরে ফেলল।

ততক্ষণে আর দু'টি গর্গন রাক্ষসী জেগে উঠেছে। পার্সিয়ুসকে ধরবার জন্য তারা আকাশে উড়তে লাগল।

কিন্তু মার্কারির মন্ত্রপূত পাখনাওয়ালা সেই জুতোর গতি মনের গতির মতো, তার সঙ্গে গর্গন রাক্ষসীরা পাল্লা দিয়ে পারবে কেন? দেখতে দেখতে পার্সিয়ুস মেঘ ফুঁড়ে অনেক ওপরে উঠে গেল। তারপর মেডুসার মুণ্ডুভর্তি সেই চামড়ার থলিটি নিয়ে আবার সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে তার নিজের বাড়িতে একেবারে তার মায়ের কাছে এসে হাজির।

মায়ের কাছে পার্সিয়ুস শুনতে পেল, দ্বীপের রাজা প্রজাদের সঙ্গে কেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার সুরু করেছেন, এমন কি তার মায়ের সঙ্গেও অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেছেন। শুনে পার্সিয়ুস গেল রাগে ক্ষেপে। সে বুঝতে পারল, কেন তাকে এই বিপজ্জনক কাজে পাঠানো হয়েছিল। কেন আবার? যাতে সে আর ফিরে না আসে এবং,

দুই বোনের মাঝখানে

সে ফিরে না এলে, রাজা মশাই আর কাউকে তোয়াক্কা করবারই দরকার বোধ করবেন না।

পার্সিয়ুস তক্ষুনি রাজবাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। গিয়ে দেখল রাজা মশাই বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে পানভোজনে মত্ত। পার্সিয়ুসকে দেখে রাজা আঁৎকে উঠলেন, তারপর ভাবলেন, পার্সিয়ুস গর্গনদের দেশে যেতে পারে নি, তাই

ফিরে এসেছে। তিনি তাই খুব ঠাট্টার স্বরে বলে উঠলেন—'কি হে বীর পুরুষ, গর্গনদের কাছে যেতে পার নি তো ?'

পার্সিয়ুস রাগে ফেটে পড়ছিল, সে বললে—'আমি যা ধরি তা না করে ছাড়ি না। এই যে এনেছি মেডুসার মুণ্ডু!' —বলেই সে তার চামড়ার থলি থেকে মেডুসার মুণ্ডুটি রাজার সামনে ঢেলে দিয়ে নিজে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

যাঁহাতক মেডুসার সেই বীভৎস মুণ্ডুটির দিকে তাকানো অমনি সেই দুষ্ট প্রকৃতির রাজা মশাই আর তাঁর বন্ধুবান্ধব—সব্বাই পাথরে পরিণত হয়ে গেল।

তারপর ? তারপর আর কি, দ্বীপময় সাড়া পড়ে গেল। সবাই পার্সিয়ুসের সাহস, বুদ্ধি আর বীরত্বের প্রশংসা করতে লাগল। তারপর তারা সবাই মিলে পার্সিয়ুসকেই তাদের রাজা করে নিল। দ্বীপে ফিরে এলো সুখশান্তি।

চীন দেশের রূপকথা

ঘণ্টাধ্বনি

অনেক কাল আগে ইয়াং লো নামে এক রাজা চীনে রাজত্ব করতেন। তাঁরই সময়ে চীনের রাজধানী নানকিং থেকে পিকিং শহরে স্থানান্তরিত হয়। সেই সময়ে পিকিং শহরে অনেক বড় বড় বাড়ি তৈরী হয়েছিল, তার একটি হ'ল ঘণ্টা-ঘর। ঘণ্টা-ঘর তৈরী হলে রাজা বললেন, এখানে খুব বড় একটি ঘণ্টা বসাতে হবে। সে ঘণ্টাটি আকারে হবে সবচেয়ে বড়, তার চেয়ে বড় আর কোন ঘণ্টা গোটা দেশে কোথাও থাকবে না। ঘণ্টাটার শব্দ যেন সারা শহরে শোনা যায়।

কুয়ান-য়ু নামে এক কারিগর ছিল, ঘণ্টা তৈরী করতে তার চেয়ে ওস্তাদ্ সারা দেশে আর কেউ ছিল না। রাজার হুকুম হ'ল তাকেই ডেকে আনবার। কুয়ান-য়ুও তার বাছা বাছা কারিগর এনে তাড়াতাড়ি ঘণ্টা তৈরীর কাজে লেগে গেল।

প্রথমে সবচেয়ে ভালো যে ধাতু তাই সংগ্রহ করা হ'ল। তারপর তা গালিয়ে ঢালবার জন্য একটা বিরাট ছাঁচ তৈরী করা হ'ল। যেদিন ঘণ্টাটা ছাঁচে ঢালাই হবে সেদিন রাজা নিজে এলেন, পাত্র-মিত্র এল, খুব ঘটা ক'রে ঢালাই হ'ল। কিন্তু যখন ছাঁচ থেকে ঘণ্টাটা খুলে বের করা হ'ল, তখন দেখা গেল তাতে একটা ফাটল। কুয়ান-য়ুর এত দিন ধরে এত পরিশ্রম সবই বৃথা গেল।

রাজা খুব হতাশ হলেন, তবু কারিগরকে ডেকে আবার নতুন করে ঢালাই করবার হুকুম দিলেন। কুয়ান-য়ু নিজেও কম দুঃখিত হয় নি, কারণ এর আগে তো কত ঘণ্টা সে ঢালাই করেছে, তার একটাও ফাটে নি। এটার আকার অবশ্য সবচেয়ে বড়। তবু ফাটবার মত কারণ তো ছিল না!

যাই হোক্, আবার সে নতুন করে তোড়জোড় করে কাজ সুরু করল এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আবার একটা মস্ত বড় ঘণ্টা ঢালাই করবার ছাঁচ তৈরী হ'ল।

এবার আরও লোকের ভিড় হ'ল। রাজা এলেন, পাত্র-মিত্র এল। সকলের উপস্থিতিতে আবার নতুন করে ঢালাই-এর কাজ সমাধা হ'ল। আবার ছাঁচ থেকে ঘণ্টাটা খুলে বের করা হ'ল। কুয়ান-য়ু উৎকণ্ঠিত হয়ে দেখতে লাগল,—না,

ঘণ্টাটা ফাটে নি কোথাও। কিন্তু এ কি হ'ল? ঘণ্টাটার চারদিক্‌টা যেন মৌচাকের মত অসংখ্য ছোট ছোট গর্তে ভর্তি! ঘণ্টার ধারটাই যদি এমন ফাঁপা হয় তবে তো তা বাজালে গম্ভীর আওয়াজ উঠবে না! সারা শহর দূরে থাক, কাছাকাছি যারা থাকবে তারাও ভালো ভাবে শুনতে পাবে না।

তবে তোমার দণ্ড হবে শিরশ্ছেদ

রাজা তো ঘণ্টা দেখে রেগে আগুন হলেন। তিনি কুয়ান-য়ুকে ডেকে গম্ভীর ভাবে বললেন,—'তোমায় আরও একবার ঢালাই করবার সুযোগ দেওয়া হবে। কিন্তু এবার যদি ঘণ্টায় কোনও দোষ ঘটে তবে তোমার দণ্ড হবে—শিরশ্ছেদ।'

কুয়ান-য়ু রাজার আদেশ শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে গেল। তারপর ঘণ্টা ঢালাই করবার যত পুঁথিপত্র ছিল সব সে আবার ভালো করে পড়ে দেখলে, দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলে, তবু কিন্তু তার মনের ভয় দূর হ'ল না। ফলে সে সর্বক্ষণ বিষণ্ণ হয়ে রইল।

কুয়ান-য়ু'র একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল, তার নাম ছিল কো-আই। সে তার বাবার এই অবস্থা দেখে মনে মনে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। তার কারণ, দেখতেই সে যে পরীর মত টুকটুকে ছিল তাই নয়, তার মনটিও ছিল ভারি নরম। সে যেমন ছিল কর্তব্যপরায়ণ, তেমনি সে তার বাবাকে ভীষণ ভালোবাসত।

সেই গাঁয়ের পাশের পাহাড়ের গুহায় এক যাদুকর থাকত। কো-আই একদিন তার কাছে গিয়ে তার বাবার এই বিপদের কথা সব খুলে বললে। যাদুকর যদি এই ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারে সে জন্য কো-আই তাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল। যাদুকর অনেক পুঁথিপত্র ঘেঁটে দেখে চুপ করে রইল। কো-আই কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষ পর্যন্ত যাদুকর বলেই ফেললে,—'অত বড় আকারের ঘণ্টা তৈরী করতে হলে তার গলিত ধাতুর মধ্যে কোনও কুমারী কন্যার রক্ত মেশাতে হয়। শাস্ত্রে বলেছে, তবেই সেই ঢালাই হয় নিখুঁত।'

যাদুকরের কথা শুনে কো-আই চমকে উঠল। তারপর নানা কথা চিন্তা করতে করতে বাড়ী ফিরে গেল।

কুয়ান-য়ু আবার কয়েক সপ্তাহ ধরে নতুন করে ঘণ্টা ঢালাই করবার তোড়জোড় করলে।
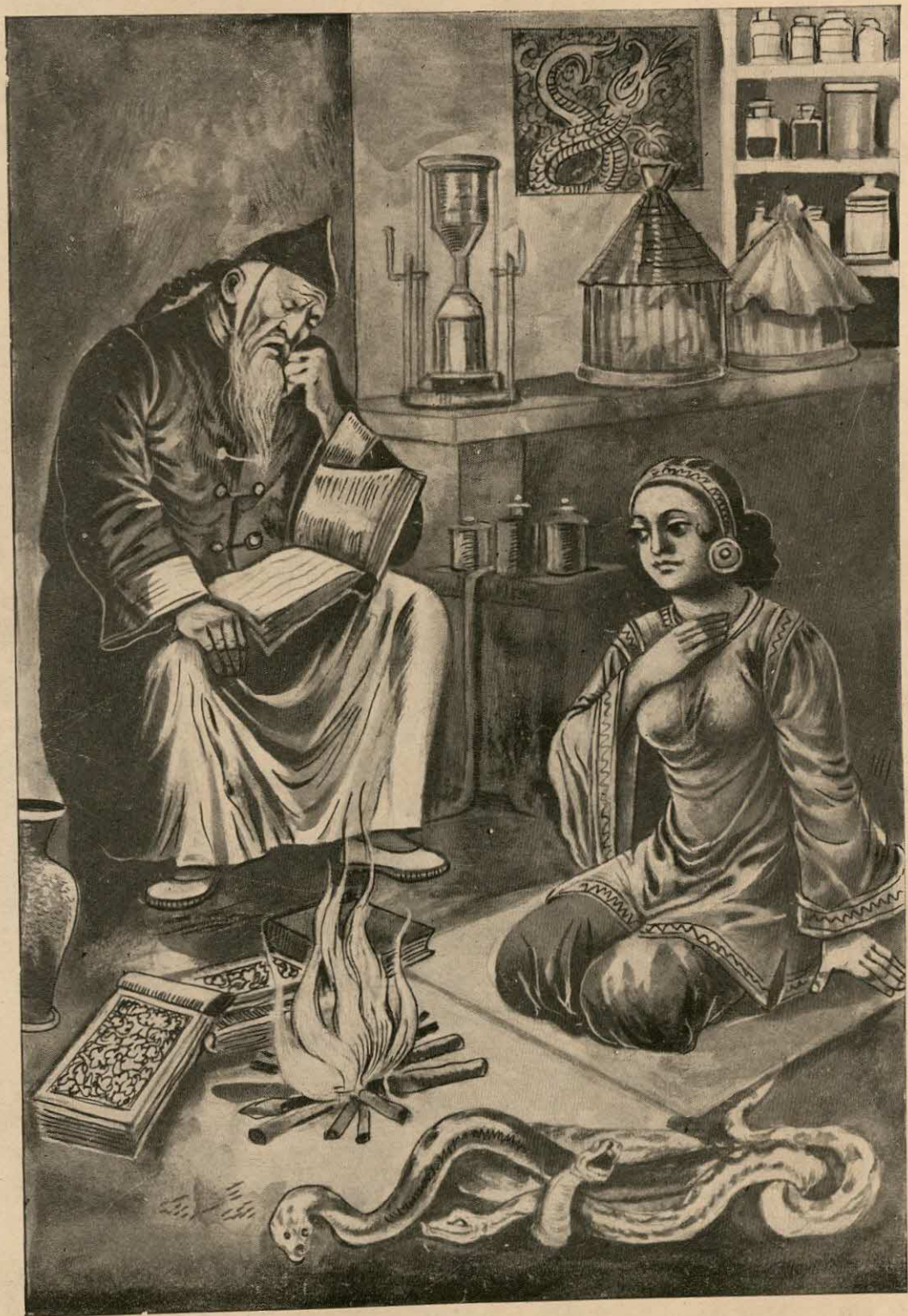
যাত্নকর অনেক পুঁথিপত্র ঘেঁটে দেখে চুপ করে রইল

— দেশবিদেশের রূপকথা : পৃঃ ৩৩৬
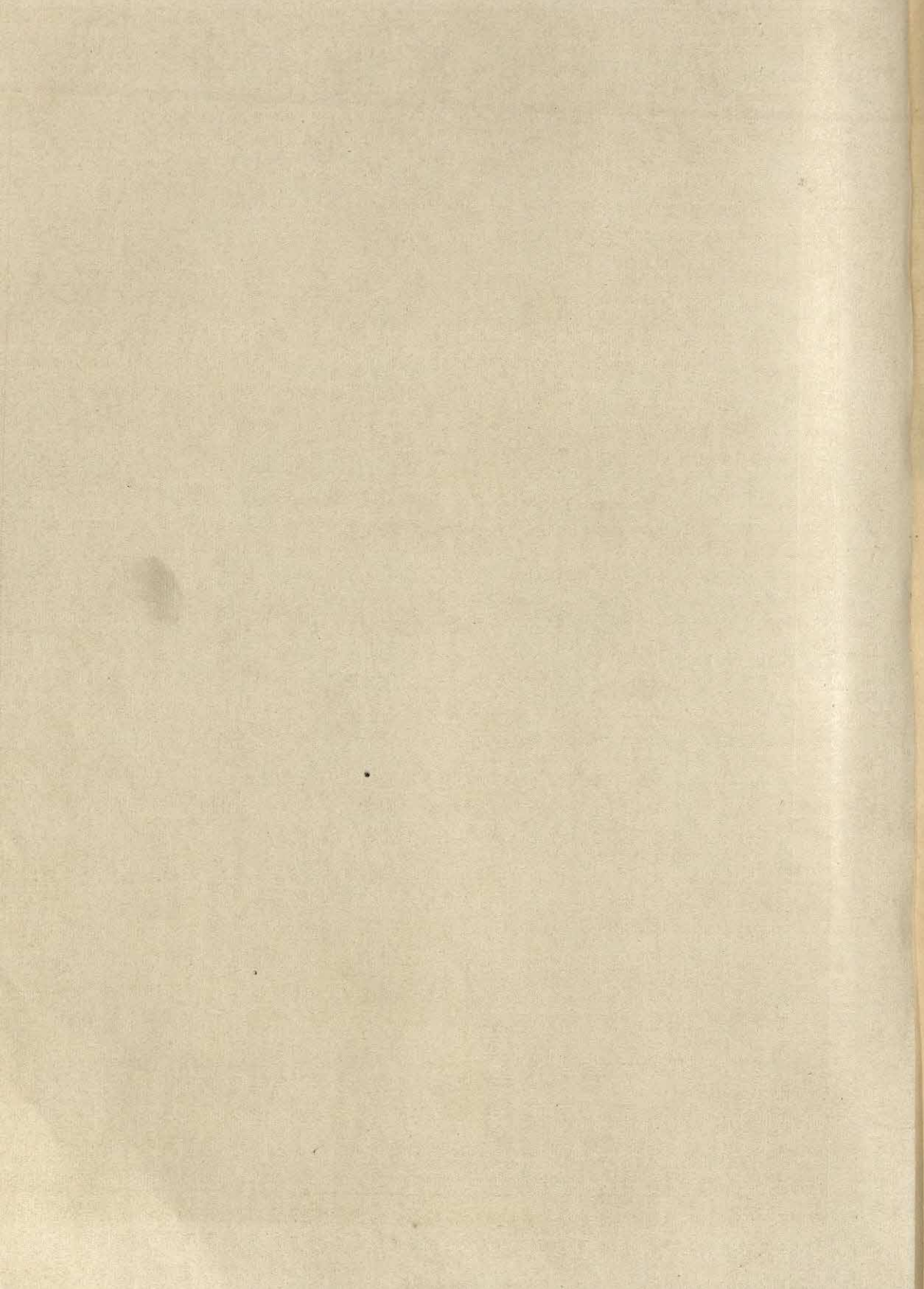
সে এবার খুব সতর্ক হয়ে সব ব্যবস্থা করতে লাগল—যাতে কোথাও কোনও ত্রুটী না থাকে। কো-আই তার বাবাকে উৎসাহ দিয়ে বলতে লাগল, এবার ঘণ্টাটা নিশ্চয় নিখুঁত হবে।

বার বার তিনবার। এবারও আবার ঢালাই-এর দিন খুব লোকজনের ভিড় হ'ল। রাজা এলেন, পাত্র-মিত্র সবাই এল। কিন্তু যখন তরল ধূমায়িত ধাতু ছাঁচে ঢালাই হচ্ছে, তখন হঠাৎ সবাই 'গেল গেল' বলে চীৎকার করে উঠল। সকলের চোখের সুমুখে কো-আই সেই টগ্‌বগ্‌-করা ফুটন্ত ধাতুর মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। তার বাবা তাকে বাধা দেওয়ার জন্য ছুটে গেল। সে তাকে ধরেও ফেলেছিল, কিন্তু তার পায়ের ছোট্ট একপাটি জুতো মাত্র তার হাতে রয়ে গেল, আর কিছুই সে রাখতে পারলে না। সেই জুতোটি হাতে নিয়ে সে ডুকরে কেঁদে উঠল। তার বন্ধুরা তাকে ধরাধরি করে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আশ্চর্যের কথা এই, এবারের ঘণ্টাটা যখন ছাঁচ থেকে খোলা হ'ল, দেখা গেল তা নিখুঁত হয়েছে, কোথাও এতটুকু ফাটা নেই, ফাঁপা নেই। ঘণ্টার গায়ে সূক্ষ্ম কারিকুরিটুকুও চমৎকার ফুটে উঠেছে। ঘণ্টাটি দেখে সবাই খুশী হ'ল।

ঘণ্টা-ঘরে টাঙ্গানো হ'ল ঘণ্টাটি। তারপর বাজানো হ'ল। অত বড় ঘণ্টা—গং করে বেজে উঠে বহু দূরে ভেসে যাবে তার স্বর—কিন্তু তার বদলে শব্দটা যেন বাজতে লাগল—"হ্‌শিয়ে' 'হ্‌শিয়ে' করে। চীনা ভাষায় জুতোকে বলে 'হ্‌শিয়ে'। সে শব্দ শুনে সবাই বলাবলি করতে লাগল—কো-আই তার জুতো চাইছে।

সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত সেই বৃহৎ ঘণ্টাটি বাজলেই শোনা যায় কো-আই তার জুতো চাইছে।

সেই টগ্‌বগ্‌-করা ফুটন্ত ধাতুর মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।
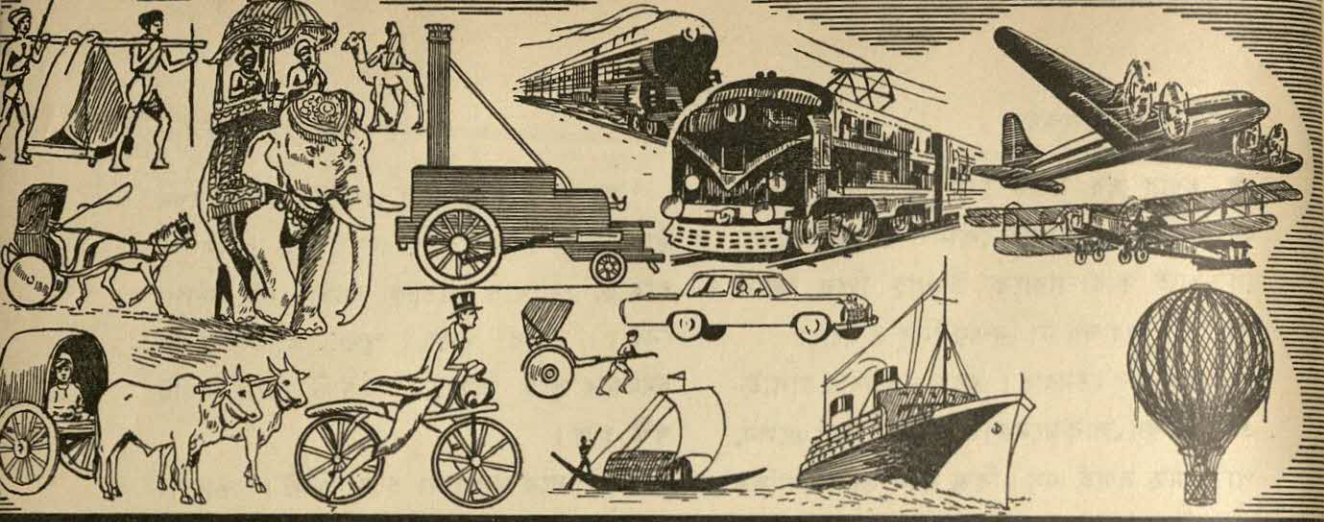
যানবাহনের কথা

চলতে হলেই গাড়ী চাই

নন্তুরা কলকাতায় থাকে। নন্তুদের বাড়ী থেকে তাদের স্কুল অনেক দূরে, কিন্তু নন্তুর তাতে কোনই অসুবিধা নেই। তার বাবার আছে মস্ত মোটর গাড়ি, তাইতে চেপে সে রোজ স্কুলে যাতায়াত করে। পৌঁছে যায় যেমন মুহূর্তের মধ্যে, ফেরেও তেমনি তাড়াতাড়ি। নন্তুর বন্ধু শ্যামল, চঞ্চল, বীরু—এদের কারো কিন্তু এ সুবিধে নেই। না থাকুক, তাদের জন্য রয়েছে সরকারী বাস্, বিদ্যুৎ-টানা ট্রাম। তাইতেই যাতায়াত করে তারা। একটু ভিড় হয়, তা কি আর করা যাবে? শ্যামল অবশ্য মাঝে মাঝে স্কুটারে চড়ে যায়। নিজে চালায় না; তার দাদা চালান, সে পেছনে বসে থাকে। শ্যামলের ছোট বোন রীণা স্কুলে যায় রিক্সা চেপে।

বড় বড় শহরে আজকাল যাতায়াতের এই ধরণের হরেক রকম সুবিধা হয়েছে। ইয়োরোপ এবং আমেরিকার খুব বড় বড় শহরে আবার রাস্তার ভিড় এড়াবার জন্য রয়েছে মাটির তলায় রেল—যাকে বলে টিউব রেলওয়ে বা আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলওয়ে।

কিন্তু ছোট শহরে বা পাড়াগাঁয়ে যাতায়াতের এত সুবিধে নেই। তবে একেবারে কিছু নেই বললে ঠিক বলা হবে না। যারা চড়তে জানে তারা হরদম সাইকেলে চড়ে এদিক্ ওদিক্ যায়। যাদের সে সুবিধে নেই তারা চড়ে সাইকেল-রিক্সা। গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ি—একা, টাঙ্গা—এগুলোও আছে অনেক জায়গায়।

কিন্তু দূরদেশে যেতে হলে? আজকাল অবশ্য ভাল ভাল রাস্তা তৈরী হওয়ায় মোটর বা বাসে শত শত মাইল পাড়ি দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। এমন কি কোন কোন শখের ভ্রমণ-কারী শুধু মাত্র সাইকেল সম্বল করে সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন। কিন্তু সে হ'ল ব্যতিক্রম। দূরদেশে যেতে হলে, বিশেষ করে যদি মালপত্র বেশী থাকে, তবে রেলগাড়ীই হচ্ছে সবচেয়ে আরামদায়ক।

গাড়ী তিন জাতের

এই তো গেল ডাঙ্গায় চলাফেরা। কিন্তু শুধু ডাঙ্গায় নয়, জলপথেও আমরা কম যাতায়াত করি না। ভেলা, শালতি, ডোঙ্গা থেকে সুরু করে নৌকো, মোটর বোট, লঞ্চ, ষ্টিমার, জাহাজ—কত কি এ জন্য ব্যবহার করা হয়! হালে আবার জলস্থল ছেড়ে অন্তরীক্ষেও, অর্থাৎ আকাশপথেও চলাফেরা সুরু হয়েছে যথেষ্ট। নানা রকম উড়োজাহাজ তৈরী হচ্ছে এ জন্য। কলকাতায় সন্ধ্যাবেলা তার একটায় চাপলে ভোর বেলাই তুমি লণ্ডন শহরে পৌঁছে যেতে পার।

আকাশপথে চলাটা হালের আমদানী বললাম, কিন্তু পুরাণের কাহিনীতেও আকাশ-পথে চলার নজির দেখতে পাই। যেমন রাবণ
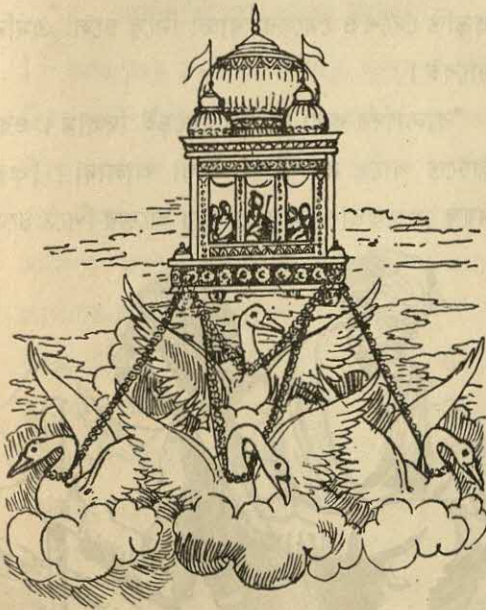
পুষ্পক রথ

রাজার ছেলে মেঘনাদ মেঘের আড়ালে গিয়ে যুদ্ধ করছেন, রাবণবধের পর রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে পুষ্পক রথে আকশপথে দেশে ফিরছেন। কবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশ কাব্যে এর ভারী চমৎকার একটা বর্ণনাও দিয়েছেন। ও গল্প বিশ্বাস করতে হলে বলতে হবে সে যুগেও উড়োজাহাজ গোছের কিছু একটা ছিল। নারদ মুনি নাকি ঢেঁকিতে চড়ে আকাশ-পাতাল চষে বেড়াতেন। ঢেঁকির চেহারাটাও অনেকটা প্রথম যুগের এরোপ্লেনের মত নয় কি,—অবশ্য ডানা দু'টো বাদ দিলে? একজন নামকরা লেখক নারদের এই বাহনের নাম দিয়েছিলেন 'ঢেঁকিপ্লেন'। অবশ্য উড়ন্ত হাঁসে-টানা পুষ্পক রথের কল্পনাও কেউ কেউ করেছেন।

যাই হোক, এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে জলে, স্থলে বা আকাশে—যেখান দিয়েই আমরা যাতায়াত করি না কেন তার জন্য আমাদের উপযুক্ত বাহন দরকার এবং সে বাহনের আকৃতি নির্ভর করবে প্রধানতঃ আমাদের যাত্রাপথের ওপর। মোটর গাড়ী যেমন আকাশে উড়তে পারে না, তেমনি মোটর বোটও চলতে পারে না কলকাতার রাস্তায়। তবে ২য় মহাযুদ্ধের সময় আমরা এমন মোটর গাড়ীও দেখেছি যা রাস্তা দিয়ে যেমন চলে তেমনি দরকার পড়লে, চাকা গুটিয়ে, জলেও নেমে পড়তে পারে, আর তখন হয়ে যায় মোটর বোট। যুদ্ধের সময়েই সাধারণতঃ এ সব গাড়ী ব্যবহার করা হয়। এদেরকে বলা হয় 'অ্যাম্‌ফিবিয়ান্' বা 'উভচর' গাড়ী।

যুগে যুগে এই সব গাড়ীর চেহারা বদলাচ্ছে। দশ-পনেরো বছর আগে যে মডেলের মোটর গাড়ী দেখা যেত এখন আর তা বড় চোখে পড়ে না। এরোপ্লেনের বেলায় এই পরিবর্তন খুব ঘন ঘন হচ্ছে। জলযানের অর্থাৎ জলের গাড়ীর বেলাতেও সেই একই কথা।

যানবাহনের শুরু

কিন্তু যানবাহনের এই যে ক্রমোন্নতি তা কি দু'-দশ বছরে সম্ভব হয়েছে? নিশ্চয়ই তা নয়।

ছোট্ট খোকা হাঁটতে পারে না। তা হলে এ ঘর থেকে ও ঘরে সে যায় কি করে?

বাপের ঘাড়ে দু'পা ছড়িয়ে আরামে···

কেন, কোলে চড়ে! শুধু এ ঘর থেকে ও ঘর কেন, পাশের বাড়ী বা আরও দূরে যেতে হলেও খোকার কোন অসুবিধে নেই। মা, বাবা বা দাদা-দিদির কোলে উঠে দিব্যি হাসি-মুখে সে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সাঁওতাল বা পাহাড়ী মেয়েদের দেখেছ কখনও? দেখবে পিঠের ওপর একটা ঝোলার মত বেঁধে তার মধ্যে বাচ্চাটাকে দিব্যি বসিয়ে নিয়ে কাজ-কর্ম করে চলেছে; দরকার হলে ঐ ভাবেই দূরের গ্রামে পাড়ি দিচ্ছে। শুধু মায়ের কথাই বা বলি কেন, বাপের ঘাড়ের ওপর দু'পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে বাচ্চারা চলেছে দিব্যি আরামে এ-

বাচ্চাটাকে দিব্যি ঝোলায় বেঁধে নিয়ে চলেছে।

পাড়া থেকে ও-পাড়া—এ রকম দৃশ্যও পাড়াগাঁয়ে হরদম দেখা যায়। চীন, ব্রহ্ম, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি দেশেও মেয়েরা বাচ্চা নিয়ে চলে এমনি ভাবেই।

বাচ্চাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। ওরা হাঁটতে পারে না, ওদের কথা আলাদা। কিন্তু বয়স্ক লোকেরাও যে সময় সময় অন্যের পিঠে চড়ে

কোন কোন তীর্থস্থানে এ রকম পিঠে চড়ে চলার রেওয়াজ আজও আছে।

চলাফেরা করে তা ভাবতে পার কি ? পাহাড়ের ওপরে রয়েছে মন্দির, সেখানে গিয়ে দেবদর্শনে অক্ষয় পুণ্য, কিন্তু পাহাড়ে ওঠার শক্তি নেই। তখন ? লোকের ঘাড়ে বসে যাওয়া ছাড়া উপায় কি ? আর পয়সা দিলে এ রকম বাহন পাওয়াও কিছু কঠিন নয়। ভারতের কোন কোন তীর্থস্থানে এ রকম পিঠে চড়ে চলার রেওয়াজ আজও আছে।

কাজেই, দেখা যাচ্ছে, চলাফেরার ব্যাপারে আদিম উপায় পৃথিবীর সব দেশেই হ'ল অন্যের কোলে, পিঠে বা কাঁধে চড়ে যাওয়া। এক সময়ে আদিম সমাজের মাতব্বর ব্যক্তিরা সম্ভবতঃ এমনি ভাবেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাফেরা করত।

বাহন হিসেবে পশুর ব্যবহার

আজকের মতই সেকালের মানুষও বুদ্ধিতে ছিল সব প্রাণীর সেরা। কাজেই চলাফেরার ব্যাপারেও যে তারা অনেকটা উন্নতি করবে তা তো বলাই বাহুল্য। তাই বনের পশুকে বশ মানিয়ে তাদেরকেই তারা বাহন হিসেবে কাজে লাগাতে লাগল। ঘোড়া বা গাধার পিঠে চড়ে তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াত করতে লাগল—মালপত্তর আনা-নেওয়ার কাজও চলল ঐ দু'টি পশুর সাহায্যে। সেকালের যাযাবর জাতিরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার কাজে ষাঁড় এবং গরুও ব্যবহার করত। তবে এ ব্যাপারে দ্রুতগামী ঘোড়ার ব্যবহারই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

তোমাদের হয়তো অজানা নয় যে আর্যেরা ভারতে আসবার বহু আগে থেকেই এ দেশে ছিল অতি উন্নত এক সমাজব্যবস্থা—যার নাম সিন্ধু-সভ্যতা। কিন্তু এরা ঘোড়ার ব্যবহার জানত না। আর্যেরা ঘোড়ার পিঠে চড়েই চলাফেরা করত। সিন্ধুবাসীদের হঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আর্যদের সফলতার মূলে এই ঘোড়া যে অনেকখানি দায়ী তাতে সন্দেহ নেই। আর্যেরা দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে দেশবিদেশে যেত—যুদ্ধ-বিগ্রহ করত। সত্যি কথা বলতে গেলে, ঘোড়ার মত মূল্যবান্ সম্পদ্ তাদের কাছে আর কিছু ছিল কিনা সন্দেহ।

আর্যেরা যে দেশেই কোন অভিযান চালিয়েছে সেখানেই ঘোড়া ব্যবহার করেছে। আমাদের দেশের প্রাচীন কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতিতে ঘোড়ার গুণকীর্তন সর্বত্র। তোমরা অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা নিশ্চয়ই শুনেছ। কোন রাজা সর্বশক্তিমান্ বলে পরিচিত হতে চাইলে তিনি সর্ব-সুলক্ষণযুক্ত এবং মন্ত্রপূত একটি ঘোড়ার গলায় বা কপালে একটি ঘোষণাপত্র ঝুলিয়ে সেটিকে ছেড়ে দিতেন। এই পবিত্র অশ্বের রক্ষক থাকত রাজার লোকজনেরা। কোন রাজ্যে সে অশ্ব প্রবেশ করলে সে দেশের রাজাকে সসম্মানে সে ঘোড়া ধরে রক্ষকদের সম্মান জানাতে হ'ত অর্থাৎ অশ্বমেধ যজ্ঞকারী রাজার বশ্যতা স্বীকার করতে হ'ত। আর তা করতে না চাইলে ঘোড়া আটকে সে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হ'ত। তখন সেই রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে ঘোড়াকে মুক্ত করতে হ'ত। এমনি ভাবে সকল দেশ জয় করার পর ঘোড়া ফিরে আসত আপন দেশে। তারপর সেই ঘোড়ার মাংস দিয়ে যজ্ঞ সমাপন করা হ'ত। যজ্ঞ শেষ করতে পারলে রাজা হতেন সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি।

অশ্বমেধের ঘোড়া জয়যাত্রায় চলেছে।

আজও, এই চার-পাঁচ হাজার বছর পরেও, ঘোড়ার পিঠে চড়ে লড়াই করার প্রথা লোপ পায় নি। শান্তিরক্ষার জন্য অশ্বারোহী পুলিশ এখনও রয়েছে; ঘোড়ায় টানা নানান্ ধরণের গাড়ী আজও প্রায় সব দেশেই দেখা যায়।

ঘোড়ার পরে আসে হাতীর কথা। প্রাচীন কালের সমাজে ঘোড়ার মত হাতীরও বিশেষ কদর ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ, গাড়ী টানা—সব কাজেই ঘোড়ার ব্যবহার খুবই ছিল ঠিকই, কিন্তু ঘোড়ার পিঠে চড়া কাজটা তেমন আরামের নয়—রীতিমত কসরতের কাজ ওটা। কাজেই আরাম করে চলাফেরার কাজে হাতীর ব্যবহারের প্রচলন হ'ল মানুষের সমাজে। হাতীর পিঠে ঘরের মত আরামদায়ক একটি কুঠরী বসানোও সম্ভব। পরবর্তী যুগে তাই করা হ'ল। একে বলে হাওদা। হাওদায় বসে আরাম করে চলাফেরা করার খুব সুবিধা। রাজবাদশাহ্‌রা তো এমনি ভাবেই চলাফেরা করতেন। তা ছাড়া হাতীর পিঠে চড়ে শিকার করারও নানা রকম সুবিধে। আজও জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে গেলে এ দেশে সাধারণতঃ হাতীই হয় বাহন। প্রাচীন কালে হাতীর পিঠে চড়ে যুদ্ধ করারও রেওয়াজ ছিল প্রচুর।

মানুষের আর একটি পরম উপকারী বাহন হচ্ছে উট। মরুভূমির দেশে চলাফেরার কাজে উটের

হাতীর পিঠে হাওদা

জুড়ি মেলা ভার। শুধু পিঠে করে লোক নেওয়াই নয়, মালপত্র আনা-নেওয়ার কাজেও উটই ব্যবহার করা হয় সে অঞ্চলে। হাতীর মত উটের পিঠেও আরাম করে বসবার হাওদা জাতীয় আসন ব্যবহারের রেওয়াজ আছে,

মরুভূমির দেশে চলাফেরার কাজে উট

তবে তা নিশ্চয়ই তেমন আরামদায়ক নয়। যুদ্ধবিগ্রহেও বাহন হিসেবে উট ব্যবহার করা হয় অনেক দেশে।

জন্তুর পিঠে না চেপে

জন্তুর পিঠে চেপে বেড়ানোই কিন্তু চলাফেরার একমাত্র উপায় বলে মানুষ মনে করে নি। চলাফেরার কাজে ডুলি, পাল্কী প্রভৃতির ব্যবহার বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। তবে এগুলিকেও মানুষের কাঁধে চড়ে যাতায়াতেরই একটু উন্নত সংস্করণ বলা যেতে পারে। এ ভাবে যাতায়াত কিন্তু সকলের পক্ষে পোষাত না, রাজা-মহারাজা বা সমাজের ধনী লোকেরাই সাধারণতঃ এগুলি ব্যবহার করতেন। অবশ্য মেয়েদের কথা বাদ। তারা বরাবরই এতে চড়ার সুযোগ পেত। এখনও মেয়েদের দরকার মত পাল্কী বা ডুলি ব্যবহার করতে দেখা যায়, বিশেষতঃ পাড়াগাঁয়ে। বিয়ের পর নতুন বৌ পাল্কী চড়ে শ্বশুরবাড়ী যেত বরের সঙ্গে। জমিদাররা মহাল দেখতে বেরুতেন পাল্কী চড়ে। ভাল বাংলায় ওর আর এক নাম শিবিকা। এই প্রসঙ্গে ডাণ্ডী, তাঞ্জাম ইত্যাদির নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। নবাবী আমলে নবাব-ওমরাহ্‌রা তাঞ্জামে চড়েই এখানে ওখানে যেতেন। আবার এরই একটা উন্নত সংস্করণের ব্যবহার আমরা দেখতে পাই মিশর দেশে।
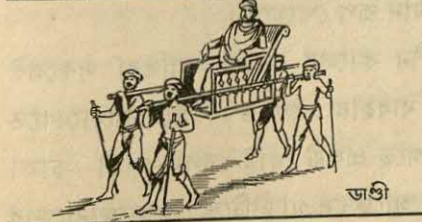
তখনকার দিনে পাল্কীও হ'ত নানা রকমের। অনেক সময় পাল্কীর গায়ে মূল্যবান্ কারুকার্য করা থাকত। ছেলেবেলা রবীন্দ্রনাথ এই রকম একটি পুরোনো পরিত্যক্ত পাল্কীতে বসে কল্পনায়

মানুষের কাঁধে চেপে যাওয়ার নানা সরঞ্জাম
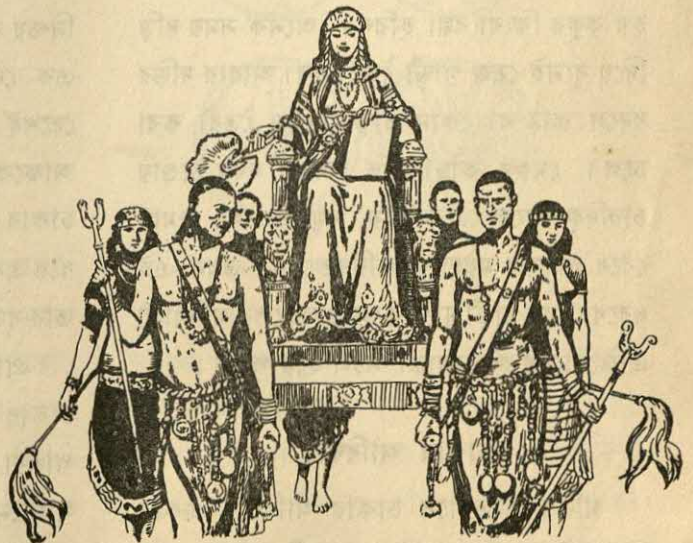
মিশর দেশে ব্যবহৃত তাঞ্জামের উন্নত সংস্করণ

কত জায়গায় যেতেন সে গল্প হয়তো তোমরা অনেকে পড়েছ। পাল্কী যারা কাঁধে নিয়ে বইত তাদের বলা হ'ত পাল্কী-বেহারা। কখনও চার জন, কখনও ছ' জন, কখনও বা আট জনও পাল্কী বইত। তাই পাল্কীর নামও ছিল চার বেহারার পাল্কী, ছ' বেহারার পাল্কী ইত্যাদি।
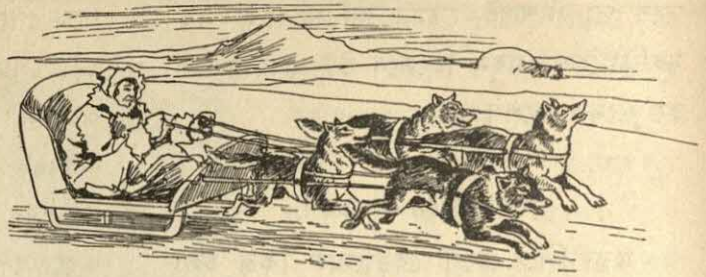
স্লেজ্ গাড়ী

দড়ি দিয়ে ঘন জাল বুনে তাতে লোক বসিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চল ছিল আদিম যুগে। একে দড়ির গাড়ী বলা চলে। অবশ্য মসৃণ, সমতল পথ না পেলে এ গাড়ী যে খুব আরামদায়ক হ'ত না তা আন্দাজেই বোঝা যায়। এরই এক উন্নত ধরণ হচ্ছে স্লেজ। আমরা সাধারণতঃ যে সব গাড়ী দেখতে অভ্যস্ত স্লেজ তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বরফের দেশেই কেবল এ গাড়ী চালানো সম্ভব। এতে কোন চাকা নেই—বরফের ওপর দিয়ে পিছলে হিঁচড়ে টেনে নিতে হয়। এগুলো টানার জন্য কাজে লাগানো হয় কুকুর কিংবা বল্গা হরিণ। অনেক সময় দড়ি দিয়ে বুনেই স্লেজ গাড়ী তৈরী হয়। আবার দড়ির বদলে কাঠ বা কোন ধাতু দিয়েও তৈরী করা চলে। মেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে যখন ঠাণ্ডায় চারদিক্ বরফে ঢেকে যায়, সমুদ্রের জল জমাট বেঁধে বরফের ময়দানে পরিণত হয়—তখন এই ধরণের স্লেজ গাড়ী না থাকলে ও অঞ্চলের অধিবাসী এস্কিমোদের জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ত।

চাকার আবিষ্কার

গতির ইতিহাসে চাকার আবিষ্কার একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গতির ইতিহাসই বা বলি কেন? মানবসমাজের অগ্রগতির ইতিহাস বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে। এ ইতিহাসে আগুন আবিষ্কার যেমন একটি যুগান্তকারী ব্যাপার, তেমনি চাকার আবিষ্কারও প্রায় সেই রকম একটি ঘটনা।

আজ সঠিক ভাবে বলা হয়তো সম্ভব নয় কে প্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিল এবং কবে করেছিল।

নীল নদের দেশ মিশর, ইউফ্রেটিস ও টাই-গ্রিসের দেশ ব্যাবিলন আর সিন্ধু নদের দেশ ভারতেই সভ্যতার প্রথম সুরু বলা চলে। এ কথাও নিশ্চয় করে বলা যায় যে এই তিন দেশের কোন এক দেশে বা আলাদা আলাদা ভাবে তিন দেশেই চাকার ধারণা এসেছিল সর্বপ্রথম। তবে আজকের দিনে আমরা যে রকম চাকা দেখি চাকার প্রথমাবস্থায় তা তেমনটি ছিল না। বহুদিন ধরে একটু একটু করে উন্নতি হয়ে তবেই চাকা তার বর্তমান রূপ পেয়েছে।

প্রাচীন কালের সভ্য জাতিরা সকলেই চাকার ব্যবহার জানত। মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া গেছে একটি ছোট্ট খেলনা-গাড়ী—চাকা লাগানো আছে সে গাড়ীটিতে। মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতা যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার

বছর আগেকার ব্যাপার। কাজেই সে সময় যদি চাকার একটি পূর্ণ রূপের পরিচয় আমরা পাই তবে সে সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার কাল নিশ্চয়ই তার বহুদিন আগেকার ব্যাপার। তা ছাড়া আজ জোর করেই বলা যায় যে এখন থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের শহরে চাকাওয়ালা গাড়ী বা রথ অনবরত চলাফেরা করত।
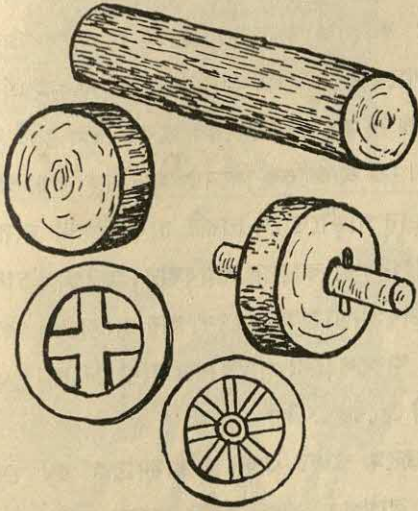
চাকার প্রথমাবস্থা

এখন থেকে পাঁচ-ছ' হাজার বছর আগে মিশর দেশও নানা ব্যাপারে বিশেষ নাম করেছিল। স্থাপত্যবিদ্যায় তখনই তারা যথেষ্ট বিশেষত্ব অর্জন করে। পাথর কেটে তার ওপর খোদাই করে তারা ফুটিয়ে তুলত নানা শিল্প-কাজ—বানাত নানান্ ধরণের সুন্দর সুন্দর মূর্তি। এই সব সুন্দর এবং ভারী মূর্তিগুলো এক
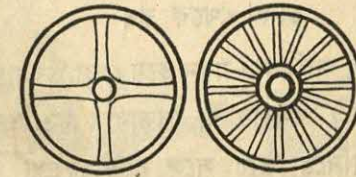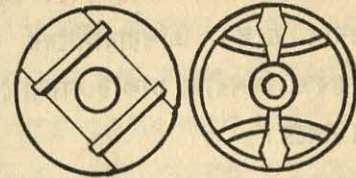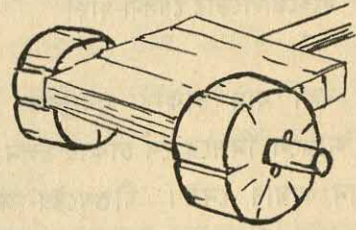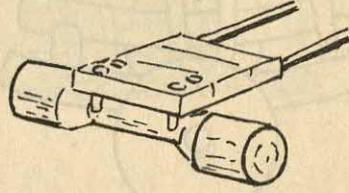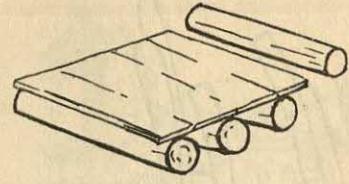
চাকার নানা অবস্থা

জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া ছিল ভারী অসুবিধাজনক। কি করে ঢালু পথের ওপর দিয়ে কাঠের গুঁড়ির ওপর গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে তা করা হ'ত তা তোমরা এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথায় পড়েছ (১ম খণ্ড—পৃঃ ২২২)। এই গুঁড়ি-

মহেঞ্জোদাড়োর খেলনা-গাড়ী
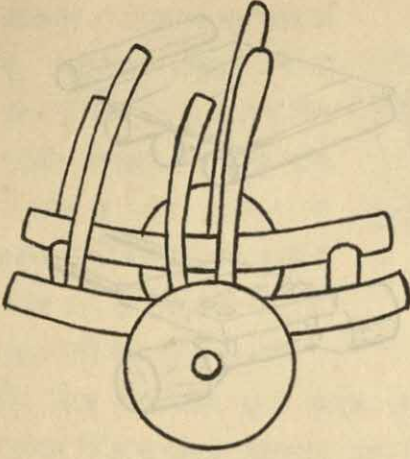
গুলিকেই বলা যায় চাকার পূর্বপুরুষ। খুব পুরোনো আমলে মিশরে যে চাকার চলন ছিল তার কোন প্রমাণ নেই। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৬৫০ বছর আগে এশিয়া থেকে মিশরে এক অভিযান চলে। এশিয়াবাসীদের কাছ থেকেই সম্ভবতঃ মিশরীরা চাকার ধারণা পেয়ে থাকবে সে সময়ে।

চাকা থেকে রথ

চাকার আবিষ্কার যখন হয়ে গেল তখন আর ভাবনা কি? বসবার বা দাঁড়াবার মত একটা জায়গা বানিয়ে তার সঙ্গে যুড়ে দেওয়া হ'ল দু'টো চাকা। এবারে গরু, মোষ বা ঘোড়া দিয়ে টেনে নিলেই হ'ল। ফলে পাওয়া গেল গাড়ী। দরকার পড়লে মানুষ দিয়েও টানার কাজ চলতে পারে। যেমন আজকের দিনের রিক্সা গাড়ী। চীন দেশে এ ধরণের গাড়ীর চল ছিল। সেকালে অবশ্য এদেশে এ ধরণের যত গাড়ীর প্রচলন ছিল তার সবগুলোকেই বলা হ'ত রথ। মানুষ ইতিমধ্যে ঘোড়াকে পোষ মানিয়ে ফেলেছে। কাজেই রথ টানার কাজে ব্যবহার করা হতে লাগল ঘোড়া। দ্রুতগামী ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে রাজা-মহারাজারা চলতেন ভ্রমণে, যোদ্ধারা যেতেন লড়াই করতে।

ঘোড়ায় টানা রথের প্রচলন সেকালের সমস্ত সভ্য সমাজেই ছিল। কত বিভিন্ন ধরণের যে রথ ছিল তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের রামায়ণ, মহাভারত এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রাচীন পুঁথিপত্তরে নানা রকম রথের উল্লেখ দেখা যায়। অবশ্য দেশ ভেদে রথের আকার এবং আকৃতি আলাদা হবেই। তবে একটা ব্যাপারে সব দেশের প্রাচীন রথের মধ্যেই একটা সাদৃশ্য ছিল। সব দেশের রথেই ছিল দু'টি করে চাকা। আজকের দিনের আধুনিক রথ অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ীতে যে চারটি চাকা দেখা যায় তা বেশ পরবর্তী কালের আবিষ্কার। অবশ্য দু'চাকার ঘোড়ার গাড়ী আজও দেখা যায় আমাদের দেশের নানা অঞ্চলে এবং পৃথিবীরও নানা দেশে। এক্কা গাড়ী দেখেছ তো? টাঙ্গা?

ক্রমে সুন্দর এবং আরামদায়ক রথ তৈরী হতে লাগল। রথ তৈরীর কাজে লাগান হ'ত কাঠ বা নানারকম ধাতু। তা ছাড়া প্রথম দিক্‌কার কাঠের চাকা যাতে বেশী দিন টেকে তার জন্যেও কাঠের চারদিকে যুড়ে দেওয়া হতে লাগল লোহা বা অন্যান্য ধাতু,—সংস্কৃতে যাকে বলে চক্রনেমি।

প্রথম যুগে রথের আরোহীই চালকের কাজ করত। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন যুদ্ধবিগ্রহের কাজে রথের প্রচলন হ'ল তখন রথের চালক হ'ল পৃথক্ ব্যক্তি। যোদ্ধা বসতেন পেছনে,
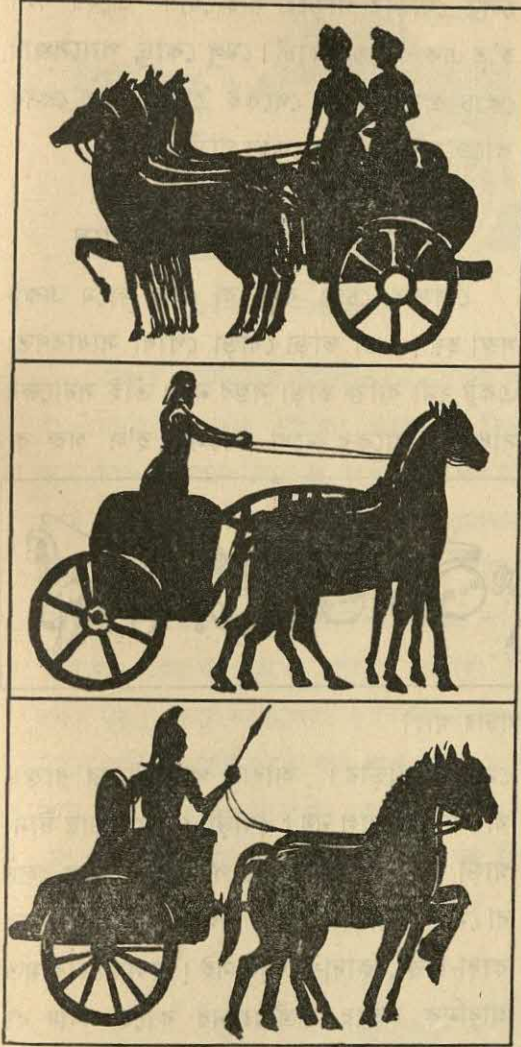
বিভিন্ন ধরণের রথ

আলাদা এবং আরামদায়ক জায়গায়। এ জন্য যারা রথ চালাত তাদের বিশেষ ভাবে শিক্ষা নিতে হ'ত। ঋগ্বেদে বিভিন্ন ধরণের রথের বর্ণনা আছে। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি বা চালক ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম পার্থসারথি।
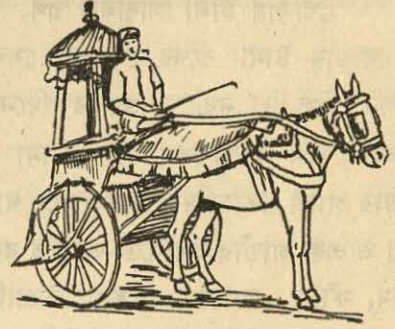
এক্কা

প্রাচীন রোম এবং গ্রীস দেশের যোদ্ধারা যে রথে চড়ে যুদ্ধবিগ্রহ করতেন তার গঠন এবং আকৃতি ছিল এমনই যে যোদ্ধাকে একই সময় রথ চালনা করা এবং যুদ্ধ করার কাজ করতে হ'ত। এগুলোকে বলা হ'ত 'চ্যারিয়ট্'।

প্রাচীন কালের রথে ঘোড়া থাকত একটি। উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন সহরের এক্কা গাড়ীর আদিমতম সংস্করণ ছাড়া এটি আর কিছু নয়। পরে অবশ্য একটার বদলে হু'টো, তার বদলে চারটে বা আটটা ঘোড়াও যুড়ে দেওয়া হতে
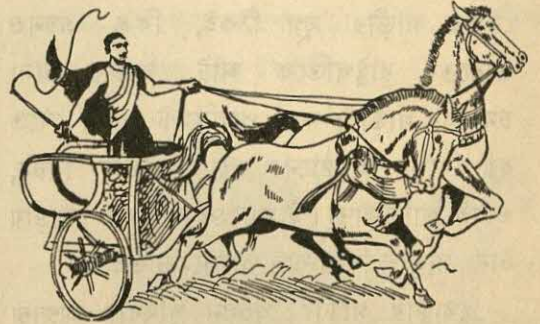
চ্যারিয়ট্

থাকে রথের সঙ্গে। আমাদের পুরাণেও আছে সূর্যদেব সাত ঘোড়ার রথে চড়েই বিশ্বপরিক্রমায় বার হন।

ঘোড়ায় টানা আধুনিক রথ

ঘোড়ায় টানা রথের যে শুধু সেকালেই প্রচলন ছিল তা নয়, আজকের দিনেও এর ব্যবহার কোন অংশে কম নয়। নানা ধরণের ঘোড়ার গাড়ী তোমাদের চোখে পড়ে থাকবে। টাঙ্গা ও এক্কা গাড়ীর কথা তো আগেই বলেছি; টম্‌টম্, ফীটন, ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম ইত্যাদি যে সব ঘোড়ার গাড়ী সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই সেদিনও ব্যবহার করতেন (এখনও কেউ কেউ করেন) তার চেহারাই আলাদা। তাতে চড়তেও ছিল খুব আরাম। দু'টো অর্থাৎ যোড়া ঘোড়া যে গাড়ী টানত তাকে বলত যুড়ি গাড়ী। তেজী ঘোড়ায় টানা এ সব গাড়ী তোমরাও কেউ কেউ দেখে থাকবে। আজ মোটর গাড়ীর যুগ ঠিকই, কিন্তু এখনও ভারতের রাষ্ট্রপতিকে আট ঘোড়ায় টানা চমৎকার গাড়ীতে করে পার্লামেণ্ট ভবনে যেতে হয় বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য। ওটাই নিয়ম, ওটাই আভিজাত্য। ইংল্যাণ্ডের রাণীকেও ঘোড়ায় টানা গাড়ীই নিয়ে যায় পার্লামেণ্ট ভবনে।

ঘোড়ার গাড়ীর প্রচলন পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অদ্যাবধি চলে আসছে। মধ্যযুগের ইয়োরোপে যানবাহনের প্রধান উপায়ই ছিল ঘোড়ার গাড়ী। সে সময়ে যাত্রী-চলাফেরা, মালপত্তর আনা-নেওয়া, ডাক পাঠানো—সবই চলত ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে। এদের বলা হ'ত এক কথায় 'কোচ্'। মেল্ কোচ্, প্যাসেঞ্জার কোচ্ প্রভৃতি নাম থেকেই বোঝা যায় কোন্ কাজে ব্যবহার হবে কোন্ গাড়ী।

বিভিন্ন ধরণের ঘোড়ার গাড়ী

গরু, মোষ, উট—এরাও গাড়ী টানে

ঘোড়ার চেয়ে বলদ বা মোষ দামে একটু সস্তা হয়। তা ছাড়া ঘোড়া পোষা সাধারণতঃ একটু ধনী ব্যক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই সমাজের সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলন হ'ল গরু বা মোষের গাড়ীর। আবার পাড়াগাঁয়ের রাস্তা-ঘাট তেমন ভাল নয়। ঘোড়া এবং ঘোড়ায় টানা গাড়ী কাদা-রাস্তায় চলতে পারে না। কিন্তু বলদ বা মোষের গাড়ীর এ সব বালাই নেই,—গ্রামের কাদা-রাস্তা, কাদা-রাস্তাই সই! কলকাতার মত আধুনিক শহরে যাত্রীবহনের কাজে বলদ বা মোষের গাড়ীর প্রচলন নেই বটে, কিন্তু মাল আনা-নেওয়ার কাজে বলদ বা মোষের গাড়ীর ব্যবহার আছে। এখনও আমাদের পাড়াগাঁয়ে, যেখানে ভাল রাস্তা নেই, বাস্ সারভিস্ চালু হয় নি—সেখানে গরুর গাড়ীই দূরদূরান্তরে যাতায়াতের একমাত্র উপায়। ওপরে ঢাকনা অর্থাৎ ছই বসিয়ে, পাটাতনের ওপর খড় ছড়িয়ে গরুর গাড়ীকেও যথাসম্ভব আরামদায়ক করবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
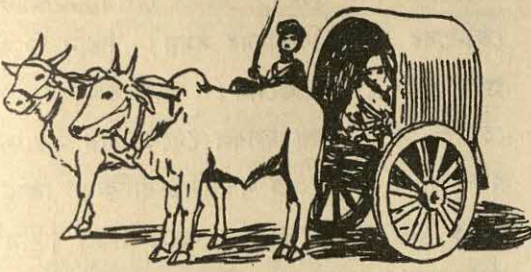
ছই-ঢাকা গরুর গাড়ী

ঘোড়ার গাড়ীর মত পৃথিবীর বহু দেশেই গরু বা মোষের গাড়ীর প্রচলন আছে বা ছিল। আমেরিকায় বলদে টানা যে গাড়ীর প্রচলন ছিল তার নাম 'ঢাকনা গাড়ী' বা 'কভার্ড্ ওয়াগন'। এ সব গাড়ী ব্যবহার করত ওদেশের যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা। আমাদের দেশেও বিভিন্ন অঞ্চলের গরুর বা মোষের গাড়ীর চেহারা এক রকম নয়। তবে সবগুলিরই ছু'টো করে চাকা। টানে বেশীর ভাগই ছু'টো গরু (বলদ) বা মোষ। তবে একটা দিয়েও টানা হয় কোথাও কোথাও। মোগল আমলে যে সব গরুর গাড়ীর চলন ছিল তা বাস্তবিকই সুন্দর এবং আরামদায়কও।
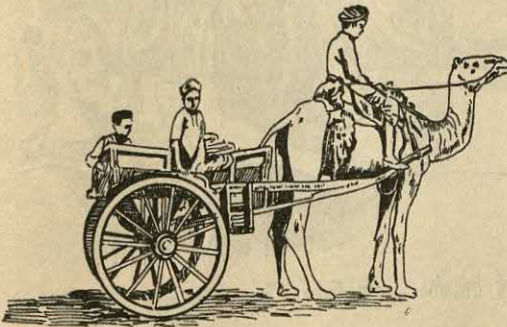
উটের গাড়ী

বরফের দেশের স্লেজ গাড়ী টানে কুকুর বা হরিণে। স্লেজ গাড়ীতে চাকা নেই। আর মরুভূমির দেশের চাকাওয়ালা গাড়ী টানে উট। আমাদের দেশে যে সব অঞ্চলে উটের গাড়ীর প্রচলন আছে তাতে চাকা থাকে ছু'টি করে। টানার কাজে ব্যবহার করা হয় একটি বা ছু'টি উট। উট ছাড়া আরও হরেক রকম জন্তুকে কখনও কখনও শখ করে গাড়ীতে যুতে গাড়ী টানা হয়। উটপাখী, ছাগল, ভেড়া, হাতী, এমন কি কুমীর দিয়েও গাড়ী টানতে দেখা গেছে।

যন্ত্রের সাহায্যে কি করে গাড়ী চালানো যায়

ডাঙ্গায় চলাফেরা করা এবং মালপত্তর বহন করবার জন্য মানুষে টানা বা জীবজন্তুতে টানা গাড়ীর কথা মোটামুটি বলা হ'ল। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানে মনুষ্যসমাজের অগ্রগতি। যান-বাহনের বেলায়ও তার অন্যথা হবার যো নেই। বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভাবতে লাগল যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে যানবাহনের কি করে উন্নতি করা যায়। ইতিমধ্যে মানুষ আবিষ্কার করেছে বাষ্পের শক্তি, পেট্রোলিয়াম গ্যাসের শক্তি, বিদ্যুতের শক্তি। তাই ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার হতে লাগল স্টীম এঞ্জিন, সাইকেল, মোটর সাইকেল, মোটর গাড়ী, স্কুটার, বৈদ্যুতিক ট্রাম, বৈদ্যুতিক ট্রেন ইত্যাদির।
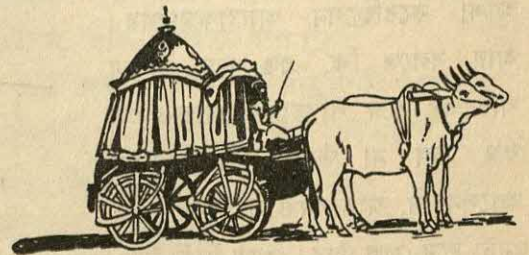
মোগল আমলের গরুর গাড়ী

এই সব যন্ত্রযানের গল্প আমরা পরবর্তী খণ্ডে শোনাব।

পণ্ডিতের প্রার্থনা

মহাবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য আক্রমণ করবেন। যাত্রার আগে কোরিন্থ শহরে এ সম্পর্কে একটা সভা ডাকা হ'ল—প্রস্তুতির জন্য স্বয়ং আলেকজাণ্ডার এলেন কোরিন্থ শহরে।

প্রবল পরাক্রান্ত আলেকজাণ্ডার এসেছেন শহরে, শহরশুদ্ধ লোক ভেঙ্গে পড়ল তাঁকে দেখতে। শহরের বড় বড় গণ্যমান্য সকলেই এলেন দেখা করতে; এমন কি বড় বড় পণ্ডিতরাও বাদ গেলেন না।

কিন্তু এলেন না শুধু একজন—কোরিন্থের সবচেয়ে নামকরা দার্শনিক পণ্ডিত ডায়োজেনিস।

কোরিন্থে এসে ডায়োজেনিসের সঙ্গে দেখা হবে, আলাপ হবে, এইটেই আশা করেছিলেন আলেকজাণ্ডার। আর, বলতে কি, এত বড় একজন পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয়ের লোভও বড় কম ছিল না তাঁর। ডায়োজেনিস আসেন নি, আসবেনও না খবর পেয়ে মনটা দমে গেল তাঁর। শেষে তিনি ঠিক করলেন, নাই বা আসুন পণ্ডিত তাঁর কাছে, তিনিই না হয় যাবেন পণ্ডিত-দর্শনে।

আলেকজাণ্ডার সদলবলে এসে হাজির হলেন ডায়োজেনিসের গৃহে। শীতের দিন। ডায়োজেনিসের তখন বিশ্রামের সময়। তিনি শুয়ে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন। আলেকজাণ্ডারের চেহারা আর সঙ্গের দলবল দেখে তাঁর বুঝতে বাকি রইল না কে এই সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু তাতে ডায়োজেনিসের কি এসে যায়? তিনি কোন কথা না বলে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন মহাবীরকে।

বেগতিক দেখে আলেকজাণ্ডারই কথা সুরু করলেন। কণ্ঠস্বরে বিশেষ সম্ভ্রম দেখিয়ে বললেন, "আমার নাম আলেকজাণ্ডার। আমাকে দিয়ে আপনার যদি কোন উপকার হয় তবে বলুন। আমি কি আপনার কোনও উপকার করতে পারি?"

সবাই ভাবল, ঈস্, লোকটা কি ভাগ্যবান্! স্বয়ং শাহানশাহ্ আলেকজাণ্ডার তার সঙ্গে এ ভাবে কথা বলছেন! নিশ্চয়ই ও ঘরবাড়ী, টাকাপয়সা অনেক কিছুই চেয়ে বসবে। যাকে বলে দাঁও মারা।

'আমায় রোদটা ছেড়ে দিয়ে যদি একটু সরে দাঁড়ান'

কিন্তু ডায়োজেনিস সে ধার দিয়েও গেলেন না। বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারেন।

আমায় রোদটা ছেড়ে দিয়ে যদি একটু সরে দাঁড়ান।"

আলেকজাণ্ডার রোদ আড়াল করে দাঁড়িয়েছিলেন, তাতে রোদ পোহাবার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছিল।

আলেকজাণ্ডারের সাঙ্গোপাঙ্গের দল পণ্ডিতের কথা শুনে তো অবাক্। কী মূর্খ এই পণ্ডিত! আলেকজাণ্ডার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উপকার করতে চাইছেন—সোনাদানা, হীরেমুক্তো—যা খুসী এইবেলা চেয়ে নে, তা না এই রকম একটা জবাব! সবাই হেসে উঠল।

হাসলেন না শুধু আলেকজাণ্ডার। সঙ্কোচের সঙ্গে তাড়াতাড়ি আড়াল-করা রোদ ছেড়ে দিয়ে তিনি শুধু বললেন, "যদি আলেকজাণ্ডার না হতাম, তবে সাধ হ'ত ডায়োজেনিস হতে।"

'ন্যায়ের বিধান দিলা রঘুমণি'

দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত একটি গানের এই কলিটি তোমাদের অনেকেরই হয়তো মুখস্থ, কিন্তু কে এই রঘুমণি সে সম্বন্ধে হয়তো সকলের সব কথা জানা নেই। আসলে কিন্তু এঁর নাম রঘুমণি নয়—রঘুনাথ শিরোমণি। 'নাথ' আর 'শিরো' বাদ দিয়ে কবি নামকরণ করেছেন রঘুমণি।

রঘুনাথ ছিলেন গরীব ব্রাহ্মণের ছেলে। নবদ্বীপে মানুষ। ৩।৪ বছর বয়সে বাপকে হারিয়ে মায়ের কাছেই তিনি প্রতিপালিত হন—অত্যন্ত কষ্টে। তার ওপর তাঁর একটা চোখ ছিল কানা। তাই ছেলেরা তাঁকে কানা রঘুনাথ ব'লে ক্ষেপাত।

একবার রঘুনাথের মা ছেলেকে একটু আগুন নিয়ে আসতে বললেন। তখনকার দিনে তো আর দিয়াশলাই-এর আবিষ্কার হয় নি যে ফস্ করে কাঠি ঘষলেই আগুন বেরুবে! তখন আগুন জ্বালানো বেশ হাঙ্গামার কাজ ছিল। তাই একবার আগুন জ্বালিয়ে সাধারণতঃ কাঠকুটো, কাঠকয়লা বা তুষটুষের সাহায্যে সে আগুন রেখে দেওয়া হ'ত। রঘুনাথের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। তিনি আগুনের খোঁজে এক টোলে গিয়ে হাজির। টোলের পড়ুয়ারা তখন পড়াশোনা করছে, কে আর উঠে আগুন দেয়! কিন্তু রঘুনাথ নাছোড়বান্দা। শেষে তাঁর পীড়াপীড়িতে একজন উঠে একটা লোহার হাতার মধ্যে খানিকটা জ্বলন্ত কাঠকয়লা এনে বলল, "নাও, কিসে নেবে নাও।"

আগুন আনতে হলে তার জন্য একটা মাটির সরা বা মালসা গোছের কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। শিশু রঘুনাথ তার কোনটাই নিয়ে যান নি; পড়ুয়া তাই তাঁকে একটু জব্দ করবার জন্য ফের বলল, "কই, আগুন নেবে না? হাত পাত।"

রঘুনাথ একটুও ঘাবড়ালেন না। চট্ করে একমুঠো বালি এনে হাতের পাতায় বিছিয়ে বললেন, "দাও, এইখানে দাও।"

টোলের অধ্যাপক সার্বভৌম মশাই দূরে বসে ব্যাপারটা দেখছিলেন। শিশু রঘুনাথের বুদ্ধি দেখে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। সেদিনই রঘুনাথের মাকে ডেকে তিনি তাঁর ছেলেকে নিজের টোলে ভর্তি করে নিলেন। বললেন, "এমন তুখোড় ছেলে! শিক্ষা পেলে, দেখো, এ একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।"

টোলের পড়া শেষ করলেন রঘুনাথ।

ন্যায়শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দেখে সার্বভৌম মশাই খুব খুসী। কিন্তু এত শিখেও রঘুনাথের মন ওঠে না। কেন না সে সময়ে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চার জন্য ভারতবর্ষে নবদ্বীপের চাইতে মিথিলার অনেক বেশী নাম। মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের মত নৈয়ায়িক পণ্ডিত গোটা ভারতবর্ষে আর নেই। তাই মিথিলার উপাধির কাছে নবদ্বীপের উপাধির মূল্য অনেক কম। রঘুনাথ ঠিক করলেন পক্ষধর মিশ্রের কাছে গিয়ে তিনি তাঁর শিষ্যত্ব নেবেন।

কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো হয় না! পক্ষধরের নাগাল পাওয়া বড় সহজ নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বাছা বাছা ছাত্রেরা তাঁর শিষ্য। আগে তাদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে হবে। তর্কের বিচারে তাদেরকে হারাতে পারলে তবেই পক্ষধর তার সঙ্গে কথা বলবেন; তার আগে নয়।

রঘুনাথ গিয়ে পক্ষধরের শিষ্যদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। বিচার আরম্ভ হ'ল। কিন্তু পক্ষধরের শিষ্যেরা রঘুনাথের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না—ঝড়ের মুখে কুটোর মত তাঁদের উড়িয়ে দিলেন রঘুনাথ। পক্ষধরের শিষ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করলেন তিনি।

পক্ষধরের চতুষ্পাঠীতে নিয়ম ছিল, গুরু ঘরের এক কোণে নিজের পুঁথিপত্র নিয়ে বসবেন, আর শিষ্যেরা সার দিয়ে বসে শাস্ত্রচর্চা করবে। এই সার দিয়ে বসার মধ্যেও আবার একটা নিয়ম ছিল। সবচেয়ে প্রধান শিষ্য বসবেন সবচেয়ে সামনের সারিতে। তারপর যোগ্যতা অনুসারে অন্যান্য শিষ্যেরা পর পর বিভিন্ন সারি দখল করে বসবেন। রঘুনাথ গোড়ার দিকে পেছনের সারিতে গিয়ে বসলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সবাইকে ডিঙ্গিয়ে একেবারে চলে এলেন গুরুর কাছের সারিতেই। এবার থেকে তর্কযুদ্ধ সুরু হ'ল শিষ্যে শিষ্যে নয়, —গুরুশিষ্যে। সে তর্ক এত কূটতর্ক যে অন্যান্য শিষ্যেরা তার কিছুই বুঝত না।

পক্ষধর 'সামান্যলক্ষণা' নামে একখানা বই লিখছিলেন, রঘুনাথ সেই বইএর নানা অংশ নিয়ে বিরূপ সমালোচনা সুরু করতেই গুরুশিষ্যের দ্বন্দ্বযুদ্ধ চরমে উঠল। কিন্তু রঘুনাথ গুরুকে এমন ভাবে কোণঠাসা করে ধরলেন যে শেষ পর্যন্ত পক্ষধর অর যুক্তিতর্ক দিয়ে পেরে উঠলেন না, —রেগে, এক সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে, রঘুনাথকে কানা বলে গাল দিয়ে বসলেন। রঘুনাথও ছাড়বার পাত্র ন'ন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে আর একটি শ্লোক আউড়ে উত্তর দিলেন—যিনি কানার চোখ ফোটাতে পারেন তিনিই হচ্ছেন আসল অধ্যাপক—সত্যিকার গুরু। আর যিনি তা পারেন না তিনি নামেই গুরু, কাজে ন'ন।

এর পর পক্ষধর নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

রঘুনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কিন্তু শাস্ত্রেই আছে পুত্র এবং শিষ্যের কাছে গুরুর পরাজয়ই আসল জয়। তিনি রঘুনাথকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং সকলের সামনে শিষ্যের কাছে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রে ভারতের শিরোমণি হয়ে দেশে ফিরে এলেন।

শুধু ফিরেই এলেন না, আর একটা কাণ্ড করে এলেন। পক্ষধরের চতুষ্পাঠীতে অনেক মূল্যবান্ পুঁথি ছিল। নিয়ম ছিল সে সব পুঁথি কেউ সেখান থেকে সরাতে পারবে না, এমন কি নকল করেও নিতে পারবে না। রঘুনাথ নিয়ম ভঙ্গ করলেন না, কিন্তু সমস্ত পুঁথি মুখস্থ করে নিয়ে এলেন।

এমনি করে ন্যায়শাস্ত্রে মিথিলার যে গৌরব ছিল তা নবদ্বীপ ছিনিয়ে নিয়ে এল। কবির ভাষায়—

"কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি,
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে যশের মুকুট পরি'।"

রঘুনাথের সহপাঠী

রঘুনাথ শিরোমণির গল্প বলতে গিয়ে তাঁরই এক সহপাঠীর কথা মনে পড়ছে। রঘুনাথ যখন সার্বভৌম মশায়ের টোলে পড়ছিলেন তখন আর একটি ছাত্র এসে সেই টোলে ভর্তি হলেন। রঘুনাথ টোলের সেরা ছাত্র, তাই প্রথম প্রথম এই নতুন ছাত্রটিকে আমলেই আনলেন না; কিন্তু দু' দিন যেতে না যেতেই তিনি বুঝতে পারলেন, এ বড় সোজা পাত্র নয়। এত বড় মেধাবী ছাত্র এ টোলে আর কখনও আসে নি। রঘুনাথের মত তুখোড় ছাত্র সারা দিন-রাত চিন্তা করেও যে সব কঠিন সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারেন না এ ছেলেটি মুহূর্তের মধ্যে তার সামাধান করে দেয়। যখন কিছু বোঝাতে যায় জলের মত এত সহজ ভাবে বুঝিয়ে দেয় যে তা থেকেই আন্দাজ করা যায় এর জ্ঞান কত গভীর।

রঘুনাথের টোলের পড়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তিনি একখানা খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ন্যায়ের টীকা লিখছিলেন। একদিন কথায় কথায় জানতে পারলেন যে এই নতুন ছাত্রটিও ঠিক ঐ বিষয়ের ওপরেই একখানা টীকা লিখেছেন। শুনে রঘুনাথ সেটি একবার দেখতে চাইলেন।

দুই সহপাঠী গঙ্গার ধারে গিয়ে বসলেন। রঘুনাথের সহপাঠী তাঁর টীকা বার করে পড়তে লাগলেন। শুনে তো রঘুনাথ অবাক্। তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল, চোখ ছল ছল করতে লাগল। ব্যাপার কি? রঘুনাথ বললেন, "ভাই, আমিও তোমার মত এই বিষয়ে একটি টীকা লিখেছি এবং, বলতে কি, আমার ধারণা ছিল —আমার টীকার মত উঁচুদরের লেখা আর কেউ কোন দিন লিখতে পারবে না এবং এই একখানা টীকা দিয়েই অমি অক্ষয় যশের অধিকারী হতে পারব। কিন্তু এখন দেখছি, তোমার এ লেখার কাছে আমার সে লেখা দাঁড়াতেও পারবে না।"

সহপাঠী ছেলেটি একবার রঘুনাথের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর মুহূর্তের জন্য কি ভেবে নিলেন; পরক্ষণেই নিজের পুথিটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, "বন্ধু, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমার লেখা টীকা এই আমি গঙ্গার জলে ফেলে দিলাম, এ লেখার কথা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না,

বন্ধু, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

কোন দিন জানবেও না। কাজেই তোমার টীকা তুমি নিশ্চিন্ত মনে প্রচার কর।"

রঘুনাথ অবাক্ হয়ে গেলেন। মানুষ এত মহৎও হতে পারে? এত বড় প্রাণ নিয়েও মানুষ জন্মায়!

ঐ ছেলেটি কে জান? নিমাই পণ্ডিত। ন্যায়শাস্ত্রের ধুরন্ধর পণ্ডিত হয়েও যিনি একদিন সব কিছু ছেড়ে ধর্মের জন্য পাগল হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন—প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন সারা বাংলা দেশ, উড়িষ্যা, বৃন্দাবন,—আরও কত জায়গা! হ্যাঁ, সেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কথাই বলছি। তিনিই ছিলেন রঘুনাথের সেই অদ্বিতীয় সহপাঠী নিমাই।

মহাবিজ্ঞানী নিউটন

স্যার আইজাক্ নিউটন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। শুধু কি মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব? নিউটনের আবিষ্কৃত অঙ্কের নানা সূত্র, আলোক-বিজ্ঞানের নানা রহস্য, আরও কত এটা-ওটা-সেটা খুঁটিনাটি আবিষ্কার তাঁকে সর্ব-যুগের—সর্বদেশের বিজ্ঞানীদের প্রথম সারির আসনে বসিয়ে রেখেছে। সেখান থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবে এমন সাধ্য কারও নেই। নিউটন পৃথিবীতে এসেছিলেন আজ থেকে প্রায় তিনশ' বছর আগে, কিন্তু এই তিনশ' বছর পরেও তাঁর আসন সেখানে অটল হয়ে আছে।

এ হেন নিউটন লোকটি কেমন ছিলেন জানবার আগ্রহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বড় পণ্ডিত যখন, তখন সহজেই মনে হবে লোকটি ছিলেন সাদাসিধে, ঢিলেঢালা স্বভাবের মানুষ, সাজপোষাকে, চালচলনে আড়ম্বরের ধার ধারতেন না নিশ্চয়ই। ঠিক তাই। শুধু সাদাসিধে, অনাড়ম্বর বললে ভুল হবে—নিউটন ছিলেন একেবারে আত্ম-ভোলা মানুষ। তুখোড় বুদ্ধি, অঙ্কে অসাধারণ মাথা, যে কোন কঠিন অঙ্কের সমাধান মুহূর্তের মধ্যে করে দিতে পারেন, কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে একেবারেই বেমানান। রাতদিন আপন মনে কি চিন্তা করে চলেছেন, সামনে কি ঘটছে না ঘটছে খেয়ালই নেই!

সেই ছেলেবেলা থেকেই এই।

নিউটনের বয়স যখন বছর চৌদ্দ তখন তাঁর মা একবার তাঁকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ক্ষেত-খামার দেখাশোনার কাজে লাগিয়ে দেন, সংসার চালাবার জন্য এই ব্যবস্থার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল তখন। প্রতি শনিবারে গ্রাণ্টহাম্ শহরে হাট বসত। নিউটনের ওপর ভার ছিল এই হাটে প্রতি শনিবার গিয়ে কেনা-বেচা করতে হবে। অবশ্য সঙ্গে একজন চাকরও যাবে। নিউটনের ছিল বই পড়ার প্রবল নেশা। হাটে

গিয়ে কেনা-বেচা করার জন্য ভগবান্ তাঁকে পৃথিবীতে পাঠান নি। নিউটন করতেন কি, হাটে না গিয়ে পথে একটা পাহাড় পড়ত,—স্পিট্‌লগেট পাহাড়,—তারই তলায় একটা নিরিবিলি ঝোপের আড়ালে গিয়ে বই খুলে বসতেন। হাটের কেনা-বেচা যা করবার তা চাকরই করত। ফিরবার সময়ে সে নিউটনকে ডেকে নিয়ে যেত।

সে আমলে যানবাহন বলতে ঘোড়াই ব্যবহার করা হ'ত বেশী। নিউটনও দীর্ঘ পথ যেতে হলে ঘোড়া নিয়েই যেতেন। একবার নিউটন ঘোড়ায় চড়ে সেই স্পিট্‌লগেট পাহাড় পার হচ্ছিলেন। এবড়োখেবড়ো পাহাড়ী পথে ঘোড়ার পিঠে যেতে কষ্ট হচ্ছিল, তাই নিউটন ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার লাগাম ধরে চলতে লাগলেন। ঘোড়াটা পেছন পেছন আসতে লাগল, নিউটন লাগাম হাতে আগে আগে চললেন। একটা অঙ্ক নিয়ে ভাবতে ভাবতে চলছিলেন তিনি, অন্য কোন দিকে হুঁশ ছিল না।

ক্রমে পাহাড় পার হয়ে সমতল রাস্তায় চলে এলেন নিউটন। তখন ভাবলেন এবার ঘোড়ায় চড়া যেতে পারে। কিন্তু চড়তে গিয়ে দেখেন কোথায় ঘোড়া! ঘোড়া কখন লাগাম খুলে বেরিয়ে পালিয়ে গেছে, তিনি শুধু লাগামটি ধরেই এতখানি পথ চলে এসেছেন।

এই অন্যমনস্কতা তাঁর পরিণত বয়সেও কমে নি। আর একবারের একটা ঘটনার কথা বলি।

নিউটন তাঁর এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছেন, তারপর সে কথা একদম ভুলে গেছেন। এদিকে নির্দিষ্ট সময়ে সেই বন্ধু এসে দেখেন—কোথায় নিউটন, তাঁর কোন পাত্তাই নেই! নিমন্ত্রণের কোন আয়োজনও নেই! বসে বসে শেষে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল তাঁর। কখন খাবার সময় হয়ে গেছে, খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। অগত্যা পা টিপে টিপে তিনি খাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।
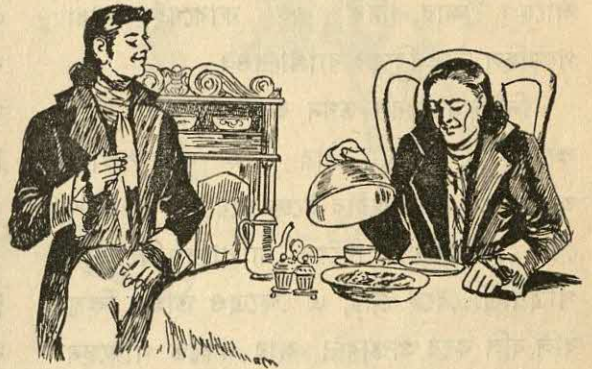
টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা রয়েছে। একা নিউটনের মত খাবার। বন্ধু আর অপেক্ষা না করে সেই খাবারই খেয়ে নিলেন। তার পরেই তাঁর মাথায় এল একটা বদ্ বুদ্ধি,—নিউটনকে জব্দ করতে হবে। তিনি উচ্ছিষ্ট হাড়-কাঁটাগুলো তুলে খাবারের প্লেটে সাজিয়ে ঢেকে রেখে দিলেন।

আগেই খেয়ে গেছি, কিন্তু সে কথা একদম মনে নেই।

খানিক পরেই নিউটন এসে হাজির। বন্ধুকে দেখে বললেন, "আরে, তুমি যে! এমন অসময়ে! কি ব্যাপার?" তাঁকে যে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তা তিনি একদম ভুলে গেছেন।

খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে নিউটন বললেন, "দাঁড়াও, আমার খাওয়া হয় নি, চট্ করে খেয়ে নি। তুমি বরঞ্চ ঐ ঘরে এসেই ব'স।"

বন্ধু মনে মনে হেসে নিয়ে নিউটনের খাবার ঘরে ঢুকলেন।

নিউটন আরাম করে বসে, ঢাকনা খুলে খেতে গিয়েই দেখেন, কোথায় খাবার, উচ্ছিষ্ট হাড়গোড়গুলো শুধু পড়ে আছে! তিনি লজ্জা পেয়ে বললেন, "দেখেছ, আমার কি ভুলো মন! আগেই খেয়ে গেছি কিন্তু সে কথা একদম মনে নেই।"

এ হেন লোকের যে জীবনযাত্রার পথে পদে পদে বাধা পড়বে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? আর ঠিক এই কারণেই বাধা পড়েছিল তাঁর বিয়ের ব্যাপারেও।

নিউটনের বয়স তখন বছর তেইশ। বিয়ে করেন নি, কিন্তু তাঁর এক দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়াকে বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে। ওদেশে তো ছেলেমেয়েরা বিয়ের ব্যাপারে নিজেরাই পাত্রপাত্রী বেছে নেয়, এ ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু বলি বলি করে প্রস্তাবটা আর করতে পারছেন না নিউটন। শেষে একদিন ঠিক করলেন আজ মেয়েটির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবেনই করবেন।

দু' জনে একত্র বেড়াতে বেরোলেন। নিউটন তখন একটা জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন। মেয়েটি কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করে বসল গবেষণার কাজ কতটা এগিয়েছে। ব্যস্, আর নিউটনকে পায় কে? তিনি তখনই সুরু করলেন বক্তৃতা। তাঁর জটিল গবেষণার কথা মেয়েটিকে বোঝাতে সুরু করলেন। স্বল্পভাষী নিউটনের মুখ দিয়ে তখন যেন কথার খই ফুটছে। হবে না কেন, তিনি যে তখন তাঁর নিজের মনের মত বিষয় পেয়ে গেছেন!

এদিকে মেয়েটির অবস্থা বোঝ! বিজ্ঞানের সে কোন ধারই ধারে না। বিশেষতঃ নিউটনের ঐ জটিল অঙ্কের ব্যাপার বোঝা তার পক্ষে তো অসম্ভব। নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই সে কথাটা একবার পেড়েছিল; কিন্তু তাতে যে এমন কাণ্ড ঘটবে তা সে কল্পনাও করতে পারে নি।

মেয়েটি প্রতি মুহূর্তে ভাবছে, নিউটন এইবার নিশ্চয়ই থামবে। থেমে, এইবার তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে। কিন্তু নিউটন তখন নিজের ভাবরাজ্যে ঘুরছেন, তিনি যে আজ বিয়ের প্রস্তাব করতেই এসেছিলেন সে কথা ততক্ষণে বেমালুম ভুলে গেছেন তিনি।

সেদিন আর প্রস্তাবটা তোলা হ'ল না নিউটনের। তার পরদিনও নয়। তার পর বলি বলি করে আর কোন দিনই ফুরসৎ হ'ল না তাঁর সে প্রস্তাব তুলবার। শেষে নিউটন আজীবন বিয়ে না করেই কাটিয়ে দিলেন।

নিউটন নাকি হাসতেন খুব কম, অট্টহাসি তো নয়ই। কিন্তু একবার নাকি তিনি সেই অট্টহাসিই হেসেছিলেন। গল্পটা এই রকম:
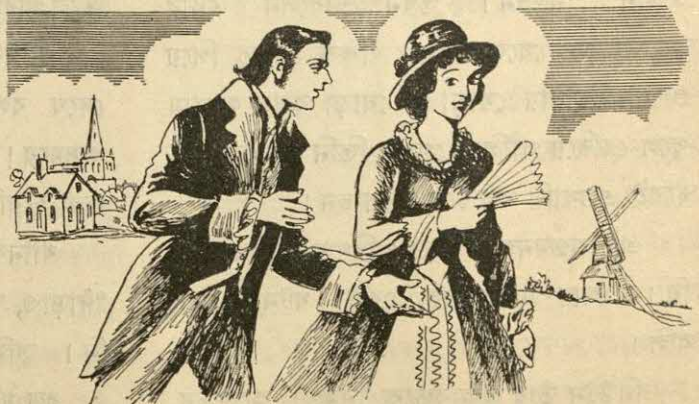
এদিকে মেয়েটির অবস্থা বোঝ!

নিউটন তাঁর এক বন্ধুকে একটা বই পড়তে দিলেন। বললেন, "পড়ে দেখ, এমন চমৎকার বই তুমি আগে নিশ্চয়ই পড় নি।"

আসলে বইটা ছিল একটা জ্যামিতির বই। খোদ ইউক্লিডের লেখা। বন্ধু বই নিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু দিন দুই বাদেই সেটা ফেরৎ নিয়ে এলেন।

"বাঃ, এর মধ্যেই পড়া হয়ে গেল! তা কেমন লাগল বইখানা?"—হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন নিউটন।

বন্ধু ঠোঁট আর নাক কুঁচকে জানালেন—বইটির মধ্যে তিনি কোন রসই পান নি। অর্থাৎ বইটি ভাল লাগে নি তাঁর।

"বল কি হে! ইউক্লিডের জ্যামিতি তোমার ভাল লাগে নি!" ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন নিউটন। এমন অবিশ্বাস্য কথা তিনি জীবনে কখনও শোনেন নি। সত্যি, এ একটা সত্যিকার হাসির কথা।

কু-লোকে বলে, জীবনে নিউটন বোধ হয় ঐ একদিনই প্রাণ খুলে অট্টহাসি হেসেছিলেন।

নেপোলিয়ন লোকটি কেমন ছিলেন

ফ্রান্সের সম্রাট্ মহাবীর নেপোলিয়নের (নাপোলিয়ঁ) কাহিনী ইতিহাসের পাতায় এখনও জ্বল্‌জ্বল্ করছে। তাঁর সময়ে সমস্ত ইয়োরোপ তাঁর নামে কাঁপত। সাধারণ ঘরের ছেলে হয়েও তিনি নিজের প্রতিভায় ফ্রান্সের রাজা তো হয়েছিলেনই, ইয়োরোপের আরও বহু অঞ্চল ফরাসী সাম্রাজ্যের দখলে এনেছিলেন। শেষে ওয়াটার্লুর যুদ্ধে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটল। পরাজিত নেপোলিয়ন বন্দী হয়ে ফ্রান্স থেকে
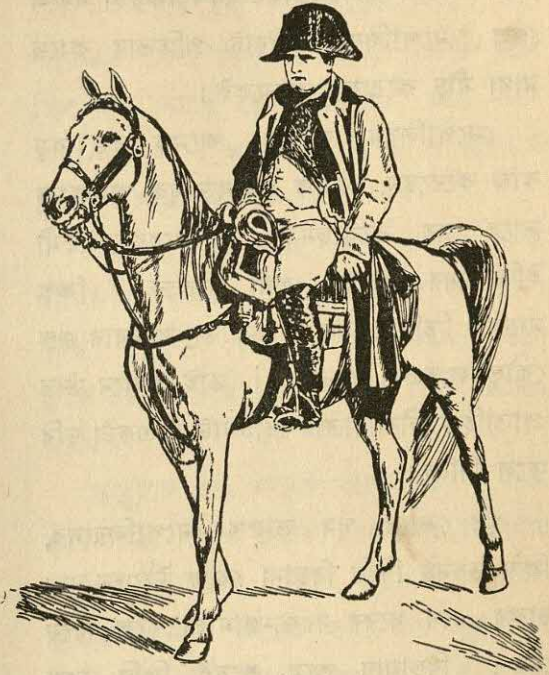
মহাবীর নেপোলিয়ন

নির্বাসিত হলেন সুদূর সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে। ইংল্যাণ্ডের একজন বড় কবি ফ্রান্স থেকে নেপোলিয়নের চিরবিদায়ের একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। নেপোলিয়ন বলছেন, "বিদায় ফ্রান্স, চিরকালের জন্য তোমার কাছ থেকে আমি বিদায় নিচ্ছি। কিন্তু তোমার ইতিহাসের পাতা—তা সে গৌরবে ঝলমলেই হোক আর কলঙ্কের কালিতে মসীলিপ্তই হোক—আগাগোড়া আমার নাম দিয়েই ভরা থাকবে।"

দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেপোলিয়নকে তাঁর সমসাময়িক বিদেশীরা অনেকেই ভাল চোখে দেখেন নি, নানা ভাবে কঠোর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু, পরবর্তী যুগে, যখন বিদ্বেষের হল্‌কাটা কমে গেলে ইতিহাসকারেরা একটু সুস্থ হয়ে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখবার অবসর পেলেন,

তখন তাঁদের মনের ভাবও বেশ কিছুটা বদলে গেল ; নেপোলিয়নের বিরাট প্রতিভার কাছে মাথা নীচু করেছেন অনেকেই।

নেপোলিয়ন জীবনে অনেক বড় বড় কাজ করেছেন, অনেক বড় বড় যুদ্ধ অবিশ্বাস্য ভাবে জয় করেছেন। সে সবের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। কিন্তু মানুষটি তিনি কেমন ছিলেন তা জানবার জন্য কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তাই এখানে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ছোটখাট দু'-একটা ছবি তুলে দিচ্ছি।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙ্গত নেপোলিয়নের, কিন্তু তখনই তিনি বিছানা থেকে উঠতেন না। চাকর এসে ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিয়ে যেত ; বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি বেশ কিছুক্ষণ প্রকৃতির শোভা দেখতে ভালবাসতেন।

মুখ-হাত ধুতে না ধুতেই চাকর নিয়ে আসত একগাদা চিঠি। বিছানায় বসেই সেগুলিতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যেতেন। যেগুলি দরকারী মনে করতেন, পাশে রেখে দিতেন, বাকিগুলো ছুঁড়ে ঘরময় ছড়িয়ে দিতেন।

এর পর চা-পর্ব এবং সেই সঙ্গে খবরের কাগজ পাঠ। পারিবারিক চিকিৎসকও এই সময়ে ঘরে ঢুকত তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। নামেই স্বাস্থ্য পরীক্ষা, আসলে কিন্তু নেপোলিয়ন তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ রঙ্গ-রসিকতা করতে ভাল-বাসতেন। ওষুধষুধের বড় একটা তোয়াক্কা করতেন না তিনি।

এর পর দাড়ি কামানো। তোমরা হয়তো ভাবছ, সম্রাট্ যখন, তখন নিশ্চয়ই তিনি আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিতেন আর নাপিত এসে দাড়ি কামিয়ে দিত। মোটেই তা নয়। দাড়ি কামাতেন তিনি নিজের হাতে। ঠাট্টা করে বলতেন, "অপরের হাতে অমন ধারাল অস্ত্রটি দিয়ে তার সামনে নিশ্চিন্তে গাল-গলা এগিয়ে দেব, সে শর্মা আমি নই।" তবে নিজের হাতে কামালেও তার মধ্যেও বনেদীয়ানা ছিল যথেষ্ট। দু'জন লোক তাঁকে সাহায্য করত সে সময়ে। একজন সামনে ধরত আয়না, আর একজন ধরত সাবান আর জলের পাত্র। ক্ষুর থাকত নেপোলিয়নের হাতে। স্থির হয়ে দাড়ি কামাতে পারতেন না তিনি, নড়ে-চড়ে, নানা কসরৎ করে চলত তাঁর দাড়ি কামানো।

দাড়ি কামানোর পর স্নান। এই স্নানটাই ছিল তাঁর যা একটু বিলাসিতা। কাজের তাড়া না থাকলে সময় সময় একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা সময়ও তিনি স্নানের টবে কাটিয়ে দিতেন।

প্রাতরাশের সময় বাঁধা ছিল সকাল সাড়ে ন'টা, কিন্তু এগারোটা-বারোটা হয়ে গেলেও অবাক্ হবার কিছু ছিল না। খাওয়াদাওয়া ব্যাপারে একেবারেই নিয়ম মেনে চলতেন না নেপোলিয়ন। এই অনিয়মের জন্য অসুখ-বিসুখেও কম ভুগতে হয় নি তাঁকে। প্রাতরাশ বলতেও কোন রাজকীয় জাঁকজমক ছিল না তার মধ্যে। কয়েক টুকরো ফল, একটু চীজ্ আর স্যুপ্, আর বড় জোর এক-আধ টুকরো মাংসের রোস্ট্। তবে খাবার পর এক কাপ্ গরম গরম কফি চাই-ই চাই।

তার পরই সুরু হ'ত তাঁর কাজ। কী কাজই না করতে পারতেন তিনি! প্রথমে যেতেন লাইব্রেরীতে। চিঠিপত্র লেখা, আদেশপত্রে সই করা, খসড়া করা—সবই চল্‌ত এই সময়ে।

৫।৬ জন প্রাইভেট সেক্রেটারী একসঙ্গে বসত পাশাপাশি। নেপোলিয়ন একই সঙ্গে ৫।৬ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য বলে যেতেন নোট করে নেবার জন্য। একটুও ভুল হ'ত না, কারো সঙ্গে কারোটা গোলমাল হয়ে যেত না— এমনি আশ্চর্য স্মরণশক্তি ছিল তাঁর। লাইব্রেরীতে গিয়ে তিনি সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসতেন মনে ক'র না। অবশ্য সিংহাসন বা গদীওয়ালা চেয়ার একটা থাকত, কিন্তু সেটা থাকত পায়ের তলায়। নেপোলিয়ন লাফিয়ে টেবিলে গিয়ে বসাই পছন্দ করতেন বেশী।

লাইব্রেরী থেকে দরবার-গৃহ। এইখানেই সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন তিনি। সন্ধ্যা ৬টায় ডিনার খাবার কথা, কিন্তু কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে রাত্রি দশটা-এগারোটার আগে ডিনার খাবার ফুরসৎ হ'ত না তাঁর। এখানে একটা মজার কথা শোন। নেপোলিয়নের একটি খুব প্রিয় খাদ্য ছিল মুরগীর রোস্ট্, আর তা গরম গরম দেওয়া চাই। কিন্তু খাবার সময় যদি নির্দিষ্ট না থাকে তবে গরম রোস্ট্ কি করে দেওয়া যাবে? কিন্তু রাজ-রাজড়ার ব্যাপারই আলাদা। খরচের যেমন চিন্তা নেই, প্রসাদ পাবার লোকেরও তেমনি নেই অভাব। কাজেই পাচকের দল প্রতি পনেরো মিনিট পর পর একটি মুরগী রোস্ট্ করে যেত—কখন খাবার দেবার ডাক পড়বে ঠিক নেই তো! বলা বাহুল্য সে সবই যেত সাঙ্গোপাঙ্গদের পেটে।

ওদেশে মদ্যপানটা তেমন দোষের নয়; ঠাণ্ডার দেশ, সকলেই খায়। আর বিশেষ করে ফরাসী মদের এমনিতেই খুব নাম-ডাক। নেপোলিয়নের কিন্তু মদের ওপর একদম ঝোঁক ছিল না—তাঁর প্রিয় পানীয় ছিল কফি। ধূম-পানেরও নেশা ছিল না তাঁর, নেশার মধ্যে ছিল নস্যি নাকে দেবার নেশা। ওতে নাকি মাথা খোলে। আমাদের দেশের পণ্ডিতেরাও তো সেই কথাই বলতেন!

ডিনারের পর কফি খেতে খেতে চলত খানিকটা গল্পগুজব, কিংবা এক বাজি তাস। কিন্তু প্রায়ই খেলার মধ্যে হঠাৎ তাস ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যেতেন তিনি নিজের কাজে।

ঘুমোতে তাঁর অনেক রাত হ'ত। সময় সময় সারা রাতে হয়তো একবারও বিছানায় যেতেন না, আর গেলেও ২।১ ঘণ্টার বেশী ঘুমোতেন না। অনেক সময় এক ঘুম দিয়ে দুপুর রাতে উঠে আবার লেখাপড়ার কাজ সুরু করে দিতেন। ঘুমোবার জন্য কোমল শয্যার ধার ধারতেন না তিনি। চেয়ারে, টেবিলে, যেখানে বসে আছেন সেখানেই খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারতেন। শোনা যায়, অনেক বার যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোড়ার পিঠেই আধ ঘণ্টাটাক ঘুমিয়ে নিয়েছেন তিনি।

সারা জীবন ধরে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য-শাসন এবং নানা রাজকার্য করে কাটালেও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ছিল অসম্ভব টান,— অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, ললিতকলা—সবেরই চর্চা করেছেন তিনি। যা পড়তেন তাই-ই খাতায় টুকে রাখতেন। ছেলেবেলা থেকেই এই অভ্যাস। আর স্মরণশক্তির তো কথাই নেই! শোনা যায় তাঁর ছেলেবেলার একখানা নোটবুকে একেবারে শেষ পাতায় লেখা ছিল—"সেন্ট

হেলেনা, আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে একটি রুক্ষ, পার্বত্য দ্বীপ।" কে জানত—ঐ পার্বত্য দ্বীপটিতেই তাঁর জীবনের শেষ ক'টা দিন অমন নিষ্ঠুর ভাবে শেষ হবে!

নেপোলিয়নের খামখেয়ালী স্বভাবের ২।১টি পরিচয় শোন। আঁটসাঁট জামাকাপড়, টুপি পছন্দ করতেন না তিনি। নতুন জামাকাপড় এলে আগে তা কর্মচারীদের পরতে দিতেন। তারা কয়েকদিন ব্যবহার করার পর যখন ঢিলেঢালা হয়ে যেত তখন তিনি সেগুলি এনে পরতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অত বড় সফল সেনপতি, নিয়মানুবর্তিতায় যাঁর যোড়া দেখা যেত না, পারিবারিক জীবনে কিন্তু তিনি ছিলেন নেহাৎ অগোছাল। খেতে বসলে জামাকাপড়ে ঝোলটোল মেখে একাকার করতেন, ছুরি-কাঁটা সামলাতে না পেরে হয়তো হাত দিয়েই খেতে সুরু করতেন, কাপ, ডিশ্, গেলাস অনবরত ভাঙ্গত তাঁর হাতে। দাড়ি কামাতে গিয়েও গালটাল কেটে কাণ্ড করে বসতেন।

তবু নেপোলিয়নের তুলনা নেপোলিয়নই। প্রয়োজনের সময় এলেই দেখা যেত তাঁর বলিষ্ঠ মূর্তি—সংকল্পে দৃঢ়, ব্যক্তিত্বে অতুলনীয়, প্রতিভায় অলৌকিক। হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়ালেও তাঁকে আলাদা করে চিনে নিতে কষ্ট হ'ত না।

নেপোলিয়নের আর একটা অদ্ভুত গুণের কথা শুনলে অবাক্ লাগে। আর কিছু নয়, মনের ওপরে তাঁর অসাধারণ আধিপত্য।

একবার, নেপোলিয়ন একটা মস্ত বড় যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছেন। জেনার যুদ্ধ। ভোরবেলাই আক্রমণ সুরু হবে। আগের রাত্রে, সন্ধ্যার পরই নেপোলিয়ন বসে গেলেন যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরী করতে। কখন, কোথায়, কি ভাবে যুদ্ধটা চালাতে হবে সবেরই একটা খসড়া করে ফেললেন তিনি। কত সৈন্য নেবেন, কোথায় কোন্ সৈন্য সাজাবেন, কার কাছে কি অস্ত্র থাকবে—ইত্যাদি হাজারো পরিকল্পনা। অবশেষে খসড়া তৈরীর কাজ শেষ হয়ে গেল। তখন রাত প্রায় দুপুর। নেপোলিয়ন ভাবলেন, এবার একটু ঘুমিয়ে নেবেন। পরক্ষণেই তাঁর মনে পড়ল, কয়েক দিন আগে তিনি একটা মেয়ে-স্কুলের আইনকানুন তৈরীর ভার নিয়েছেন, সেটা করা হয় নি। এই ফাঁকে বরঞ্চ সেটাই আগে করে নেওয়া যাক; ঘুমের জন্য একটু পরে শুলেও চলবে।

শোন কথা! সাধারণ একটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগের দিনই আমাদের মনের কি অবস্থা হয় জান তো! শুধু ঐ এক ভাবনা, এক চিন্তা। ঘুমের মধ্যেও ভেসে ওঠে দুঃস্বপ্ন। আর, রাত পেহালেই যে লোকটিকে জীবন-মরণের পরীক্ষা দিতে হবে, সে হঠাৎ সেই সব ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একটা স্কুলের কাজ নিয়ে মেতে উঠল! কিন্তু সত্যিই তাই। স্কুলের সেই নিয়মকানুনের খসড়াও তখনই করে ফেললেন নেপোলিয়ন—শোবার আগেই। ভাবখানা, যুদ্ধের জন্য যা কিছু ভাবনার তা তো আগেই ভেবে রাখা হয়েছে, এখন আর ও নিয়ে ভেবে কি হবে?

তোমাদের হয়তো কৌতূহল জাগছে—পরের দিন যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল। হবে আবার কি, নেপোলিয়ন যা ভেবেছিলেন তাই-ই হয়েছিল; অর্থাৎ এক চমকপ্রদ জয়।
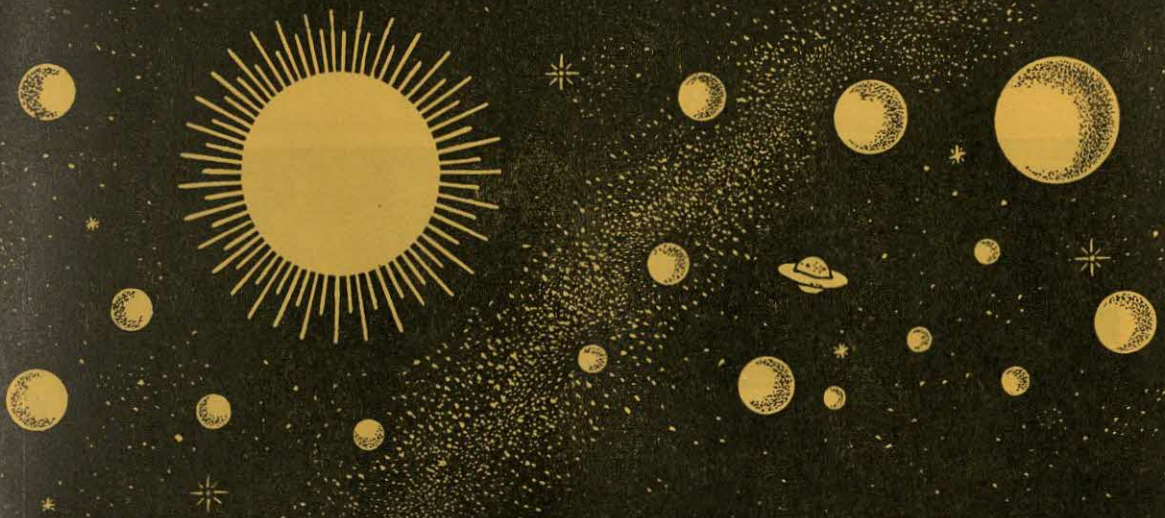
সূর্যের আদুরে ছেলে (?) বুধ

এবারে আমরা একে একে গ্রহদের গল্প সুরু করব,—সূর্যের চারদিকে যে সব গ্রহ আছে তাদেরই কথা। প্রথমেই বলছি বুধের কথা, করণ বুধই হচ্ছে সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রহ।

আমাদের পুরাণে বুধকে বলা হয় চন্দ্রদেবের পুত্র। কি করে এই কল্পনা তাঁদের মাথায় এসেছিল বলা কঠিন, কারণ চন্দ্রের সঙ্গে বুধের কোনই সম্পর্ক নেই। বুধ হচ্ছে একটি গ্রহ, চাঁদ উপগ্রহ। তাও বুধের উপগ্রহ নয়—পৃথিবীর। বুধের কোন উপগ্রহই নেই। বরঞ্চ বুধকে সূর্যেরই সন্তান বলা যেতে পারে, কেন না এখনও বেশীর ভাগ পণ্ডিতই মনে করেন সমস্ত গ্রহেরই জন্ম সূর্য থেকে। এ সম্পর্কে আমরা প্রথম খণ্ডেই আলোচনা করেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ : ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৮-৪৩)। তবে আজকাল কোন কোন বিজ্ঞানী অন্য কথাও বলছেন। যেমন কেউ কেউ বলছেন, মহাশূন্যে এক বিরাট ধূলিরাশি ও গ্যাসের পিণ্ডের সঙ্গে সূর্যের ঠোকাঠুকির সময়ে সূর্য তাদের একটা বিরাট অংশকে নিজের আকর্ষণী শক্তি দিয়ে টেনে নিয়ে আসে। তার পর সেগুলো নিজেদের মধ্যে ঘষাঘষি, ঠোকাঠুকির ফলে দানা বেঁধে কালক্রমে ছোট-বড় গ্রহে রূপান্তরিত হয়। প্রতি যুগেই আমরা সৃষ্টিতত্ত্বের এ রকম নতুন নতুন ব্যাখ্যা শুনতে পাচ্ছি। এর মধ্যে কোন্‌টা সম্ভব তা কেবল বিশেষজ্ঞরাই যাচাই করে নিতে পারেন। তবে এটুকু বলা যায় যে এখনও এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত।

যাই হোক, প্রচলিত মত অনুযায়ী বুধকে যদি সূর্যেরই ছেলে বলে ধরে নেওয়া যায়, তা হলে বলতে হবে বুধ হচ্ছে সূর্যের সবচেয়ে আদুরে ছেলে। আদুরে ছেলেকে যেমন বাবা-মা সর্বদা কাছে কাছে রাখেন—চোখের আড়াল করতে চান না—এও যেন সেই রকম আর কি!
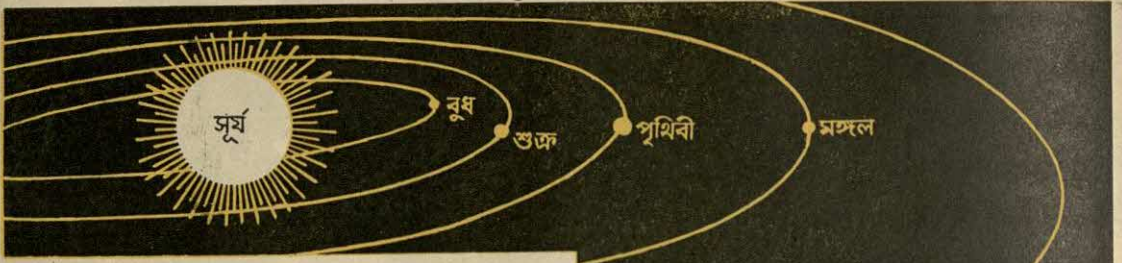
ন'টি গ্রহ বিভিন্ন দূরত্ব রেখে সূর্যকে সর্বক্ষণ প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

অন্যান্য গ্রহের তুলনায় সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব খুবই কম—গড় পড়তা তিন কোটি ষাট লক্ষ মাইল মাত্র। গড় পড়তা বলছি এই জন্য যে বুধ সূর্যকে বৃত্তাকারে ঘোরে না—তার রাস্তার দু' পাশটা বেশ একটু চাপা। একটা বৃত্তকে দু' পাশে চাপ দিলে কেমন দেখতে হয়? হাঁসের ডিমের মত চ্যাপ্টা, নয় কি? বুধের ভ্রমণপথও এই রকম হাঁসের ডিমের মত সূর্যকে ঘিরে আছে। কখনও সূর্যের অনেকটা গা ঘেঁষে গেছে সে পথ, কখনও খানিকটা দূর দিয়ে। এই পথ বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে বুধ যখন সূর্যের খুব কাছে এসে পড়ে তখন তাদের মধ্যে দূরত্ব দু' কোটি পঁচাশি লক্ষ মাইলের মত। আবার যখন দূরে যায় তখন এই দূরত্ব বেড়ে প্রায় চার কোটি তেত্রিশ লক্ষ মাইল পর্যন্ত হয়।

সূর্য থেকে দূরত্ব যেমন সবচেয়ে কম, আকারেও তেমনি বুধ অন্যান্য গ্রহের তুলনায় অনেক ছোট। আমাদের পৃথিবীর সঙ্গেই তুলনা করা যাক না কেন! বুধের মত তেইশটা বুধ একত্র করে পুঁটলি বাঁধলে তবে হয়তো আমাদের পৃথিবীর সমান হবে। এমন কি আমাদের চাঁদের সঙ্গে তুলনা করলেও বুধ খুব একটা বড় হবে না।

বুধও চাঁদের মত বাড়ে-কমে

কিন্তু আকারে ছোট হলেও বুধের সঙ্গে পরিচয় যে আমাদের অনেক দিনের তা পুরাণের গল্প থেকেই বোঝা যায়। বাস্তবিক, ভারতীয় জ্যোতিষীরা বুধ গ্রহকে অনেক দিন থেকেই চিনতেন এবং ওর চালচলনেরও খবর রাখতেন। তবে বুধ এমনিতেই খুব ছোট্ট গ্রহ, তার ওপর

সূর্যের খুব কাছে আছে বলে সেই ঝক্‌মকে আলোয় চট্ করে তাকে খুঁজে বার করার জো নেই। বুধ যখন ঘুরতে ঘুরতে সূর্য থেকে অনেকটা দূরে চলে আসে তখনই কেবল সন্ধ্যার দিকে অল্প একটু সময় আর ভোরের দিকে একটু সময় তাকে খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক্ জ্যোতিষীরা তো এজন্য বুধকে দু'টি পৃথক্ তারা মনে করতেন। নামও দিয়েছিলেন তাই দু'টি—ভোরেরটিকে 'অ্যাপোলো' আর সন্ধ্যারটিকে 'মার্কারী'। তাঁদের এ ভুল অনেকদিন পরে ধরা পড়ে।

আজকালকার জ্যোতির্বিদ্‌দের কিন্তু বুধকে দেখতে হলে অত দিন অপেক্ষা করতে হয় না, কৌশলে সূর্যের আলো ঢেকে রেখে তাঁরা প্রায় যে কোন সময়ে বুধকে খুঁজে বার করতে পারেন দূরবীণে—অবশ্য যদি না বুধ সে সময়ে একেবারে সূর্যের কোল ঘেঁষে থাকে। তবে দূরবীণ
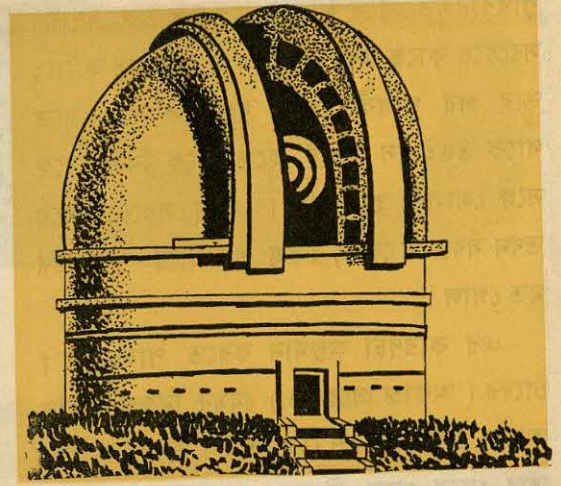
একটি আধুনিক মানমন্দির

দিয়ে দেখলে বুধকে সাধারণতঃ গোল দেখায় না, চাঁদ যেমন বাড়ে-কমে বুধও তেমনি বাড়ে-কমে। ফলে ঠিক চাঁদেরই মতন বুধকে কখনও দেখায় কুমড়োর কাটা ফালির মত, কখনও বা আধখানা মালপো'র মত, কখনও বা আরও বড়। বুধ
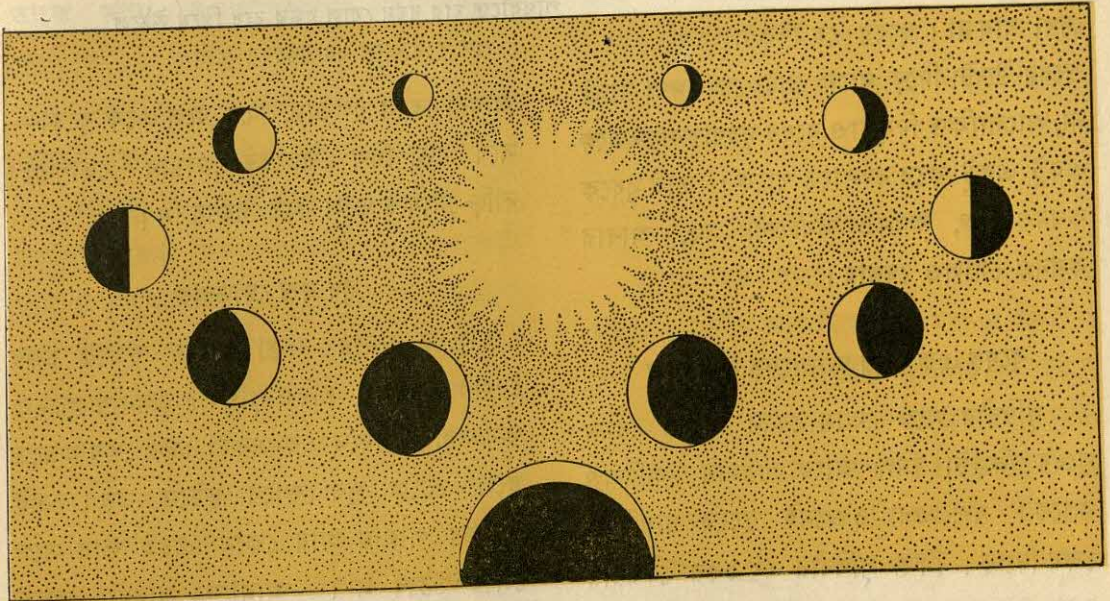
বুধ কেমন করে বাড়ে-কমে

পৃথিবীর যত কাছে আসে তাকে তত সরু দেখায়। সবচেয়ে কাছে যখন তখন সে ঐ কুমড়োর ফালি; তার পর পৃথিবী থেকে যত দূরে সরে যেতে থাকে ততই সে ছোট হতে থাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোলও হয়ে যায়। যখন সবচেয়ে দূরে তখন সবচেয়ে ছোট, কিন্তু একেবারে পূর্ণচন্দ্রের মত গোল।

এর কারণটা অনুমান করতে পারছ কি? চাঁদের (অন্যান্য গ্রহেরও) যেমন নিজস্ব কোন আলো নেই বুধেরও ঠিক তাই। সূর্যের আলো তার গায়ে পড়ে ঠিকরে আসে বলেই তাকে উজ্জ্বল দেখায়। এখন, বুধ তো রয়েছে পৃথিবী থেকে সূর্যের অনেক কাছে, বুধের যে ঘুরবার রাস্তা তা পৃথিবীর ঘুরবার রাস্তার ভিতরে। কাজেই পৃথিবী থেকে দেখলে বুধের সবটুকু একসঙ্গে সূর্যের আলোয় আলোকিত দেখা যায় না। বুধের যে দিক্‌টা সূর্যের উল্টো দিকে থাকে সেটা তো দেখা যায়ই না, আলোকিত দিক্‌টাও বুধের ঘুরবার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে বদলাতে থাকে। তাই বুধকে কখনও সরু, কখনও অর্ধচন্দ্রের মত, আবার কখনও গোলও দেখায়।

বুধের এক বছর আমাদের তিন মাস

পৃথিবীর সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে যেমন বুধের কিছুটা মিল আছে তেমনি অমিলও আছে। ধর, ওরা দু'জনেই সূর্যের চারদিকে চক্কর দিচ্ছে। কিন্তু পৃথিবীর এই চক্কর দেওয়ার কাজ এক-একবার শেষ হতে লাগে ৩৬৫ দিন— যাকে আমরা বলি আমাদের এক বছর। কিন্তু বুধের সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে কতদিন লাগে জান? মাত্র ৮৮ দিন। তা হলে বুধের বেলায় সেইটেই হ'ল তার এক বছর। অর্থাৎ বুধের এক-একটি বছর আমাদের মোটামুটি তিন মাসের সমান। তোমার বয়স কত? ১৬ বছর? তা হলে বুধে গিয়ে বাস করলে (যদি সম্ভব হ'ত) তাদের হিসেবে তুমি হতে একটি ৬৪ বছরের বুড়ো। তেমনি বুধে যদি কোন লোক থাকত আর ৮০ বছর বয়সে সে যদি আমাদের পৃথিবীতে চলে আসত তা হলে
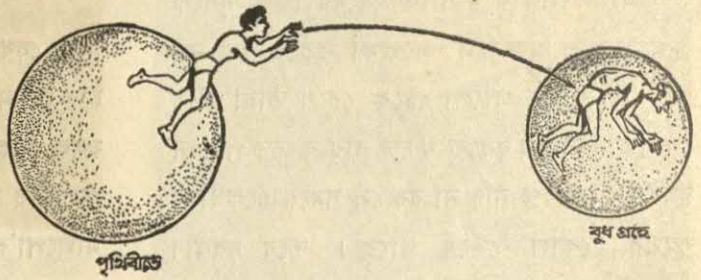
পৃথিবীতে যার বয়স ষোল বছর বুধে গিয়ে উঠলে সে হয়ে যাবে ৬৪ বছরের বুড়ো

আমরা হেসে বলতাম, "কে বলে একে বুড়ো— সবে তো বিশ বছরের জোয়ান ছোকরা! দাড়ি-গোঁফও ভাল করে গজায় নি!"

বুধ মস্ত দৌড়বাজ

বুধের চলার রাস্তা অর্থাৎ সূর্যকে চক্কর দেবার ভ্রমণপথ যদিও পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম তবু, ৮৮ দিনে এক-একটা চক্কর শেষ করতে হলে, তাকে খুব জোরে ছুটতে হয়। এই দৌড়ের পাল্লায় আর কোন গ্রহই তার সঙ্গে পেরে উঠবে না। আমাদের পৃথিবী ছোটে সেকেণ্ডে ১৮ মাইল, আর বুধ ছোটে সেকেণ্ডে

বন্দুকের গুলির সঙ্গে যদি বুধ দৌড়ের পাল্লা দেয়……

গড়ে ২৯ মাইল। আবার 'গড়ে' কথাটা ব্যবহার করছি। করছি এইজন্যে যে বুধের গতিবেগ সর্বদা সমান নয়। যখন সূর্য থেকে খুব দূরে তাকে তখন সে অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে—সেকেণ্ডে ২৩ মাইল আন্দাজ ছুটতে থাকে। সূর্যের কাছাকাছি এলেই তার গতিবেগ যায় অসম্ভব রকম বেড়ে;—তখন সে সেকেণ্ডে ৩৫ মাইল বেগে ছুটতেও কসুর করে না। ভাবখানা যেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারি পালাই বাবা!' হ'লই না হয় সে সূর্যের আদুরে ছেলে, তা বলে বাপের শাসনের ভয়ও তো থাকতে পারে, কি বল? তা ছাড়া বাপের যা তেজ!

কিন্তু এই সেকেণ্ডে ৩৫ মাইল বেগটা কতখানি বেগ তা আন্দাজ করতে পার? একটা উপমা দিলে হয়তো বুঝবে। ধর, একটা বন্দুক ধরে গুলি ছোঁড়া হ'ল আর ঠিক ঐ একই সঙ্গে বুধকেও ছুটতে বলা হ'ল। দেখা যাবে বন্দুকের গুলি ১০০ গজ যেতে না যেতে বুধ দশ হাজার গজ রাস্তা পেরিয়ে যাবে। বুধের ব্যাস ৩০০৮ মাইল। এই পরিমাণ পথ পার হতে তার দু'মিনিটও লাগবে না।

এই রকম প্রচণ্ড দৌড়বাজ বলেই বুধের নাম পাশ্চাত্য দেশে দেওয়া হয়েছে 'মার্কারি'। গ্রীক্ পুরাণে মার্কারি হচ্ছেন দেবদূত। তাঁর জুতোর সঙ্গে পাখীর ডানার মত ডানা আঁটা। ঐ ডানার জোরে তিনি শূন্যপথে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেন দেবতাদের কাছে খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্য।

বুধের আসল রূপ

সূর্যের যত কাছে যাওয়া যাবে গরম তত বাড়বে। গ্রীষ্ম আর শীতেই আমরা এ তফাৎটা টের পাই। কিন্তু পৃথিবীর তুলনায় বুধ রয়েছে সূর্যের অনেক কাছে, কাজেই সেখানকার গরমটা যে অনেক বেশী হবে তাতে আর সন্দেহ কি? কতটা বেশী? তারও হিসেব বার করেছেন পণ্ডিতেরা। বুধ যখন সূর্যের কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে থাকে তখন তার গায়ের তাপ

দেবদূত মার্কারি শূন্যপথে ছুটে চলেছেন

আমাদের পৃথিবীর সবচেয়ে গরমের দিনের তাপের চতুর্গুণ। আর যখন সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে তখন তা হয়ে যায় ন' গুণ। কি রকম গরম সেটা? এক টুকরো টিন বা সীসে সেই গরমে ফেলে রাখলে তা তো মুহূর্তে গলে যাবেই, সঙ্গে সঙ্গে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতেও সুরু করবে।

এমন অবস্থায় বুধের চেহারাটা আমরা কল্পনায়ই খানিকটা আন্দাজ করতে পারি। তবে বিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে আরও কিছু খুঁটি-নাটি খবর যোগাড় করতে ছাড়েন নি। তাঁদের মতে বুধের ওপরকার অবস্থাটা প্রায় চাঁদের মতই 'পোড়া'—যদিও বুধ আকারে চাঁদের প্রায় দেড়গুণ। বুধের ছোট্ট শরীরের জন্য তার মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিও খুব কম। এরই ফলে বুধ তার চারদিকে কোন গ্যাসের আবরণকে টেনে রাখতে পারে নি—সবটাই ছিট্‌কে চলে গেছে মহাশূন্যে। এই গ্যাসের আবরণকেই তো আমরা বলি বায়ুমণ্ডল! তা হলে বলব বুধের চারদিকে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। বুধের ওপর সূর্যের আলো পড়ে সে আলো ঠিকরে আসার পর তার বর্ণালী পরীক্ষা করেও বিজ্ঞানীরা এই মতই দিয়েছেন। অতিরিক্ত গরমের জন্য বুধের মাটি-পাথরও নিশ্চয়ই খুব শুকনো হয়ে গেছে—ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। খুব ভালো দূরবীণ দিয়ে দেখলে বুধের গায়ে লম্বা লম্বা আঁচড়ের মত দাগ দেখা যায়। অনেক পণ্ডিত মনে করেন এগুলি আর কিছুই না—বুধের গায়ের বিরাট বিরাট ফাটল, যা নাকি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সূর্যের প্রচণ্ড তাতে সেখানকার মাটি-পাথর ফাটিয়ে তৈরী হয়েছে।

বুধের একদিকে চিরদিন, একদিকে চিররাত্রি

পৃথিবীর এক-একটা দিন শেষ হয় ২৪ ঘণ্টায়, অর্থাৎ পৃথিবী যে তার মেরুদণ্ডের চারদিকে লাট্টুর মত ঘুরপাক খাচ্ছে তার এক-একটি পাক শেষ হতে ঐ ২৪ ঘণ্টা লাগে। কিন্তু বুধের দিন? বুধ যতক্ষণে তার নিজের শরীরের চারদিকে একবার পাক খায় ততক্ষণে সূর্যকেও পূরো একটা চক্কর দিয়ে আসে। তার মানে, বুধ তার শরীরের একটা দিক্ বরাবর সূর্যের দিকে রেখে ঘুরছে, অপর দিক্‌টা বরাবরই রয়েছে সূর্যের আড়ালে। কাজেই বুধের এক দিকে চিরকালের জন্য দিন, অপর দিকে চির-

বুধের মাটিপাথর নিশ্চয়ই ফেটে চৌচির হয়ে গেছে

উত্তাপ যেমন সময় সময় ৬৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে, তেমনি অন্ধকার দিক্‌টায় উত্তাপও সময় সময় নেমে আসে শূন্য ডিগ্রী ফারেনহাইটের চাইতেও ৪৫০ ডিগ্রী নীচে। আর, তোমরা নিশ্চয়ই জান, ২১২ ডিগ্রী ফারেনহাইট হচ্ছে সেই উত্তাপ যাতে জল টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে সুরু করে। আবার তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটে নামলেই জল জমে বরফ হয়। তা হলে কল্পনা করে দেখ বুধের অবস্থাটা!

কালের জন্য রাত্রি। বুধে যদি কোন বাসিন্দা থাকত তা হলে বেচারাদের না দেখা হ'ত সূর্যোদয়, না চন্দ্রোদয়। যেখানে চাঁদই নেই সেখানে আবার চন্দ্রোদয় হবে কেমন করে? তবে হ্যাঁ, সূর্যটা ওখান থেকে তারা দেখত খুবই বড় করে। আমাদের আকাশের সূর্যের চাইতে সেটা অন্ততঃ ৯।১০ গুণ বড়।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। বুধ তার মেরুদণ্ডের চারদিকে পাক খাচ্ছে একেবারে খাড়া ভাবে—পৃথিবীর মত তার ভ্রমণপথের ওপর একটু হেলে নয়। এর ফলে বুধে আমাদের মত ঋতুপরিবর্তন সম্ভব নয়।

আগে বলেছি, বুধ সর্বদাই তেতে রয়েছে। কথাটা বুধের যে পিঠটা সূর্যের দিকে ফেরানো সে পিঠটা সম্বন্ধেই বলা চলে। অপর পিঠটা, যেটা নাকি বরাবর সূর্য থেকে আড়াল করা রয়েছে, সেটার সম্বন্ধে ও কথা বলা চলে না। বরঞ্চ ঠিক উল্টো। বুধের আলোকত দিকটার

তবে কি বুধে কোনও জ্যান্ত প্রাণী নেই? কোন গাছপালা? কি করে থাকবে বল? আমাদের জানাশোনা কোন জীবজন্তু বা গাছপালা কি ঐ রকম গরম বা ঐ রকম ঠাণ্ডায় টিকতে পারে? অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, বুধের খানিকটা জাঁয়গায়, যেখানটায় আলোকিত অংশ শেষ হয়ে অন্ধকার অংশ সুরু হতে চলেছে সেই সীমা-

বুধের একটা দিক্‌ বরাবর সূর্যের আড়ালে
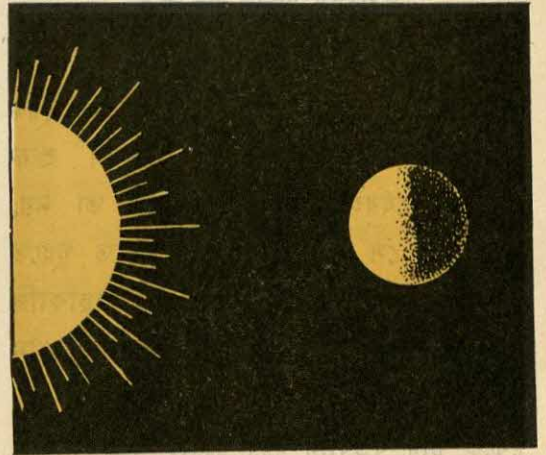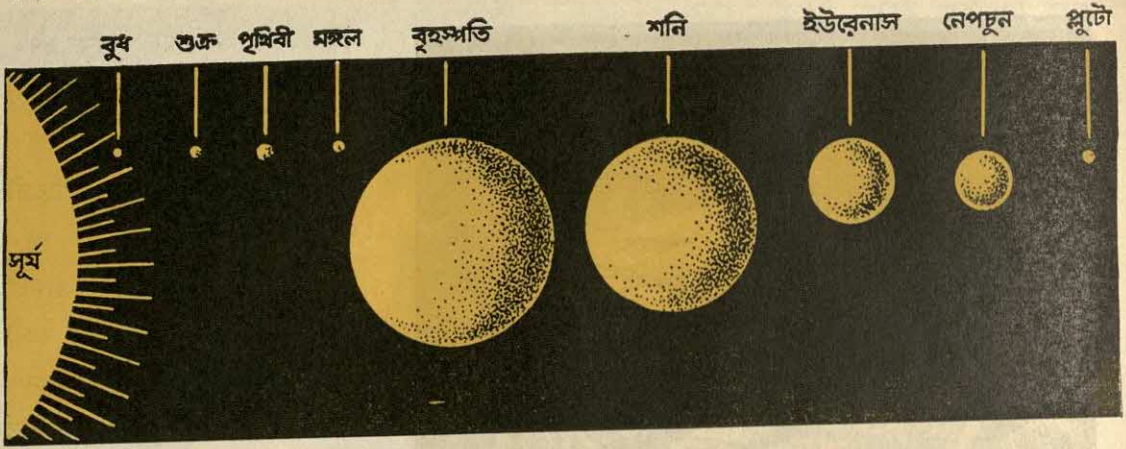
পৃথিবীর তুলনায় আর আর গ্রহগুলোর কোন্‌টা কত বড়

রেখায়, গরম বা ঠাণ্ডা নিশ্চয়ই অনেকটা কম। সেখানে খুব নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বা উদ্ভিদ্ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু বুধে জল-বাতাসের অভাবের দরুণ সে সম্ভাবনাও খুব কম।

তবে একটা বিষয়ে কিন্তু বুধ পৃথিবীর ওপর টেক্কা দিয়েছে। শরীরের তুলনায় বুধ ভীষণ ভারী। শুধু পৃথিবীর তুলনায় নয়, অন্যান্য গ্রহদের সঙ্গেও বুধের শরীরের বহর আর ওজন তুলনা করলে ওই কথাই বলতে হবে।

সবচেয়ে উজ্জ্বল গ্রহ শুক্র

সূর্যের কাছাকাছি গ্রহদের মধ্যে বুধের পরেই রয়েছে শুক্র। সূর্য থেকে শুক্রের দূরত্ব গড়ে প্রায় ৬ কেটি ৭০ লক্ষ মাইল। শুক্র শুধু যে সূর্যেরই কাছাকাছি রয়েছে তা নয়, পৃথিবীরও সে নিকটতম গ্রহ। ঘুরতে ঘুরতে শুক্র আর পৃথিবী মাঝে মাঝে এত কাছাকাছি এসে পড়ে যে তখন তাদের মধ্যে ব্যবধান থাকে মাত্র আড়াই কোটি মাইল, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদ যতখানি দূরে রয়েছে শুক্র রয়েছে তার একশ' গুণ দূরে।

চাঁদ আকারে ছোট হলেও তাকে আমরা গ্রহ-তারাদের তুলনায় কত বড় দেখি! সে তো তার কাছাকাছি থাকার দরুণই! শুক্রকেও ঐ জন্য অন্যান্য গ্রহ-তারার তুলনায় বেশ একটু বড় দেখায়; বড় এবং উজ্জ্বল। পৃথিবী থেকে দেখলে অত উজ্জ্বল গ্রহ বা তারা আকাশে আর একটিও দেখা যায় না। অবশ্য এই উজ্জ্বলতার আরও কারণ আছে, সে কথা পরে বলছি।

শুক্র গ্রহকে তোমরা সবাই দেখেছ। তবে সকলেই চেন কিনা জানি না। বছরের সব সময়ে ওকে দেখা যায় না, কিন্তু যখন দেখা যায় তখন বেশ ভাল করেই দেখা যায়। বছরের কোন কোন সময়ে ঠিক সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম আকাশে একটা খুব জ্বলজ্বলে তারা নিশ্চয়ই তোমাদের চোখে পড়েছে—যেটিকে বলা হয় সাঁঝের তারা বা সন্ধ্যাতারা। আবার তোমাদের মধ্যে যারা খুব ভোরে ওঠ, তারাও হয়তো লক্ষ্য করেছ, বছরের কোন কোন সময়ে সেই ভোর বেলা—সূর্য উঠবারও আগে পুব আকাশে একটা জ্বলজ্বলে তারা ঝক্‌মক্ করে। আমরা

ওকে বলি শুকতারা। এ দু'টি তারাই কিন্তু আসলে তারা নয়—আমাদের শুক্র গ্রহ।

তা হলে শুক্র গ্রহ কি দু'টো? একটা ভোরে দেখা যায়, একটা সন্ধ্যায় দেখা যায়? উঁহুঃ, তা নয় মোটেই। একটাই গ্রহ—কখনও দেখা দেয় ভোর বেলা, কখনও সন্ধ্যা বেলা। একই দিনে শুকতারা আর সন্ধ্যাতারা দেখা কখনই সম্ভব নয়।

শুক্র এত ঝক্‌মকে কেন?

শুক্রকে অত উজ্জ্বল—অত সুন্দর দেখায় বলেই কবিরা ওকে নিয়ে কত কবিতা লিখেছেন, কত কাল্পনিক গল্প বানিয়েছেন! পাশ্চাত্য দেশে তো ওর নামই দেওয়া হয়েছে 'ভিনাস্'। ভিনাস্ হলেন সৌন্দর্যের দেবী।

কিন্তু শুক্র এত উজ্জ্বল কেন? সূর্যের মত ওরও কি নিজস্ব কোন আলো আছে? তা কি করে থাকবে? গ্রহদের কারোরই তো নেই। অন্যান্য গ্রহ এবং উপগ্রহের মত শুক্রেরও সমস্ত আলো সূর্য থেকে ধার করা—অর্থাৎ সূর্যের আলো ওর গায়ে এসে সেখান থেকে ঠিকরে পড়ার দরুণই ওকে ঝলমলে দেখায়। সূর্যের কাছে বলে শুক্র সূর্য থেকে আলো অনেক বেশী পায়—পৃথিবী যতটা পায় তার অন্ততঃ দ্বিগুণ। বুধ অবশ্য আরো বেশী আলো পায়, কিন্তু বুধের আকার অনেক ছোট, দূরত্বও আমাদের কাছ থেকে অনেকটা বেশী। তা ছাড়া সূর্যের আলো বুধের গায়ে পড়ে শুক্রের মত অমন ভাবে ঠিকরে পড়ে না। হিসেব করে দেখা গেছে শুক্র তার গায়ে-এসে-পড়া আলোর শতকরা ৫৯ ভাগই ঠিকরে ফেরৎ পাঠায়, যেখানে চাঁদ পাঠায় মাত্র শতকরা ৭ ভাগ।

সৌন্দর্যের দেবী ভিনাস্

শুক্রের গা থেকে এত আলো ঠিকরে আসার কারণও বিজ্ঞানীরা বার করেছেন। পৃথিবীর মত শুক্রকেও ঘিরে রেখেছে ঘন বাতাসের আবরণ। পৃথিবীর চাইতে সে আবরণ অনেক ঘন এবং হয়তো পুরুও বেশী—মেঘের মতই বলা যেতে পারে। এই মেঘের আবরণ দেখতে সাদা, তাই তার ওপর সূর্যকিরণ পড়লে সে আলো অত উজ্জ্বল হয়ে ফিরে আসে। কেউ কেউ বলেন, ও মেঘ নয়—শুক্রের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে অসংখ্য ধূলোর কণা, সেই ধূলিকণাই সূর্যের আলো ফেরৎ পাঠিয়ে শুক্রকে অমন ঝলমলে করে রেখেছে। আবার কেউ

কেউ বলেন ওগুলো ঠিক ধূলিকণা নয়,—জমাট কার্বন ডাইঅক্সাইডের কুচি।

শুক্র কি দিয়ে তৈরী

শুক্রের বায়ুমণ্ডল কি দিয়ে তৈরী এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা এখনও একমত হতে পারেন নি। শুক্রের আলো স্পেক্‌ট্রোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে ঐ বাতাসে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড পাওয়া গেছে। জলীয় বাষ্পও কিছু আছে, কিন্তু অক্সিজেন নেই। আবার কারো কারো মতে, ঐ বাতাস প্রধানতঃ নাইট্রোজেন দিয়ে তৈরী; তার মধ্যে কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইডও আছে, জলীয় বাষ্পও কিছু আছে।

কিন্তু ঐ ঘন আস্তরণের, অর্থাৎ শুক্রের বায়ুমণ্ডলের নীচে শুক্রের শরীরটা দেখতে কি রকম সে বিষয়ে আমাদের কোনও ধারণা নেই। নানা মুনির এ বিষয়ে নানা মত। এমন কি শুক্রের দেহ কঠিন না তরল এ নিয়েও মত-বিরোধ আছে। একদল বলেন, শুক্রের দেহ যদি চাঁদের মত পাথুরে হ'ত তা হলে শুক্রের বায়ুমণ্ডলের বেশীর ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইডই রাসায়নিক পরিবর্তনে 'কার্বনেট' হয়ে ঐ সব পাথরের সঙ্গে যুড়ে যেত। তা যখন হয় নি, তখন শুক্রের ওপরটা এখনও নিশ্চয়ই তরল জল দিয়েই তৈরী। শুক্রের দেহটা যে রুক্ষ নয়, মসৃণ, এ প্রমাণও তাঁরা দেবার চেষ্টা করেছেন।

আর একদল আবার বলেন, শুক্রের দেহটা যদি জল দিয়ে তৈরী হয় তা হলেও তো তার ওপরকার কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ওপরের চাপে তার মধ্যে বেশ কিছুটা গুলে যাবার কথা —যেমন সোডা ওয়াটারের বেলায় হয়। তা হলে তো বলতে হবে শুক্রের সমুদ্রগুলো আসলে এক একটা সোডা ওয়াটারের ডিপো! এঁদের মতে শুক্রের দেহ মোটেই তরল নয়, মরুভূমির মত রুক্ষ। সূর্যের আলো শুক্রের বায়ুমণ্ডল ভেদ করেও সেই মরুভূমিকে গরম করছে।

আর একদলের মতে শুক্রদেহ জলের মত তরল হলেও আসলে তা জল নয়—পেট্রোলিয়াম জাতীয় কোন তেল দিয়ে তৈরী হওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ ঐ তেলই অত্যন্ত উত্তপ্ত হলে ঐ রকম ঘন মেঘের বাষ্প তৈরী করতে পারে এবং তা ভেঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। যাই হোক, যতক্ষণ না হাতেনাতে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ এ বিষয়ে নানা মতবাদকে কল্পনার মতই মনে করে নিতে হবে।

শুক্রের হ্রাস-বৃদ্ধি বা কলা

বুধের সঙ্গেও কিন্তু শুক্রের কোন কোন বিষয়ে মিল আছে। প্রথম মিল—বুধের মত শুক্রও পৃথিবীর চাইতে সূর্যের অনেক কাছে আছে, অর্থাৎ তার ভ্রমণপথ পৃথিবীর ভ্রমণপথের ভিতরে। কাজেই বুধের বেলা যা হয় শুক্রের বেলাও তাই হবে—পৃথিবী থেকে দেখলে শুক্রকে সব সময়ে গোল দেখাবে না, চাঁদের মত নানা আকারের দেখাবে। সত্যিই তাই দেখায়—যদিও খালি চোখে তা দেখা যায় না। তবে শুক্রের এই ক্ষয়বৃদ্ধি বুধের চাইতে অনেক স্পষ্ট ভাবে—অনেক বড় করে দেখা যায়। কারণ শুক্র শুধু আকারেই বুধের চেয়ে বড় নয়, পৃথিবী থেকেও বুধের চেয়ে অনেক কাছে। শুক্র যখন পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে অর্থাৎ সূর্যের ও-পিঠে থাকে তখন সে সম্পূর্ণ গোল,

কিন্তু আকারে দেখায় সবচেয়ে ছোট। যতই সে এগিয়ে আসে ততই সে আকারে বাড়তে থাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে চাঁদের কলার মত ক্ষয় হতে সুরু করে। যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে তখন সে সবচেয়ে ক্ষীণ, কিন্তু উজ্জ্বলতম। তার পর যেই দূরে সরে যেতে থাকে অমনি তার
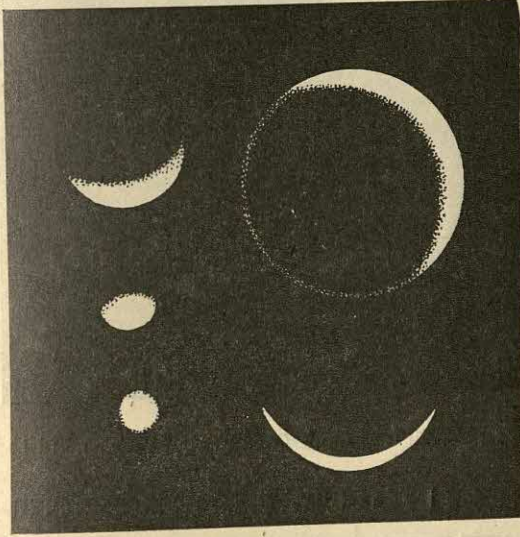
শুক্রের ক্ষয়বৃদ্ধির দূরবীণের সাহায্যে তোলা ফটো

কলা বাড়তে থাকে কিন্তু আকার যায় ছোট হয়ে, উজ্জ্বলতাও কমে যায়।

পৃথিবী শুক্রের যমজ বোন

কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রের মিল আরও বেশী। এত বেশী যে শুক্রকে বলা হয় পৃথিবীর যমজ বোন। বহরে প্রায় দু'টি গ্রহই সমান, পৃথিবী সামান্য একটু বড়। পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল, শুক্রের ৭৭০০ মাইল। ওজনে শুক্র পৃথিবীর ১০ ভাগের ৮½ ভাগ। তবে গতি-বেগের পাল্লায় শুক্র পৃথিবীকে হারিয়ে দিয়েছে। পৃথিবী যেখানে ছোটে সেকেণ্ডে ১৮ মাইল, শুক্র সেখানে ছোটে ২২ মাইল। পৃথিবীর সূর্যকে একটা পাক খেতে লাগে ৩৬৫ দিন, শুক্রের লাগে ২২৫ দিন। অর্থাৎ পৃথিবীর হিসেব দিয়ে মাপলে শুক্রের এক-একটি বছর ২২৫ দিনে বা সাড়ে সাত মাসে শেষ হয়।

শুক্রের দিন কত বড়

শুক্রের এক একটি দিন কত বড় লম্বা, অর্থাৎ সূর্যকে পাক খাবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্র নিজের শরীরের চারদিকে লাট্টুর মত কতক্ষণে একবার পাক খাচ্ছে এ নিয়েও পণ্ডিতেরা নানা সমস্যায় পড়েছিলেন। বুধের মত শুক্রেরও বছর এবং দিন সমান সমান—এই ধারণাই বহুদিন যাবৎ পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এখনও বেশীর ভাগ পণ্ডিতেরই তাই মত। অর্থাৎ বুধের মত শুক্র যে সময়ে সূর্যের চারদিকে একবার চক্কর দেয় ঠিক সেই সময়েই নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকেও একবার পাক খায়। তাই যদি হয় তা হলে বলতে হবে শুক্রের একদিকে চির-কালের জন্য রাত্রি, অপর দিকে চিরকালের জন্য দিন। এ ক্ষেত্রে শুক্রের যে দিক্‌টায় চিররাত্রি সে দিক্‌টা অসম্ভব ঠাণ্ডা হবার কথা, আবার যেদিক্‌টায় চিরদিন সে দিক্‌টা তেমনি অসম্ভব গরম হবার কথা। বাতাস গরম হলে হাল্কা হয়ে যে দিকে ঠাণ্ডা সেদিকে ছুটতে থাকে আর ঠাণ্ডা বাতাস এসে তার জায়গা দখল করে। কাজেই শুক্রেও নিশ্চয়ই তাই ঘটছে। সর্বক্ষণই তার বায়ুমণ্ডলে চলছে প্রচণ্ড ঝড়।

যাঁরা শুক্রের দিন আরও ছোট বলে অনুমান করেন তাঁরাও বহু যুক্তির অবতারণা করেছেন। শুক্রের ঠাণ্ডা পিঠ আর গরম পিঠের

উত্তাপে যে বিরাট তারতম্য থাকার কথা এঁরা পরীক্ষা করে তা পান নি। এক পিঠের তাপ পাওয়া গেছে ৫০ ডিগ্রী সেঃ, অপর পিঠের ২৩ ডিগ্রী সেঃ। একদিকে চিররাত্রি, অপর দিকে চিরদিন হলে এটা কি করে সম্ভব? অপর পক্ষ বলছেন, তোমরা তো শুক্রের ঠিক গায়ের উত্তাপ অর্থাৎ জমির উত্তাপ মাপতে পার নি, মাপছ ওপরকার মেঘের তাপ। ও দিয়ে কিছু বলা চলে না। শুক্রের ওপরটা মেঘলা হওয়ায় সেখানে কোন স্থায়ী দাগ খুঁজে পাওয়া যায় না—এই হয়েছে সমস্যা। আর একটা মজা, অন্যান্য গ্রহগুলো যে দিকে মুখ করে ঘোরে শুক্র ঘোরে তার উল্টো মুখে। এতেও সমস্যাটা ঘোরালো করে তুলেছে। ফলে কেউ কেউ শুক্রের দিন প্রায় পৃথিবীর দিনেরই সমান—এমন কথাও বলেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত শুক্রের এক-একটা দিন পৃথিবীর ২৪০টা দিনের সমান—এই ধারণাটাই জোরালো হয়ে উঠেছে।

শুক্রের সন্ধানে রকেট

১৯৬২ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা শুক্রকে লক্ষ্য করে একটা রকেট ছুঁড়েছিলেন। এই রকেটের নাম দেওয়া হয়েছিল মেরিনার-২, আর ওর মধ্যে ছিল নানা রকম স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। ঐ বছরেরই ১৪ই ডিসেম্বর রকেটটি শুক্রের প্রায় পাশ ঘেঁষে চলে যায় আর সেই সময় ওর ভিতরের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি শুক্র সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠায়। ঐ সময় শুক্র থেকে রকেটটির দূরত্ব ছিল মাত্র সাড়ে একুশ হাজার মাইল। এই সব যন্ত্রে শুক্র সম্বন্ধে এমন অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে যা নাকি এত দিনের বহু ধারণা পালটে
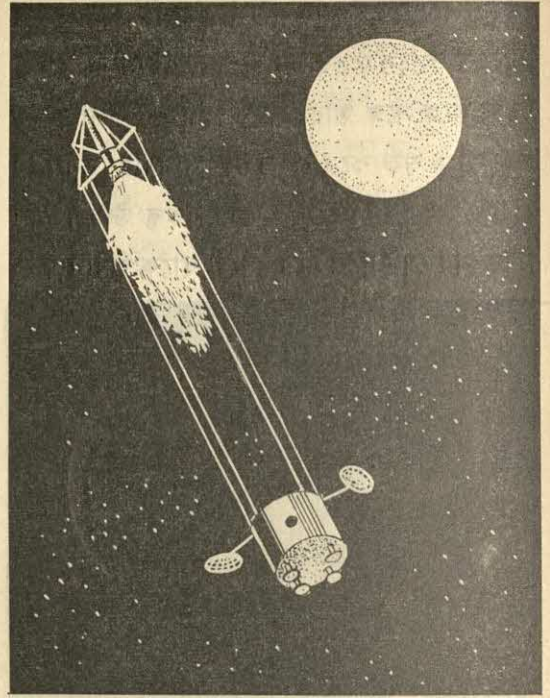
শুক্রের প্রায় গা ঘেঁষে মেরিনার-২ ছুটে চলে যায়।

দিয়েছে। যেমন ধর, পৃথিবীর চারদিকে যেমন একটা চুম্বকের ক্ষেত্র আছে, শুক্রে তা নেই; শুক্র যে দিকে মুখ করে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘোরে তার উল্টো মুখে এবং তার এক-একটা দিন আমাদের প্রায় ২৫০ দিনের সমান; শুক্রের দু'পিঠেরই উত্তাপ প্রায় সমান—৪৩০ ডিগ্রী সেঃ। জল ১০০ ডিগ্রীতেই ফুটে বাষ্প হয়ে যায়, কাজেই এ যদি সত্যি হয় তা হলে তো শুক্রের দেহটা মরুভূমির মত হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু মেরিনার-২ রকেটের দেওয়া তথ্যগুলোও সব সঠিক কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ উঠেছে। কারণ ওরও দু' বছর পরে আমেরিকার আর একদল জ্যোতির্বিজ্ঞানী খুব উঁচু আকাশে বেলুনে করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে যে সব তথ্য যোগাড় করেছেন তার অনেকগুলো ওর

সঙ্গে মেলে না! শুক্রের গায়ের তাপ আরও কম বলে মনে হয়েছে—এত কম যে শুক্রের গা-টা সমুদ্রজলে তৈরী এ-ধারণাটাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে এঁরাও বলেছেন, শুক্রের এক-একটা দিন অন্ততঃ আমাদের ২৪৭ দিনের সমান।

শুক্র কি কালে পৃথিবীর মতই হবে?

এই কারণেই শুক্রে কোন জীবিত প্রাণী আছে কিনা সে সম্পর্কে সঠিক কিছু বলা চলে না। আমাদের পরিচিত সমস্ত প্রাণীরই বাঁচবার জন্য অক্সিজেন দরকার। শুক্রে এই অক্সিজেন আছে বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি। অবশ্য জল আছে এবং, উত্তাপ সম্বন্ধে কারো কারো যা মত, তাতে সে উত্তাপে বিশেষ বিশেষ ধরণের প্রাণীর বেঁচে থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। পৃথিবীতেও তো মেরুর মত ঠাণ্ডা দেশে, আবার মরুভূমির মত গরম জায়গায়ও কোন কোন প্রাণী টিকে থাকে! তবে কারো কারো ধারণা, ২।৩ শ' কোটি বছর আগে পৃথিবীর অবস্থা যেমন ছিল শুক্রের এখন সেই অবস্থা। সে সময়ে পৃথিবীর বাতাসে নাকি কার্বন ডাই-অক্সাইড অনেক বেশী ছিল—যা এখন দেখা যাচ্ছে শুক্রের বাতাসে। পৃথিবী তখন ছিল জল-ময়। প্রথম প্রাণের সূচনা তো ঐ জলেই হয়! তা হলে কি শুক্রও ভবিষ্যতে একদিন পৃথিবীর মত প্রাণময় জগতে পরিণত হবে? পৃথিবীর মতই বন-জঙ্গল, ছোটবড় প্রাণী দেখা দেবে শুক্রের বুকে? আর পৃথিবী? পৃথিবী কি তখন আরও পুরোনো হয়ে চাঁদের মত রুক্ষ, প্রাণহীন চেহারা নিয়ে ভূতের মত মহাকাশে ঘুরে বেড়াবে?

২০০৪ খৃষ্টাব্দে

শুক্র সম্বন্ধে আরও একটা খবর দেবার আছে। শুক্রের ভ্রমণপথ পৃথিবীর ভ্রমণপথের চাইতে সূর্যের কাছাকাছি হওয়ায় এবং গতিবেগ বেশী হওয়ায় মাঝে মাঝে ঘুরবার সময়ে সে পেছন থেকে এসে পৃথিবীকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। এই সময় পৃথিবী, শুক্র এবং সূর্য একই সরল রেখায় এসে পড়ে—পৃথিবী থেকে শুক্রকে দেখলে তখন মনে হয় সূর্যের গায়ে একটা কালো বিন্দু। ১৯ মাস পর পরই ব্যাপারটা ঘটবার কথা, কিন্তু ঘটে কদাচিৎ। কারণটা আর কিছু না, শুক্র আর পৃথিবীর ভ্রমণপথ তো ঠিক সমান্তরাল নয়, একটু ত্যারছা। যাই হোক, ব্যাপারটা যখন ঘটে তখন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে হৈ-হৈ পড়ে যায়, কারণ তাঁরা ঐ সময় ওরই সাহায্য নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা জটিল সমস্যা সমাধান করে ফেলেন, নতুন নতুন তথ্যও যোগাড় করে ফেলেন বিস্তর। ১৮৮২ সালে শেষ বার ঐ ঘটনা ঘটেছে, আবার নাকি ঘটবে ২০০৪ সালে।

নতুন খবর

এই বই যখন ছাপা হচ্ছে তখন হঠাৎ খবর এল সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তাঁদের একটি রকেটকে ধীরে ধীরে আল্‌তো ভাবে শুক্রের বুকে নামিয়ে দিয়েছেন এবং, ভিতরে লোক না থাকলেও, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে ইতিমধ্যেই ঐ রকেট নানা রকম তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। রুশ বিজ্ঞানীরা এখন সেগুলো পরীক্ষা করে দেখছেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে শুক্র সম্বন্ধে আরও চমকপ্রদ কিছু কিছু খবর হয়তো পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

অঙ্ক শাস্ত্রের কথা

মিশর দেশের গণিতচর্চা

ব্যাবিলনে কি ভাবে অঙ্কের বিভিন্ন শাখার উন্নতি হয়েছিল সে কথা তোমাদের আগেই বলেছি। (ছোটদের বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড—পৃঃ ২১১-২১)। প্রাচীন সভ্য দেশগুলির মধ্যে আর একটি হচ্ছে মিশর। এবারে দেখা যাক কি ভাবে এই প্রাচীন মিশরে অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে চর্চা হ'ত।

প্রাচীন কালের সভ্য সমাজে প্রয়োজনের তাগিদেই সাধারণতঃ অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলন হ'ত। তবে মিশরে যে ঠিক ঐ ভাবেই গণিতের চর্চা সুরু হয়েছিল তার কোন সঠিক প্রমাণ নেই। অনেকের ধারণা, ওখানে শাস্ত্রটা আমদানী হয়েছিল বিদেশ থেকে। তবে এ কথা ঠিক, পরবর্তী কালে মিশরবাসীরা গণিতের বিভিন্ন শাখায় বেশ উন্নতি করেছিল। এখানে বলে রাখা ভাল যে প্রাচীন গ্রীক্‌রাও মিশর দেশ থেকেই অঙ্ক শিখেছিল। কেউ কেউ এমনও বলে থাকেন, যে, মিশরেই নাকি গণিতের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছিল সর্বপ্রথম। অবশ্য এর পিছনে কোন যুক্তি নেই।

বিদেশীদের কাছ থেকে মিশরীরা অঙ্ক শিখলেও এখানে জ্যামিতি, পাটীগণিত, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতির উন্নতি বড় কম হয় নি। মিশরের শাসকেরা জ্যামিতির সাহায্য নিয়ে জমি ভাগ করে দিতেন প্রজাদের মধ্যে। নীলনদের দেশ মিশর। এখানে কৃষিকাজের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। কৃষিকাজের জন্য সেচ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য মাপজোঁকের জন্য জ্যামিতির খুবই প্রয়োজন। সুতরাং মিশরে যদি স্বাধীন ভাবে জ্যামিতি বিদ্যার আলোচনা সুরু হয়ে থাকে তবে তা অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

দশমিক পদ্ধতি আর বিভিন্ন সূত্র

প্রাচীন মিশরবাসীরা গণনার দশমিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিল। আজকাল আমাদের দেশে দশমিক পদ্ধতি চালু হয়েছে। ১এর দশগুণ ১০, ১০এর দশগুণ ১০০, ১০০র দশগুণ ১০০০। গ্রামের পাঠশালায় এখনও একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুতের সঙ্গে

পরিচয়লাভ ঘটে পড়ুয়াদের। দশমিক পদ্ধতিও আসলে এই জিনিসই। আমাদের দেশেও এ পদ্ধতি বহুদিন থেকে চালু রয়েছে। তবে ওজনের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে দশমিক উপায় চালু ছিল না—ছিল মণ, সের, ছটাকের। ১৬ ছটাকে ১ সের, ৪০ সেরে ১ মণ—এ কথা তোমরা এখনও ভুলে যাও নি নিশ্চয়ই। মণ, সের, ছটাকের মধ্যে সম্বন্ধ দশ গুণ বা দশ ভাগ নয়। কাজেই এ উপায়টি দশমিক উপায় নিশ্চয়ই নয়। আজকাল ওজনের জন্য আমরা যে কিলোগ্রাম ব্যবহার করি তা কিন্তু দশমিক পদ্ধতি। ১ গ্রামকে একক ধরে তার দশ গুণকে বলা হয় এক ডেকাগ্রাম, তার দশ গুণকে বলা হয় হেক্টোগ্রাম ; আবার তার দশগুণকে বলা হয় কিলোগ্রাম। ছোট মাপের ওজনের কথা বিচার করলে আমরা বলতে পারি—১ গ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ ডেসিগ্রাম, তার দশ ভাগের এক ভাগ সেন্টিগ্রাম, তার দশ ভাগের এক ভাগ মিলিগ্রাম। মিশর দেশেও অনেকটা এই ধরণের গণনার নিয়ম চালু ছিল। সেখানে অঙ্কের সংখ্যা লিখবার জন্যে যে সব সংকেত ব্যবহার করা হ'ত তার কয়েকটি নীচে দেওয়া হল ঃ

বড় বড় সংখ্যার জন্যে এ সব সংকেত দেখে মনে হয় মিশরবাসীরা খুব বড় সংখ্যার সঙ্গেও বেশ পরিচিত ছিল। তা ছাড়া পাটীগণিতের প্রধান চারটি পদ্ধতি—যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ—তাও এরা জানত। অবশ্য আজকের দিনে আমরা যেমন ভাবে এ সব কাজ সম্পন্ন করে থাকি তারা ঠিক সে ভাবে তা করত না। পাটীগণিতের ভগ্নাংশ সংখ্যা এবং তারও যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিল মিশরবাসীরা। এমন কি গণিতের যে কোন প্রক্রিয়ার সমাধান করতে গিয়েও এরা সব সময়েই ভগ্নাংশ ব্যবহার করত,—অনেক সময় প্রয়োজন ছাড়াই।

স্কুলের উঁচু ক্লাসের যারা ছাত্র তারা সমান্তর এবং গুণোত্তর শ্রেণীর সঙ্গে পরিচিত,—ইংরেজীতে যাদের বলা হয় এ. পি. এবং জি. পি.। মিশর-বাসীরা এ সবের সঙ্গেও পরিচিত ছিল। এ সম্বন্ধে একটি মজার উদাহরণ আছে প্রাচীন মিশরীয় গণিতে। ৭ জন লোক ছিল। প্রত্যেকের ছিল ৭টি করে বিড়াল। প্রতি বিড়াল আবার ৭টি করে ইঁদুর খায়। প্রতি ইঁদুর খায় ৭টি যবের শীষ। প্রতি শীষে আছে ৭টি দানা। তা হলে কতগুলি দানা হবে তার যোগফল বার করতে হবে। মিশরবাসীরা বেশ সহজ উপায়েই এ সব অঙ্ক কষে দিতে পারত।

জ্যামিতির কথা তো আগেই বলেছি। নানা আকৃতির জমির ক্ষেত্রফল বার করবার উপায় মিশরবাসীদের জানা ছিল। যেমন ধর, কোন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বার করতে হলে আজকাল আমরা তা করি এই ভাবে ঃ
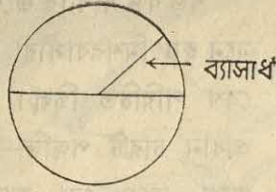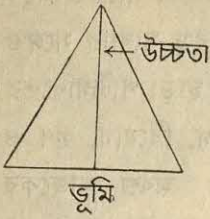
ত্রিভুজ ও বৃত্তের ক্ষেত্রফল বার করতে হলে···

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = ½ × ত্রিভুজের ভূমির দৈর্ঘ্য × উচ্চতা, আর এটাকে আমরা বলি ক্ষেত্রফলের সূত্র বা ফরমুলা। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বার করতে গিয়ে মিশরবাসীরাও ঠিক এই রকম সূত্রের সাহায্য নিত।

আবার কোন বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে আমরা নীচেকার ফরমুলার সাহায্য নেই :

বৃত্তের ক্ষেত্রফল = π × (বৃত্তের ব্যাসার্ধ)²।

π (পাই) এই গ্রীক্ অক্ষরটি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। ব্যাবিলনবাসীদের মত মিশর-বাসীরাও π-এর মান নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছিল (তাকে পাই নামে বলুক আর ন্যাই বলুক)। এই মান ৩·১৬।

তোমরা জান, পিরামিড হচ্ছে প্রাচীন মিশরের একটি অদ্ভুত কীর্তি। এই পিরামিড
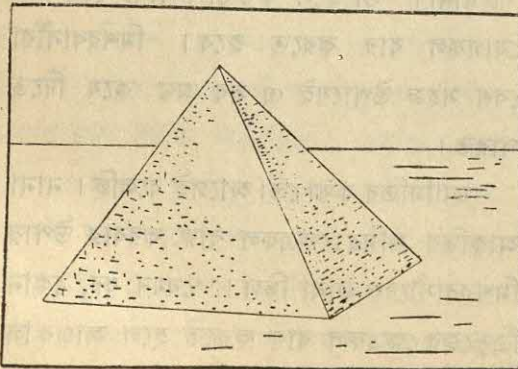
পিরামিড

তৈরী করতে উঁচুস্তরের স্থাপতিবিদ্যার প্রয়োজন, অঙ্কে খুব ভাল জ্ঞান না থাকলে চলে না। কাজে কাজেই, এ কথা বলা চলে যে অঙ্কের নানা রকম হিসেব, মাপজোঁক এবং এ সব কাজের জন্য সহজ সূত্র বা ফরমুলা সম্বন্ধে মিশরবাসীরা ওয়াকিবহাল ছিল।

কৃষিজীবী মিশরীয় সমাজ শস্য জমা করে রাখবার জন্য ব্যবহার করত বড় বড় শস্যাগার। এগুলির আকৃতিও ছিল পিরামিডের মত। একটি শস্যাগারে কি পরিমাণ শস্য রাখা আছে তা জানবার জন্যে শস্যাগারটির আয়তন জানা দরকার। তা ছাড়া শস্যাগারের উপরের দিক্ থেকে শস্য বার করে নিলে কতটা শস্য নেওয়া হ'ল বা কতটা শস্য থেকে গেল তার হিসেব করতে হ'ত হামেশাই। কাজেই এ কাজকে সহজ করবার জন্যও নিশ্চয় তারা কোন ফরমুলার সাহায্য নিত। আবার এ সব ফরমুলায় যাতে ভুলচুক না থাকে সেদিকেও তারা নিশ্চয়ই নজর দিয়েছিল। এমনি ভাবে মিশরবাসীরা গণিতের নানা সূক্ষ্ম হিসেব এবং জ্যামিতি বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল।

ব্যাবিলন আর মিশরের সভ্যতা প্রায় কাছাকাছি সময়ের। যীশু খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগেই সুরু হয়েছিল এদের সভ্যতা। সমস্ত রকম বিজ্ঞানের আদি বিজ্ঞান যে অঙ্কশাস্ত্র সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কাজেই আজ এ কথা ভাবলে বিস্ময় জাগে না কি যে এখন থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগেও মিশরবাসীদের এই অঙ্কের বিভিন্ন শাখায় কতটা দখল ছিল? তবে একটা কথা

এখানে বলে রাখা ভাল। মিশর এবং ব্যাবিলনের মত ভারতেও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা সুরু হয়েছিল যীশু খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগে। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। কিন্তু মিশর বা ব্যাবিলনের সভ্যতা যেখানে যীশু খৃষ্টের আগেই অন্ধকারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল সেখানে ভারতীয় গণিত এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার চর্চা চলেছিল যীশু খৃষ্টের জন্মের প্রায় বারশ'বছর পরেও। ভারতীয় গণিতের আলোচনার সময়ে আমরা এ সম্বন্ধে আর ও বলব।

প্রাচীন মিশরে বীজগণিতের চর্চাও যে হয় নি তা নয়। তবে জ্যামিতি বা পাটীগণিতে এদের দান যতটা বীজগণিতের বেলা ততটা নয়। তবে কোন অজানা সংখ্যা অর্থাৎ বীজকে নির্ণয় করবার জন্যে এরা নানারকম সমীকরণ ব্যবহার করত তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সময়ের হিসেব

এখনও নীল নদের এবং তার শাখা-প্রশাখার জলের ওপরই নির্ভর করে মিশরের চাষ-আবাদ। নীল নদে মাঝে মাঝে বন্যা হয়—লোকের চাষের জমি ভাসিয়ে দিয়ে, ঘরবাড়ী নষ্ট করে বহু ক্ষতি করে। কাজেই বন্যার বিরুদ্ধে মিশর-বাসীদের সাবধান থাকতে হয়। আগেকার দিনেও এ ব্যাপারটি ঘটত। বছরের কোন্ বিশেষ সময়ে নীল নদে বন্যা আসবে তা সঠিক জানবার জন্যই মিশরে সময় গণনা করার প্রয়োজন হয়েছিল। মিশরীয় পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করলেন, আকাশে একটা বিশেষ ধরণের তারার আবির্ভাব ঘটলেই নীল নদে বন্যা আসে। এ সময়টা, দেখা যায়, সাধারণতঃ বর্তমান ইংরেজী জুন মাসের কাছাকাছি সময়। কাজেই সীমাহীন কালকে দিন, মাস, বছরে ভাগ করে নিল মিশরবাসীরা। এদের বছর গণনা সুরু হ'ত জুন মাসে। যীশু খৃষ্টের জন্মের চার হাজার বছর বা তারও আগে থেকেই মিশরবাসীরা বছর গণনার কাজ সুরু করেছিল। চান্দ্র মাস বা চান্দ্র বছরের সঙ্গে সৌর মাস বা সৌর বছরের পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা আগেই বলেছি। চান্দ্র বছরের ভিত্তিতেই মিশরবাসীরা তাদের বছর গণনা করত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই চান্দ্র বছরের হিসেবে যে নীল নদের বন্যা সুরু হয় না এ তথ্যটি তারা বুঝতে পারল। তবু সৌর বছরের হিসেবে বছর গণনার কাজ সঙ্গে সঙ্গেই সুরু করে না দিয়ে তারা চান্দ্র বছরের হিসেবেই বছর গণনার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। অবশ্য এ ভাবে বেশী দিন কাজ চলে নি। পরে এরা সৌর বছর হিসেবে কাল গণনা আরম্ভ করে। প্রতি মাসে ৩০ দিন
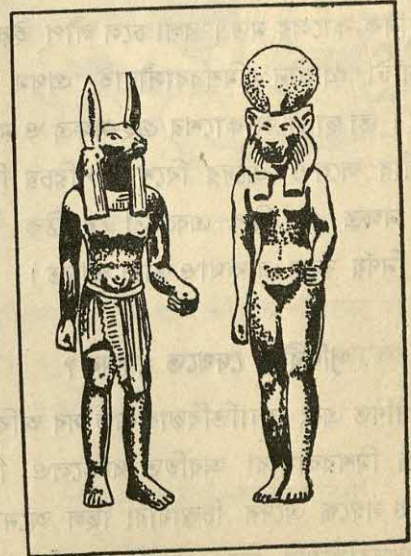
মিশরীয় দেবদেবী
বছরের শেষ পাঁচ দিন ছিল এঁদের পূজার দিন।

ধরে ১২ মাসে হয় ৩৬০ দিন]। বছরের বাকি পাঁচদিন আমরা কোন না কোন মাসের সঙ্গে যোগ করে নিয়েছি। মিশরবাসীরাও ৩৬৫ দিনেই বছর ধরত বটে, কিন্তু বাড়তি পাঁচদিন বিভিন্ন মাসের সঙ্গে যোগ না করে নিয়ে একেবারে বছরের শেষে একসঙ্গে যোগ করে নিত। মিশরীয় দেবদেবীর পূজা-অর্চনার দিন ধার্য করা হ'ত ঐ পাঁচদিন।

চার বছর পর পর বছর একদিন বেড়ে যায়; তাকে আমরা বলি 'লীপ্ ইয়ার'। ফেব্রুয়ারী মাসটাকে ২৮ দিনের জায়গায় একদিন বাড়িয়ে ২৯ দিন করে নেওয়া হয় ঐ লীপ্ ইয়ারে। মিশরবাসীরা লীপ্ ইয়ারের সমাধানও করেছিল আমাদের মতই। তারা প্রতি চার বছর পর ৫ দিনের বদলে ৬ দিন যোগ করত ৩৬০ দিনের সঙ্গে। অর্থাৎ প্রতি চার বছর অন্তর মিশর-বাসীদের বছর হ'ত ৩৬৬ দিনে। এ ব্যাপারে এদের হিসেব ছিল এক কথায় একেবারে আধুনিক কালের মত। বলা চলে লীপ্ ইয়ারের ধারণাটা প্রাচীন মিশরবাসীরাই প্রথম চালু করে। তা ছাড়া আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ও নক্ষত্র-মণ্ডলীর সঙ্গেও এদের বিশেষ পরিচয় ছিল। ধ্রুব নক্ষত্র যে স্থির এবং তা যে ঠিক উত্তর দিক্ নির্ণয় করে এ কথাও তারা জানত।

পৃথিবীটা দেখতে কেমন?

গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যার এত সব অবিষ্কার সম্বন্ধে মিশরবাসীরা অবহিত থাকলেও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে এদের চিন্তাধারা ছিল অনেকটা ব্যাবিলনবাসীদের মত। ব্যাবিলনবাসীরা মনে করত যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে মিশরবাসীদের ধারণা

জেরুজালেম, আর মিশরবাসীরা মনে করত যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে আছে মিশর দেশটা, —এই যা পার্থক্য। এদের ধারণা ছিল, পৃথিবী দেখতে অনেকটা বাক্সের মত। তার চারদিকে রয়েছে একটা বিরাট নদী—নদীতে রয়েছে একটা বিরাট নৌকো। এই নৌকোয় চড়ে বিরাট সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চৌকো পৃথিবীর চার কোণায় রয়েছে চারটে বিরাট পাহাড়—এরাই ধরে রেখেছে আকাশকে পৃথিবীর ওপরে একটা চাঁদোয়ার মত।

ব্যাবিলন এবং মিশরবাসীদের ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে কল্পনা শুনে তোমরা হয়তো আজ হাসবে। কিন্তু এখন থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে এ সব জায়গার অধিবাসীরা তাদের সীমাবদ্ধ ধ্যানধারণা নিয়ে এ জাতীয় চিন্তা করতেও যে সমর্থ হয়েছে সেটা কম বিস্ময়ের কথা নয়। মানবসভ্যতার সেই আদি যুগের চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে পরবর্তী কালের বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সে-ই হ'ল গোড়াপত্তন। প্রাচীন ভারতেও এ সম্বন্ধে নানারকম চিন্তাধারা প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য

তার কতক এই ব্যাবিলন বা মিশরবাসীদের থেকে যে খুব বেশী আলাদা তা বলা চলে না।

ভারতীয় ঋষিরাও ভাবতেন

অঙ্কের কথা আলোচনা করতে করতে পৃথিবীর আকারের কথায় চলে এসেছি। যদিও এটা ঠিক অঙ্কের মধ্যে পড়ে না, পড়া উচিত ভূগোলের মধ্যে, তবুও তোমাদের কৌতূহল মেটাবার জন্যে এ সম্বন্ধে সেকালকার লোকদের ধারণা কেমন ছিল একটু বলে নেওয়া যাক। আজকে আমরা সবাই জানি পৃথিবীর আকার গোল, অনেকটা বলের মত, তবে উত্তর দক্ষিণে কমলা লেবুর মত একটুখানি চাপা,—আর আমরা রয়েছি পৃথিবীর পিঠের ওপর। শুধু আমরা কেন, পাহাড় পর্বত, নদী-সমুদ্র—সবই পিঠের ওপর রেখে পৃথিবী মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনবরত। এ পাক খাওয়ার কাজ কত লক্ষ কোটি বছর আগে স্নুরু হয়েছে তা আমাদের সঠিক জানা নেই, আর তা কত লক্ষ কোটি বছর ধরে চলবে তাও আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। শুধু এটুকু জানি যে অন্যান্য গ্রহের মত আমাদের এ পৃথিবীটাও সূর্যের চারিদিকে ক্রমাগত ঘুরছে—ঘুরছে—আর ঘুরছে।

প্রাচীন কালের লোকদের কিন্তু এ সম্বন্ধে ধারণা ছিল একেবারেই আলাদা। সেকালের ব্যাবিলন এবং মিশরে পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল তা তোমরা শুনেছ, সেই সঙ্গে শুনেছ বিভিন্ন গ্রহ নিয়ে গড়া আমাদের এই সৌর জগৎ সম্বন্ধেও তাদের ধারণা কি ছিল। ব্রহ্মাণ্ড বলতে তারা ঐ জিনিসই বুঝত।

কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের এ সম্পর্কে যে কল্পনা বা চিন্তাধারা তা ছিল অনেক বেশী ব্যাপক। সূর্য এবং গ্রহদের নিয়ে গড়া সৌর জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করেই প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বা জ্যোতির্বিদ্ ক্ষান্ত থাকেন নি, সৌর জগতের বাইরে যে অসীম বিশ্ব পড়ে রয়েছে সে সম্বন্ধেও তাঁরা ভেবেছেন। এর মত আরও কত লক্ষ লক্ষ জগৎ সীমাহীন মহাশূন্যে স্রষ্টার অঙ্গুলিসংকেতে তাদের নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে তা ভেবে প্রাচীন ভারতীয় ঋষি সেই নিরাকার পরম-ব্রহ্ম-পদে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথা নত করেছেন। প্রাচীন ঋষি তাঁর তপোবনের আশ্রমে এমনি ভাবেই বহু জ্ঞানের সন্ধান দিতেন তাঁর শিষ্যদের কাছে।

তপোবনের আশ্রমে ভারতীয় ঋষি আর তাঁর শিষ্যেরা

নানান্ দেশের নানান্ ধারণা

এখানে আমরা শুধুমাত্র আমাদের পৃথিবী সম্বন্ধে নানান্ দেশে কি ধারণা ছিল তাই

তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। শুনে তোমাদের নিশ্চয়ই বেশ মজা লাগবে।

আগেই বলেছি প্রাচীন ব্যবিলনের লোকেরা ভাবত পৃথিবী একটা বন্ধ বাক্সের মত। আবার প্রাচীন মিশরের লোকেরাও ভাবত পৃথিবীটা একটা বাক্সের মত ঠিকই, কিন্তু বাক্সটা আকারে লম্বা আর ভুপৃষ্ঠ সমতল নয়, মাঝখানটা উঁচু। দান্তের মতে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীটা গোল—এর খানিকটা ভূভাগ, বাকীটা সমুদ্র। দেবদূতদের (এঞ্জেল) ইচ্ছেতেই পৃথিবী ঘুরছে।

গ্রীক পুরাণের মতে পৃথিবীটা আসলে খুবই ছোট, এর কর্তা হলেন বজ্রধারী জিউস। ভারতীয় দেবতাদের মধ্যে বজ্রধারী ইন্দ্রের যে স্থান গ্রীক দেবতাদের মধ্যে জিউসের স্থানও ঠিক তাই। জিউ-সের একজন অধস্তন দেবতা হলেন হিলিয়স অর্থাৎ সূর্য। তিনি প্রতিদিন সকালে তাঁর জোয়ান ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে পূর্বাকাশ থেকে আকাশপথে রওনা হন, আর যাত্রা শেষ করেন সন্ধ্যাবেলা পশ্চিম আকাশে এসে। সমস্ত রাত তিনি তাঁর ঘোড়াগুলো নিয়ে মাটির তলায় বিশ্রাম করেন। এ সম্বন্ধে গ্রীক্ পুরাণে একটি মজার গল্প আছে, সে গল্পটি বলি।

ফীটনের গল্প

হিলিয়সের ছিল একটি মাত্র ছেলে,—নাম ফীটন। বড় ফুটফুটে দেখতে ছেলেটি—তবে একটু চঞ্চল এই যা। ছেলেটির ভারী সখ, একদিন তার বাবার রথে চড়ে সেও একটু বেড়িয়ে আসে। কিন্তু বাপ মোটেই রাজী ন'ন। ছেলের শত অনুনয়-বিনয় বৃথা যায়।

দিন যায়। ছেলের অনুনয়-বিনয় সমানে চলতে থাকে। শেষে একদিন পিতৃস্নেহ পরাজয় বরণ করল। ফীটন অনুমতি পেল একদিনের জন্যে সূর্যরথ চালাবার। হিলিয়স সেদিনের জন্য রথ ছেড়ে দিলেন ছেলেকে।

ছেলের আনন্দ আর ধরে না। খুসী-মনে সে সূর্যরথে চড়ে ঘোড়ার লাগাম ধরল কষে। তেজী ঘোড়াগুলো ছুটে চলল আকাশপথে নক্ষত্র-রাজ্যের ভিতর দিয়ে।

পথে পড়ল একটি নক্ষত্রমণ্ডল। নাম বৃশ্চিক। এর চেহারা এত ভয়ঙ্কর যে ঘোড়া-গুলো ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভয় পেয়ে সেগুলো ছুটল বিপথে। অতটুকু ছেলে ফীটন, তার পক্ষে ওদের সামলানো শক্ত হয়ে পড়ল।
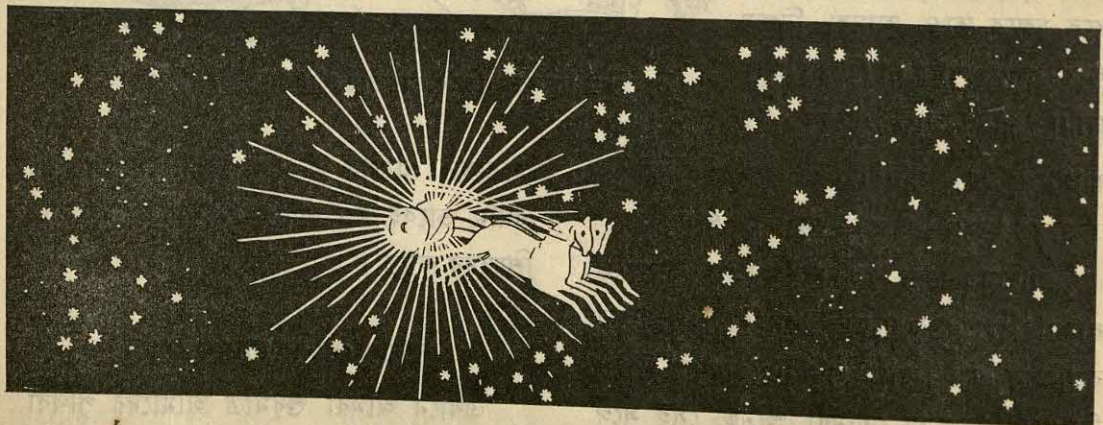
ঘোড়াগুলো ভয় পেয়ে ছুটল বিপথে।

সূর্যরথ ছুটে চলেছে। আসল পথ ছেড়ে এসে পড়েছে একেবারে পৃথিবীর কাছে। তার আগুনে পৃথিবীর সব কিছু পুড়ে ছাই হতে লাগল। লোকজন যে কত পুড়ে মরল তার লেখাজোখা নেই! চারিদিকে শুধু পরিত্রাহি রব। বাঁচবার আর কোন পথ না দেখে পৃথিবীর লোকেরা দেবরাজ জিউসের আরাধনা করতে লাগল। এতক্ষণে জিউসের নজরে পড়ল ব্যাপারটা। দেখে তো তাঁর চক্ষুস্থির। কিন্তু পৃথিবীকে বাঁচাতেই হবে। বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করলেন ফীটনের দিকে। জিউসের বজ্রাঘাত সহ্য করবার ক্ষমতা কারো নেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, ফীটন তো ছেলেমানুষ! বজ্রের ঘায়ে ফীটনের মৃতদেহ রথ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। ঘোড়াগুলোও কম ভয় পায় নি। ভয় পেয়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিকে হিলিয়সের অবস্থা বড়ই করুণ। অথচ পুত্রের মৃত্যুতে শোক করবার সময়টুকুও নেই তাঁর। বড় দায়িত্বপূর্ণ তাঁর কাজ—তাঁরই সামান্য একটু ভুলে এত বড় কাণ্ডটা ঘটে গেছে। তিনি ছুটে গিয়ে অতি কষ্টে ঘোড়াগুলোকে ধরে ঠিক পথে চালিয়ে নিলেন। সেবারকার মত রক্ষা পেয়ে গেল পৃথিবী। নিতান্ত পুত্রস্নেহবশেই যে হিলিয়স এ কাজটি করেছেন তা বুঝলেন দেবরাজ জিউস। তিনি সেবারকার মত ক্ষমা করলেন হিলিয়সকে। পৃথিবীর লোক দেখল সূর্য আবার স্বস্থানে ফিরে এসেছে। তারা প্রাণ ভরে জিউসের মহিমা কীর্তন করতে লাগল।

আমাদের পুরাণে কি বলে

এর পর শোন পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে আমাদের পুরাণের অভিমত। একটি মতে পৃথিবী হচ্ছে একটা গোলার্ধ। অর্থাৎ আধখানা বলের মত দেখতে। চারটে হাতীর পিঠের ওপর বসানো আছে সেই পৃথিবীটা। হাতী চারটি আবার দাঁড়িয়ে আছে একটা কচ্ছপের পিঠে। কচ্ছপটা জলের ওপর ভেসে আছে।

আরও নানা রকম কাহিনী পাওয়া যায় পুরাণে। যেমন ধর, পৃথিবীটা গোল, দাঁড়িয়ে রয়েছে বাসুকির সহস্র ফণার ওপর। বাসুকি হ'ল সাপেদের রাজা—এক বিরাট অজগর, যার রয়েছে এক হাজার ফণা। আমরা ছেলেবেলায় আরও একটা মজার গল্প শুনেছি ঠাকু'মা-দিদিমাদের কাছে। এক গোমাতা নাকি তার এক শিংএর ওপর বিরাট পৃথিবীটা ধারণ করে রেখেছে। অনেক দিন পর পর সে যখন এক শিং থেকে অন্য শিংএ পৃথিবীটাকে সরিয়ে নেয় তখনই হয় ভূমিকম্প। বাসুকির ফণা নাড়ার সময়েও তাই হয়।
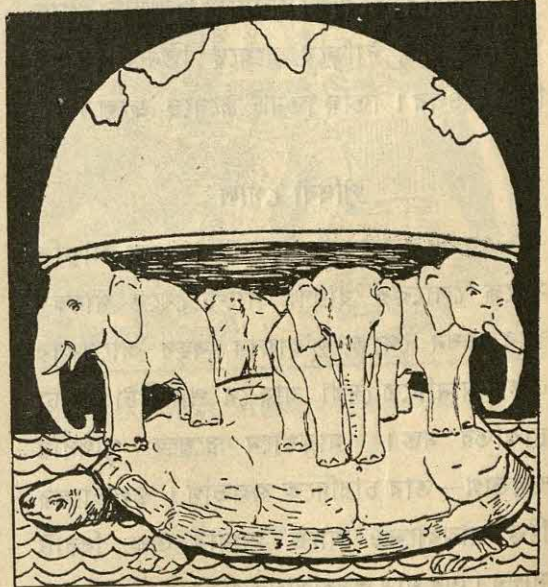
জলের ওপর ভেসে আছে কচ্ছপ; তার পিঠে চারটে হাতী। হাতীর পিঠে আধখানা বলের মত পৃথিবী।
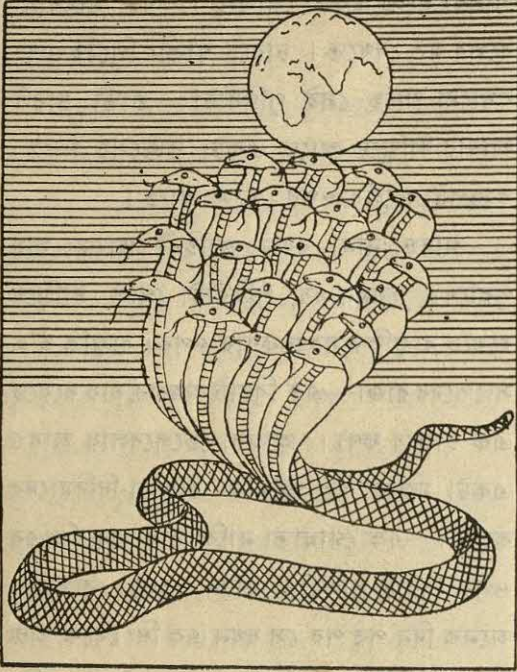
বাসুকি তার হাজার ফণার ওপর ধরে রেখেছে পৃথিবীকে।

রাশিয়ার কিংবদন্তী অনুসারে পৃথিবীটা গোল চাকতির মত, দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটে তিমির পিঠের ওপর। তিমি তিনটি রয়েছে জলে।

পৃথিবী গোল

এর পর অবশ্য পৃথিবীর আকার এবং আকৃতি সম্বন্ধে লোকের ধারণা পাল্টে যেতে থাকে। তবে এখন থেকে দু'হাজার বছর আগেকার একটি মানচিত্রে দেখা যায় যে পৃথিবীটা একটা চাকতির মত। মাঝখানে রয়েছে পৃথিবীর স্থলভাগ—তার চারদিকে জলভাগ। স্থলভাগের ঠিক মাঝখানেও আছে আবার এক বিরাট সাগর। এর নাম ভূমধ্যসাগর বা মেডিটেরেনিয়ান সী। আজ আমরা জানি, পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে ভূমধ্যসাগর নিশ্চয়ই নয়। ভূমধ্যসাগর কোথায় আছে তাও তোমাদের অজানা নয়। নামটি কিন্তু এখনও রয়ে গেছে ভূমধ্যসাগর, অর্থাৎ পৃথিবীর মাঝখানকার সাগর।

পরবর্তী কালে কবি হোমার এবং টলেমী, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নানারকম ধারণার প্রচার করেছেন। তাতে বৈচিত্র্য থাকলেও এঁদের সকলেরই কিন্তু ধারণা ছিল যে পৃথিবীর আকৃতি গোল। তবে তার স্বপক্ষে কোন সঠিক প্রমাণ খাড়া করা সম্ভব হয় নি তাঁদের পক্ষে।

সর্বপ্রথম যিনি পৃথিবী পরিক্রমা করতে রওনা হন তাঁর নাম ম্যাগেলন। তিনি ছিলেন পর্তুগাল দেশের লোক। সে ১৫১৯ সালের কথা। পাঁচখানা জাহাজ এবং ২৩৯ জন
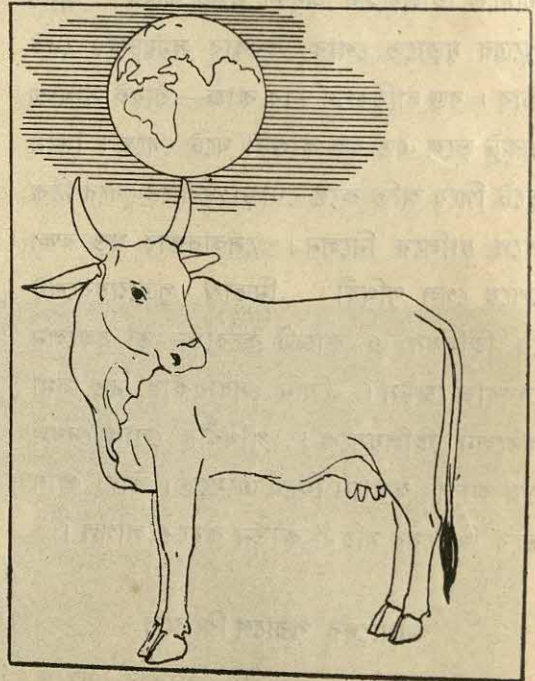
গোমাতা এক শিং থেকে আর এক শিংএ পৃথিবীকে সরিয়ে নেয়।
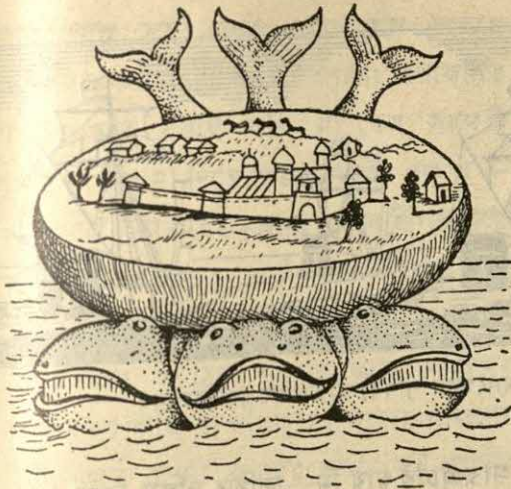
রাশিয়ার কিংবদন্তী : তিনটে তিমির পিঠের ওপর গোল চাকতির মত রয়েছে পৃথিবীটা।

নাবিক সে পরিক্রমায় অংশ গ্রহণ করেছিল। পরিক্রমা শেষ করতে সময় লেগেছিল প্রায় তিন বছর। এ অভিযানে চারখানা জাহাজ নষ্ট হয়েছিল ; নাবিকদের মধ্যে ১৬০ জনই প্রাণ হারিয়েছিল। অধিনায়ক ম্যাগেলনও প্রাণ হারান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সঙ্গে এক যুদ্ধে।

স্পেন দেশের সেভিল বন্দর থেকে এই অভিযান স্থুরু হয় ১৫১৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। গোটা পৃথিবীটা ঘুরে ১৫২২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর একখানা মাত্র জাহাজ কয়েকজন নাবিক নিয়ে সেভিল বন্দরে এসে পৌঁছয়, এবং এই থেকেই নিশ্চিত রূপে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর আকার গোল—ফুটবলের মত, আর আমরা রয়েছি পৃথিবীর পিঠের ওপর।

এ প্রসঙ্গে কলম্বাসের নামও উল্লেখ করবার মত। ভারতবর্ষের খোঁজে রওনা হয়ে কি করে তিনি আমেরিকা পোঁছান সে কাহিনী ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। এই দুই আবিষ্কারকের পূর্বে ইয়োরোপের অধিবাসীরা আমেরিকা মহাদেশ এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কথা জানত না। আর সেই জন্যই তারা ভাবত পৃথিবীর আকার বুঝি আধখানা ফুটবলের মত।

পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে নানা ধারণা আলোচনার পর আবার আমরা ফিরে আসছি সত্যিকার অঙ্কশাস্ত্রের কথায়।

ম্যাগেলন—পৃথিবী পরিক্রমার ইতিহাসে সর্বপ্রথম যাঁর নাম অমর হয়ে আছে।

প্রাচীন ভারতে গণিতচর্চা

প্রাচীন সভ্যতার তিনটি ধারার মধ্যে ব্যাবিলন এবং মিশর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা আলোচনা করব প্রাচীন ভারতের
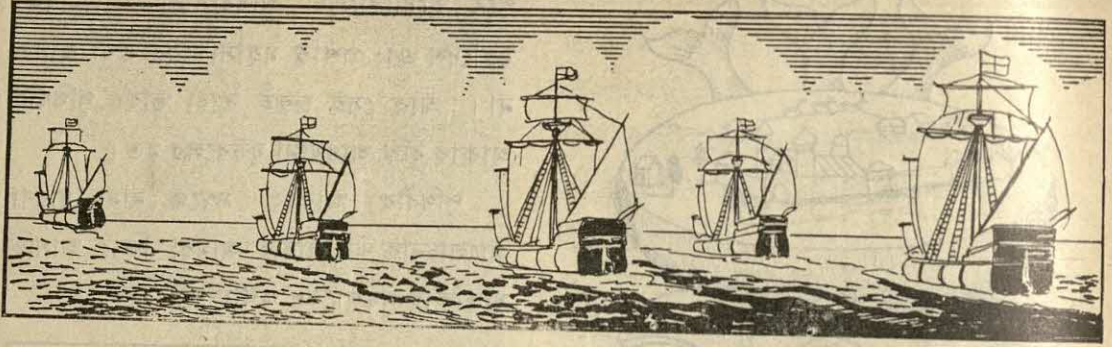
পাঁচখানা জাহাজ আর ২৩৯ জন নাবিক নিয়ে ম্যাগেলন পৃথিবী পরিক্রমায় বেরোলেন।

গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা-চর্চা সম্বন্ধে। এখানে বলে রাখা ভাল, যে, যদিও প্রায় কাছাকাছি সময়েই এই তিন অঞ্চলে গণিত এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে চর্চা সুরু হয়েছিল, কিন্তু ভারতে এ চর্চা চলেছিল বহুদিন পর্যন্ত। ফলে ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র যে অনেক বেশী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তা আশা করি তোমাদের বলে দিতে হবে না। তবু, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার যে সময় সুরু, প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানসাধনার সেখানেই প্রায় শেষ। আধুনিক গণিত ও বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলির বেশ কিছুটা এই ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু, যে কারণেই হোক, পরবর্তী কিছুকাল যাবৎ ভারতে আশানুরূপ বিজ্ঞানচর্চা হয় নি। অথচ বিজ্ঞানসাধনার ধারা দেখে এ কথা ভাবতে দ্বিধা জাগে যে প্রাচীন কালের ভারতবাসী বিজ্ঞানচর্চা থেকে বিরত থেকেছিলেন। মনে হয় সে সময় বিজ্ঞানসাধনার কোন নিদর্শন আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি—হয়তো বা তা নষ্ট হয়ে গেছে চিরদিনের মত। নানারকম রাষ্ট্রবিপ্লবই হয়তো এর কারণ। তা ছাড়া ভারতবাসী কোন দিনই আত্মপ্রচার চায় নি—লিখিত দলিল রাখা আত্মপ্রচারেরই সামিল। ভারতীয় বিজ্ঞানে শ্রুতির স্থান অতি উচ্চে। শুনে শুনে কণ্ঠস্থ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা চলে এসেছে এদেশে বহু কাল আগে থেকে। কে জানে, হয়তো কতকটা এই কারণেই লিখিত দলিল আমাদের হাতে পৌঁছয় নি।

যা আমাদের হাতে পৌঁছয় নি তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই, কিন্তু প্রাচীন ভারতের গণিতচর্চা সম্বন্ধে যে সব তত্ত্ব আমরা জানতে পেরেছি তাও বড় কম নয়। ভারতীয় পণ্ডিতেরা জ্ঞানবিজ্ঞানের মধ্যে গণিতকে যে খুব একটা উঁচু স্থান দিতেন সে কথাও আমরা আগেই উল্লেখ করেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড ; পৃঃ ২০৫)।

ভারতে অঙ্ককে কেন এত প্রাধান্য দেওয়া হ'ত

সেকালে ভারতবাসীর মধ্যে অঙ্কশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার কারণও যথেষ্ট ছিল। হিন্দুদের পূজাপার্বণ, বিবাহাদি নানা উৎসব—সব কাজে কোন না কোন অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই প্রাচীন কাল থেকে সুরু করে

আজ পর্যন্ত সেই একই ধারা বয়ে চলেছে আমাদের মধ্যে। যতই আমরা তথাকথিত আধুনিকতার বড়াই করি না কেন, সরস্বতী পূজায় অঞ্জলি না দিতে পারলে মনটা বড় খুঁত-খুঁত করে। তোমাদের অজানা নয় যে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা হয়। অর্থাৎ মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। কাজেই সরস্বতী পূজার সময়টি নির্দিষ্ট এবং তা ঠিক করবার জন্যে আমাদের দরকার হয় পাঁজি বা পঞ্জিকার। আবার পঞ্জিকার তিথি-নক্ষত্র গণনা করবার জন্য সেই প্রাচীন কালের ভারতীয় পদ্ধতি চলে আসছে আজ পর্যন্ত। শুধু সরস্বতী পূজার কথাই নয়, আজ পর্যন্ত যত রকম পূজা-পার্বণ আমরা করি সবই করা হয় কোন নির্দিষ্ট সময়ে। এ ছাড়া আমাদের নানা আচার-অনুষ্ঠানও পঞ্জিকা দেখে, সময়-দিনক্ষণ মিলিয়ে, তবেই না করা হয়!

প্রাচীন ভারত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারেও বেশ উন্নত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে সাধারণ হিসেবটুকু জানা না থাকলে কতই না অসুবিধায় পড়তে হয়! তা ছাড়া সেকালে বেশীর ভাগ কেনা-বেচা চলত জিনিসের অদলবদল করে—যার জন্য মাপ সম্বন্ধে জ্ঞানটা ছিল বিশেষ প্রয়োজনীয়। ধর, আমার কোন ধান-জমি নেই, অথচ ধান আমার চাই-ই। আবার যার প্রচুর ধান-জমি আছে তার নেই তরকারির জমি, নেই মাছের পুকুর। আবার অন্য কারোর বা আছে মাছের চাষ। আজকের দিনে এটা কোন সমস্যাই নয়। যার যে জিনিস আছে
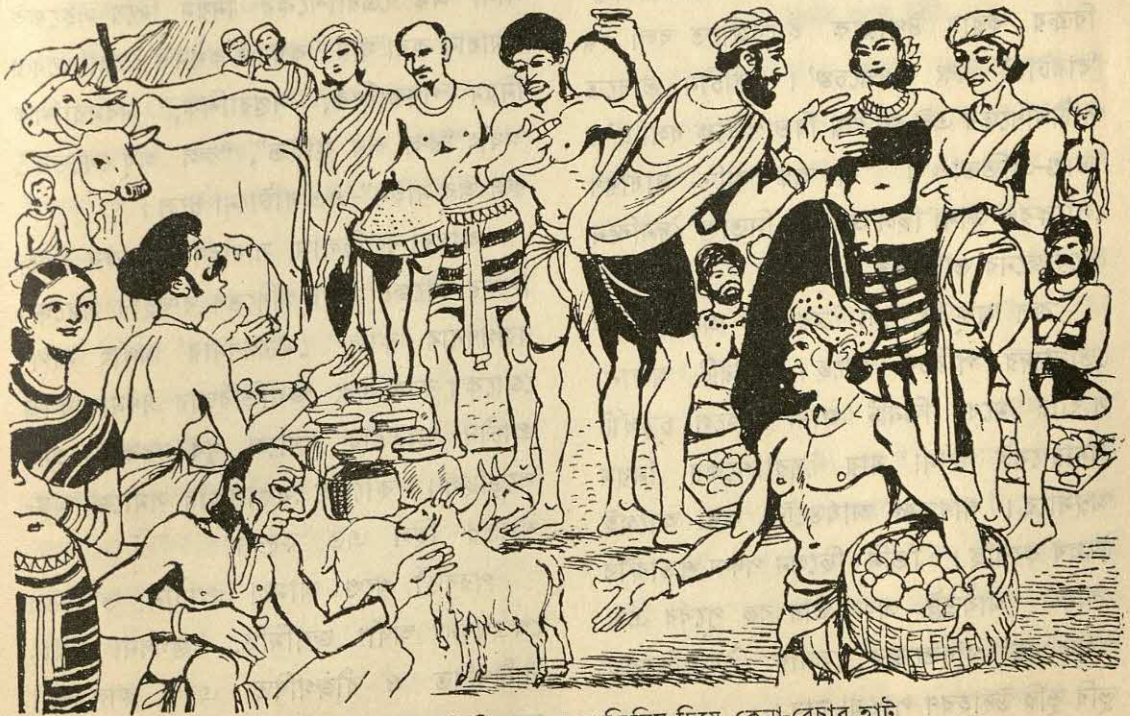
ভাণ্ড-প্রতিভাণ্ড : জিনিসের বদলে জিনিস দিয়ে কেনা-বেচার হাট

সে তা বিক্রী করে তা দিয়ে তার প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আনলেই মিটে যায় সমস্যা। এই কেনা-বেচার জন্যও কত রকম আয়োজন আছে। হাট আছে, বাজার আছে, আরও আছে কত উন্নত ধরণের যোগাযোগ-ব্যবস্থা। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন আজকের দিনের মত মুদ্রার প্রচলন তেমনটি হয় নি। যাও বা কিছু কিছু হয়েছে তা তেমন ব্যাপক ভাবে নয়। কাজেই অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য বদলী প্রথায় চালানো ছাড়া উপায় ছিল না তখন। পাড়াগাঁয়ে আজও যে এ ধরণের প্রথার চল নেই তা নয়। কাজেই সেকালের সাধারণ লোককেও, নিজেদের স্বার্থেই, একটু-আধটু হিসেব জানতে হ'ত।

ভাণ্ড-প্রতিভাণ্ড

এক জিনিসের বদলে অন্য জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করার উপায়কে ইংরেজীতে বলা হয় 'বারটার' এবং 'এক্সচেঞ্জ'। প্রাচীন ভারতে পাটীগণিতের এই জাতীয় বিভাগটিকে বলা হ'ত 'ভাণ্ড-প্রতিভাণ্ড'। এ অঙ্ক অতি সাধারণ লোকেরও জানা ছিল এবং তা নিতান্ত দৈনন্দিন প্রয়োজনের তাগিদেই।

'রুল অফ্ থ্রি' বা ত্রৈরাশিক অঙ্কের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে। চারটি অজানা সংখ্যার মধ্যে তিনটি জানা থাকলে চতুর্থটি অনায়াসেই জানা যায় ত্রৈরাশিকের নিয়ম অনুসারে। গণিতজ্ঞ আর্যভট্টের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি ছিলেন পঞ্চম শতাব্দীর লোক। আর্যভট্ট এবং তাঁর বহু পূর্বের এবং পরের বহু গণিতজ্ঞের লেখায় ত্রৈরাশিকের ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়।

বরাহমিহিরও ছিলেন প্রাচীন ভারতের অন্য একজন গণিতজ্ঞ। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন:

"যদি এক বছরে সূর্য একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পাদন করতে পারে তবে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনে সে কতটা পথ অতিক্রম করবে? অতি সাধারণ অজ্ঞ লোকও কি এক টুকরো খড়িমাটির সাহায্যে এই সহজ হিসেবটুকু করতে পারবে না?"

এর থেকেই বোঝা যায় সেকালে এদেশে অতি সাধারণ লোকেরাও অঙ্কের হিসেবপত্র নিয়ে মোটামুটি খানিকটা চর্চা করতেন। না হলে বরাহমিহিরের মত একজন পণ্ডিত এমন কথা নিশ্চয়ই লিখতেন না।

'ভাণ্ড-প্রতিভাণ্ড' বা বার্টার এবং এক্সচেঞ্জের নানা অঙ্ক ত্রৈরাশিকের নিয়ম দিয়ে সহজেই সমাধান করা যায়। কখনও কখনও ত্রৈরাশিকের নিয়ম পঞ্চরাশিক, সপ্তরাশিক, নবমরাশিক অর্থাৎ "রুল অব্ ফাইভ", "রুল অব্ সেভেন", রুল অব্ নাইন"-এও খাটানো চলে।

আমরা বলছিলাম, সাধারণ লোকের নিত্য দিনের কাজের মধ্যে গণিতের ব্যবহার সম্বন্ধে। বস্তুগণনার কাজ, ক্ষেত্রগণনার অর্থাৎ মাপ-জোঁকের কাজ এবং জ্যোতির্বিদ্যার গণনার কাজ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে খুব দরকারী হয়ে পড়েছিল। কাজেই সেকালকার সমাজে অঙ্কশাস্ত্রের ছিল এত কদর।

পরবর্তী খণ্ডে আমরা প্রাচীন ভারতের ক্ষেত্রগণনা অর্থাৎ জ্যামিতি, বস্তুগণনা অর্থাৎ পাটীগণিত ও বীজগণিত এবং কালগণনা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা

সেচের কথা

পৃথিবীতে দিনের পর দিন লোক বেড়েই চলেছে। প্রাচীন মানুষ বনেজঙ্গলে, মাঠেঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, তখন তারা শিকার করে খেত পশুপাখীর মাংস—কখনও কাঁচা, কখনও বা আগুনে ঝলসানো। নিরামিষ খাবারের মধ্যে ছিল জংলী গাছের ফলমূল। কেন না শস্য তখন কোথায়? গাছের ফলও সব সময় সব জায়গায় পাওয়া যেত না, বিশেষ করে শীতকালে। তখন হয়তো গাছে পাতাই নেই, তো ফল কোথায়?

খাবারদাবারের যখন টান পড়ল তখন মানুষ শিখল ফসল ফলানোর কাজ। জমিতে ফসল ফলানোর জন্য মাটি খোঁড়া, বীজ বোনা ও গাছ বড় করে তোলার জন্য দরকার হ'ল জলের। আগে বৃষ্টির জলের ওপরেই ফসল ফলানো নির্ভর করত। আজও অনেক জায়গায় বৃষ্টির জলের ওপরই চাষের কাজ নির্ভর করে। কিন্তু বৃষ্টির জল তো সব জায়গায় ঠিক সময়ে ঠিক মত হয় না! কোনও বছর হ'ল বেশী, কোনও বছর হ'ল কম। ফলে কখনও কখনও হয় 'হাজা', আবার কখনও বা হয় 'রুকো'। তাই ফসল ফলাতে হ'লে বীজ বোনার পর থেকে গাছ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সময়ে নিয়ম মত জল দেওয়া দরকার। কেবল দেবতার ওপর নির্ভর করলে সব সময়ে চলে না।

যাগযজ্ঞ করে বৃষ্টি

অবশ্য আগেকার দিনে রাজারাজড়াদের রাজত্বে অনাবৃষ্টি ও মড়ক আরম্ভ হ'লে যাগযজ্ঞ করা হ'ত, পুড়ত কলসী কলসী ঘি, ভারে ভারে আসত কাঠ। সেই যজ্ঞের পুণ্যে বৃষ্টি হ'ত। ব্যাপারটা উড়িয়ে না দিয়ে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বার করা হয়তো খুব কঠিন নয়। ঘিয়ের গরম ধোঁয়া উঠে যেত ওপরের আকাশে। তার ফলে বাতাস হ'ত হাল্কা। সঙ্গে সঙ্গে দূরের ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে আসত ঐ হাল্কা হাওয়ার শূন্যতা পূরণ করতে, সঙ্গে নিয়ে আসত দূরের মেঘ। তার পর সেই মেঘ গলে সুরু হ'ত বৃষ্টি, আর তাইতেই ক্ষেত ভরে উঠত ফসলে। রামায়ণ-মহাভারতে বৃষ্টি হওয়ার জন্য এ রকম যাগ-যজ্ঞের কত কাহিনীই না লেখা আছে!

বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে রেখে ঠিক সময়ে প্রয়োজন মত ক্ষেতে দেওয়ার নামই 'সেচ'। নদী বা হ্রদের ধারের ক্ষেতেই জল দেওয়া প্রাচীন কালে সহজ ছিল। কোথাও বা নদীর জল ক্ষেতের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে সেই জল ক্ষেতে আল বেঁধে ধরে রাখা হ'ত। আজও কাশ্মীর অঞ্চলে এ ব্যবস্থার চলন আছে। এর এক সুন্দর কাহিনী উপনিষদে লেখা আছে।

আয়োদ ধৌম্য আর আরুণির কাহিনী

প্রাচীনকালে আয়োদ ধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁর তিন শিষ্য—উপমন্যু, আরুণি ও বেদ। একদিন মহর্ষি ধৌম্য পাঞ্চাল দেশের শিষ্য আরুণিকে ক্ষেতের আল বাঁধতে পাঠালেন। রাত হয়ে গেল, কিন্তু সে আর ফেরে না। ঋষি-পত্নী শিষ্যদের জন্যে রান্নাবান্না করে রেখেছেন, খাওয়ার সময় তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন ধৌম্য শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে
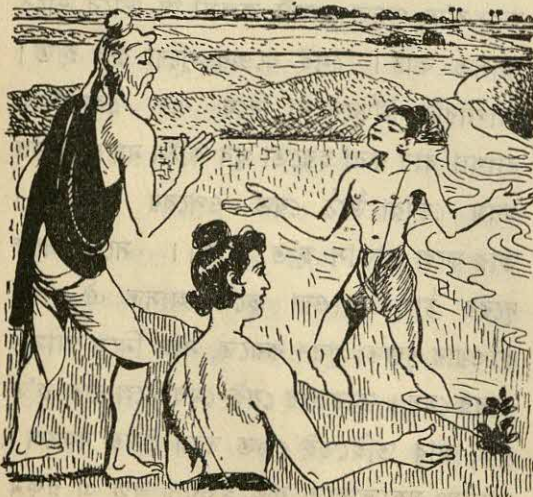
'শুয়ে পড়ে পিঠ দিয়ে জল আটকে রাখছিলাম।'

ক্ষেতের কাছে গিয়ে "আরুণি! আরুণি!" বলে ডাকতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ডাকা-ডাকির পর আরুণি সর্বাঙ্গে কাদা মেখে শীতে কাঁপতে কাঁপতে হাজির হলেন গুরুদেবের সামনে।

"এ কি ব্যাপার আরুণি?" প্রশ্ন করলেন ধৌম্য।

"গুরুদেব, জলের বেগ এত বেশী যে মাটির আল দিয়ে আর তাকে ধরে রাখতে পারা গেল না। তাই আমি শুয়ে পড়ে পিঠ দিয়ে জল আটকে রাখছিলাম। পিঠই আলের কাজ করছিল।"

এই গল্পের ভিতর দিয়ে আমরা শুধু যে সে যুগের গুরুশিষ্যের সম্পর্ক জানতে পারি তাই নয়, আরও কিছু জানতে পারি সেই সঙ্গে। শিষ্যেরা গুরুর আদেশে কোন অসাধ্য কাজ করতেই পিছ-পা হতেন না। আবার তখনকার দিনে শুধু শাস্ত্রপাঠ করলেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'ত না, শিষ্যদের হাতেনাতে কাজ শিখতেও সুযোগ দিতেন গুরুদেবেরা। উপনিষদের যুগেও এ দেশে সেচের কাজ কেমন করে চলত তার সুন্দর একটি চিত্র পাওয়া যায় এই গল্পে।

কূয়োর জলে সেচ

বেদেও কূপ বা কূয়োর জলের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। শুধু পানীয় জলের জন্যই যে কূপ খনন করা হ'ত তা নয়, ক্ষেতে জল দেবার জন্যেও কূপ খনন করা হ'ত।

দুষ্মন্ত-শকুন্তলার কাহিনীতেও গাছের গোড়ায় আলবাল রচনা করে জল ধরে রাখার কাহিনী আমরা পড়েছি। এটিও নিঃসন্দেহ

শকুন্তলার এটি ছিল নিত্যকার কাজ

সেচেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ এবং আশ্রমকন্যা শকুন্তলার এটি ছিল একটি নিত্যকার কাজ।

বৈদিক মন্ত্রে লেখা আছে—

"ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥"

অর্থাৎ, মরুদেশজাত জল আমাদের মঙ্গল প্রদান করুক, জলময় দেশের জল আমাদের কল্যাণ প্রদান করুক, সমুদ্রের জল আমাদের
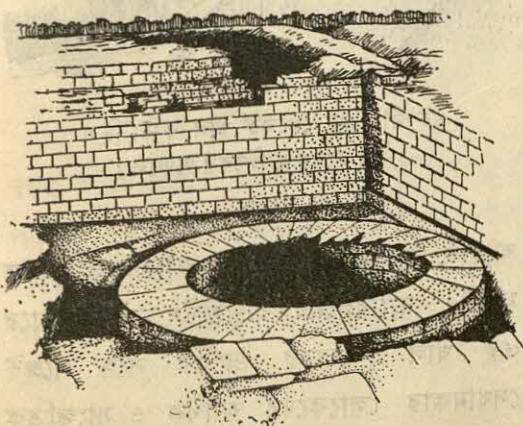
মহেঞ্জোদাড়োর কূয়ো

মঙ্গল বিধান করুক, কূপের জল আমাদের শুভ-দায়ক হোক।

প্রাক্‌-বৈদিক যুগে মহেঞ্জোদাড়োর ভগ্নাবশেষের মধ্যে কূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। ছবিতে দেখো এই কূয়োর আকৃতি ছিল কি সুন্দর গোল! তখনকার দিনের লোকদের মধ্যে জ্যামিতির জ্ঞান কি রকম যথেষ্ট ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় কূয়োর এই ঠিক গোল চেহারা দেখে।

ভগীরথও কি সেচ-এঞ্জিনীয়ার ছিলেন ?

ভগীরথের মর্ত্যে গঙ্গা আনবার কাহিনী মনে আছে তো? কপিল মুনি সমুদ্রতীরে (এখনকার গঙ্গাসাগরের কাছে) ব'সে যোগ-সাধনা করছিলেন, সেখানে ইন্দ্র এসে সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করে বেঁধে রেখে যান। মুনিকে তো আর কেউ সন্দেহ করবে না! সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে কিন্তু মুনিকেই ঘোড়া-চোর মনে করে অপমান করল। অসময়ে ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় মুনি রেগে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেকে চোখের আগুনে ভস্ম করে ফেললেন। সগর বংশ লোপ পেয়ে গেল। মুনি বললেন, যদি স্বয়ং গঙ্গাদেবী এসে কখনও ঐ ভস্মের ওপর দিয়ে বয়ে যান তবেই শুধু ওদের উদ্ধার হবে।

কিন্তু কে আনবে সুরধুনী গঙ্গাকে—সেই হিমালয়ের ওপর থেকে এত দূরের সমুদ্রে? শেষে সগরেরই এক নাতির নাতি ভগীরথ বললেন, 'আমি করব এই অসাধ্য কাজ।' তাই হ'ল। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে গঙ্গা নেমে এলেন মর্ত্যে। — চললেন ভগীরথের পিছু পিছু।
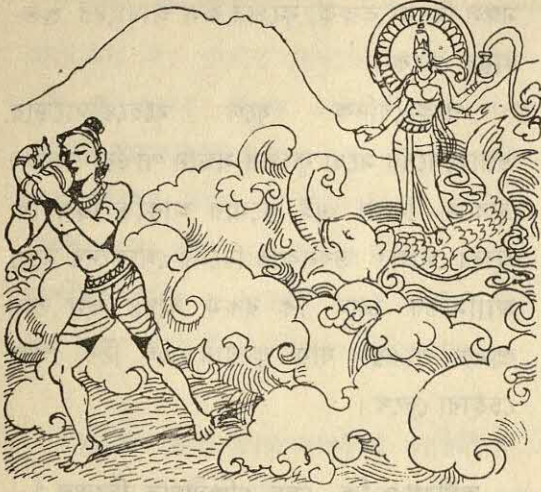
গঙ্গা নেমে এলেন মর্ত্যে

গঙ্গার স্রোত কুলু কুলু করে বয়ে চলল উত্তর ভারতের বুক চিরে, আর শেষ পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে এসে মিশল সমুদ্রে। উদ্ধার হ'ল সগর বংশ।

কোন কোন সেচ-বৈজ্ঞানিক মনে করেন মূল গঙ্গা থেকে ভাগীরথী মানুষের কাটা বিরাট খাল। পূর্ববাহিনী গঙ্গা হঠাৎ আপনা হ'তে দক্ষিণবাহিনী হবার যথেষ্ট কোন কারণ নেই। শুধু বর্তমানের বাংলা দেশের বিশেষ অঞ্চলে সেচ ও বাণিজ্যের জন্যই এই খাল কাটা হয়েছিল। তা হ'লে ভগীরথকে আদিম সেচ-এঞ্জিনীয়ার বলা যেতে পারে, নয় কি?

মিশর আর অন্যান্য দেশে কি হ'ত

মহাবীর আলেকজাণ্ডার যখন সুদূর ম্যাসিডন থেকে দিগ্বিজয়ে বেরোলেন তখন তাঁর রণতরী ইউফ্রেটিস নদীর ওপর সেচের জন্য আড় বাঁধে আটকে গেল। হুকুম হ'ল, বাঁধ ভেঙ্গে ফেল। সেই বাঁধ ভেঙ্গে রণতরী নিয়ে চলে গেলেন মহাবীর আলেকজাণ্ডার। শস্যশ্যামলা ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর দুই পাড়ের সমতলভূমি সেচের অভাবে মরুভূমিতে পরিণত হ'ল। সারা ব্যাবিলোনিয়া-চ্যালডিয়ার গৌরব-রবি চিরতরে ডুবে গেল। এ সব তো ঐতিহাসিক ঘটনা!

মিশরের প্রাচীন সভ্যতাকে 'নীল নদের উপত্যকার সভ্যতা' বলা হয়। নীল নদের জলস্রোতেই এটা গড়ে উঠেছিল হাজার হাজার বছর আগে। এই নীল নদ থেকেই খাল কাটা ছিল নীল নদের দু'দিকের অঞ্চলে। সেখানে নদীর জলে আসত পলি, উর্বর করত ক্ষেত, ফলত ফসল। ফলে লোকের মুখে জুটত
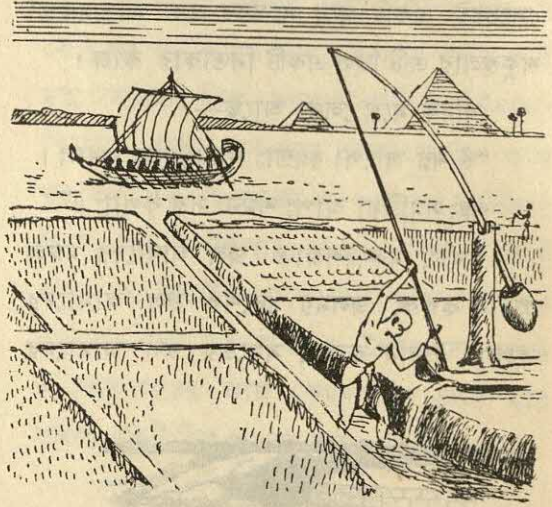
এই নীল নদ থেকেই খাল কাটা ছিল
নীল নদের দু'দিকের অঞ্চলে।

আহার, আর সেই সঙ্গে সুখস্বাচ্ছন্দ্যও আসত যথেষ্ট। ব্যাবিলনের ইউফ্রেটিস নদীর দু'ধারে এই খাল ও সেচের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার লোকেদের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি দেখা দিয়েছিল। নদীর জলের বাড়া-

কমার সঙ্গে সন-তারিখের সম্বন্ধ বের করেছিল প্রথম মিশরবাসীরা।

যেদিন নীল নদের জল বেড়ে 'মেম্‌ফিসে' ১২ থেকে ১৫ এল্‌স্‌ হ'ত তখন সুরু হ'ত মিশরীয় বছরের প্রথম দিন। মিশরীরা বলত,—যখন আকাশের বড় জ্বলজ্বলে তারা লুব্ধককে (সিরিয়াস) দেখা যাবে ভোর বেলা এবং জলের মাত্রা নীল নদে উঠবে খুব উঁচুতে, তখন বোঝা যাবে যে সে বছরে খুব ভাল ফসল ফলবে। নীল নদের বন্যায় শস্যের ক্ষেত ভেসে যেত, জমির ওপর পড়ত পলি, সীমানা যেত মুছে। তখন নতুন করে পরের
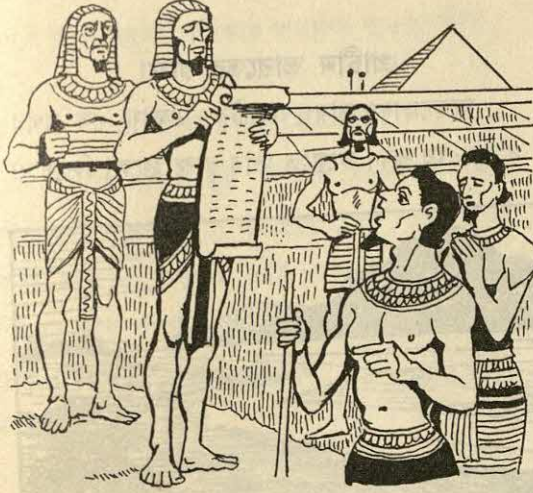
নীল নদের বন্যার পর জমির সীমানা নতুন করে চিহ্নিত করা হ'ত।

বছর জমির সীমানা চিহ্নিত করা দরকার হয়ে পড়ত। আজ জ্যামিতির ছাত্রেরা যাকে পীথাগোরাসের উপপাদ্য বলে জানে সেই সহজ নিয়ম অনুযায়ীই দড়ির একদিকে তিন ভাগ, একদিকে চার ভাগ ও আর এক দিকে পাঁচ ভাগ দড়ি দিয়ে সমকোণ তৈরী ক'রে জমির সীমারেখা টানা হ'ত।
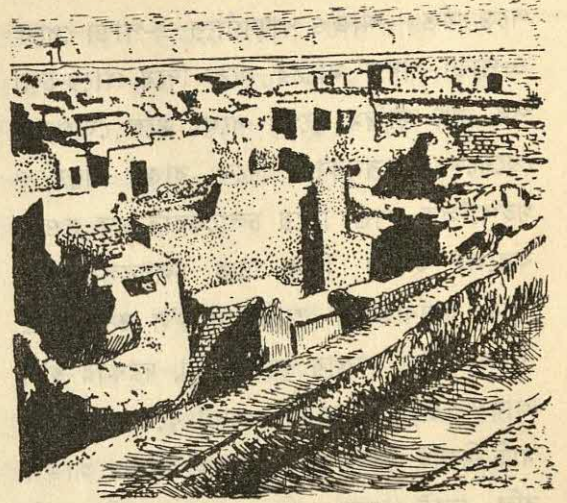
ইউফ্রেটিস্‌ নদীর বহু খালের ধ্বংসাবশেষ আজও পড়ে আছে।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোডোটাস নীল নদের উপত্যকায় লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে লম্বা লম্বা খালের কথা লিখে গেছেন। মিশর-রাজ টলেমী ফিলেডেলফাস সেই খাল বার বার মেরামত করিয়েছিলেন। নীল নদের উপত্যকায় পাথরের নামগন্ধও ছিল না। সেখানে মাটি দিয়েই বাঁধ তৈরী হ'ত, মাটি কেটেই খাল তৈরী হ'ত। ব্যাবিলনের ইউফ্রেটিস নদীর বহু খালের ধ্বংসাবশেষ আজও পড়ে আছে। তেমনি দেখা যায় সিন্ধু, হোয়াংহো ও টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী থেকে কাটা খালের পুরোনো চিহ্ন। এগুলি নিঃসন্দেহ সে যুগের এঞ্জিনীয়ারদের আশ্চর্য সেচ-পরিকল্পনার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

রাস্তা তৈরী

যাযাবর মানুষ এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বার বার যাতায়াত করায় পায়ের তলার জমিতে ঘাস মরে গিয়ে পায়ের রেখা

পড়ে যেত। আজও পাড়াগাঁয়ে এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া পর্যন্ত মাঠের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা পথ সেই আদিম যুগের পথের সঙ্গে যোগসূত্র রেখেছে। তখনকার দিনে রাস্তা মানুষ ও গৃহপালিত পশু নিয়ে চলাফেরার মত চওড়া করলেই হ'ত। কিন্তু দ্রুত চলাচলের জন্য যখন যানবাহনের আবিষ্কার হ'ল তখন আর ঐ রকম সরু রাস্তায় কুলোল না, দরকার হ'ল আরও চওড়া রাস্তার। প্রথম যুগে সে রাস্তা মাটি দিয়েই তৈরী হ'ত—যাকে আমরা আজও বলি মেটে রাস্তা, কিন্তু যখন ভারী ভারী গাড়ীর রেওয়াজ হ'ল তখন শুকনো ধূলো বা ভিজে মাটির ওপর দিয়ে তা টেনে নেওয়া যেত না। তাই তখন মাটির ওপরটা শক্ত করবার জন্যে পাথর বিছানোর ব্যবস্থা সুরু হ'ল—যাতে সব ঋতুতেই গাড়ী চলাচল করতে পারে।

গাড়ী চলে চলেই এ রকম লিক্ তৈরী হয়ে গেছে। প্রাচীন রাজগৃহে মহারাজ বিম্বিসারের আমলে পাথুরে পথে রথ চলে চলে পাথরের ওপর রথের চাকার চিহ্ন আজও দেখা যায়। তোমরা রাজগিরে গেলে দেখতে পাবে। প্রাচীন যুগে ভাল ও চওড়া রাস্তার প্রয়োজন হয়েছিল বিশেষ করে বাণিজ্য ও রাজ্যশাসন ব্যাপারে, সৈন্যসামন্ত, লোক-লস্কর, এমন কি কখনও বা ভক্তের মিছিল নিয়ে যাওয়ার জন্যও। এই সব দীর্ঘ পথের পাশে রাত্রিবাসের জন্য চটি বা পান্থ-শালা খোলা থাকত। সেখানে মানুষ ও পশুর খাদ্য পাওয়া যেত। রাতে বিশ্রাম ও আহার মিলত।

প্রাচীন ভারতের রাস্তা

মহেঞ্জোদাড়োর মাটির তলায় যে নগর খুঁড়ে বার করা হয়েছে তার রাস্তাগুলো সিধে ও

প্রাচীন রাজগৃহে মহারাজ বিম্বিসারের আমলে পাথুরে পথে চলে চলে রথের চাকার চিহ্ন আজও দেখা যায়

চাকার জন্য লিক্

যেখানে জমি পাথুরে সেখানে চাকা ধরার জন্য লম্বা লিক করে দেওয়া হ'ত। কেউ কেউ বলেন, দু'টি সমান্তরাল লিক্ গাড়ী যাবার জন্যই কাটা হ'ত; আবার কেউ কেউ মনে করেন,

চওড়া। তখনকার দিনে শহরে ক'টাই বা লোক থাকত আর ক'টাই বা গাড়ী ছিল? তবুও সেখানে পঁয়ত্রিশ ফুট চওড়া রাস্তা পাওয়া গেছে। চওড়া রাস্তার দু'ধারে বাড়ী আর প্রতি বাড়ীর পাশ দিয়ে দিয়ে নালা চলে
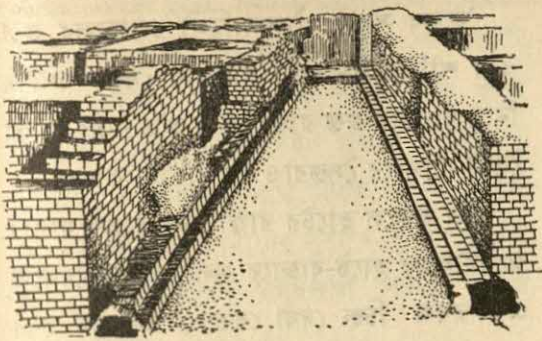
মহেঞ্জোদাড়োর রাস্তা

গেছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের সময়ে প্রাচীন পাটলীপুত্রেও চওড়া রাস্তা ছিল। সেই রাস্তার ধূলো মারবার জন্য জল দেওয়ার ব্যবস্থা ও রাস্তার ধারে জমা ময়লা পরিষ্কার করারও ব্যবস্থা ছিল।

গ্রীস আর রোমের কথা

প্রাচীন গ্রীসে দুই চাকার মাঝখানে প্রায় পাঁচ ফুট (৪'-১১") ব্যবধান রেখে রথ তৈরী করা হ'ত। রাস্তাও তাই হ'ত সেই রকম। বিশেষ করে পাহাড়ে জায়গায় সেই চাকার লিক ছিল আট-ন' ইঞ্চি চওড়া এবং তিন-চার ইঞ্চি গভীর।

হোমারের ইলিয়াডে পাথর দিয়ে মোড়া বাজারের বর্ণনা আছে। রাস্তার দু'পাশেই তো বসত বাজার! প্রাচীন রোমানরাও রাস্তা নির্মাণে বিশেষ পারদর্শী ছিল। তারা আল্‌প্‌স্ পাহাড় ফুঁড়ে রাস্তা তৈরী করে চলে গেছে 'গলে', অর্থাৎ বর্তমান ফরাসী দেশে। ইংলিশ প্রণালী পার হয়ে সুদূর গ্রেট বৃটেনেও রোমানদের প্রাচীন রাস্তার নমুনা পাওয়া যায়। খাস লণ্ডনেও তার প্রাচীন চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। সারা রোমান সাম্রাজ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল দীর্ঘ রাস্তা তৈরী হয়েছিল,—সুদূর পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে সিরিয়ায়, উত্তরে ইংল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত। বিখ্যাত রোমান রাস্তা হ'ল ভিয়া আপ্পিয়া।

কি করে তৈরী হ'ত রাস্তা

প্রসিদ্ধ রোমান এঞ্জিনীয়ার ভিট্রুভিয়াসের লেখা থেকে প্রাচীন রোমান রাস্তা নির্মাণের প্রণালীর কথা জানা যায়। মন্দিরের কাছে রাজপ্রাসাদের মধ্যে বসত আগেকার দিনের বাজার। সেই বাজারে আসত দূর দূরান্তের গ্রাম ও শহর থেকে নানারকমের জিনিস।
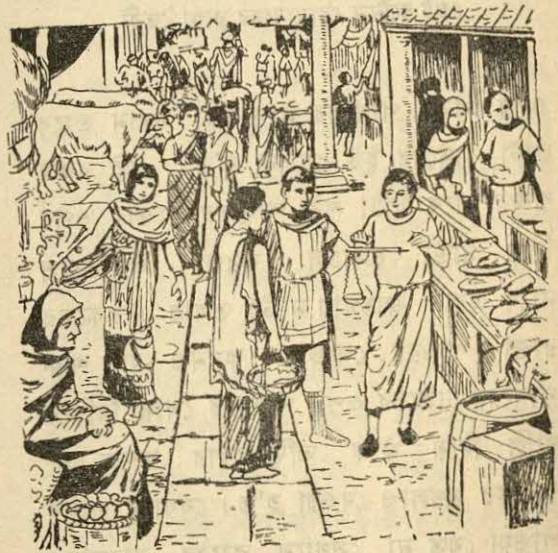
রাস্তার দু'পাশেই বসত বাজার

গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগের জন্য দরকার হ'ত রাস্তা। তখনকার দিনে রাস্তা তৈরী হ'ত বড় বড় পাথরের চাঙ্গড় বিছিয়ে, আর তার ওপর ছোট ছোট পাথরের টুকরো এক-এক স্তর সাজিয়ে। বালি দিয়ে ফাঁক ভর্তি করে তার

গ্রেট বৃটেনে রোমানদের রাস্তা তৈরী

ওপর শক্ত পাথরের মাপ-করা সমান ভাবে ছাঁটা পাথরের ইট বসানো হ'ত। এই রকম সুন্দর ভাবে ছাঁটা শক্ত পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ী চলাচল করত। ল্যাসিয়াস নামে একটা জায়গায় মাটির তলায় ঐ রকমের রাস্তা পাওয়া গেছে। কখনও বা শক্ত পাথরের চাঁইয়ের ওপর পাথরের খোয়া বিছিয়ে বালি দিয়ে ফাঁক ভর্তি করার বদলে চূণ-সুরকির মশলাও দেওয়া হ'ত। যেখানে পাথর পাওয়া যেত না সেখানে কাঠের ব্যবহারও দেখা গেছে।

ধরতে গেলে এই সুন্দর সুন্দর রাস্তার জন্যই সম্ভব হয়েছিল এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন আর সেই সুযোগে বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ভাষার সঙ্গেও পরস্পরের পরিচয় ঘটেছিল।

যুদ্ধের সময়ে সৈন্যবাহিনী চলাচলের জন্য এবং শান্তির সময়েও এখানকার সৈন্য ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তা তৈরী হ'ত। এই রাস্তা তৈরী ব্যাপারে সৈন্যরাও খুব সাহায্য করত।

উর অঞ্চলে হাটের রাস্তা ছিল উল্লেখযোগ্য। সুমেরীয়দের হাটে-বাজারে গুলতির মত দেখতে এক রকম চিহ্ন দেখা যেত। ওর অর্থ হ'ল ওখানে একের বেশী রাস্তা এসে মিশেছে, অর্থাৎ ও জায়গাটা একাধিক রাস্তার সঙ্গমস্থল বা বাজার।

নগর নির্মাণের গোড়ার কথা

নগর, চলতি কথায় যাকে আমরা বলি শহর,—একটি বিচিত্র জায়গা। এখানে মানুষকে দূর দূরান্তর থেকে পানীয় জল বয়ে আনতে হয় না, জমি চষে আহার সংগ্রহ করতে হয় না, কেনাকাটা করতে দূর-দূরান্তের হাটে যেতে হয় না। চারিদিকের গাঁয়ের তৈরী কত ভাল ভাল জিনিস বিক্রী করার জন্য লোকে আপনিই এসে জড় হয় এখানে। কোথাও মন্দির, কোথাও আদালত, কোথাও অতিথি-শালা! কত কর্মব্যস্ততা, কত ছুটোছুটি, কত রকমের কাজের বন্ধন এই নগরেই!

একদা মানুষ যখন ঘুরে বেড়ানোর নেশা কাটিয়ে এক এক জায়গায় এক এক দল বাস করতে সুরু করল আর চারিদিকের জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরী করতে লাগল, তখনই গড়ে উঠল গ্রাম। তারপর সেই গাঁয়ের জিনিসপত্র আদান-প্রদান করতে নানা গাঁয়ের মানুষ জড় হ'তে লাগল বিশেষ দিনে বিশেষ স্থানে। প্রধানতঃ বাণিজ্যের জায়গাকে কেন্দ্র

করেই গড়ে উঠল শহর। ইতিমধ্যে মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ও একটি অদৃশ্য শক্তির কাছে বল পাবার জন্য গড়ে উঠছিল মন্দির। সেই পূজার দেবতার মন্দিরের চারিদিকেও গড়ে উঠতে লাগল অনেক প্রাচীন শহর। আমাদের পুরাণে এদেশের সেই প্রাচীন পুণ্যদায়িকা নগরগুলি সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা,
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতে পুণ্যদায়িকা।"

এগুলি হ'ল শুধু ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে কয়েকটি পুণ্যদায়িকা নগরীর নাম। এরা ইতিহাসের বিখ্যাত নগরী হিসাবে আজও পরিচিত, অবশ্য মায়াবতীর নাম এখন অনেকে ভুলে গেছে। তা ছাড়া ভারতবর্ষের আরও নামজাদা শহর ছিল রাজগৃহ, তক্ষশিলা, পাটলীপুত্র, প্রয়াগ, পাতালপুরী, ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি অনেক। প্রথম মানুষের তৈরী দেবতাদের মধ্যে একজন হলেন শিবলিঙ্গ। গোল বেড়ের মধ্যে লম্বা একটি পাথরকে খাড়া করে বসানো। এর মধ্যেও রয়েছে আদি এঞ্জিনীয়ারিং-এর বীজ, যাকে বলা হয় 'মনোলিথ'—সাম্য বা স্থিতি।

গড়ে উঠল শহরের পর শহর

আরও নানা ব্যাপারকে কেন্দ্র করে শহর সৃষ্টি হতে লাগল। যেমন, মন্দির আর খেলার জায়গাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল শহর—গ্রীসের অলিম্পিয়া। তেমনি ভাল জলবায়ু পরিবর্তনের জায়গাকে কেন্দ্র করেও গ্রীস দেশে 'কস্' শহর গড়ে উঠেছিল। ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে ওঠার কথা তো আগেই বলেছি। এ রকম শহর প্রাচীন মিশরে, ভারতবর্ষে, চীনে, মেসোপটেমিয়ায়, গ্রীস ও রোমান সাম্রাজ্যের নানা জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছিল। রাজধানীকে কেন্দ্র করেও বড় বড় শহর গড়ে উঠল, সৈন্যদের ছাউনীকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠল শহর।

গাঁয়ের মানুষ শহরে এসে জুটল। বহু মানুষের একসঙ্গে থাকা এবং তাদের বিবিধ প্রয়োজন মেটানোর জন্য জটিলতাও গেল বেড়ে। প্রয়োজন হ'ল নেতার—যিনি ক্রমে হলেন রাজা। এই রাজা শুধু শহরের নয়, গ্রামেরও কর্তা হয়ে বসলেন।

রাজার বাসস্থানকে কেন্দ্র করে যে শহর গড়ে উঠল তারই নাম হ'ল রাজধানী। এর কথা একটু আগেই বলেছি।

অনেক মনীষী মনে করেন নগর-সভ্যতা আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেও বেশ উন্নত ছিল। সেখানে ইটের তৈরী বড় বড় ইমারত দেখা যেত। তার কোনটায় থাকতেন রাজা, কোথাও বা সেগুলি হ'ত মন্দির, আবার কোথাও বা তা ধর্মগোলা অর্থাৎ শস্য-সঞ্চয়-ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। কেন না শহরে তো জমি চাষ হয় না বা ফসল ফলে না, সামান্য আনাজপাতি, ফলমূল ছাড়া! সিন্ধুনদের তটে মহেঞ্জোদাড়োয় মাটির তলায় প্রাচীন নগরীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তেমনি পাঞ্জাবের হরপ্পা অঞ্চলেও প্রাচীন প্রাক্‌বৈদিক সভ্যতার শহরের সন্ধান পাওয়া গেছে। টাইগ্রিস নদীর কূলে প্রাচীন নগর-সভ্যতা মাটিচাপা অবস্থা থেকে খুঁড়ে বার করা হচ্ছে।

মিশরেও বিরাট বিরাট পিরামিডের চারিদিকে গড়ে উঠেছিল এক একটা নগর—এক এক রাজার রাজত্বে। সেই রাজার মৃত্যুর পর ঐ পিরামিড অর্থাৎ সমাধি-অঞ্চল ছেড়ে আসত লোকে। কিছু পুরোহিত ও রাজকর্মচারীরা মাত্র ঐ প্রাচীন কীর্তি বাঁচিয়ে রাখতেন। আবার নতুন রাজা তাঁর সমাধির জন্য গ'ড়ে তুলতেন নতুন পিরামিড, আর তার চারদিক্ ঘিরে নতুন শহর।

প্রাচীর-ঘেরা শহর

মিশরের প্রাচীন শহরগুলি কিন্তু প্রাচীর বা পরিখা-ঘেরা নয়। কিন্তু তার পরেই দেখি শহরগুলি এমনি খোলামেলা নগর নয়, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, আর জলে ভর্তি পরিখা দিয়ে চারিদিক্ আগলানো, যাতে শত্রুপক্ষ সহজে শহরে ঢুকে পড়ে লুঠতরাজ না করতে পারে। ইলিয়াডে প্রাচীন ট্রয় নগর ছিল এই রকম। প্রাচীন রোমানরা ছিল এ বিষয়ে আরও সতর্ক। তাদের বড় বড় সব শহরই এই রকম পাঁচীল-ঘেরা থাকত। রোমান এঞ্জিনীয়াররা মনে করতেন শহর গোল পাঁচীল দিয়ে ঘেরা হওয়া বাঞ্ছনীয়, পাঁচীলের ওপর থেকে বাঁশী বাজালে নগররক্ষকেরা যাতে পরস্পরের বংশীধ্বনি সহজে শুনতে পায়। আমাদের দেশেও প্রাচীর ও পরিখা-ঘেরা শহরের চল ছিল। রাজগিরে গেলে পাহাড়ের গায়ে এখনও সেই দু'হাজার আড়াই হাজার বছর আগেকার পাথরের লম্বা দেয়াল দেখতে পাবে—যা নাকি রাজগৃহকে ঘিরে রেখেছিল।

তখনকার দিনের শহর আজকের মত এত বিরাট ছিল না এবং এত লোকও সেখানে থাকত না। আজকাল তো এক-একটা বড় শহর কয়েক বর্গ মাইল যুড়ে হতে পারে এবং তাতে লক্ষ লক্ষ নয়—কোন কোনটায় কোটি লোকও বাস করে।

সেকালের শহর কত বড় হ'ত

এ যুগের তুলনায় আগের দিনে শহর কত ছোট হ'ত তা নীচের খুব পুরোনো ফর্দটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

শহরের নাম	কোন্ দেশ	বিস্তৃতি (একরে)
মেগিডো	প্যালেস্টাইন	৩·৫
গুর্নিয়া	ক্রীট	৬·৫
মাইসিনি	গ্রীস	১২·০
কারকেমিস্	সিরিয়া	৪০·০
মহেঞ্জোদাড়ো	ভারত (বর্তমানে পাকিস্তান)	৬০০·০
উর	ইরাক	২২০·০
খোরসাবাদ	অ্যাসিরিয়া	৭৪০·০
উরূকের	ইরাক	১২৮০·০
নিনেভা	ইরাক	১৮০০·০
ব্যাবিলন	ইরাক	৬ থেকে ৯ বর্গ মাইল

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন বর্তমান ইরাকের উর শহরে ২৪০০০ ও মোফাজে শহরে ৩৪,০০০ লোক আজ থেকে ৪০০০ বছর আগে বাস করত। ৩০০০ খৃষ্টপূর্বে মহেঞ্জো-দাড়োয় দোতলা বাড়ীও ছিল—যার মাপ লম্বায় তিরিশ ফুট, আর চওড়ায় সাতাশ ফুট।

ইরাকের নীপ্পুরে যে পাথরের ফলক বেরিয়েছে (১৫০০ খৃষ্টপূর্ব) তাতে প্রাচীন

নগরের রেখাচিত্র আঁকা বেরিয়েছে। সেই ছবিতে ইউফ্রেটিস্ নদী থেকে কাটা খাল, ফটক, নগর-প্রাচীর, মন্দির প্রভৃতি আঁকা। অ্যাসিরিয়ায় পাওয়া পাথরের ফলকে নগরের একটা বিন্যাসও দেখা যায়।

সেকালের বাড়ী তৈরী

ঋতুর প্রকোপ অর্থাৎ বৃষ্টি, রোদ, শীত ইত্যাদি থেকে রক্ষা পেতে ও হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে নিরাপদে থাকার জন্য যাযাবর মানুষের দরকার হয়েছিল ঘর।

খাড়া পাথরের ওপর পাথর শুইয়ে গড়া আদিম যুগের ঘর

মানুষের প্রথম ঘর হচ্ছে পাহাড়ের গুহা। পাথর আর ডালপালা জড় ক'রে, গুহার মুখ বন্ধ ক'রে তাকে নিরাপদ করা হ'ত। সেই থেকেই সুরু মানুষের গৃহনির্মাণের ইতিহাস।

যেদিন মানুষ একটা শোয়া-পাথর খাড়া ক'রে পুঁততে শিখল সেই দিনই নির্মাণবিদ্যার সুরু, তারপর পাশাপাশি পাথর খাড়া ক'রে সেই খাড়া পাথরগুলির ওপর একটা শোয়ানো পাথর চাপিয়ে ছাদের মত যেদিন করতে শিখল সেদিন হ'ল ঘর তৈরীর মান এগিয়ে নিয়ে যাবার দিন। এধার-ওধারের পাথরের টুকরো জোগাড় করে মৌচাকের চেহারার মত বা উপুড়-করা ধামার মত ঘর তৈরী সুরু হ'ল। পাখীর বাসা দেখে মানুষ গাছের ডালেও কিছুকাল থাকার ব্যবস্থা করেছিল।

তারপর চলল গাছেরই লতাপাতা, ডালপালা দিয়ে ঘর বাঁধা। চামড়ার তাঁবুও তৈরী হ'ল। কিন্তু এগুলো তো পাথরের মত মজবুত নয়! অথচ পাথর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। তাই এর পর মাটি দিয়ে ইট বানিয়ে সেই ইট রোদে শুকিয়ে তাই দিয়ে দেওয়াল তোলা সুরু হ'ল। এখনও তিব্বত অঞ্চলে এই প্রথায় দিব্যি মজবুত ঘর তৈরী করা হয়। তারও পরে আগুন দিয়ে রোদে শুকানো ইট পুড়িয়ে নেওয়া হ'ল।

পাথরের আর ইটের বাড়ী

মহাকালের যে ধ্বংস করা স্বভাব তা থেকে মুক্তি পাওয়া কিছুটা সম্ভব যদি পাথর বা পোড়া ইট দিয়ে বাড়ী তৈরী হয়। তাই
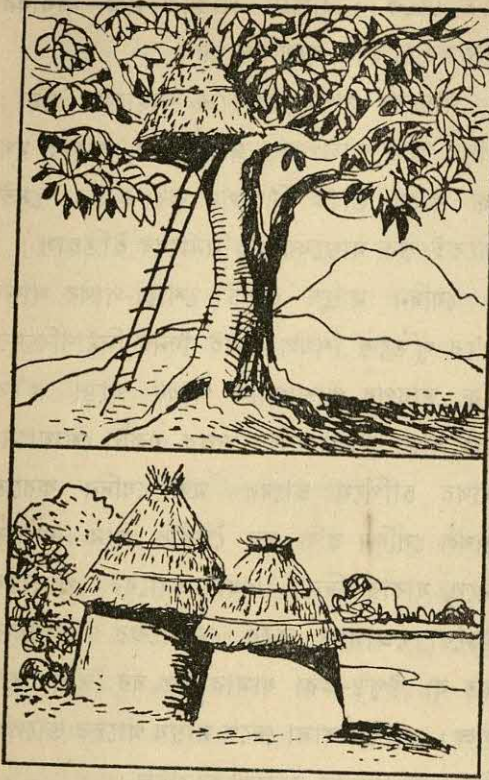
ওপরে : গাছের ডালে মানুষের ঘর
নীচে : পাতায় ছাওয়া মাটির ঘর

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন ঘর-বাড়ী যা দেখা যায় তা হ'ল অশোকের স্তম্ভ বা বৌদ্ধদের স্তূপ। সবই পাথরের তৈরী। তবে ইটের তৈরী ঘরবাড়ী-সমেত সম্পূর্ণ শহরের আবিষ্কার হয়েছে মহেঞ্জোদাড়োয়, হরপ্পায়, তক্ষশিলায় এবং ভারতবর্ষের বাইরেকার কোন কোন প্রাচীন শহরে।

কথায় বলে ইতিহাসের পুনরাবর্তন হয়। আজ আমাদের পৃথিবীতে গণতন্ত্রের যুগ। রাজতন্ত্র জগৎ থেকে প্রায় মুছে যাচ্ছে। কিন্তু প্রাচীন কালে নৃপতান্ত্রিক রাজধানী ও পুরোহিত-প্রধান ধর্মস্থানই ছিল অধিক। কিন্তু তারও আগে, অর্থাৎ আর্য সভ্যতারও আগে সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসস্তূপে কোন বিরাট রাজ-প্রাসাদ কি খুব উঁচু মন্দির পাওয়া যায় নি। তার বদলে দেখা যায় বেশ চওড়া চওড়া ঘর—মিশর কি মেসোপটেমিয়ায় যেমনটি পাওয়া যাবে না। এখানকার সবই সাধারণ ধরণের ছোটখাটো ব্যাপার। মহেঞ্জোদাড়োয় সাধারণের স্নানাগার ও উন্নততর স্বাস্থ্যবিধান ছিল। বাড়ীর দেওয়াল কোথাও কাঁচা, কোথাও পোড়া ইটের তৈরী ; অধিকাংশই আয়তাকার। নানা মাপের পাকা ইটের গোল কূয়ো। এ সব কূয়ো তৈরী হ'ত কোণা-কাটা ইট দিয়ে—যা নাকি সে যুগের এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার এক আশ্চর্য নমুনা।

এদিকে মিশরে ফ্যারাওরা (রাজা) আপন আপন সমাধির জন্য তৈরী করলেন পিরামিড। অদ্ভুত এর গড়ন। বিরাট বিরাট পাথরের 'ব্লক্' দিয়ে তৈরী। এত হাজার বছরেও এরা তো দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে! বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোডেটাস চীয়োপ্সের পিরামিডের (২৮৫০ খঃ পূঃ) কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন যে এই পিরামিড তৈরী করতে এক লক্ষ লোকের বিশ বছর লেগেছিল। একদল লোক তিন মাস কাজ করার পর তাদের ছুটি হ'ত। তারা ফিরে যেত আপন আপন ঘরে। ক্ষেতখামার করত ন'মাস। আবার ফিরে আসত এই পিরামিড তৈরীর কাজে। দেখা গেছে যে এরা দিনে এক ঘন-ফুট পাথরের কাজ করত। অত উঁচুতে পাথর-গুলো তোলা হ'ত পিরামিডের পাশে বালির গড়েন জমি তৈরী ক'রে। নত তলের উপরের

দিকে কাঠের রলা ফেলে চৌকো পাথর মানুষে ঠেলে তুলত এবং তাকে যথাস্থানে রাখা হ'ত।

ফিনিসিয়ার 'বাল্‌বেক' মন্দিরের একটি বিরাট পাথরের মাপ ১০,০০০ ঘনফুটের বেশী, অর্থাৎ ১২ ফুট × ১৩ ফুট × ৬৪ ফুট। মনে হয় পাথরের পাহাড় কেটে তৈরী হয়েছিল এই মন্দির (ইলোরার কৈলাস মন্দিরের মত)। তার পর মিশরীয় মন্দির তৈরীর ব্যাপারে বিশেষ এক পদ্ধতি ছিল। বাইরের খাড়া দেওয়াল ভিতরের দিকে ঈষৎ হেলানো, কিন্তু তার ভিতরে
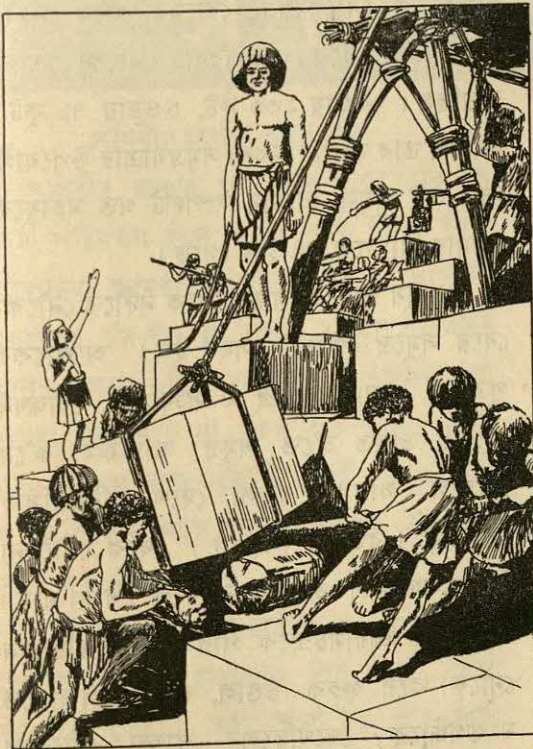
কাঠের রলা ফেলে চৌকো পাথর মানুষেই ঠেলে তুলত।

পাথরের থাম পর পর সাজানো। কিন্তু গ্রীস দেশে এই মন্দির তৈরী ব্যাপারে মিশরীয়দের বিপরীত পদ্ধতি নেওয়া হ'ল। মিশরীয় মন্দিরের ভিতরের থামগুলি এবার বাইরে বের ক'রে দেওয়া হ'ল।

ব্যাবিলন আর অ্যাসিরিয়ার ঘরবাড়ী

মিশরের মত অ্যাসিরিয়া ও ব্যাবিলনিয়ায় পাথরের ছড়াছড়ি নেই, তাই তাদের বাড়ী তৈরী করতে পোড়া মাটির ইটের ব্যবহার দেখা যায়। প্রথম প্রথম কাঁচা ইটের ব্যবহার এবং পরে পোড়া ইটের ব্যবহার সুরু হয়। ব্যবিলনিয়ার স্তম্ভের ভিৎ খুঁড়ে দেখা গিয়েছে কাঁচা ইটের ভেতরের গাঁথনীর চারদিকে ৫০ ফুট লম্বা পাকা ইটের বেড় দেওয়া। অর্থাৎ এই স্তম্ভের ব্যাস হ'ল প্রায় ষোল ফুটের কিছু বেশী। ঐ সব ইট যোড়ার মশলা হিসেবে সাধারণ চূণ-সুরকীর বদলে বিটুমেন অর্থাৎ পীচ জাতীয় জিনিসও ব্যবহার করা হ'ত।

গ্রীক স্থাপত্য

মিশর ও ব্যাবিলনের বেজায় ঢাউস দেওয়ালের ঘর-বাড়ীর বদলে গ্রীকেরা সরু-সরু-থাম-দেওয়া মন্দির তৈরী সুরু করল। থামের মাপ ও কারিগরীর বিশদ বিশ্লেষণ করে গ্রীক স্থাপত্যের ধারাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। তখনকার দিনে ছাদ হ'ত সাদাসিধে পাথরের পাটা দিয়ে ঢাকা, কিংবা গাছের ডালপালা দিয়ে ছু' পাশের দেওয়াল চাপা দেওয়া। এর পরে বাড়ী তৈরীর উন্নতির আর এক বাধা হ'ল ছুই দেওয়ালের মধ্যে বড় ফাঁককে ঢাকা দেওয়ার ব্যাপার। সেই সমস্যার সমাধানে ইট্রাস্কানেরা আবিষ্কার করল খিলেন। প্রাচীন মিশরে ও গ্রীসে খিলেন দিয়ে ছুই দেওয়ালের ব্যবধান ঢাকা দেবার পদ্ধতি চালু ছিল না ; কিন্তু আশ্চর্য, মেসোপটেমিয়া—বিশেষ করে উর, নাফ্‌ফর, ওয়ারকায়, এমন কি

নিনেভায়ও মাটির তলায় ময়লা জল যাবার ড্রেনে, সেচের জল যাবার খালে খিলেন-দেওয়া সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। সে প্রায় ৪০০০ খৃঃ পূঃ-এর কথা। মিশরে যে খিলেন ছিল তা অতি সামান্য ও সাধারণ বাড়ীর জন্য। রোমানরা বড় বড় ফাঁক বোজাতে হলে কোণা-কাটা ইট দিয়ে খিলেন তৈরী করত। এর পরে আবার গোল জায়গা চাপা দিতে গম্বুজের ব্যবহার সুরু করে। সেই গম্বুজের গুরুভার কমাবার জন্য কংক্রীটের মধ্যে ফাঁপা মজবুত হাঁড়ি ব্যবহার করা হ'ত। এর আগে যদিও কাচের আবিষ্কার হয়েছিল কিন্তু তা ঘরবাড়ীতে লাগানো সম্ভব হয় নি।

নৌকো তৈরীর কথা

নৌকো আর জাহাজের ব্যবহার শিখেছে মানুষ বহু যুগ আগে। রঘুবংশে লেখা আছে গঙ্গা রাঢ়ের বিরাট নৌবাহিনীর কথা। ফিনিসিয়ান, গ্রীক, কার্থেজিয়ান এবং রোমানরা কাঠের নৌকো দাঁড় এবং পাল দিয়ে চালাত। প্রাচীন গ্রীকদের নৌকো ১৩০-১৬৫ ফুট লম্বা, ১৬-১৭ ফুট চওড়া হ'ত। সে নৌকো ১৭০ জন পর্যন্ত দাঁড়ি দিয়ে চালানোর ইতিহাস আছে।
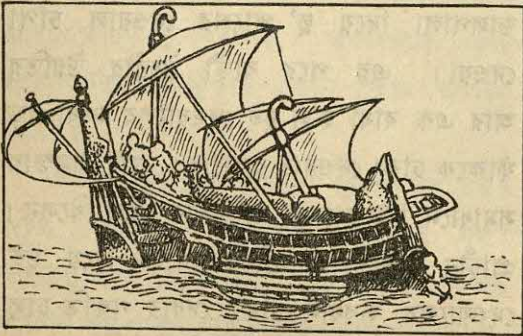
প্রাচীন হিন্দুজাহাজের পাথরে খোদাই দেওয়াল-চিত্র (যবদ্বীপ)

বাইবেলে নোয়ার আর্কের কাহিনী তো তোমরা আগেই পড়েছ! পুরাণের মহাপ্লাবনের কথাও! আর্ক জিনিসটা বন্ধ নৌকো ছাড়া আর কি?

মিশরের শস্যবাহী নৌকো 'তেইমিস'-এর দৈর্ঘ্য ছিল ১৮০ ফুট, প্রস্থ ৪৫ ফুট, উচ্চতা ছিল সাড়ে তেতাল্লিশ ফুট। শোনা যায় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের পরিচালনায় সাইরাকিউসের হিয়ারো এর চেয়েও বড় এবং বিখ্যাত নৌকো তৈরী করেন এবং সেটি মিশরের রাজা দ্বিতীয় টলেমিকে উপহার দেন। তিন থাক দাঁড়ি দাঁড় বাইত সে নৌকোয়। রোমের কাছে নেমীর হ্রদের তলা থেকে এক বিরাট নৌকো তোলা হয়েছিল। লম্বায় ২৩৩ ফুট, চওড়ায় ৭৯ ফুট। চ্যাটাল তার তলাটা অবশ্য সমুদ্রযাত্রার উপযোগী নয়। এই অমূল্য প্রাচীন সম্পদটি গত মহাযুদ্ধে বোমার আঘাতে নষ্ট হয়ে গেছে।

দরায়ুস গান্ধার অঞ্চল থেকে নদীতে নৌকো বেয়ে সমুদ্রে পৌঁছতে সমর্থ হন। অশোকের পুত্র ও কন্যা, মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা, বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ভারত হ'তে সমুদ্র অতিক্রম ক'রে সিংহলে যান। বাংলা দেশের বিজয়সিংহ সিংহগড় (বর্তমান সিঙ্গুর?) থেকে নৌসৈন্য নিয়ে লঙ্কাদ্বীপ জয় করেন বলে শোনা যায়। রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রকে পার করে দিয়েছিলেন নৌকো করে গুহক চণ্ডাল, আর মহাভারতে মৎস্যগন্ধাকে দেখেছিলেন শান্তনু নৌকোর ওপরে। সে নৌকোর আকৃতি কি রকমের ছিল বলা শক্ত, তবে যবদ্বীপ, বলিদ্বীপে হিন্দুর সমুদ্র-যাত্রার যে পাথরে খোদাই দেওয়াল-চিত্র পাওয়া গেছে তা থেকে সেকালকার জাহাজের চেহারার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

পৃথিবীর কথা

পৃথিবীর হাওয়া আর জল

পৃথিবীর জন্মের পর ধীরে ধীরে তার কি রকম পরিবর্তন হতে লাগল তার কিছু কিছু আলোচনা আমরা আগেই করেছি। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩-৫১)। সে পরিবর্তন এখনও চলছে—দিবারাত্র চলছে। একদিনে তা আমরা টের পাই না, কিন্তু শত শত—হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি বছর ধরে যে পরিবর্তন ঘটল তাকে বুঝতে খুব কষ্ট হবার কথা নয়।

পৃথিবীর ওপরকার খোলসটার কথাই ধরা যাক না কেন! প্রধানতঃ জল আর ডাঙ্গা দিয়ে এটি তৈরী। জল থেকে কি করে ডাঙ্গা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সে কথা আমরা আগেই বলেছি। খোলসের ওপর আবার একটা গ্যাসের আবরণ আছে—প্রায় দু'শ' মাইল পর্যন্ত। তাকে আমরা চলতি কথায় বলি হাওয়া বা বাতাস, আর শুদ্ধ বাংলায় বলি বায়ুমণ্ডল। ইংরেজীতে এরই নাম অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার। এই বায়ুমণ্ডলের বেশীর ভাগই এখন নাইট্রোজেন গ্যাস দিয়ে তৈরী—আয়তন দিয়ে মাপলে শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ। বাকিটা প্রধানতঃ অক্সিজেন—শতকরা ২১ ভাগ। তা ছাড়া আছে সামান্য কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস (শতকরা ০·৪ ভাগ), এক ভাগ আন্দাজ নিষ্ক্রিয় গ্যাস (আর্গন, হিলিয়াম, নিওন, ক্রিপ্‌টন, জেনন), যৎসামান্য জলীয় বাষ্প এবং স্থান বিশেষে অতি অল্প পরিমাণ এটা-ওটা-সেটা। অবশ্য সঙ্গে আছে প্রচুর ধূলো, কিন্তু সেগুলো তো গ্যাস নয়! এই বায়ুমণ্ডল বা হাওয়া নীচের দিকে বেশ ভারী এবং ঘন, কিন্তু যতই ওপরে ওঠা যাবে ততই হাল্কা হ'তে হ'তে ক্রমে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে।

হাওয়ার নীচেই ডাঙ্গা আর জল। আমরা ভূগোলে পড়েছি পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। কথাটা কিন্তু পৃথিবীর খোলস

পৃথিবীর বুকের ওপর পরিবর্তন এখনও চলছে—দিবারাত্র চলছে।

সম্বন্ধেই বলা চলে, কারণ পৃথিবীকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে তার ঠিক মাঝখান দিয়ে, অর্থাৎ কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে, একটা কাঠি যদি ঢুকিয়ে দেওয়া যেত তা হ'লে সেটা হ'ত আট হাজার মাইল লম্বা। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় পৃথিবীর ব্যাস। তা হ'লে এর অর্ধেক অর্থাৎ পৃথিবীর ওপরকার খোলস থেকে তার কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে চার হাজার মাইল—যাকে বলা হয় পৃথিবীর ব্যাসার্ধ। কিন্তু এই চার হাজার মাইলের মধ্যে জলের গভীরতা গড়-পড়তা নাকি বড় জোর আড়াই মাইল। গড়-পড়তা বলছি এই জন্য যে সব জায়গায় এই গভীরতা সমান নয়—কমও আছে, বেশীও আছে। পৃথিবীর যে জায়গাটায় সমুদ্র সব চেয়ে গভীর সেখানেও এই গভীরতা সাত মাইলের বেশী হবে না। যাই হোক, ওপরের বাতাসকে যদি শুদ্ধ ভাষায় বায়ুমণ্ডল বলা হয় তবে পৃথিবীর এই জলের অংশটাকে জলমণ্ডল বা আরও সাধু ভাষায় বারিমণ্ডল বলা যেতে পারে। ইংরেজী করে বললে বলা যায় হাইড্রোস্ফিয়ার। হাইড্রো হচ্ছে জল।

পাথর, পাথর আর পাথর

পৃথিবীর খোলসটা কোথাও ডাঙ্গা বা মাটি আর কোথাও বা জল দিয়ে ভরা। কিন্তু সে তো অতি সামান্য অংশ! তার নীচে কি আছে? বিজ্ঞানীরা ওর নাম দিয়েছেন লিথোস্ফিয়ার, যার বাংলা করলে বলা যায় শিলামণ্ডল। এর আগে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২-৫৫) আমরা পৃথিবীর ভিতর দিক্‌টা নিয়ে আলোচনা করেছি। জলই বল আর ডাঙ্গাই বল, ওপরে খানিকটা মাটি (সেও পাথর থেকেই তৈরী), আর তার নীচে রয়েছে গ্র্যানাইট পাথর। তারও নীচে রয়েছে বেসল্ট পাথরের স্তর। আর তার নীচে? খানিকটা ভারী পাথরের নীচে মিশে রয়েছে লোহা আর

নিকেল। তারও নীচে, একেবারে কেন্দ্র পর্যন্ত চলে গেছে প্রায় ১৯০০ মাইল পর্যন্ত পুরু একটা লোহা আর নিকেলের স্তর।

লোহা আর নিকেল হচ্ছে ধাতু ; কিন্তু তার ওপরের পাথরগুলো ?—ওর সবই কি গ্র্যানাইট আর বেসল্ট ? ও ছাড়া অন্য পাথর কি হয় না ?
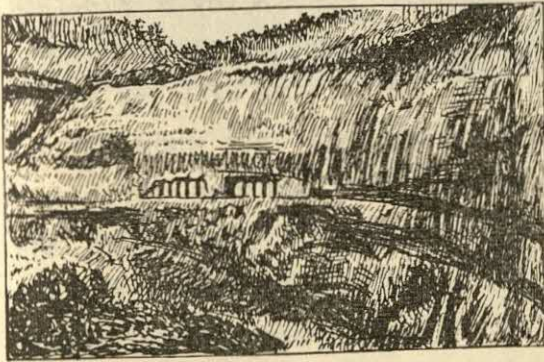
অজন্তার পাহাড় গোটাটাই আগ্নেয় শিলা দিয়ে তৈরী।

আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে-আসা তরল লাভা দিয়ে তৈরী হয় বেসল্ট পাথর। গ্র্যানাইটেরও জন্ম ঐ রকম আগ্নেয় পাথর থেকে। পাথরকে শুদ্ধ বাংলায় বলা হয় শিলা। তা হ'লে এই জাতের পাথরকে আমরা আগ্নেয় শিলা বলতে পারি। অবশ্য সোজা বাংলায় আগুনে পাথর বলতেই বা দোষ কি ? ইংরেজীতে একে বলা হয় ইগ্‌নিয়াস্ রক্। তোমরা অজন্তা গুহার ছবি অনেকেই দেখেছ। পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে ঐ সব গুহা তৈরী করা হয়েছিল। অজন্তার পাহাড় গোটাটাই আগ্নেয় শিলা দিয়ে তৈরী।

কিন্তু সব জাতের পাথরকেই এ রকম আগ্নেয় শিলা বলা হয় না, যদিও একেবারে গোড়া খুঁজতে গেলে হয়তো সবগুলিরই জন্ম আগ্নেয় শিলা থেকে বলা যেতে পারে। আর এক জাতের পাথরের আমরা নাম দিয়েছি পাললিক শিলা। কেউ কেউ বলেন স্তরীভূত শিলা। এর ইংরেজী নাম সেডিমেণ্টারী রক্।

পাললিক নামটা শুনে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। ওটি একটি বিশেষণ পদ—পলি থেকে যার জন্ম সেই হ'ল গিয়ে পাললিক। এই পাথর স্তরে স্তরে সাজানো থাকে বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলা হয়।

পাথরের অনেক শত্রু

কি করে তৈরী হয় এই পাথর ? পাথরের শত্রু অনেক। অমন যে শক্ত আগুনে পাথর তাকেও ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারে এমন শক্তির অভাব নেই। রোদ, বৃষ্টি, হাওয়া, এমন কি ঠাণ্ডা বরফও হচ্ছে এই সব শক্তি।
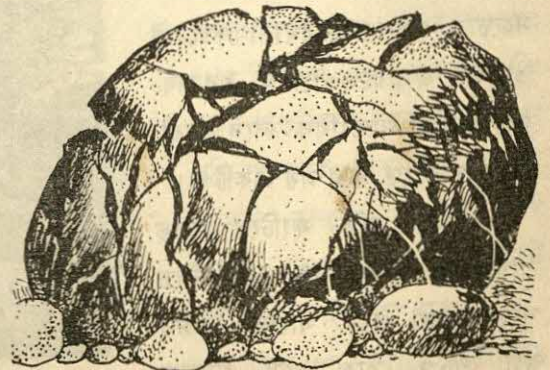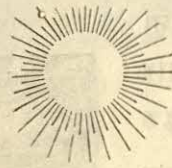
রোদে ফেটে চৌচির হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে পাথর।

রোদ, বৃষ্টি আর হাওয়ার পাল্লায় পড়ে কত অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারা হতে পারে পাথরের!

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পাথরের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করে চলেছে তারা। শুধু অত্যাচার

জলের তোড়ে ফোঁপরা হয়ে গেছে পাথর।

নয়, মজার মজার কাণ্ডও যে না করছে তা নয়। রোদ, বৃষ্টি আর হাওয়ার পাল্লায় পরে কত অদ্ভুত অদ্ভুত চেহারা হতে পারে পাথরের—সবচেয়ে ওপরের ছবিখানা দেখলেই তা আন্দাজ করতে পারবে। এর সব-গুলিই কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে তৈরী, মানুষের হাতে গড়া নয় একটিও!

রোদের তাত ফাটিয়ে দিচ্ছে পাথরকে। সেই ফাটা পাথর নীচে পড়ে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির জল প্রচণ্ড বেগে এসে আঘাত করছে পাথরকে। সেই আঘাতে পাথর থেকে ছোট ছোট কণা ক্রমাগত খসে খসে পড়ছে—জলে ধুয়ে সেই গুঁড়োকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে জলের স্রোত। প্রথমে ঝরণা, তারপর তাই হয়ে যাচ্ছে নদী। শুধু পাথরের গুঁড়ো নয়, ছোট ছোট পাথরের টুকরো-গুলোকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছে নদী। যাবার পথে ঘষা লেগে লেগে সেগুলো আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে—প্রথমে টুকরো টুকরো নুড়ি, তার পর সেই নুড়িরও কতক হয়ে যাচ্ছে একেবারে গুঁড়ো পাথরের কণা। কখনও জলের তোড় গোটা পাথরকে ভাঙ্গতে না পারলেও তাকে
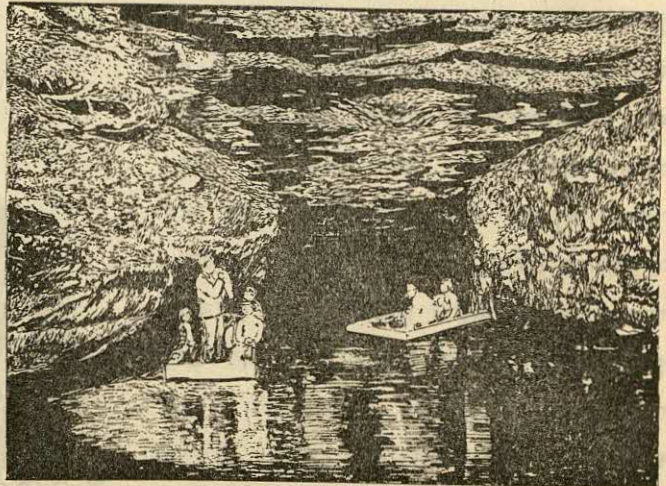
জলের স্রোত পাহাড় খুবলে তৈরী করছে বিরাট পাতাল-গুহা।

সেই বালির ঘষা লেগেও ক্রমাগত ক্ষয়ে যাচ্ছে পাথর। একদিনের ব্যাপার নয় তো, হাজার হাজার —লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি বছর ধরে চলছে এই ঘষে ঘষে ক্ষয় করার কাজ। তোমরা মিশরের মরুভূমির মধ্যে পাথর দিয়ে তৈরী পিরামিড আর স্ফিংক্‌স্‌-এর (অর্ধেক মানবী, অর্ধেক সিংহী) বিরাট মূর্তির ছবি নিশ্চয়ই দেখেছ। ওর চারধারেই বালি। সেই বালি বাতাসে উড়ে এসে পিরামিডের

জলের আর একটি কাণ্ড! জল চুঁইয়ে পড়ে পাহাড়ের গায়ে তৈরী হয়েছে অপূর্ব গুহা।

ফোঁপরা করে দিচ্ছে। কোথাও বা জল চুঁইয়ে, পাহাড়কে পাহাড় খুবলে, গলিয়ে তৈরী করছে বিরাট বিরাট গুহা। পাহাড়ের তলায় পাতাল-গুহাও তৈরী হচ্ছে এই ভাবে।

সমুদ্রও বসে নেই। সেও, সুবিধা পেলেই, খুবলে কেটে নিচ্ছে পাড়ের অংশ।

তার পর, ধর, হাওয়া। এদেরও জোর বড় কম নয়! এমনি তো এসে ধাক্কা মারছেই, সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে আনছে যত রাজ্যের বালি।
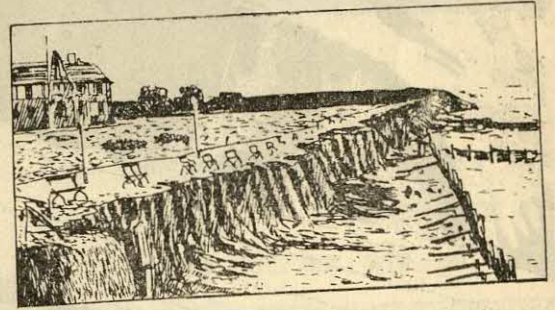
সমুদ্রের ঢেউ এসেও পাড় থেকে খুবলে কেটে নিতে ছাড়ে না।

পাথরকে কি রকম এবড়োখেবড়ো আর স্ফিংক্‌স্‌-এর মুখখানাকে কি রকম ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে তা ছবি দেখলেই বোঝা যায়। সামান্য কয়েক হাজার বছরেই যদি এমনটা হয় তা হ'লে কোটি কোটি বছরে না জানি কি হবে!

এরও ওপর আছে ঠাণ্ডা আর বরফ। এরাও কম যায় না।

মরুভূমির হাওয়ায়-উড়ে-আসা বালি স্ফিংক্‌স্‌-এর মুখ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে—মাত্র কয়েক হাজার বছরে।

পাথরের ফাটলে জল ঢুকে থাকে, তার পর ঠাণ্ডায় যখন তা জমে বরফ হয়ে যায় তখন আয়তনে যায় বেড়ে। (জল জমে বরফ হ'লে আয়তনে বেড়ে যায় এ বৈজ্ঞানিক তথ্য নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে ?) ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গেই ফেটে যায় সেই পাথর। ঠাণ্ডার দেশে আরও আছে বরফের নদী—যাকে আমরা বলি তুষার-

বরফের নদী
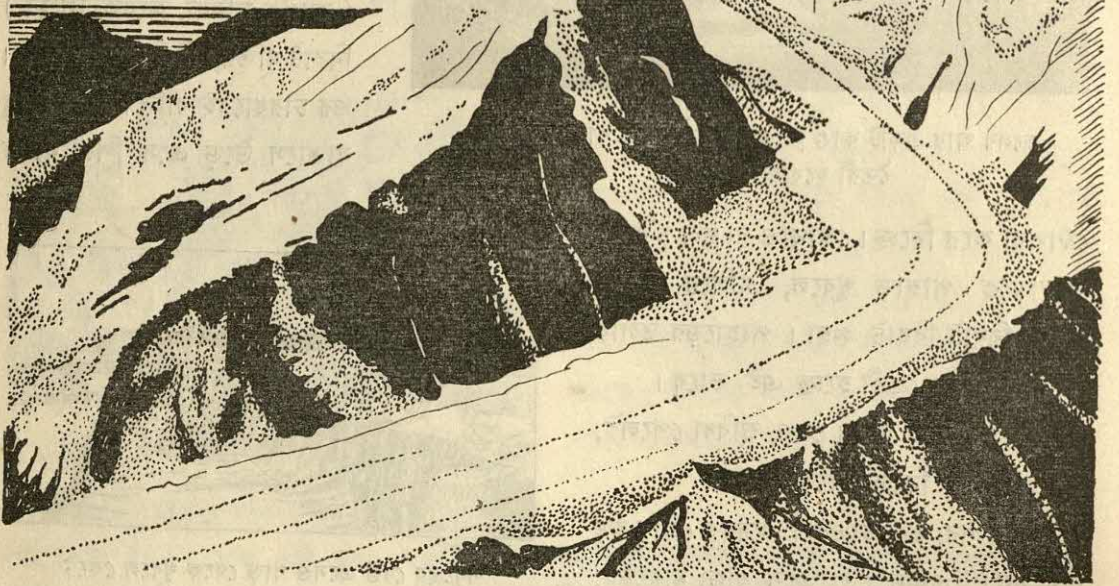
নদী বা গ্লেসিয়ার। এই নদীতে জল নেই, সব বরফ। কিন্তু নদীর মতই তা বয়ে চলেছে—যদিও খুব ধীরবেগে। যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানকার পাথরের গায়ে ক্রমাগত আঁচড় কেটে চলেছে এরা, সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে নিচ্ছে ছোট ছোট নুড়ি আর পাথরের গুঁড়ো—একেবারে ময়দার গুঁড়োর মত মসৃণ। তারপর গরম জায়গায় এসে যখন সেই বরফ গলে গিয়ে সত্যিকার নদী হয়ে গেল অমনি তার স্রোতও গেল বেড়ে। নুড়ি আর পাথরের গুঁড়োগুলো ভেসে চলল সেই স্রোতে। কতক নুড়ি হয়তো পথেই পড়ে রইল স্তূপাকার হয়ে। তার পর লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমে একাকার হয়ে আরও শক্ত পাথরে পরিণত হ'ল। কিন্তু তুষারের সেই অজস্র আঁচড় আর পালিশ-করা চেহারা তখনও রয়ে গেল তাদের শরীরে। ভূবিজ্ঞানীরা এ সব পাথর দেখলেই চিনতে পারেন কি ভাবে ওরা তৈরী হয়েছে।

কিন্তু গুঁড়োগুলো কোথায় যায়? নদীর স্রোতের সঙ্গে চলতে চলতে কতক নদীর তলায় থিতিয়ে পড়ে, কিন্তু বেশীর ভাগই নদীর স্রোতের সঙ্গে চলে আসে সমুদ্রে (বা হ্রদে)। সেখানে এসে স্তরে স্তরে জমা হয় সেগুলো। এগুলোকেই আমরা বলি পলি।

স্তরের পর স্তর পলি জমতে জমতে বেশ পুরু হয়ে ওঠে। তখন ওপরকার স্তর নীচেকার স্তরের ওপর চাপ দিতে থাকে। সেই সঙ্গে রয়েছে পৃথিবীর ভিতরকার উত্তাপ। ফলে নরম পলি আর শেষ পর্যন্ত নরম থাকে না, ধীরে ধীরে শক্ত পাথরে পরিবর্তিত হয়। তখন তাকে শিলা বলতে কোনও বাধা নেই। পলি (ইংরেজীতে যাকে বলে সেডিমেন্ট) থেকে তৈরী, তাই তাকে বলা হয় পাললিক শিলা বা সেডিমেন্টারী রক্।

নতুন পাথরের জন্ম

এই পলি থেকে তৈরী পাথরও কিন্তু অনেক রকমের হতে পারে। খাঁটি কাদা থেকে তৈরী হয় যেগুলো সেগুলোকে বলা হয় শেল্। বালি জমে যেগুলো তৈরী হয় সেগুলোকে বলা হয় বেলে পাথর। বালির ইংরেজী স্যাণ্ড্। তাই ইংরেজীতে এগুলিকে বলা হয় স্যাণ্ড্-স্টোন্। আবার অনেক সময় নানা রকমের সামুদ্রিক প্রাণীর শক্ত খোলা গুঁড়ো হয়ে জমে জমে, শেষে শক্ত হয়ে এক রকম পাথর তৈরী করে—যাকে বলা হয় চূণাপাথর বা লাইম্‌স্টোন্। এই সব খোলার আসল উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম্ কার্বনেট—যাকে বাংলায় আমরা বলি খড়ি। তাই এগুলিকে খড়ির
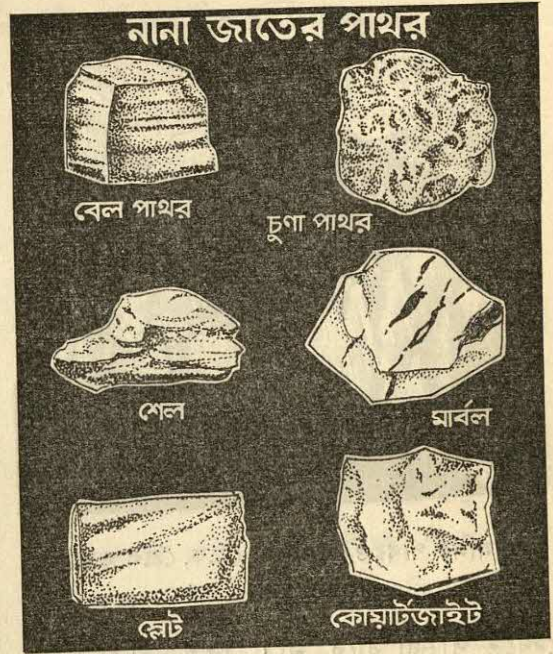
নানা জাতের পাথর

পাথর বললেও ভুল হবে না। খড়ির ইংরেজী হচ্ছে চক্, তাই একে চক্ পাথরও বলা হয়। আর এই খড়ি পোড়ালেই পাওয়া যায় চূণ। তাই এর আর এক নাম চূণাপাথর। চূণাপাথর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও অনেক দেখতে পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডের ডোভার অঞ্চলেও সমুদ্র ঘেঁষে রয়েছে এই খড়ির পাহাড়। খড়ির মতই সাদাটে তার রং। ডোভারের উপকূলে যখন জাহাজ এসে পৌঁছয় তখন দূর থেকে এই খড়ির পাহাড় দেখে ইংরেজ মাত্রই পুলকিত হয়ে ওঠে।

তোমরা হয়তো ভাবছ, এই পলি থেকে তৈরী পাথর—যাকে আমরা শুদ্ধ ভাষায় পাললিক শিলা নাম দিয়েছি—সেগুলো কেবল মাত্র নদী বা সমুদ্রের তলায় কিংবা তাদের ধার ঘেঁষেই থাকবে, অন্যত্র নিশ্চয়ই তাদের
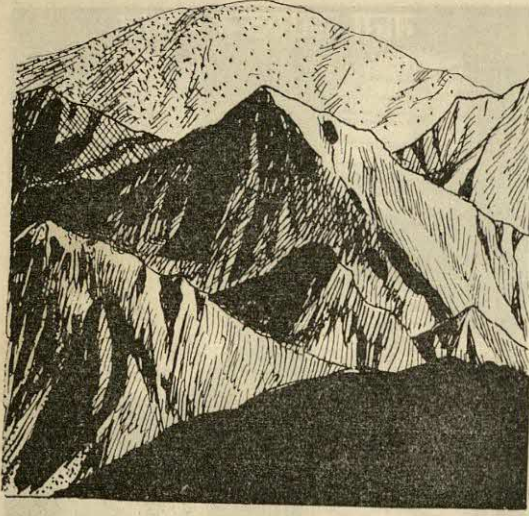
পাললিক পাথরও ভেঙ্গেচুরে, বেঁকে, ঠেলে ওঠে পাহাড় হয়ে।

দেখতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সত্যি তা নয়। পৃথিবীর ভিতরটা বরাবরই রয়েছে খুব অশান্ত অবস্থায়। ক্রমাগত ঠেলাঠেলি, গুঁতো-গুঁতি, ধাক্কাধাক্কি সেখানে লেগেই রয়েছে। ফলে এই সব পাললিক পাথরগুলোও ঠিক যেমন ভাবে স্তরে স্তরে তৈরী হয়েছে সে ভাবে আর থাকতে পারে না,—ভেঙ্গে-চুরে, বেঁকে, ঠেলাঠেলি করে যখন-তখন ওপরে উঠে আসে। কখনও বা ভাঁজ হয়ে যায়,—কতক পাহাড়ের মত খাড়া হয়ে ওঠে, কতক বা আরও নেমে যায়। শুনলে আশ্চর্য লাগবে,—অমন যে বিরাট হিমালয় পাহাড়, সেও নাকি ঠিক এই ভাবে পাললিক শিলা দিয়ে গড়ে উঠে ঠেলা খেয়ে ঐ অত উঁচু হয়ে উঠেছে! হিমালয় পাহাড় কি করে তৈরী হ'ল সে গল্প তোমাদের পরে শোনাব। তবে এখানে এটুকু বলা যেতে পারে যে এই পাললিক পথরের মধ্যেই আমরা নানারকম ফসিল অর্থাৎ গাছপালা বা জীবজন্তুর পাথুরে দেহাবশেষ খুঁজে পেতে পারি। আগ্নেয় শিলা যে রকম গরম অবস্থা থেকে তৈরী হয় তাতে তার মধ্যে কোনও ফসিল সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়; গরমে সবই তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে! এখন, কোন পাথরের মধ্যে যদি শামুক, ঝিনুক বা ঐ রকম সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ বা তার চিহ্ন পাওয়া যায় তা হলে আমরা স্বভাবতঃই ধরে নেব যে ঐ পাথর সমুদ্রের পলি থেকেই তৈরী হয়েছে। হিমালয়ের অনেক উঁচু চূড়ার পাথরেও ঠিক ঐ রকম ফসিল পাওয়া গেছে।

আর এক রকমের পাথর : রূপান্তরিত শিলা

আরও এক ধরণের পাথর আছে—বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন রূপান্তরিত শিলা বা মেটামরফিক্ রক্। এই পাথর তৈরী হয় প্রচণ্ড তাপ আর চাপের ফলে। আগেই বলেছি, পৃথিবীর ভিতরটায় যখন-তখন নানা ভাবে নানা রকম গুঁতোগুঁতি, ঠেলাঠেলি চলে। তারই ফলে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড চাপের—
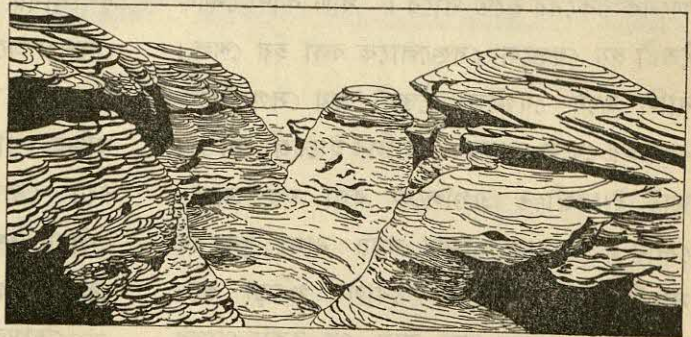
রূপান্তরিত শিলা : শেল থেকে স্লেট

যা অনেক সময়ে পাথরগুলোকে ঠেসে ধরে। সেই সঙ্গে যদি প্রচণ্ড তাপও যোগ দেয়,—যেমন জ্বলন্ত লাভা-স্রোত বেরোবার সময়ে দেখা যায়, তা হ'লে কোন কোন পাথরের চেহারা একেবারে বদলে গিয়ে তা নতুন ভাবে গড়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ সাধুভাষায় সে পাথর অন্য পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই ভাবেই চূণাপাথর বদলে গিয়ে হয় মার্বল পাথর, গ্র্যানাইট্ বদলে গিয়ে হয় নাইস্ পাথর। বাংলায় এই মার্বল পাথরকেই আমরা বলি শ্বেতপাথর। তোমরা জব্বলপুরে গেলে নর্মদার ওপর এই মার্বল বা শ্বেত পাথরের পাহাড় দেখতে পাবে—অবশ্য তাকে চিনে নিতে হবে। লিখবার জন্য তোমরা যে স্লেট পাথর ব্যবহার কর (নকল স্লেটের কথা বলছি না—আসল স্লেট) সেগুলোও এই রকম রূপান্তরিত শিলা ছাড়া কিছু নয়। শেল্ রূপান্তরিত হয়েই হয় স্লেট।

পাথর কি দিয়ে তৈরী

এবারে এস, পাথরগুলি নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করা যাক, কিংবা কোনটার টুকরো ঘষে ঘষে স্বচ্ছ করে নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেলে দেখা যাক্ কি পাওয়া যায়। সাধারণ অণুবীক্ষণে নয় কিন্তু—ভূতাত্ত্বিকদের জন্য তৈরী বিশেষ ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে।

পরীক্ষা করে দেখলে দেখা যাবে বেশীর ভাগ পাথরই তৈরী হয়েছে কতকগুলি খনিজ দিয়ে—ইংরেজীতে এদেরকে বলা হয় মিনারেল। এর মধ্যে আবার ৮।৯টি খনিজই প্রধান। বেশীর ভাগ পাথরই তৈরী হয়েছে ঐ বিশেষ ক'টি খনিজ দিয়ে। এদের মধ্যে আছে কোয়ার্ট্জ্ (স্ফটিক), মাইকা (অভ্র), ফেল্‌ড্‌স্পার, ক্যালসাইট ইত্যাদি।

খনিজ বা মিনারেল কিন্তু আরও বহু রকমের হতে পারে—শত শত, এমন কি হাজার হাজার! কিন্তু বেশীর ভাগ পাথরেই সেগুলো থাকে না। বিশেষ বিশেষ খনিজ বিশেষ বিশেষ জায়গায় পাওয়া যায় আর, বলতে কি, আমাদের যত রাসায়নিক সম্পদ্, তা সে ধাতুই বল আর অধাতু-মেশানো অন্য মশলাই বল, সবই প্রায় আমরা এই সব খনিজ থেকে সংগ্রহ করি। এই খনিজ পদার্থগুলো কিন্তু সবই তৈরী হয়েছে কতকগুলি মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে। অর্থাৎ এগুলিকে আমরা প্রাকৃতিক রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ বলতে পারি। ইংরেজী করে বললে বলতে হবে ন্যাচারাল্ কেমিক্যাল্ কম্পাউণ্ড্‌স্। যেমন, কোয়ার্ট্জ্ তৈরী হয়েছে প্রধানতঃ সিলিকন্ আর অক্সিজেন দিয়ে; ফেল্‌ড্‌স্পার তৈরী হয়েছে অক্সিজেন, সিলিকন্, অ্যালুমিনিয়াম্, সোডিয়াম্, পটাসিয়াম্ কিংবা ক্যালসিয়াম্ মিশিয়ে। চূণাপাথর এবং মার্বল পাথরেরও প্রধান উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম, কার্বন আর অক্সিজেন। অভ্র বা মাইকা একটা মজার খনিজ। জিনিসটা দেখতে ঠিক কাচের মত স্বচ্ছ—খুব পাতলা পাতের পর পাত স্তরে স্তরে বসিয়ে তৈরী। আবার মজা, তুমি যদি অভ্রকে ফুটো করতে চেষ্টা কর—এমন কি বন্দুকের গুলি ছুঁড়েও চেষ্টা কর, তা হলেও তা পারবে না। শুধু সেটা ফেটে একটা একটা করে পাত আলাদা হয়ে আসবে।

এই অভ্রও প্রধানতঃ সিলিকন্ আর অক্সিজেন দিয়ে তৈরী। এমনি ধারা অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌কেও এক রকম মজার পাথর বা মিনারেল বলা যায়। এগুলি রেশমী সূতোর মত আঁশ দিয়ে তৈরী। ঐ আঁশগুলিই পাথর —এবং এই আঁশ একটি একটি করে সূতোর মত ছাড়িয়ে নিয়ে তা দিয়ে দিব্যি কাপড়ের মত বোনা যায়। শুধু বোনা নয়, তা দিয়ে পোষাকও তৈরী করা যেতে পারে। এই অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ও প্রধানতঃ সিলিকন্ আর অক্সিজেন দিয়ে তৈরী বলে আগুনে পোড়ে না। অ্যাস্‌বেস্‌টসের পোষাক এঁটে আগুনের মধ্যেও লোকে দিব্যি নির্ভয়ে ঢুকে যেতে পারে এবং অক্ষত দেহেই বেরিয়ে আসতে পারে।

আরও নানারকম খনিজ বা মিনারেল

সাধারণ পাথরের মধ্যে পাওয়া যায় না এ রকম খনিজ বা মিনারেলও পৃথিবীতে আছে অসংখ্য তা আগেই বলেছি। এর কোন কোনটা আবার প্রায় খাঁটি মৌলিক পদার্থের রূপ নিয়েও থাকতে পারে। যেমন সোনা, রূপো, তামা, গন্ধক (সালফার), অঙ্গার (কার্বন), এমন কি কখনও কখনও লোহাও। তবে বেশীর ভাগই থাকে যৌগিক অবস্থায়। যে সব যৌগিক খনিজ থেকে আসল মৌলিক পদার্থগুলো বেশী পরিমাণে বার করে নিয়ে আমরা নানা কাজে লাগাতে পারি সেগুলিকে আমরা বলি আকর। ইংরেজীতে একেই বলে "ওর্"। যেমন লোহার প্রধান আকর বা ওর্ হচ্ছে হিমেটাইট—লোহা আর অক্সিজেন মিশিয়ে তৈরী। বাংলায় এগুলোকে লোহাপাথরও বলে। এ ছাড়া ম্যাগনেটাইট, লিমোনাইট, সাইডেরাইট ইত্যাদি থেকেও লোহা পাওয়া যায়। তামার আকর হচ্ছে কিউপ্রাইট (তামা আর অক্সিজেন মিশিয়ে তৈরী), কপার পায়রাইট (তামা, গন্ধক আর লোহা মিশিয়ে তৈরী), ম্যালকাইট (তামা, কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরী)। তেমনি ধারা সীসের আকর বলতে গ্যালেনা, অ্যালুমিনিয়ামের আকর বলতে বক্সাইট, টিনের আকর বলতে ক্যাসিটেরাইট, দস্তার (জিঙ্ক) আকর বলতে জিঙ্ক ব্লেণ্ড, সোডিয়াম এবং ক্লোরিনের আকর বলতে লবণ (পাথুরে বা সামুদ্রিক), ফস্‌ফরাসের আকর বলতে অ্যাপেটাইট—এই রকম হাজারো জিনিসের হাজারো আকর রয়েছে। নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এগুলো থেকে ঐ সব জিনিস বার করে নেওয়া হয়।

কয়েকটি খনিজ বা মিনারেলের নমুনা

মণিরত্ন

আমরা কথায় বলি সাত রাজার ধন মাণিক। মাণিক অর্থাৎ মণি-মাণিক্য বা মণিরত্ন বলতে

মণিরত্ন আসলে মিনারেল ছাড়া আর কিছু নয়

আমরা খুবই মূল্যবান্ পদার্থ বুঝি। আসলে কিন্তু এগুলি সবই হচ্ছে নানা জাতের পাথর বা খনিজ—এক মুক্তো ছাড়া। তবে এ সব পাথর বা খনিজ ক্বচিৎ কখনও খুঁজে পাওয়া যায় আর তৈরীও হয় খুব কম, তাই ওদের এত আদর—এত দাম। পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি মণির কথা শুনলেই আমাদের অনেকের চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে, দেখলে তো কথাই নেই! পদ্মরাগকে চলতি কথায় বলে চুণী, ইংরেজীতে বলে রুবি। ঐ রকম মরকতকে বলা হয় পান্না—ইংরেজীতে এমারেল্ড। আসলে কিন্তু এ সবই পাথর বা খনিজ, যাকে আমরা মিনারেল বলে বলেছি। যেমন ধর চুণীর মধ্যে আছে অ্যালুমিনিয়াম্ আর অক্সিজেন। এ রকম দামী পাথর আরও আছে। যেমন স্যাফায়ার বা নীলা, সান্‌স্টোন্ বা সূর্যকান্ত মণি, মুন্‌স্টোন্ বা চন্দ্রকান্ত মণি, অ্যাগেট্, অ্যামেথিষ্ট, গার্নেট, জেড, টোপাজ, ল্যাপিস্ ল্যাজুলি ইত্যাদি। এমন কি কোয়ার্ট্‌জ্‌ও তেমন স্বচ্ছ হলে খুব দামী পাথর হতে পারে। সময় সময় কোয়ার্ট্‌জ্ তৈরী হবার সময়ে কোন গতিকে ওর মধ্যে হয়তো এক ফোঁটা জল ঢুকে গেল। সে জল আর কখনও বেরোতে পারে না, কোয়ার্ট্‌জের কধ্যেই এককণা মুক্তোর মত জমে থাকে আর দেখতে হয় অপরূপ। এ রকম কোয়ার্ট্‌জ্-এর দামও খুব বেশী হয়।

মণিমাণিক্যের মধ্যে সবচেয়ে দামী বোধ হয় হীরে। হীরেকে পাথর না বলে মিনারেল বা খনিজ বলাই ঠিক। আর মজা, হীরে কিন্তু একটি মাত্র খাঁটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরী! সেটি হচ্ছে অঙ্গার বা কয়লা, যার বৈজ্ঞানিক নাম কার্বন। মাটির নীচেকার প্রচণ্ড উত্তাপে আর চাপে কোন কোন কয়লা দানা বেঁধে ঐ রকম ঝক্‌ঝকে হীরেয় পরিণত হয়। নইলে, রাসায়নিকের কাছে কিন্তু কয়লা আর হীরের উপাদান একই। শুধু হীরেটা আরও খাঁটি দানাদার অঙ্গার—এই যা!

এই সব মূল্যবান্ খনিজ বা পাথর পৃথিবীতে খুব কম তৈরী হয় আর খুঁজে পাওয়া যায় আরও কম—তা আগেই বলেছি। তবু দেখা গেছে, এর কোন কোনটা এক একটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় একটু বেশী পাওয়া যায়। যেমন হীরে সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় আফ্রিকায়।

ভারতবর্ষের গোলকুণ্ডা অঞ্চলেরও হীরের জন্য খ্যাতি ছিল। এ ছাড়া দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকারও কোন কোন জায়গায় অনেক হীরে পাওয়া গেছে। পান্না সাধারণতঃ বেশী পাওয়া যায় দক্ষিণ অমেরিকায়, ইকুয়েডর, পেরু, কলোম্বিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে। চুণী বেশী পাওয়া যায় ব্রহ্মদেশে। আজকাল অবশ্য বিজ্ঞানীরা ল্যাবরেটরীতে কৃত্রিম উপায়েও এই সব মণিরত্ন তৈরী করতে সুরু করেছেন, তবে আসলগুলোর তুলনায় কৃত্রিম উপায়ে তৈরী রত্নের দাম স্বভাবতঃই অনেক কম। কৃত্রিম উপায়ে হীরে তৈরী করতেও বিজ্ঞানীরা ছাড়েন নি, কিন্তু সে হীরা আকারে এত ছোট হয়েছে আর তা করতে খরচ এত বেশী পড়েছে যে শেষ পর্যন্ত তা মজুরিতে পোষায় নি।

কয়লার কথা

খনিজের মধ্যে অনেকে কয়লাকে একটি প্রধান স্থান দেন। খনি থেকে খুঁড়ে বার করা হয়, সুতরাং সেই দিক্ দিয়ে কয়লাকে খনিজ বলতে আপত্তির কোন কারণ নেই। তবে ঠিক মিনারেল বলতে আমরা যা বুঝি কয়লাকে ঠিক সে দলে ফেলা হয় না। কয়লার প্রধান উপাদান অবশ্য অঙ্গার বা কার্বন, কিন্তু ওর সবটাই কার্বন নয়, সঙ্গে অন্য জিনিসও অল্প পরিমাণে থাকে। খনি থেকে কাঁচা কয়লা তুলে যখন আমরা তা কোক্ ওভেনে পুড়িয়ে কোক্ কয়লা তৈরী করি কিংবা গ্যাস ওয়ার্ক্স্-এ পুড়িয়ে কোল গ্যাস তৈরী করি তখনই ঐ সব আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি গ্যাসের আকারে বেরিয়ে আসে। এদের মধ্যে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, গন্ধক, ইত্যাদি অনেক কিছু থাকে। প্রথম দু'টির রাসায়নিক সংযোগে তৈরী হয় অ্যামোনিয়া। গন্ধকও (হাইড্রোজেন সালফাইড বা সালফার ডাইঅক্সাইড থেকে) বার করে নেওয়া হয়। এ ছাড়া পাওয়া যায় রাশি রাশি আলকাৎরা—যাকে নাকি নানা রকম মূল্যবান্ রাসায়নিক সামগ্রীর ডিপো বলা যেতে পারে। প্রধানতঃ কার্বন আর হাইড্রোজেনের নানা রকম জটিল মিশ্রণে এগুলো তৈরী হয়।

কয়লা কিন্তু নানা জাতের হয়। পিট্ কয়লার মধ্যে কার্বনের ভাগ সবচেয়ে কম—শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ। দেখতেও এগুলো কালো নয়, বাদামী। লিগ্‌নাইট কয়লায় কার্বন আর একটু বেশী (শতকরা ৬৭ ভাগ) থাকলেও এগুলোও পূরোপূরি কালো নয়—বাদামী আর ছাই-ছাই রংএর মাঝামাঝি। এর চেয়ে ভালো কয়লা হচ্ছে বিটুমিনাস্ কয়লা—যার মধ্যে কার্বন আছে শতকরা ৮৮ ভাগ। এই কয়লাই সাধারণ কালো কয়লা যা আমরা সচরাচর দেখতে পাই। অবশ্য এই কয়লা কাঁচা অবস্থায় সাধারণ গৃহস্থালীতে ব্যবহার করা হয় না—ওকে পোড়ালে নানা রকম গ্যাস বেরিয়ে আসে বলে বড্ড ধোঁয়া হয় কিনা! এই কাঁচা কয়লা পুড়িয়ে যে কোক্ কয়লা পাওয়া যায় তাই আমাদের বাড়ীর উনুনে ব্যবহার করা হয়। তবে রেলের এঞ্জিন বা কোন কোন কারখানায় কাঁচা বিটুমিনাস্ কয়লাও ব্যবহৃত হয়। ওর দামও কম, তা ছাড়া ধোঁয়া নিয়ে কারও বড় একটা মাথাব্যথাও নেই সেখানে।

কিন্তু এর চেয়েও ভাল কয়লা আছে, তার নাম অ্যান্‌থ্রেসাইট কয়লা। এর শতকরা

প্রায় ৯৫ ভাগই কার্বন। যে সব শিল্পে খুব খাঁটি কয়লার দরকার সেখানেই এই অ্যানথ্রে-সাইট্ ব্যবহার করা হয়।

অল্প কয়েক রকম কয়লার নামই বললাম, কিন্তু কোন কয়লা-বিশেষজ্ঞ ভূতাত্ত্বিককে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ ছাড়াও বহু জাতের কয়লার নাম বলবেন। কোনটা ম্যাটমেটে, কোনটা অসম্ভব চক্চকে, কোনটা বলের মত গোল ইত্যাদি। কিন্তু ও-সব ফর্দ শুনে আমাদের আপাততঃ কোন লাভ নেই। তবে কয়লার আর দু'টি রূপের কথা এখানে বলা দরকার। অবশ্য দু'টোই পরিবর্তিত রূপ, দু'টোকেই দানাদার কয়লা বলতে পার, কিন্তু সাধারণ কয়লার সঙ্গে তাদের প্রভেদ আকাশ-পাতাল। এদের একটি হচ্ছে হীরে—একেবারে খাঁটি কার্বন—তার কথা তোমাদের আগেই বলেছি। আর একটিকে বলা হয় গ্র্যাফাইট। এটিকেও প্রায় খাঁটি কার্বন বলতে পার—অ্যানথ্রেসাইটের অনেক পরের ধাপ। অনেকটা সীসের মত চক্চকে ঝক্ঝকে এই দানাদার কার্বন তোমরা অনেকেই হয়তো দেখেছ। হাতে নিলে পিচ্ছিল মনে হবে। নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরীর জন্য এই গ্র্যাফাইটের ভারী চাহিদা। তাই আজকাল কৃত্রিম উপায়েও কয়লা থেকে এই গ্র্যাফাইট তৈরী করে নেওয়া হয়।

এত কয়লা কোথা থেকে আসে

মাটির তলায় পাওয়া যায় কয়লা, কিন্তু সে কয়লা ওখানে এল কোত্থেকে? এসেছে গাছ থেকে। কয়লাকে গাছেরই রূপান্তরিত মূর্তি বলতে কোন বাধা নেই। আজ থেকে প্রায় ২৫।৩০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুকে যে বড় বড় গাছের বন ছিল সেগুলিই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শেষ পর্যন্ত কয়লায় এসে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীতে তখন স্যাঁৎসেঁতে জলা জায়গা ছিল প্রচুর। ঐ সব গাছ মরে গেলে প্রায়ই ঐ সব স্যাঁৎসেঁতে জলা জায়গায় ভেঙ্গে পড়ত। কতক হয়তো যেত জলার মধ্যে তলিয়ে। প্রথমটায়, মাটির মধ্যে যে অজস্র জীবাণু বাস করে (তখনও করত) তারা ঐ সব গাছগুলিকে দিত পচিয়ে। তার পর সেগুলি পড়ত পলি চাপা। আর সেই সঙ্গে পৃথিবীর ভিতরকার উত্তাপ তো আছেই। ২৫।৩০ কোটি বছর তো সোজা সময় নয়! এই দীর্ঘকাল ঐ অবস্থায় কাটালে স্বভাবতঃই গাছের সমস্ত অংশ নষ্ট হয়ে যাবার কথা, কিন্তু পলির তলায় পড়ার দরুণই হয়তো তার অঙ্গার বা কার্বন অংশটুকু শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল—তবে তা ইতিমধ্যে আরও ঘন হয়ে গেছে। এই ঘনীভূত কার্বনই শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াল কয়লা। কয়লা সাধারণতঃ শেল্ পাথর বা বেলে পাথরের মধ্যেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর নানা জায়গায় এই রকম বড় বড় বন থেকে কয়লার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশেও রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এক বিস্তৃত জায়গা যুড়ে কয়লার খনি দেখতে পাওয়া যায়। ভূতাত্ত্বিকরা বলেন, প্রাগৈতি-হাসিক যুগে ঐ অঞ্চলে ছিল এক বিরাট অরণ্যানি। তাঁরা ওর নাম দিয়েছেন 'গণ্ডোয়ানা ফরেস্ট'। মানুষ তখনও পৃথিবীতে আসে নি, সেটা ছিল সরীসৃপ যুগ। অর্থাৎ ডাইনোসর ও অন্যান্য নানা জাতের ছোট-বড় সরীসৃপ ঐ সব বনে
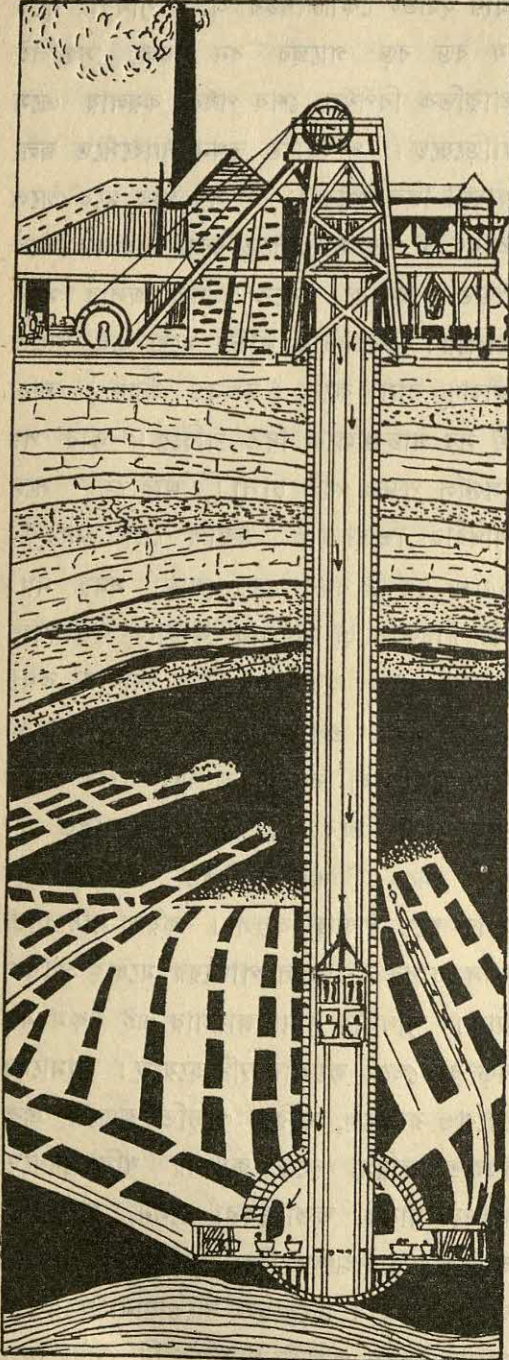
গভীর খনির ভিতর থেকে শ্যাফ্‌ট্‌-এ করে। কয়লা তোলা হচ্ছে

বাস করত। সেই গণ্ডোয়ানা জঙ্গলই কাল-ক্রমে মরে, পচে, মাটির তলায় চাপা পড়ে ঐ জায়গায় এখন এক বিরাট কয়লা-খনি অঞ্চলের সৃষ্টি করেছে।

এই সব কয়লার জায়গা তোমরা অনেকেই হয়তো দেখেছ। কেউ কেউ কয়লার খনির মধ্যে হয়তো নেমেও থাকবে। কোন কোন জায়গায় অল্প মাটির নীচেই এই কয়লার চাঁই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কয়লা বার করতে হ'লে মাটির নীচে শত শত ফুট নেমে যেতে হয়। এমন কি ছু' মাইল গভীর কয়লার খনিও দেখা গেছে। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে বলে দিতে পারেন কোথায় কতটা নীচে কতখানি আন্দাজ কয়লা সঞ্চিত আছে। তার পর গভীর গর্ত খুঁড়ে, মাটির নীচে সুড়ঙ্গ কেটে সেই কয়লা ভেঙ্গে ভেঙ্গে তোলা হয়। মাটি এবং কয়লার চাঁই ফাটাবার জন্য ডিনামাইট জাতীয় বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়।

মাটির নীচে কাটা এই কয়লা-খনিকে অনায়াসেই পাতালপুরী বলা যেতে পারে। সেই পাতালপুরীর অন্ধকার রাজ্যে শত শত মজুর দিনরাত পালা করে আমাদের জন্য কয়লা ভাঙ্গছে। কোথাও বা গাঁইতি, কোদাল দিয়েই কাজ চলছে, আবার কোথাও বা বৈদ্যুতিক বা অনুরূপ অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে কয়লা কাটবার জন্য। সে এক অদ্ভুত রাজ্য বলতে পার। ভিতরে হয়তো বিজলী-বাতি জ্বলছে—তবে সর্বত্র নয়। ওপর থেকে চাপ দিয়ে হাওয়াও ছাড়া হচ্ছে। তবু গরমে, ঘামে হাঁপিয়ে উঠতে হয়। তারই

খনির মধ্যে কয়লা কাটার যন্ত্র

খাদ) রেল লাইনের মত লাইন পাতা আছে। গাড়ী সেই লাইনের ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসছে খনির প্রধান গর্তের সামনে। তার পর শ্যাফ্‌ট্‌ বা লিফ্‌টে করে তা ওপরে তোলা হচ্ছে। দিন নেই, রাত নেই—সমানে চলছে এই কাজ। মাঝে মাঝে খনির নীচে কয়লা বা পাথরের ধ্বস নেমে দুর্ঘটনাও যে ঘটে না এমন নয়। খনির ভিতর জমে-থাকা বিষাক্ত গ্যাসও অনেক সময় নানা দুর্বিপাক ঘটাতে পারে। তবে আগেকার দিনের তুলনায় এ সব দুর্ঘটনা এখন অনেক কম শোনা যায়।

মধ্যে মজুরেরা কয়লার বড় বড় চাঁই ভেঙ্গে ছোট ছোট গাড়ীতে ভরে দিচ্ছে। সেই সুড়ঙ্গের মধ্যেই (চলতি কথায় ওকে বলা হয়
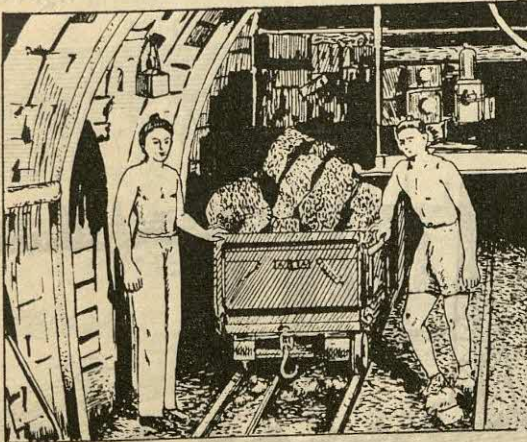
মজুরেরা কয়লার চাঁই ভেঙ্গে ছোট ছোট গাড়ীতে ভরে দিচ্ছে।

পেট্রোলিয়াম্—যার এক নাম তরল সোনা

মাটির নীচের আর একটি খনিজ সম্পদ্ হচ্ছে পেট্রোলিয়াম্। পেট্রোলিয়াম্‌কে বলা হয় তরল সোনা। আসলে কিন্তু সোনার সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই। জিনিসটা প্রায় সোনার মতই দামী আর দেখতে তরল, তাই এই নাম।

পেট্রোলিয়ামের জন্মকাহিনীও, বিজ্ঞানীদের মতে, অনেকটা কয়লারই মত। প্রধানতঃ প্রাগৈতিহাসিক যুগের মরা গাছপালা আর নানা রকম প্রাণীর (বেশীর ভাগই সামুদ্রিক) শরীর পচে গিয়ে সমুদ্রের বা কোনও হ্রদের তলায় জমতে থাকে। তার পর জীবাণুর আরও

আক্রমণে আর পলির চাপে এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর ভিতরকার প্রচণ্ড উত্তাপে তার মধ্যে
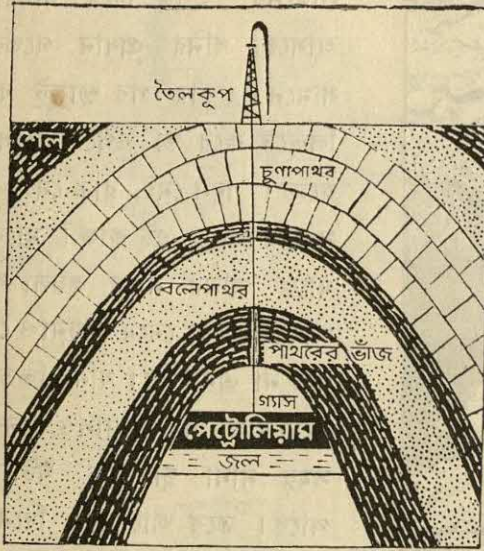
মাটির তলায় বিভিন্ন পাথরের স্তরে আটকা পড়ে আছে চট্‌চটে পেট্রোলিয়াম্ আর ন্যাচারাল গ্যাস।

সুরু হয় নানা রকম রাসায়নিক পরিবর্তন। একদিন ধরে নয়—এখানেও কোটি কোটি বছর ধরে চলে এই প্রক্রিয়া। ফলে সেই সব দেহাবশেষেরও হয়ে যায় আমূল পরিবর্তন। এক সময় যে তারা গাছ বা প্রাণী ছিল নতুন চেহারা দেখে তা আর কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কারণ জিনিসটা এতদিনে তেল আর কাদার মত চটচটে নরম হয়ে গেছে, কতক হয়ে গেছে গ্যাস—নানা রকম হাইড্রোকার্বন জাতীয় গ্যাস। এগুলোর ওপরেও কিন্তু ততদিনে অনেক পাথর আর পলির স্তর পড়ে গেছে, ফলে সেগুলোর আর ঠেলে বেরিয়ে আসার উপায় নেই। পাথরের মধ্যেই কোন একটা স্তরে ঐ চট্‌চটে তেল-কাদা আর গ্যাস আট্‌কা পড়ে গেছে। ঐ চট্‌চটে জিনিসটাই হচ্ছে পেট্রোলিয়াম্ আর সঙ্গের ঐ গ্যাসটার নাম দেওয়া হয়েছে ন্যাচারাল গ্যাস অর্থাৎ স্বাভাবিক গ্যাস।

একদল পণ্ডিত অবশ্য পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও একটা মত খাড়া করেছিলেন। তাঁদের ধারণা, মাটির নীচে ধাতব কার্বাইডের ওপর গরম বাষ্পের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেও পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নয়। তবে আধুনিক
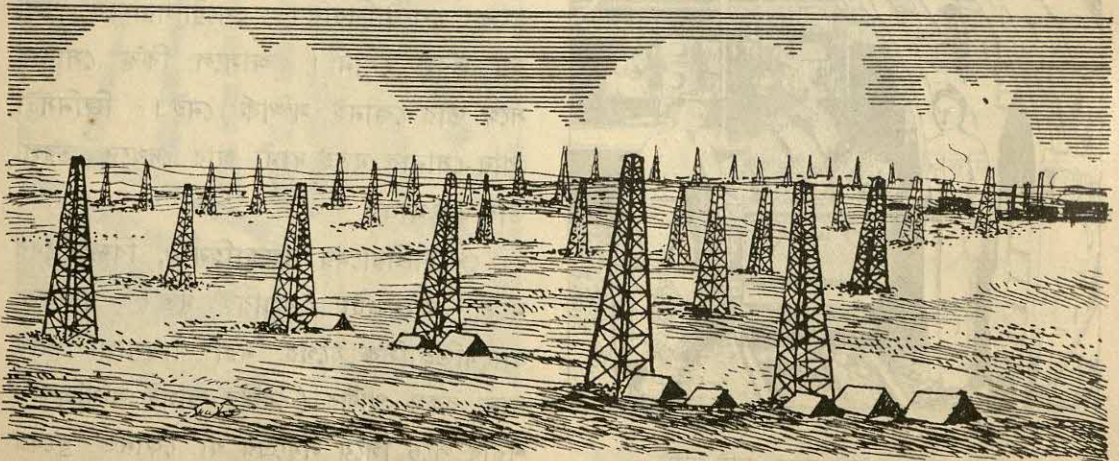
পেট্রোলিয়াম্ খনি অঞ্চলের সাধারণ দৃশ্য

বিজ্ঞানীদের বেশীর ভাগই এ মতবাদ মেনে নিতে নারাজ।

পেট্রোলিয়াম্ নামটা এসেছে পেট্রো অর্থাৎ পাথর থেকে। পেট্রোলজি মানে প্রস্তরতত্ত্ব, অর্থাৎ পাথরের বিজ্ঞান। সাধারণতঃ পাথরের স্তরে জিনিসটা পাওয়া যায় বলেই হয়তো এই নাম। তবে অনেক জায়গায় সমুদ্রের নীচেও পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া গেছে। তবে সেও তো পাথরেরই স্তরের ফাঁকে ফাঁকে। হিন্দীতে ওকে বলে 'মাট্টিকা তেল'। তা নামটা কতকটা ঠিকই দেওয়া হয়েছে বলা চলে।

যতদূর জানা গেছে আমেরিকাতেই প্রথম এই তেলের আবিষ্কার হয়েছিল। সেখানকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানরা নাকি এই তেল গায়ে মাখত শরীর সুস্থ রাখবার জন্য। তাদের দেখাদেখি সাদা চামড়ার লোকেরাও তাই সুরু করে এবং কালক্রমে বিজ্ঞানীরা ওর মধ্যে এত হরেক রকম মূল্যবান্ রাসায়নিক সম্পদ্ আবিষ্কার করেন যে ওর নাম "তরল সোনা" দিতেও তাঁদের বাধে নি।

এই আবিষ্কারের কাহিনীটিও বেশ মজার।

আমরা যে নুন ব্যবহার করি তা সাধারণতঃ সমুদ্রের জল থেকে সংগ্রহ করা হয়। সমুদ্রের জল ছাড়া নুনের পাহাড় বা নুনের খনি থেকেও নুন পাওয়া যেতে পারে। নুনের খনি থেকে নুন তুলতে হলে সেখানে বড় বড় গর্ত করে সেই গর্তে জল ঢেলে দেওয়া হয়। জলে নুন গুলে যায়, তখন পাম্প করে সেই নুন-গোলা জল তুলে নেওয়া হয়।

এখন, আমেরিকার ভার্জিনিয়া অঞ্চলে ছিল
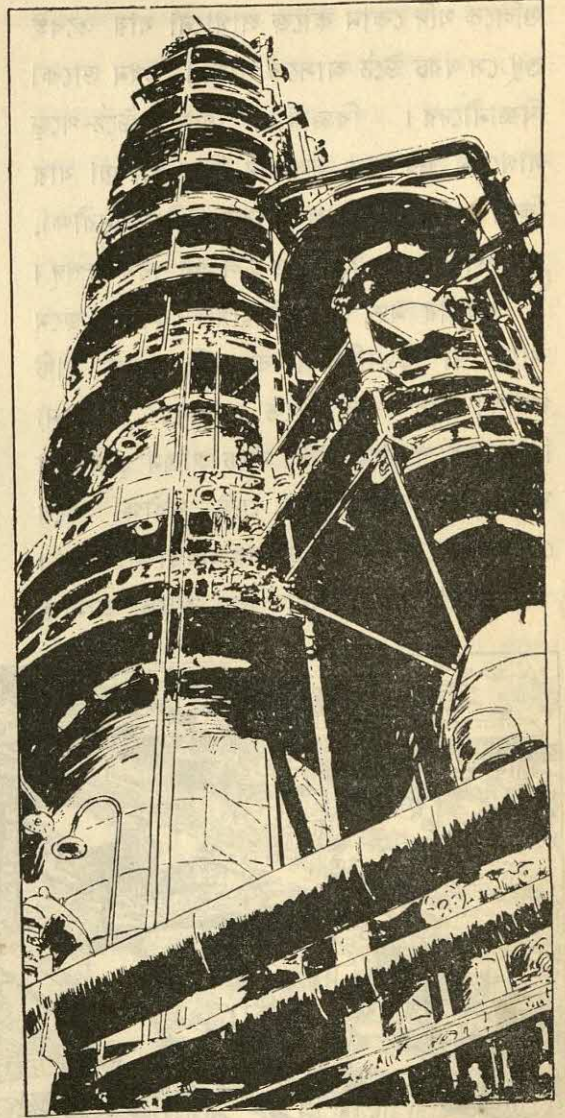
পেট্রোলিয়াম্ কারখানার একটি অংশ : এই কারখানায় পেট্রোলিয়াম্ ভেঙ্গে হরেক রকম জিনিস তৈরী হয়।

এই রকম কতকগুলি নুনের খনি। একবার সেখান থেকে নুন তুলতে গিয়ে দেখা গেল সেই নোনা জলের সঙ্গে মিশে রয়েছে প্রচুর চট্চটে পাথুরে তেল—পেট্রোলিয়াম্। এখন কি করা যায়? প্রচুর খরচ করা হয়েছে ; এই তেল-

গুলিকে যদি কোন কাজে লাগানো যায় তবেই শুধু সে খরচ উঠে আসতে পারে। তখন ডাকো বিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞানীরা এসে উঠে-পড়ে লাগলেন ওর মধ্যে মূল্যবান্ কিছু পাওয়া যায় কিনা বার করতে। চলল দারুণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আর তারই ফলে আবিষ্কৃত হ'ল ওর পরম সম্পদ্।

কয়লার মত, পেট্রোলিয়াম্ও কোথায় জমে আছে তা ভূতাত্ত্বিকরা যন্ত্রপাতি দিয়ে মাটি পরীক্ষা করে বলে দিতে পারেন। এ জন্য বিস্ফোরক ফাটিয়ে মাটির নীচে কৃত্রিম ভূমিকম্প ঘটিয়ে সেই ভূমিকম্পের ঢেউ পরীক্ষা করে পেট্রোলিয়ামের অস্তিত্ব জানার ব্যবস্থাও হয়েছে।

কোথায় পেট্রোলিয়াম্ জমা আছে জানতে পারলে সেখানে শক্ত ধারাল যন্ত্র দিয়ে কূয়োর মত গভীর গর্ত কেটে তা তোলা হয়। এজন্য ঐ গর্তগুলোকে বলে তৈলকূপ বা পেট্রোলিয়াম্ ওয়েল। প্রথম যখন তোলা হয় তখন জিনিসটা দেখতে মোটেই লোভনীয় নয়—কাদা কাদা, অনেকটা কালচে তেলের মত। সময় সময় সেই সঙ্গে প্রচুর ন্যাচারাল গ্যাসও বেরিয়ে আসে। এই গ্যাসও ফেলবার নয়, কিন্তু তেলটা আরও দামী। ঐ তেল কারখানায় নিয়ে গিয়ে ধাপে ধাপে তার বিভিন্ন অংশ ডিস্টিল্ করে পৃথক্ করা হয়। এক এক উত্তাপে এক এক রকম জিনিস বেরিয়ে আসে। প্রথমে বেরোয় কতকগুলি গ্যাস; তার পর
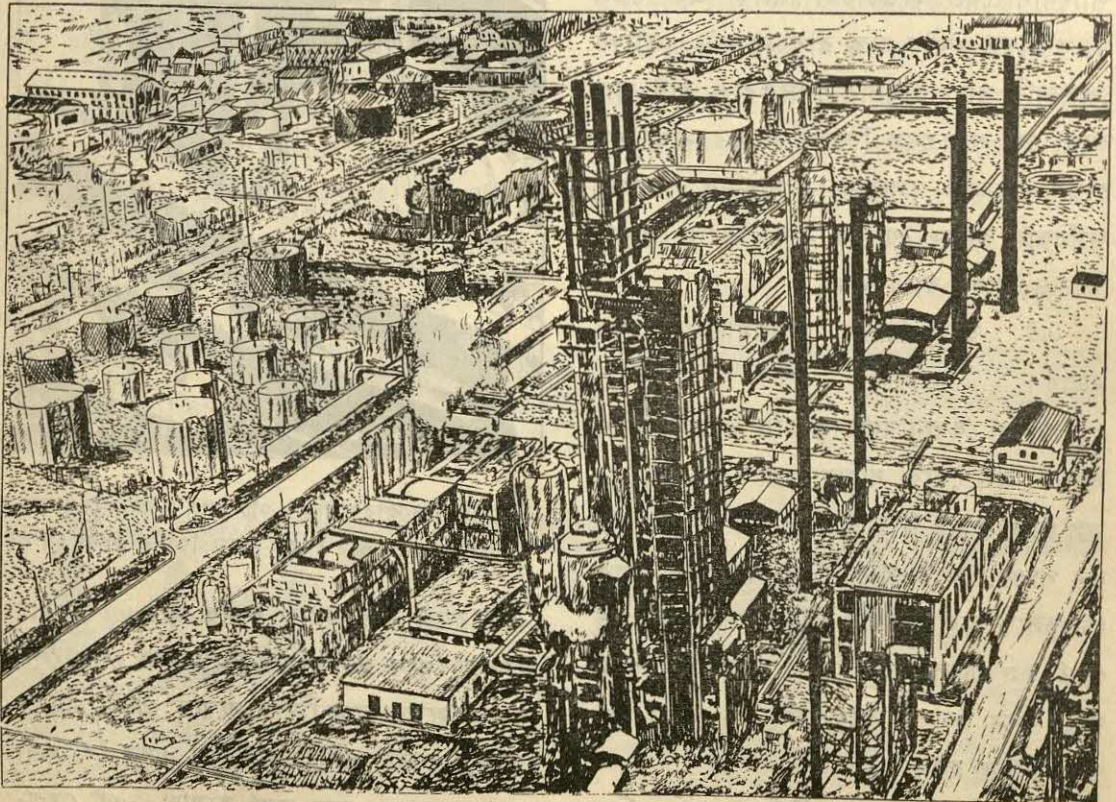
পেট্রোলিয়াম্ নগরী
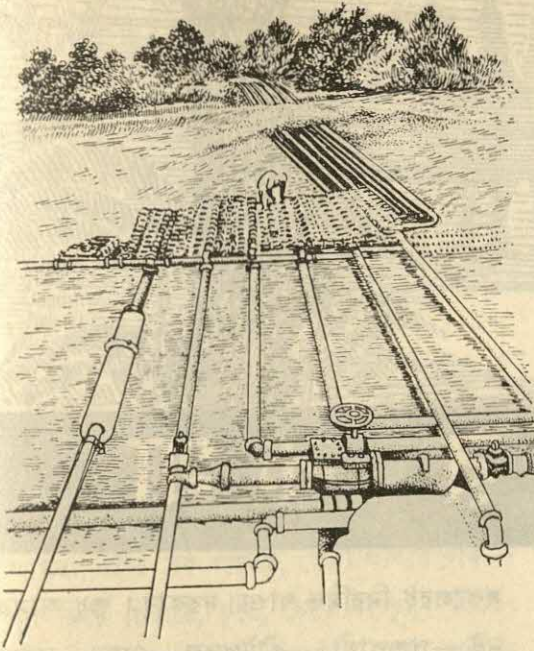
লম্বা লম্বা নলের ভিতর দিয়ে শত শত মাইল দূরে নিয়ে যাওয়া হয় পেট্রোলিয়াম্।

গ্যাসোলিন বা পেট্রোল ; তার পর কেরোসিন, ডিজেল অয়েল, লাইট অয়েল, লুব্রিকেটিং অয়েল ; তার পর গ্রীজ্, মোম, এবং শেষে পড়ে থাকে অ্যাসফল্ট। বলা বাহুল্য এর সব ক'টিই পৃথক্ করে শোধন করে নিতে পারলে তার দাম বড় কম নয়। কিন্তু তার জন্য দরকার বিরাট বিরাট কারখানার। তাই সাধারণতঃ পেট্রোলিয়াম্ খনির কাছাকাছি প্রায়ই গড়ে ওঠে ইস্পাত নগরীর মতই বিরাট এক একটা পেট্রোলিয়াম্ নগরী।

পেট্রোলিয়াম্ থেকে পেট্রোকেমিক্যাল্স্

আজকাল আবার শুধু এটুকু নিয়েই বিজ্ঞানীদের মন ওঠে না। তাঁরা ওগুলোকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ওগুলির সাহায্যে হরেক রকম রাসায়নিক মালমশলাও তৈরী করছেন। এগুলিকে বলা হয় 'পেট্রোকেমি-ক্যাল্স্'। এর মধ্যে আছে কালো রং—কার্বন ব্ল্যাক্,—যা ব্যবহার করা হয় ছাপার কালিতে, মোটরের টায়ারে, গ্রামোফোনের রেকর্ডে। এ ছাড়াও আছে নানা রকম রাসায়নিক কাঁচা মাল—যা দিয়ে তৈরী হচ্ছে নানা জাতের প্লাষ্টিক, নাইলন, পলিথিলিন, রং, বানিশ, আঠা, ওষুধবিষুধ, শ্যাম্পু ও নানা প্রসাধন-সামগ্রী।

পেট্রোলিয়াম্ যেখান থেকে পাওয়া যায় নানা কারণে সব সময়ে সেখানেই তাকে শোধন করা যায় না—কারখানা অনেক সময় অনেক দূরেও বসাতে হয়। এজন্য সাধারণতঃ মোটা মোটা নলের মধ্যে দিয়ে ঐ তেলকে নিয়ে যেতে হয়। শত শত মাইল লম্বা নল। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে সবশুদ্ধ প্রায় ২ লক্ষ মাইল এই রকম নল বসাতে হয়েছে। অন্যান্য অনেক দেশেও বেশ লম্বা লম্বা নল আছে। ক্যানাডা, ইরান, মিশর, ইরাক, রাশিয়া এবং ব্রহ্মদেশে প্রচুর পেট্রোলিয়াম্ পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও আসামে বেশ বড় পেট্রোলিয়াম্ খনি আছে। ভূতাত্ত্বিকরা এখন আবার নতুন করে সন্ধান করে বেড়াচ্ছেন ভারতের আর কোথাও এ সম্পদ্ আছে কিনা। কেউ কেউ সন্দেহ করছেন বাংলা দেশে সুন্দরবনের কাছে সমুদ্রের নীচে সম্ভবতঃ বেশ কিছু পেট্রোলিয়াম্ জমে আছে। যদি সত্যি তাই হয় তা হ'লে আমাদের দেশের সম্পদ্ অনেক বেড়ে যাবে সন্দেহ নেই।
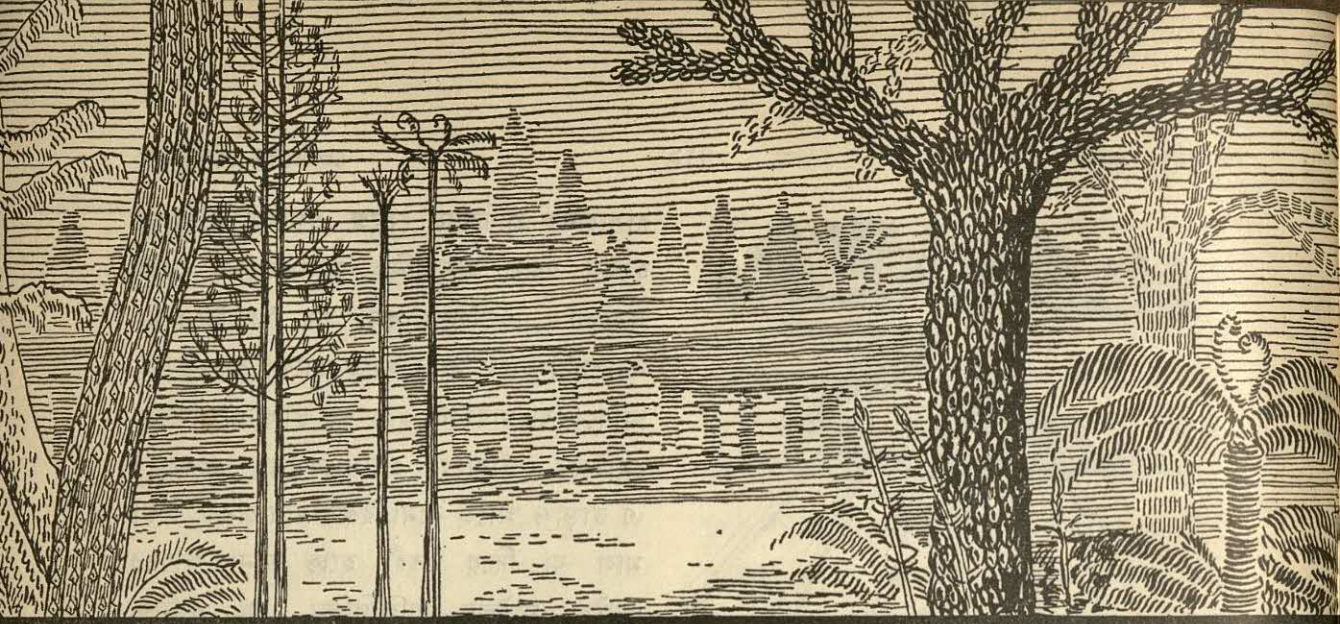
গাছপালার কথা

শিকড় কি করে

গাছের প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে শিকড় একটি। এই শিকড় কত বিচিত্র রকমের হ'তে পারে সে গল্প তোমরা আগেই শুনেছ (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮২—৮৮)। কিন্তু শিকড়ের কাজ কি?

একটি কাজের কথা তো আগেই বলেছি। গাছকে খাড়া করে রাখবার জন্য শিকড় খুঁটির কাজ করে। এজন্য তাকে অনেক সময় মাটির অনেক নীচে নেমে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে ডালপালা অর্থাৎ শাখা-শিকড় ছড়িয়ে সে গাছকে মাটির গায়ে আটকে রাখে, আর ওদিকে গাছের ওপরকার গুঁড়ি বা কাণ্ড তার ডালপালা সমেত তাকে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখে।

কিন্তু ওটাই শিকড়ের আসল কাজ নয়। শিকড়ের আসল কাজ হচ্ছে গাছের জন্য খাবার সংগ্রহ করা।

বেঁচে থাকবার জন্য, শরীরের পুষ্টির জন্য এবং সুস্থ ভাবে বেড়ে উঠবার জন্য আমাদের সকলেরই নিয়মিত খাওয়া দরকার। শুধু আমরা নই,—পশুপাখী, কীটপতঙ্গ—এদের কারো পক্ষেই না খেয়ে বাঁচা সম্ভব নয়। আমাদের খাবার আমরা পয়সা দিয়ে বাজার খুঁজে কিনে নিয়ে আসি। বিশেষ বিশেষ লোকেরা এই সব খাবার যোগাবার ভার নেয় আর তাই বিক্রী করে নিজেদের জীবনযাত্রার অন্যান্য চাহিদা মেটায়। তবু আজকাল কথায় কথায় নানান্ দেশে খাদ্যাভাবের কথা হামেশাই শোনা যাচ্ছে।
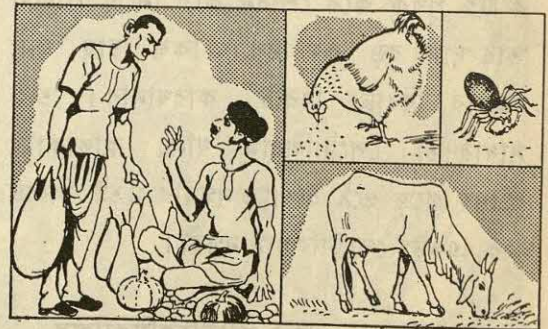
আমরা বাজার থেকে খাবার কিনে আনি; পশুপাখী, পোকামাকড়ের কিন্তু প্রায় সারাদিনই কাটে খাবারের খোঁজে।

আজ এটা নেই, কাল ওটা পাওয়া যাচ্ছে না! পশুপাখী, পোকামাকড়ের তো প্রায় সমস্ত সময়টাই কেটে যায় দৈনন্দিন খাদ্য সংগ্রহের তাড়ায়। কত খোঁজাখুঁজি, কত কলকৌশল, কত হাঙ্গামা করেই না তাদের খাবার সংগ্রহ করতে হয়!

শিকড় দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ

প্রাণীদের মত গাছেরাও তো জীব, কাজেই তাদেরকেও খেতে হয়। কিন্তু গাছেদের খাদ্য আর আমাদের খাদ্য ঠিক এক রকম নয়। আমরা, প্রায় সব প্রাণীই, তৈরী খাবার খাই—মুখ দিয়ে চিবিয়ে, চুষে, চেটে বা চুমুক দিয়ে। ঐ থেকেই তো ভাল খাবারের নাম হয়েছে "চর্বচূষ্যলেহ্যপেয়"। চর্ব্য—অর্থাৎ যা চিবুনো যায়, চূষ্য—যা চোষা যায়, লেহ্য—যা লেহন করা অর্থাৎ চাটা যায়, আর পেয়—যা নাকি পান করা যায় চুমুক দিয়ে। কিন্তু গাছের তো আমাদের মত মুখ নেই, তাই আমাদের মত করে খেতেও পারে না তারা। তার ওপর আমাদের মত তৈরী খাবারও তারা পায় না—তাদের খাবার তাদের নিজেদেরই তৈরী করে নিতে হয় একেবারে কাঁচা মাল থেকে। বরঞ্চ আমরা, প্রাণীরাই, তাদের সেই তৈরী খাবারের ওপর ভাগ বসাই। কারণ, আমাদের নিজেদের ও ভাবে কাঁচা মাল থেকে খাবার তৈরী করে নেবার ক্ষমতা নেই। নিরামিষাশী প্রাণীরা তো সোজা গাছগুলোকেই খেয়ে নেয়,—কাঁচা অবস্থায়ই। আর মাংসাশী প্রাণীরা ধরে ধরে খায় সেই সব নিরামিষাশী প্রাণীদের। সেও কাঁচাই। অবশ্য কেউ কেউ আবার এই দু'রকম খাবার খেতেই ওস্তাদ্। আমরা, মানুষেরা, সেই দলের মধ্যে। তবে আমরা সব সময়ে কাঁচা খাই না, রান্না করেও খাই, এই যা!

কাঁচা মাল বলতে তোমরা কিন্তু চাল, ডাল, তরিতরকারি, তেল, ঘি, মশলা—এ সব মনে করে ব'সো না,—যা নাকি রান্নার আগে যোগাড় করতে হয়। কাঁচা মাল বলতে আমরা খোদ মৌলিক পদার্থ—যেমন ধর কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, গন্ধক ইত্যাদির কথাই বলছি। গাছেরা এই সব মৌলিক পদার্থ সংগ্রহ করে তাই দিয়ে নিজেদের শরীরের ভিতরই নিজেদের খাবার তৈরী করতে পারে—যা আমরা পারি না, এবং এর কতকগুলি যোগাড় করে পাতার সাহায্যে, বাকিটা শিকড়ের সাহায্যে।

গাছকে সংস্কৃতে বলা হয় 'পাদপ'। শিকড় হচ্ছে গাছের পা—সংস্কৃত করে বললে 'পাদ'। এই শিকড় অর্থাৎ পা দিয়েই গাছ খাবার যোগাড় করে বা পান করে বলতে পার, তাই গাছের আর এক নাম পাদপ।

শিকড় দিয়ে গাছ মাটি থেকে জল টেনে নেয়, আর সেই সঙ্গে জলে-গোলা মাটির ভিতরকার নানা রকম রাসায়নিক পদার্থও চলে আসে। এর মধ্যে আছে নানা রকম নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ, গন্ধক-ঘটিত পদার্থ, ফস্‌ফরাস্-ঘটিত পদার্থ; তা ছাড়া লোহা, পটাসিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ইত্যাদি নানা রকম ধাতুর মশলা। শিকড় দিয়ে টেনে নিয়ে গাছ ঐ সব গোলা জিনিস নিজের সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে দেয় আর সেইখানেই সেগুলো দিয়ে তৈরী করে প্রোটিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়

খাদ্য। গাছের পাতার সাহায্যে হয় চিনি এবং শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট) জাতীয় খাদ্য। সেখানকার প্রধান কাঁচা মাল কার্বন বা অঙ্গার। গাছ তা সংগ্রহ করে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস থেকে।

কার্বন আর নাইট্রোজেন

এখানে একটা মজার কথা শোন। তোমরা হয়তো ভাবছ, কোন কোন জায়গার মাটিতেও তো কয়লা মেশানো থাকে, আর কার্বন বা অঙ্গার তো এই কয়লারই আসল উপাদান। তা হলে সেখানে তো গাছ মাটি থেকেই তার কার্বন টেনে নিতে পারত! কিন্তু কোন গাছই ঐ ভাবে কার্বন নেয় না বা নিতে পারে না। তেমনি, তোমরা জান, আমাদের চারধারে যে বাতাস রয়েছে তার মধ্যে পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র অক্সিজেন, বাকি চার ভাগই নাইট্রোজেন। অথচ বেশীর ভাগ গাছেরই এই বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নেবার ক্ষমতা নেই। তারা তাদের নাইট্রোজেন যোগাড় করে মাটি থেকে। মাটিতে যে সব নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক মশলা মেশানো আছে এবং যেগুলি জলে গুলে যায়, সেইগুলিই গাছ টেনে নেয় তার খাবারের কাঁচা মাল হিসেবে। কেবল মাত্র বিশেষ বিশেষ কয়েক জাতের গাছ বাতাস থেকেও নাইট্রোজেন নিতে পারে, তাও অন্য কৌশলে। মটর, সীম, চীনেবাদাম ইত্যাদি শুঁটিওয়ালা গাছ হচ্ছে এই জাতের গাছ। বিজ্ঞানের ভাষায় এদেরকে বলা হয় 'লেগুমিনাস' জাতের গাছ।

এই লেগুমিনাস জাতের গাছও বাতাস
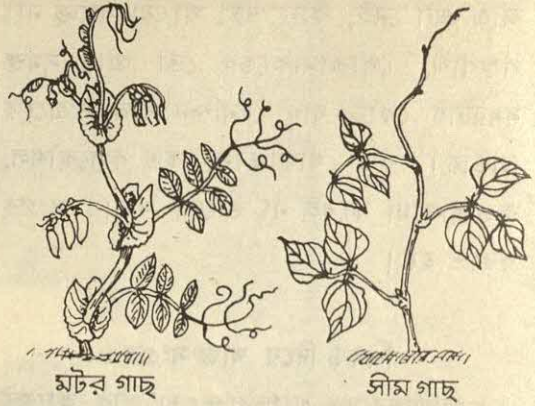
শুঁটিওয়ালা লেগুমিনাস জাতের গাছ

থেকে কৌশলে নাইট্রোজেন টেনে নেয় বলেছি, ঠিক সোজাসুজি নাইট্রোজেন টেনে নেবার ক্ষমতা এদেরও নেই। কৌশলটা কিন্তু বেশ মজার। এই সব গাছের শিকড়ে এক রকম জীবাণু এসে 'বাসা' বাঁধে। ছোট ছোট গোল গোল বাসা, দেখতে গুটির মত। ইংরেজীতে ওকে বলে 'নডিউল্'। এই জীবাণুগুলোই বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের বাসায় জমা করে আর ঐ সব গাছ সেই জমা-করা নাইট্রোজেন আত্মসাৎ করে। অবশ্য অমনি অমনি নেয় না, তার বদলে জীবাণু-

ধঞ্চে আর মটর গাছের শিকড়ে এক জাতের জীবাণু এসে বাসা বেঁধে নাইট্রোজেন জমা করে।
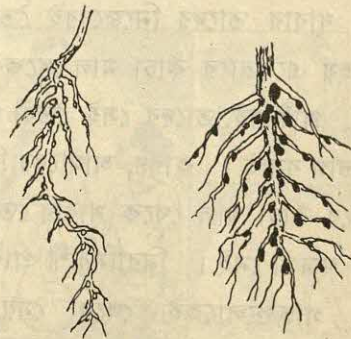
গুলোকেও গাছেরা তাদের আনা অন্য খাবারের ভাগ দেয়। অর্থাৎ এরা দু'দলে মিলে যেন একটা "পরস্পর হিতকরী সমিতি" খুলে বসে। বিজ্ঞানীরা একে বলেন 'সিম্বায়োসিস্'।

শিকড় কি ভাবে রস টেনে নেয়

যাই হোক, আবার আমরা পুরোনো কথায় ফিরে যাচ্ছি। শিকড় মাটি থেকে রস টেনে নেয় বলেছি, কিন্তু কি করে ?

তোমাদের মধ্যে যারা পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্র তারা "অস্‌মসিস্" বলে একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার কথা নিশ্চয়ই জান, যা নাকি প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই ঘটে। যারা জান না তাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি। একটা পরীক্ষা দিয়েই বোঝানো যাক। থিস্‌ল্ ফানেল দেখেছ কি ? একটা লম্বা কাচের চোঙ্গা—যার একটা মুখ বেশ চওড়া। ধর, এই রকম একটা থিস্‌ল্ ফানেলের চওড়া মুখটায় একটা খুব পাৎলা চামড়ার পর্দা শক্ত করে বাঁধা আছে। পাৎলা চামড়ার পর্দাটাকে বলা যায় 'সেমি-পারমিব্‌ল্' পর্দা—অর্থাৎ ওর দু'দিকে দু'রকম ঘন রস রাখলে সে রস পর্দা ভেদ করে কেবল এক দিকেই যেতে পারে, অন্য দিকে নয়। চামড়া ছাড়া আরও কোন কোন জিনিস দিয়ে এ রকম সেমি-পারমিব্‌ল্ পর্দা বানানো যেতে পারে। এবারে ফানেলের ভিতরটায় খানিকটা গাঢ় চিনির রস ঢেলে দেওয়া হ'ল আর সেই রস-ভরা ফানেলটা আর একটা চওড়া পাত্রে জল ভরে তার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। এই পাত্রে আছে শুধুই জল, সুতরাং সেটা ফানেলের ভিতরকার চিনির রসের মত মোটেই ভারী নয়। খানিক পরে কি দেখা যাবে ? দেখবে, ফানেলের ভিতরকার ভারী রস চামড়ার পর্দাটার ভিতর দিয়ে পাত্রের পাৎলা জলকে শুষে তার দিকে টেনে নিয়েছে। ফলে সে রসটা আর আগের মত ভারী নেই, ক্রমেই পাৎলা হয়ে হয়ে আসছে—যতক্ষণ না ওপরের
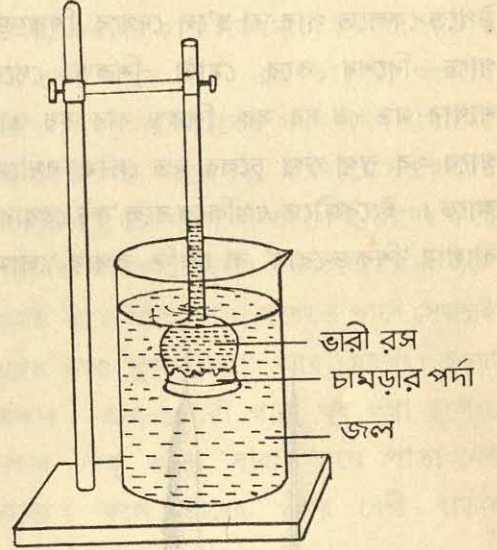
অস্‌মসিস্

রস আর নীচের রস অর্থাৎ জল সমান গাঢ় হচ্ছে। এ রকম হবেই, কারণ এটাই প্রকৃতির নিয়ম আর এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় "অস্‌মসিস্"।

আরও একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটা শুকনো কিসমিস জলে ভিজিয়ে রাখলে কি হয় কখনও লক্ষ্য করেছ ? একটু পরেই কিসমিসটা জল শুষে নিয়ে ফুলে ওঠে। কেন ফুলে ওঠে ? না ঐ অস্‌মসিস্ প্রক্রিয়ার জন্যই। কিসমিসের ভিতরকার মিষ্টি রস বাইরের জলের চাইতে গাঢ়, আর কিসমিসের ছালটা হচ্ছে পাৎলা চামড়ার মতই সেমি-পারমিব্‌ল্। ফলে

কিসমিসের ভিতরের রস বাইরের জলকে টেনে নেবে যতক্ষণ না কিসমিসের বাইরের আর ভিতরের রস সমান গাঢ় হবে।

শিকড় যে মাটি থেকে রস টানে সেও এই অস্‌মসিস্ প্রক্রিয়ার সাহায্যে। একটা শিকড়কে যদি সাবধানে, কোথাও না ছিঁড়ে, মাটি থেকে উপড়ে ফেলতে পার তা হ'লে দেখবে শিকড়ের গায়ে—বিশেষ করে মোটা শিকড় থেকে শাখার মত যে সব সরু শিকড় বার হয় তার গায়ে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চুলের মত লোম বসানো আছে। ইংরেজীতে এগুলিকে বলে 'রুট্ হেয়ার', বাংলায় 'শিকড়-রোম' বা চলতি কথায় 'লোম-

সরষে গাছের সরু শিকড়। ডানদিকে লোম-শিকড় দেখা যাচ্ছে, বাঁ-দিকে লোম-শিকড়ের গায়ে মাটি জড়িয়ে আছে।
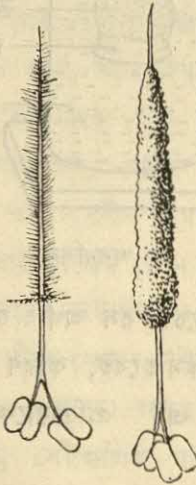
শিকড় বলা হয়। এই লোম-শিকড়গুলিই হচ্ছে গাছের জল টানবার আসল অস্ত্র। এগুলি সব সময়ে ভিজে মাটিতে জড়ানো থাকে। শিকড়ের মধ্যে থাকে ভারী রস, আর বাইরে মাটির গায়ে লেগে থাকে পাৎলা রস—যার মধ্যে গুলে আছে গাছের নানা রকম কাঁচা খাবার। তাই অস্‌মসিসের ফলে বাইরের রস আপনিই শিকড়ের মধ্যে চলে আসে।

মাটিতে কি সব সময়ে জল থাকে? অনেক সময় মাটির ওপরটা রোদ্দুরে শুকিয়ে একেবারে শুকনো হয়ে যেতে পারে কিন্তু খানিকটা তলাকার মাটি প্রায় সব সময়েই সরস থাকে। মাটি একটু খুঁড়লেই তা স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। মোটা শিকড় তার শাখা-শিকড় আর লোম-শিকড় সমেত এই তলাকার সরস মাটিতেই ঢুকবার চেষ্টা করে। গ্রীষ্মকালে এমনও দেখা যায় যে মাটি এত শুকিয়ে গেছে যে অনেক তলাতেও জলের হদিস পাওয়া ভার। শিকড় কিন্তু তাতেও ঘাবড়াবার পাত্র নয়—জলের খোঁজে হন্যে হয়ে সে তখন ক্রমাগত নিজেকে লম্বা করতে করতে এগিয়ে চলে। কোথায়
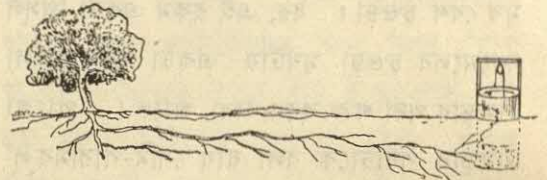
খরার দিনে লম্বা শিকড় জলের জন্য হন্যে হয়ে ছুটে চলে বহু দূর।

নদী, কোথায় পুকুর, কোথায় কূয়ো,—অন্ততঃ পক্ষে কোথায় একটুখানি জল জমে আছে শিকড় যেন ঠিক তা বুঝতে পারে, আর সেই দিকে ধেয়ে চলে। খুব খরার সময়ে বড় বড় গাছের শিকড়কে সময় সময় এই রকম জলের খোঁজে শত শত ফুট দূরে চলে আসতে দেখা গেছে। মাটির তলায় অনেক সময় নানা রকম ইট-পাটকেল, নুড়ি, বালি ইত্যাদি ছড়ানো থাকে। সেগুলো ভেদ করে যাওয়া শিকড়ের পক্ষে

কষ্টকর, তাই শিকড় এঁকেবেঁকে সেগুলো এড়িয়ে এগোতে থাকে। এই জন্যই কোন গাছের লম্বা শিকড় টেনে তুললে তাকে সাধারণতঃ সোজা দেখবে না, সব সময়েই দেখবে আঁকাবাঁকা। কারণটা বুঝলে তো ?

গাছের কাণ্ড

'কাণ্ড' মানে 'কাণ্ডকারখানা' অর্থাৎ কিনা ব্যাপারস্যাপার নয়, কাণ্ড মানে গুঁড়ি—যেটি নাকি গাছের অপর প্রধান অংশ। এবারে তার কথায় আসা যাক্। চলতি কথায় গাছের কাণ্ডকে গুঁড়ি বলা হয়। তবে গুঁড়ি বলতে আমরা অনেকেই গাছের নীচের দিক্‌টাই সাধারণতঃ বুঝি। আসলে গাছের ডালপালা, পাতা—সবটা মিলেই গুঁড়ি বলা উচিত। বরঞ্চ, যাতে গোলমাল না হয়ে যায় সেজন্য ওকে আমরা সাধু ভাষায় 'কাণ্ডই' বলব।

সব গাছের কাণ্ড এক রকম নয়। আম-জাম, বট-অশ্বত্থ জাতের বড় বড় গাছ, যা বহু বছর বেঁচে থাকে,—তাদের কাণ্ডের শুধু তলার দিক্‌টাই নয়, ওপরের দিক্‌টাও বেশ মোটা হয় ; প্রচুর ডালপালা থাকে, প্রচুর পাতাও গজায়। কিন্তু তাল, শুপারী প্রভৃতি গাছেরা, দীর্ঘজীবী হলেও,—ওদের কাণ্ড অত মোটা হয় না, পাতাও অত বেশী থাকে না। এর কারণটা আন্দাজ করতে পার? সব গাছকেই যখন-তখন বাতাসের ঝড়-ঝাপ্টা সহ্য করতে হয়। এখন, যে সব গাছের আকার বড়, ডালপালা, পাতা বেশী, তাদের গায়ে বাতাসও আটকায় বেশী। তাই বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে যাতে খাড়া থাকতে পারে সেজন্যই এদের কাণ্ড খুব মোটা আর মজবুৎ হওয়া দরকার। তাল-শুপারী গাছ, খুব লম্বা হলেও, মাথার দিক্ ছাড়া সারা গায়ে পাতা নেই তাদের। ফলে তাদের গায়ে বেশী বাতাস
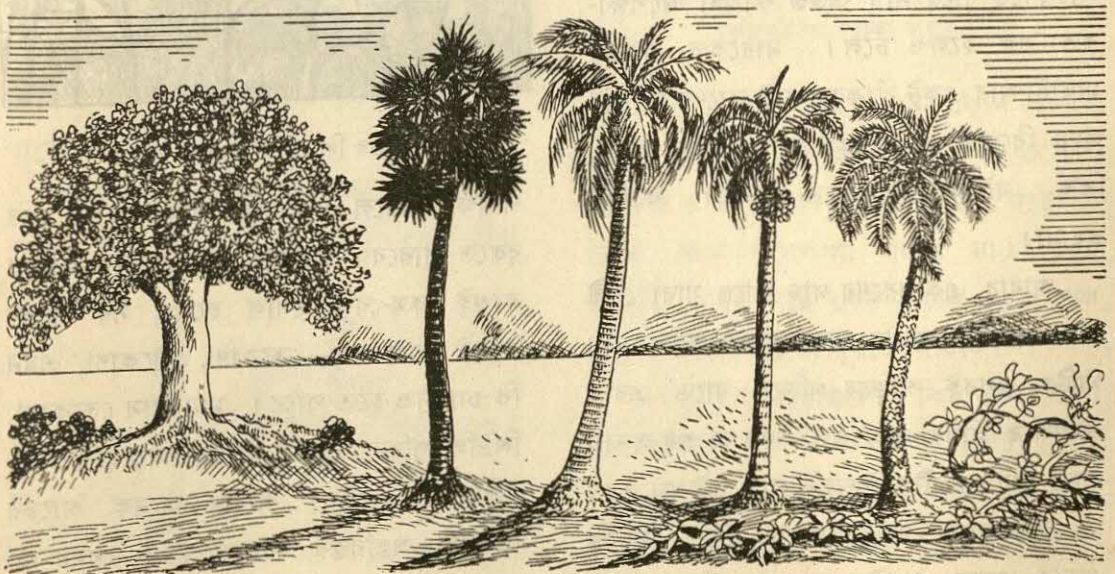
যে সব গাছের ডালপালা, পাতা বেশী তাদের কাণ্ডও হয় মোটা। যাদের গায়ে বেশী পাতা গজায় না তাদের গুঁড়ি অত মোটা হয় না।

একই জায়গায় দেখা যাচ্ছে মোটা গুঁড়ি আর সরু গুঁড়ির গাছ। কারণটা স্পষ্ট।

আটকাতে পারে না। এজন্য কাণ্ডটা অপেক্ষাকৃত সরু হলেও চলে। নারকেল গাছের মাথাটা আর একটু ঝাঁকড়া, তাই তাদের গুঁড়িটা সময় বিশেষে আর একটু মোটা হতে পারে, কিন্তু বট-অশ্বত্থের মত মোটা কখনই হয় না।

আবার, এক ধরণের গাছ আছে যারা বেশী দিন বাঁচে না, আবার খাড়া হয়েও থাকে না। মাটির ওপরই গড়িয়ে গড়িয়ে বাড়ে এরা। এগুলিকে আমরা বলি লতা গাছ বা শুধু লতা। লাউ, কুমড়ো, সীম ইত্যাদি গাছ এই জাতের। এ সব গাছের ঝড়ে-বাতাসে উল্টে উপড়ে পড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না,—ঠিক ঘাসের মত। সেই যে সংস্কৃত শ্লোকটা আছে না—"তৃণানি নোন্মূলয়তি প্রভঞ্জনঃ, মৃদূনি নীচৈঃ প্রণতানি সর্বতঃ", যার ভাবার্থ হচ্ছে—প্রভঞ্জন,—কিনা ঝড়, কখনও তৃণদের উপড়ে ফেলে না; কারণ মৃদু এবং নীচুরা এমনিতেই সকলের কাছে মাথা নত করে থাকে। (তাই পালোয়ান গাছদের ওপরেই তারা বিক্রম দেখায়।) এই কারণেই এই সব লতা গাছের কাণ্ডও শক্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। আর আয়ুও তো ওদের খুব বেশী নয়!

গাছের কাণ্ড দেখতে কেমন? শুধু বই না পড়ে বাগানে গিয়ে নানান্ ধরণের গাছপালা পরীক্ষা করলে এ সম্বন্ধে আরও ভাল করে বুঝতে পারবে। দেখবে, বেশীর ভাগ গাছের কাণ্ডই কম-বেশী গোল হলেও সব গাছের কাণ্ডই গোল নয়,—তেকোণা, চৌকোণা, এমন কি চ্যাপ্টাও হতে পারে। মুথা ঘাস তেকোণা, শিউলি, পুদিনা প্রভৃতি গাছের কাণ্ড চৌকোণা, ফণীমনসা চ্যাপ্টা। আবার অনেক গাছের ভিতরটা অল্পবিস্তর ফাঁপাও হয়। যেমন ধর বাঁশ গাছ। লাউ-কুমড়োর ডগাও কতকটা ফাঁপা নয় কি? এর কারণও ভেবে দেখবার মত।
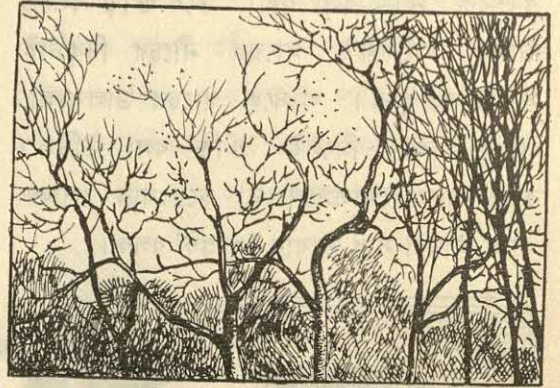
শীতের দিনের পাতা-ঝরা গাছ।
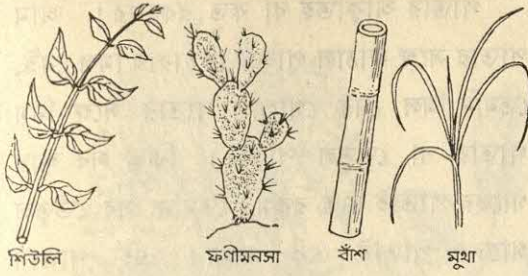
সব কাণ্ডই গোল হয় না—চৌকোণা, তিনকোণা
বা চ্যাপ্টাও হতে পারে।

কাণ্ডের গায়ে ডালপালা আর পাতা

কাণ্ডের গায়ে ডালপালা বসানো থাকে, সেই ডালপালায় বসানো থাকে তার পাতা।

কোন কোন গাছের গায়ে খানিকটা অন্তর অন্তর গাঁট বসানো দেখতে পাওয়া যায়। বাঁশ, আখ প্রভৃতি গাছে এগুলি খুব সুস্পষ্ট। লক্ষ্য করলে দেখবে, এ সব গাছের পাতার কুঁড়ি এই গাঁট ছাড়া অন্য জায়গায় গজায় না। এই গাঁট বা গ্রন্থি সব গাছের গায়েই আছে—তবে সব গাছেই অত স্পষ্ট চোখে পড়ে না। কখনও কখনও এই গাঁট কাণ্ডকে আংটির মত ঘিরে থাকে।

সাধারণ গাছের নতুন ডাল এবং নতুন পাতা কোথা থেকে কি ভাবে বেরুচ্ছে দু'-একটা গাছ
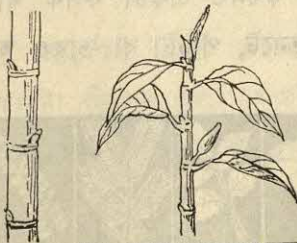
বাঁশ গাছের গাঁট থেকে কুঁড়ি বেরিয়েছে।
পাশে বট পাতার কোলে মুকুল।

নিয়ে পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবে। দেখবে, প্রায় সব গাছেরই একটা করে কুঁড়ি প্রথমে বেরোয় এই গাঁট থেকে, তারপর সেটা খুলে গিয়ে পাতার চেহারা নয়। আর সেই পাতারই কোল থেকে আবার বেরোয় নতুন কুঁড়ি—যা দেখতে দেখতে পরিণত হয় ডালপালায়। এই ভাবে ক্রমাগত কুঁড়ি, পাতা আর ডালপালা গজিয়ে গজিয়ে গাছ বড় হতে থাকে। গুঁড়ির আগায় যে কুঁড়ি বা মুকুল থাকে তাই থেকেই
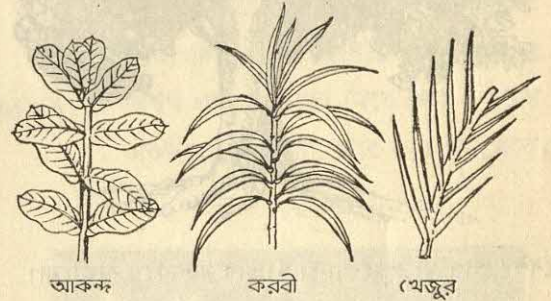
গাছের পাতা সাজাবারও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে—
আকন্দ, করবী আর খেজুর গাছের পাতা
দেখলেই তা বোঝা যায়।

গাছ লম্বায় বাড়ে। অবশ্য কোন কোন গাছের গাঁট থেকে আবার প্রায়ই কোন কুঁড়ি বেরোয় না, তাই এ সব গাছের একেবারে ডগা ছাড়া গা থেকে কোন ডালপালা গজায় না। তাল, শুপারী, খেজুর গাছে কেন নীচের দিকে ডাল হয় না এবারে হয়তো বুঝতে পারবে।

এই কুঁড়ি বা পাতাগুলোও কিন্তু এলোমেলো বসানো থাকে না, ওরও বসবার একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে,—এক এক গাছে এক এক রকম নিয়ম। এই নির্দিষ্ট নিয়মেরও কিন্তু কয়েকটা কারণ আছে। একটা কারণ—পাতাগুলো এমন ভাবে সাজানো দরকার যাতে প্রত্যেকটি পাতা

সূর্যের আলো সমান ভাবে পায়। পাতায় কেন প্রচুর সূর্যের আলো পাওয়া দরকার সে কথা পরে বলব। আর একটা কারণ—গাছের

বেশীর ভাগ গাছেরই পাতা ছাতার মত করে সাজানো।

নীচেটায় যতটা সম্ভব ছায়া বিস্তার করা, যাতে প্রখর সূর্যতাপেও তলাকার মাটিটা শুকিয়ে না গিয়ে ভেজা ভেজা থাকে—শিকড়ের রস টানতে অসুবিধা না হয়। এজন্য, লক্ষ্য করে দেখো, বেশীর ভাগ গাছেরই পাতা ছাতার মত করে সাজানো থাকে। ছাতার নীচে দাঁড়ালে যেমন রোদ থেকে রেহাই পাওয়া যায়, গাছেরাও সেই রকম পাতাগুলোকে ছাতার মত করে সাজিয়ে তলাকার মাটিকে রোদ থেকে বাঁচায়।

পাতার আকৃতিই বা কত রকমের! আম পাতার সঙ্গে কাঁঠাল পাতার চেহারার মিল নেই, তেমনি মিল নেই গোলাপ পাতার সঙ্গে নিম পাতার বা তেঁতুল পাতার। কিন্তু সব আম গাছের পাতাই এক রকম, তেমনি সব তেঁতুল গাছের পাতাই এক রকম। এই পাতার আকৃতি দেখে গাছগুলিকে সহজেই চিনতে পারা যায়। সব পাতারই দু'টি অংশ আছে—একটি

ইউ গাছের পাতা।—ফলকগুলো কেমন লম্বাটে!

বোঁটা আর একটি ফলক। আবার একই পাতায় কখনও একটা ফলক থাকে, কখনও থাকে তিনটে, পাঁচটা বা তারও অনেক বেশী।

পাতার ফলক কত রকমের হতে পারে তার কিছু নমুনা

বুনো চেরীগাছ আর তার পাতা। পাতার করাতের দাঁতের মত কিনারা লক্ষ্য কর।

আম, কাঁঠাল, বট, অশ্বত্থ—এ সব গাছেরই পাতা এক ফলকের। তেমনি বেলপাতা তিন ফলকের, গোলাপের পাতা তিন ফলক, পাঁচ ফলক দু'রকমেরই হতে পারে। নিম, তেঁতুল, কামিনী, বাবলা, শিমুল—এমন কি লজ্জাবতী লতারও ফলক বহু। আবার এই ফলকগুলো সবই যে এক সমতল ক্ষেত্রে থাকবে তার মানে নেই। পেঁপে পাতা দেখেছ তো? সেখানে পাতার বোঁটা আর ফলক সমান্তরাল নয়,—ফলকগুলো বোঁটা থেকে সমকোণ করে ছড়ানো।

ফলকের আকৃতিও নানা রকমের হতে পারে। কোনটা ডিমের মত, কোনটা বর্শার মত, কোনটা লম্বা লাঠির মত, কোনটা চৌকো, কোনটা গোল, কোনটা হরতনের মত। আবার পাতার ধারগুলোও নানা রকমের হতে পারে,—একটানা, ঢেউ-খেলানো, করাতের মত কাটা কাটা ইত্যাদি।

পাতার শিরা

আমাদের গায়ে যেমন শিরা-উপশিরা আছে পাতার ফলকের গায়েও তেমনি শিরা-উপশিরা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। এই শিরা-বিন্যাসের মধ্যেও যথেষ্ট কারিকুরি আছে। একগাছা ঘাস, খড় বা বাঁশপাতা নিয়ে দেখ,—শিরাগুলি সব সমান্তরাল। সাধারণতঃ যে সব গাছের বীজপত্র একটি তাদেরই এই রকম সমান্তরাল শিরা দেখা যায়। আবার একটা বট বা অশ্বত্থ গাছের পাতা নিয়ে দেখ,—মাঝে একটা মোটা শিরা, আর তার গা থেকে
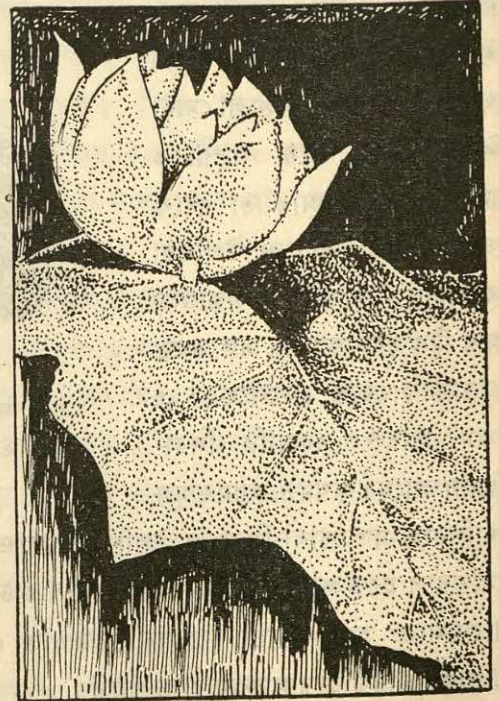
হল্যাণ্ডের বিখ্যাত টিউলিপ ফুল আর তার পাতা। পাতার ঢেউ-খেলানো কিনারা এর বৈশিষ্ট্য।

পাতার শিরা-বিন্যাস

পাতাগুলোকে সব সময়ে সূর্যের আলো পাবার জন্য ছড়িয়ে থাকতে হয়। কিন্তু পাতার শত্রুও তো অনেক! তার মধ্যে বাতাস আছে, ঝড়ও আছে। পাতার ফলক যদি কেবল নরম জিনিস দিয়েই তৈরী হ'ত তা হলে একটু জোর বাতাসেই তা ছিঁড়ে যেত। শক্ত শিরাগুলি পাতাকে এই সব প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করে—সহজে ছিঁড়ে যেতে দেয় না। যেখানে শিরাগুলো তেমন জোরালো নয় সেখানে পাতা সহজেই ছিঁড়ে যেতে পারে এবং যায়ও। কলা গাছের পাতার শিরাগুলো এই রকম কম-জোরী,

পাখীর পালকের মত ছোট ছোট শাখা-শিরা বেরিয়ে ছড়িয়ে গেছে। এই শাখা-শিরা থেকে আবার বেরিয়ে গেছে নানা উপশিরা। এর পর একটা লাউ বা কুমড়ো পাতা নিয়ে দেখ। তার মধ্যে কোনও মোটা মধ্য-শিরা দেখতে পাবে না, বোঁটা থেকে একসঙ্গে কতকগুলো মোটা শিরা বেরিয়ে এসে পাতাটিকে ঢেকে ফেলেছে, আর তা থেকে যে সব শাখা-শিরা বা উপশিরা বেরিয়েছে সেগুলো জড়াজড়ি করে ঠিক যেন জালের মত সমস্ত পাতাটিকে ছেয়ে ফেলেছে। এ রকম আরও রকমারি শিরা-বিন্যাস আছে। কখনও কখনও মূল মধ্যশিরার মত শাখা-শিরা ও উপশিরাগুলোও সমান্তরাল হতে পারে,—যেমন কলাপাতা। জট পাকানোও হতে পারে,—যেমন তেজপাতা। এ ছাড়া আরও হরেক রকম হতে পারে।

এই শিরার কাজ কি? শুধু বাহারের জন্যই কি এগুলি তৈরী হয়েছে? মোটেই না।

বুনো আপেল গাছ আর তার পাতা। পাতার শিরা-বিন্যাসে যেমন রয়েছে বৈশিষ্ট্য, তেমনি ওপর দিকে আর তলার দিকেও রয়েছে প্রচুর পার্থক্য।

সেজন্য একটু ঝড়-বাতাসেই কলাপাতাগুলো কেমন ছিঁড়ে যায় তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ।

কিন্তু গাছের ফলককে দৃঢ় করাই শিরার একমাত্র কাজ নয়। শিরার আরও একটা বড় কাজ আছে যা চলে গাছের ভিতরে। তোমাদের আগেই বলেছি, গাছেরা নিজেদের

খাবারের কিছুটা তৈরী করে নেয় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে নিয়ে। এ কাজটা শিকড়ের নয়,—পাতার। সূর্যের আলোর সাহায্যে গাছ পাতার ভিতর যে খাবার তৈরী করে তা গাছের সর্বদেহে ছড়িয়ে দিতে হয় এবং এ ব্যাপারে প্রথম ভূমিকা নেয় পাতার এই শিরাগুলি। পাতার "তৈরী খাবার" চলাচলের পথ হচ্ছে এই শিরা। এই শিরাগুলির ভিতর দিয়েই সে খাবার প্রথম চলে আসে, তারপর তা থেকে গাছের আসল কাণ্ডে, ডালপালায়, ফলে-ফুলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে এই শিরায় তিন রকমের নল দেখা যাবে, যা নাকি বিশেষ বিশেষ ধরণের কোষ দিয়ে তৈরী। তার একটা দিয়ে পাতায়-তৈরী চিনি চলাচল করে, আর একটা দিয়ে যায় প্রোটিন, আর তৃতীয়টি দিয়ে পাতার সর্বত্র জল সরবরাহ করা হয়—যে জল শিকড় মাটি থেকে শুষে নিয়ে দেয় কাণ্ডের ভিতর, আর সেখান থেকে যা পাতার এই শিরাগুলির মধ্যে চলে আসে।

কয়েকটি ছদ্মবেশী কাণ্ড

ছদ্মবেশী কাণ্ড আর ছদ্মবেশী পাতা

গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ড যে সব সময়ে মাটির ওপরেই থাকবে তার কোন মানে নেই। যেমন ধর,—ওল, মানকচু, আদা, আলু, হলুদ, পেঁয়াজ —এগুলোর প্রায় সবটাই থাকে মাটির নীচে --বিশেষ করে যে অংশটা আমরা খাই সেই অংশটা। অবশ্য এ সব গাছগুলিরই কতক অংশ মাটির ওপরেও থাকে এবং এর কোন কোনটার পাতা আমরা শাক হিসেবেও খাই। আলুশাক, পেঁয়াজকলি—এ সব তো অনেকের কাছেই মুখরোচক। কিন্তু আসল গাছটা মাটি খুঁড়ে তবেই বার করে নিতে হয়। মাটির নীচে গাছের যে অংশটা চলে যায় তাকে তো আমরা শিকড় বলি। তা হলে এগুলোও কি শিকড় ? না, এগুলি সবই গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ড—বিশেষ ধরণের কাণ্ড বলতে পার। প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে কোন গাছের কেবল শিকড়টা ছিঁড়ে নিয়ে পুঁতে দিলেই তা থেকে গাছ হয় না। কিন্তু এর সবগুলোরই মাটির তলাকার অংশ, যাকেশিকড় বলে ভুল হতে পারে,—তুলে নিয়ে পুঁতে দিলে নতুন গাছ গজাবে।
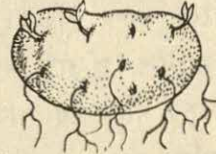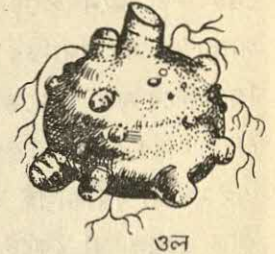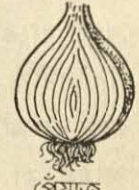
ওল এবং কচুতে অনেকগুলো মুখ থাকে। চলতি কথায় লোকে বলে 'মুখী'। (পঞ্চমুখী ওল নাকি খেতে খুব সুস্বাদু। আমি কিন্তু ওল দেখলেই ভয় পাই। সঙ্গে সঙ্গে যোগীন্দ্র সরকারের

সেই ছড়া মনে পড়ে—"ওল খেয়ো না ধরবে গলা।" সাঁৎরাগাছির ওলের নামে অনেকের জিভ দিয়ে জল পড়তেও দেখেছি। কিন্তু, যাক্ গে—ও সব হচ্ছে ব্যক্তিগত মতামত!) আসলে এই মুখ বা মুখীগুলিই হচ্ছে ওদের কুঁড়ি। ঐ কুঁড়ি ভেঙ্গে বা কেটে মাটিতে পুঁতলে নতুন গাছ বেরোয়। ওল বা কচুর গায়ে যে পাৎলা বাদামী খোসা থাকে সেগুলিই হচ্ছে ঐ গাছের পাতা। বিজ্ঞানীরা বলেন ঐ পাতা রূপান্তরিত হয়ে ঐ রকম বাদামী খোসায় পরিণত হয়েছে। পাতার আসল যা কাজ মাটির তলায় চাপা থাকায় তা তো ওদের করতে হয় না, তাই ওদের সবুজ রং ঐ রকম বিকৃত হয়ে গেছে। গাছের পাতা কেন সবুজ হয় সে কথা তোমাদের যথা সময়ে বলব। যাই হোক্, বেশ দেখা যাচ্ছে, ওল আর কচুতে কুঁড়ি আর পাতা দুই-ই আছে যা নাকি কেবল গাছের কাণ্ডেই থাকতে পারে। তাই ওদেরকে শিকড় বলি কি করে?

আলুর বেলাও ঐ এক কথা। আলুকে যদি মূলো-গাজরের মত গাছের শিকড় বলে মনে কর তবে একেবারেই ভুল করবে। আলুর সারা গায়েও আঁশের মত রূপান্তরিত পাতা ছড়িয়ে আছে। নতুন আলুতে এটা ভাল করেই চোখে পড়ে। আর আছে ছোট ছোট গর্ত বা কুঁড়ি, যাকে আমরা বলি আলুর 'চোখ'। এই চোখগুলো কেটে মাটিতে পুঁতে দিলে দেখা যাবে তা থেকে 'অঙ্কুর বেরিয়ে' নতুন গাছ গজাচ্ছে। কাজেই আলুও মাটি-চাপা কাণ্ড ছাড়া কিছু নয়।

হলুদ, আদা—এরাও অনেকটা ঐ রকম, তবে একটু তফাৎ আছে। এদেরও সারা গা পাৎলা বাদামী কাগজের মত রূপান্তরিত পাতায় ভর্তি। তা ছাড়া এদেরও গায়ের আশপাশ যুড়ে রয়েছে ওল-কচুর মত মুখ বা কুঁড়ি আর শিকড়। তবে তাদের মত নীচের দিকে না বেড়ে এগুলি বেড়ে চলে পাশাপাশি। আবার, এক পাশটা যখন বাড়তে থাকে অপর পাশটা তখন আস্তে আস্তে শুকিয়ে মরে যায়।

পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি গাছকেও এ রকম মাটিচাপা কাণ্ড বলতে হবে। পেঁয়াজ বা রসুনের সারা গা যুড়ে রয়েছে পর্দার পর পর্দা খোসা। একটার নীচে একটা। এইগুলিই হচ্ছে ওদের রূপান্তরিত পাতা। সমস্ত খোসাগুলো যদি ছাড়িয়ে ফেল তা হলে ভিতরে শক্ত একটা চাকার মত আসল কাণ্ডটা দেখতে পাবে। কাণ্ডের নীচ দিয়ে জটলা-বাঁধা শিকড়ও দেখতে পাবে।

তা হলে এগুলোকে ছদ্মবেশী কাণ্ড আর ছদ্মবেশী পাতা বলতে দোষ কি? বিজ্ঞানীরাও এদের রকম-সকম দেখে এদের এক একটা পৃথক্ পৃথক্ বৈজ্ঞানিক নাম দিয়েছেন। যেমন ওল বা কচু জাতীয় গাছকে ওঁদের ভাষায় বলা হয় 'কর্ন্'; বাংলা নাম 'বজ্রকন্দ'। আলু জাতীয় গাছকে বলা হয় 'টিউবার'; বাংলায় 'কন্দল'। আদা, হলুদ জাতীয় গাছকে বলা হয় 'রাইজোম' (অধোবিহারী কন্দ), আর পেঁয়াজ, রসুন জাতের গাছকে বলা হয় বাল্‌ব্; বাংলায় শুধু 'কন্দ'।

এই সব গাছের কাণ্ডের এই রকম পরিবর্তনের কারণ কি? কারণ আছে বৈ কি! মূলো গাছের শিকড়ের মত এই সব কাণ্ডেরও কাজ খাবার সঞ্চয় করে রাখা,—যাতে অভাবের সময়ে সে সব খাবার কাজে লাগানো যেতে পারে। চিনি (সুগার) আর শ্বেতসার (স্টার্চ) জাতীয় খাদ্যই এখানে জমা থাকে।

পাতারা নানা ভাবে চেহারা বদলাতে পারে

গাছের কাণ্ড যেমন চেহারা বদলে নানা রকমারি রূপ নেয় তেমনি পাতারাও সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে চেহারা বদলায় তা শুনলে। সময় সময় পাতারা আরও নানাভাবে চেহারা বদলাতে পারে। বিজ্ঞানীরা এ ধরণের সব পাতাকেই বলেন রূপান্তরিত পাতা। যেমন ধর, কোন কোন গাছের গায়ে এমন কাঁটা থাকে যে সাবধান না হলে তাতে হাত দিলে রক্তপাত হয়ে যেতে পারে। বেলগাছের কাঁটা কী শক্ত আর ধারাল তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। তেমনি বাবলা-কাঁটা, খেজুর-কাঁটা, ফণিমনসার কাঁটাও কম যায় না! এমন কি অমন যে কবিদের প্রিয় পদ্ম আর গোলাপ,—তাতেও কণ্টক অর্থাৎ কাঁটা! আসলে এই কাঁটাগুলি কিন্তু সবই গাছের পাতা—রূপান্তরিত

পাতা চেহারা বদলে রূপান্তরিত হয়েছে কাঁটায়।

হয়ে কাঁটার চেহারা নিয়েছে। উদ্দেশ্য কি বুঝতে পারছ? আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছু না।

আবার কোন কোন গাছ আছে যারা কিছু কিছু পাতাকে সূতোর মত চেহারায় নিয়ে আসে। এ সব গাছের দেহ সাধারণতঃ খুব দুর্বল। এমনি এরা খাড়া হয়ে থাকতে পারে না, মাটির ওপর যখন থাকে তখন লতিয়ে লতিয়ে চলে, তাই এদের বলা হয় লতা।
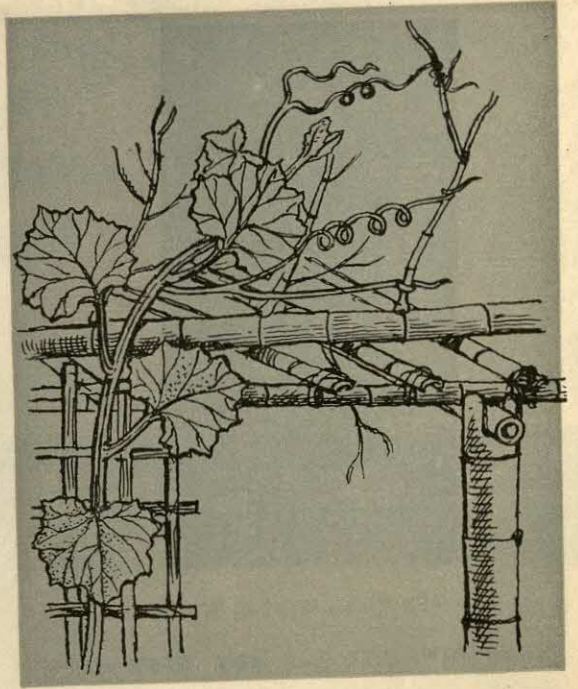
কুমড়ো গাছ তার সূতোর মত আকর্ষ দিয়ে আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরেছে।

এরা সুযোগ পেলেই অন্য গাছ কি অন্য কোন অবলম্বনকে আঁকড়ে ধরে তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ওপরে ওঠে। কিন্তু জড়াবার জন্য তো একটা কিছু হাতিয়ার চাই। এদের সূতোর মত রূপান্তরিত পাতাই হচ্ছে সেই হাতিয়ার। ইংরেজীতে এগুলিকে বলা হয় 'টেণ্ড্রিল'। বাংলা নাম 'আকর্ষ'। লাউ, কুমড়ো, মটর, ঝিঙ্গে, শশা, উচ্ছে প্রভৃতি গাছে এই ধরণের সূতোর মত আকর্ষ নিশ্চয়ই তোমাদের চোখে পড়েছে।

কোন কোন লতানে গাছ আবার কাঁটা দিয়েও অন্য গাছকে আঁকড়ে ধরে থাকে। এই কাঁটাগুলোও আসলে বদলানো পাতা ছাড়া কিছু নয়। যেমন ধর শিয়াকুল গাছ বা চুপড়ি আলুর গাছ। মটর, কুমড়ো, লাউ প্রভৃতির আকর্ষ বেরোয় তাদের ডগা থেকে, কিন্তু অনেক

মটর গাছের আকর্ষ বা আঁকড়ি

গাছের পাশ থেকেও এ রকম আকর্ষ ঝুলতে দেখা যায়। আবার মজা দেখবে, কোন কোন লতা যখন অন্য গাছকে জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠে তখন হয় তারা বাঁ দিক্ দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে ওঠে, নয় তো ডান দিক্ দিয়ে পাক খায়। একই জাতের গাছ কেউ বাঁ পাকে জড়াচ্ছে, কেউ ডান পাকে জড়াচ্ছে—এ কখনও হয় না। একটু লক্ষ্য করলে দেখবে, মাধবী লতা, মালতী লতা—এরা সবাই আশ্রয়দাতা গাছকে বাঁ পাকে

লতানে কাঁটা গাছ তার কাঁটা দিয়ে অন্য গাছকে আঁকড়ে ধরেছে।

জড়ায়। যদি জোর করে ডান দিকে ঘুরিয়ে বেঁধে দাও তবুও, দু'দিন বাদেই দেখবে, ফের সেটা ঘুরে এসে বাঁ-পাকে জড়াতে সুরু করেছে, কিছুতেই ডান পাকে জড়াবে না। এ রকম লতাকে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন 'বামাবর্ত লতা' অর্থাৎ যা বাঁ দিকে আবর্তন করে। এর ঠিক উল্টো হচ্ছে 'দক্ষিণাবর্ত লতা'। উদাহরণ ঃ চুপড়ি আলু, খাম আলু ইত্যাদি।

বামাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত লতা

বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেন, গাছের এই যে পাক খাওয়া এটা ঠিক গাছের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে না। (গাছের কি বুদ্ধি আছে?) কচি লতার ডগা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে চলে। ঐ লতা যখন আশ্রয়কে এসে ধরে তখন যে দিক্‌টা আশ্রয়-দাতাকে লেপটে থাকে সে দিক্‌টা ঘষা লাগার ফলে উল্টো পিঠের মত অত তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে না। ঐ উল্টো দিক্‌টা তো আর কোন বাধা পাচ্ছে না! এরই ফলে লতা ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে গাছের গায়ে পাক খেতে থাকে।

জীবজন্তুর কথা

বিচিত্র প্রাণিজগৎ

জগৎ শুধু প্রাণময় নয়, প্রাণিময়ও বটে, আর কত বিচিত্র সেই প্রাণিজগৎ! সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম,—উপনিষদের ভাষায় যাকে বলা যায় প্রায় "অণুরণীয়ান্", অর্থাৎ অণুর চেয়েও সূক্ষ্ম,—অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া যা নজরেই পড়ে না চোখে—এমন সব প্রাণী থেকে সুরু করে সত্তর-আশী-একশ' ফুট লম্বা অতিকায় নীল তিমি পর্যন্ত কত না বিচিত্র প্রাণীতে ভরে রয়েছে পৃথিবীর জল-স্থল-অন্তরীক্ষ! বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ জাতের প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন। তার মধ্যে পোকামাকড়ই আছে আট লক্ষ জাতের। তা ছাড়া আছে অন্ততঃ ত্রিশ হাজার জাতের মাছ, তিন হাজার জাতের উভচর, ছ' হাজার জাতের সরীসৃপ, ন' হাজার জাতের পাখী এবং কম করে তিন হাজার জাতের স্তন্যপায়ী। এ ছাড়াও আছে অন্য জাতের প্রাণী। কিন্তু তাতেও বিজ্ঞানীরা খুশী ন'ন, এখনও তাঁরা সমানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নতুন নতুন প্রাণীর সন্ধানে এবং সন্ধান পাচ্ছেনও। প্রতি বছরই তাই প্রাণিজগতের ফর্দ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে, কিন্তু তবু তার শেষ নেই।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ, এই এত জাতের প্রাণীর হিসেব মনে রাখা কি করে সম্ভব? কাজটা সত্যিই কঠিন, কিন্তু তোমরা এ কথাও হয়তো জান যে ঠিক মত শ্রেণী-বিভাগ প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই একটি গোড়ার কথা। প্রাণিবিজ্ঞানের বেলায়ও তা সমান সত্যি।

এতক্ষণ আমি 'জাত' কথাটা বারে বারে উল্লেখ করেছি। চলতি কথায় সাধারণ লোকেরা ঐ শব্দটি দিয়েই এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীর তফাৎ বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু 'জাত' শব্দটির অর্থ খুব স্পষ্ট নয়। বিজ্ঞানীরা আরও নিখুঁত শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী এবং সেই ভাবেই তাঁরা তাঁদের শব্দ বাছাই করে নিয়েছেন। প্রাণি-জগতের এই জাতিভেদ কি ভাবে করা হয়েছে সে সম্বন্ধে একটু মোটামুটি আভাস এখানে দিচ্ছি।

বিচিত্র প্রাণিজগৎ—অ্যামিবা থেকে মানুষ
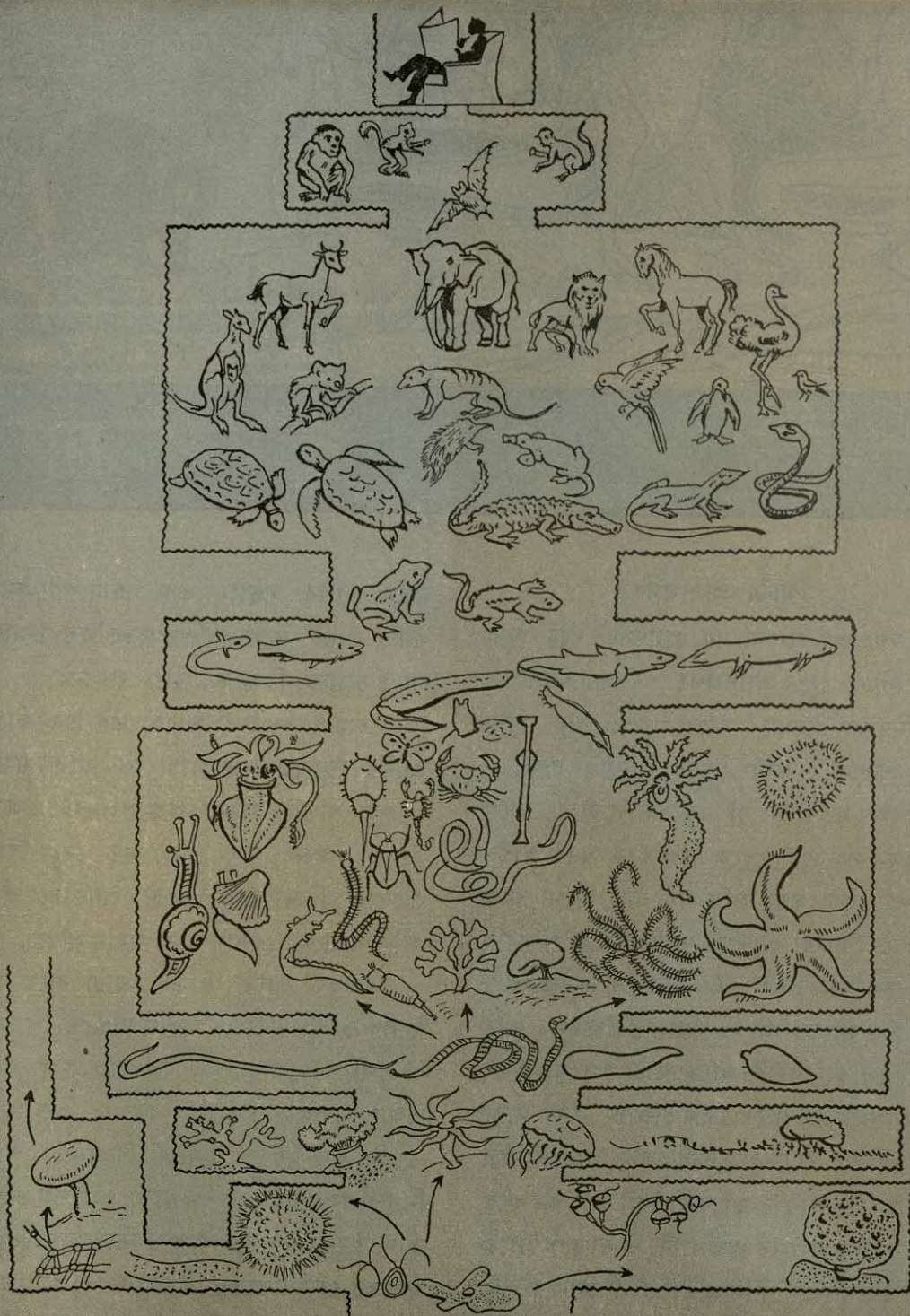
প্রাণিজগতের দু'টি বড় বড় ভাগ

প্রথমেই আমরা প্রাণিজগৎকে মোটামুটি দু'টি বড় বড় ভাগে ভাগ করতে পারি। এক,—যাদের শিরদাঁড়া আছে, আর দুই,—যাদের শিরদাঁড়া নেই। শিরদাঁড়াকে ভাল বাংলায় বলে মেরুদণ্ড, ইংরেজিতে বলে ভার্টিব্রেটা। তাই প্রথম জাতের প্রাণীদের আমরা নাম দিয়েছি 'দণ্ডযুক্ত' বা 'ভার্টিব্রেট্'। শিরদাঁড়া থাকলেই থাকবে অস্থি বা হাড়, তাই প্রথমটিকে যদি আমরা অস্থিক বা আরও সহজ করে হাড়-ওয়ালা প্রাণী বলি তা হলে তেমন ভুল হবে না। আর যাদের শিরদাঁড়া নেই তাদের ও-রকম হাড়ও নেই, তাই তারা হ'ল নিরস্থিক বা হাড়-ছাড়া প্রাণী। পোকামাকড়েরা সবই এই হাড়-ছাড়া দলে পড়ে। তা ছাড়া বেশীর ভাগ নীচু জাতের প্রাণীও ঐ দলভুক্ত। অবশ্য হাড় না থাকলেও এদের অনেকের গায়ে আছে শক্ত খোলস বা

হাড়-ছাড়া প্রাণীর মধ্যে শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া এবং চিংড়িও পড়ে।
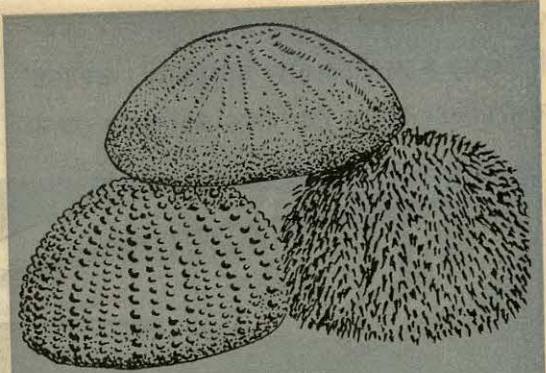
সী-আর্চিন সমুদ্রের আদিম প্রাণীদের বংশধর—এদেরও হাড় নেই
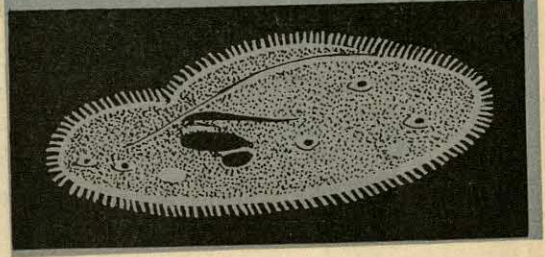
সী-আর্চিনেরই আর একটি জাতভাই

খোলা। যেমন ধর শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি। লক্ষ্য ক'র, কাঁকড়া আর চিংড়িকে কিন্তু আমি কাঁকড়া আর চিংড়িই বলছি, কাঁকড়া মাছ আর চিংড়ি মাছ বলছি না। কারণ ওদের কোনটাই যে মাছ নয় তা তো তাদের চেহারা দেখেই বোঝা যায়। মাছ হচ্ছে হাড়ওয়ালা প্রাণী। তেমনি তিমিকেও তিমি মাছ বলা চলে না। তিমির ছানারা মায়ের দুধ খায়, মাছ তো আর তা খেতে পারে না!

হাড়ওয়ালা বা শিরদাঁড়াওয়ালা প্রাণীরা সকলেই প্রায় শিরদাঁড়া-হীন প্রাণীদের চাইতে উঁচু জাতের। ওদের হালচাল, স্বভাব, বুদ্ধিবৃত্তি বিচার করলেই এটা স্পষ্ট ধরা পড়ে। আর
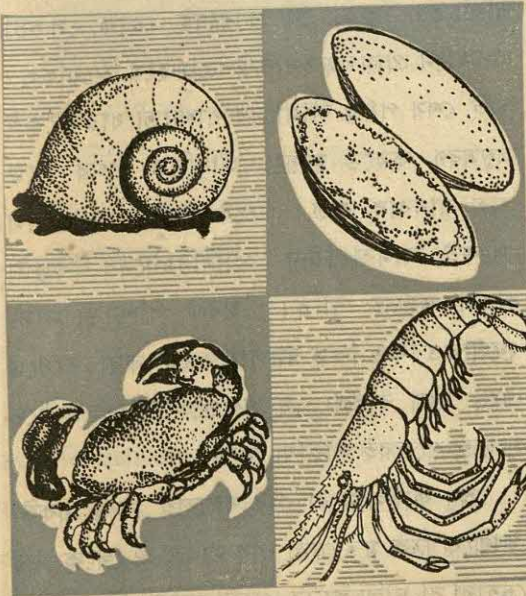
সেটাই স্বাভাবিক। হাড়-ছাড়া প্রাণীরাই যে ক্রমবিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে হাড়ওয়ালা প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে সে বিষয়ে পণ্ডিতদের কোন

ওপরে: বিড়াল-মাছ বা 'ক্যাট ফিশ্'। এদের গায়ে আঁশ নেই, আছে খানিকটা বর্মের মত খোলা হাড়। প্রথম যুগের হাড়ওয়ালা প্রাণীর একটি নমুনা বলা যেতে পারে এদেরকে। নীচে: ডিপনয়। মাছ ক্রমবিবর্তনের ফলে উভচরে পরিণত হয়। এরা হচ্ছে সেই দুইএর মাঝামাঝি প্রাণী। এদের ফুসফুস্ আছে যা অন্য মাছেদের নেই।

মতভেদ নেই। সৃষ্টির একেবারে গোড়ায়—যখন পৃথিবীতে প্রথম প্রাণী দেখা দিল, তখন তারা সকলেই ছিল হাড়-ছাড়া প্রাণী। হাড়ওয়ালা প্রাণী হচ্ছে মাছ, কিন্তু তার আগে এ দুইএর মাঝামাঝি প্রাণীও এসেছিল।

আধুনিক শ্রেণী-বিভাগ

মোটামুটি এই বড় বড় দু'টি ভাগে সমুদয় প্রাণিজগৎকে ছেঁকে ফেলেও পণ্ডিতেরা তাদের আবার একবার ভাগ করেছেন ২২টা ভাগে। এর মধ্যে ২১টাই হচ্ছে মেরুদণ্ডহীন প্রাণী, অর্থাৎ ইন্‌ভার্টিব্রেট্, ২২ নম্বরটিরই শুধু আছে মেরুদণ্ড বা অন্ততঃ একটি নরম কিন্তু মজবুত দণ্ড—যাকে বলে নোটো কর্ড। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে কর্ডাটা। অবশ্য ঐ ২১টার মধ্যে ৯টাই প্রধান, বাকিগুলিকে শাখা ভাগ বলা যেতে পারে।

বিজ্ঞানের ভাষায় এই ভাগগুলির এক একটিকে বলা হয় ফাইলাম্। বাংলায় বলা হয় পর্ব। এখানে তোমরা লক্ষ্য করবে যে এই যে আধুনিক শ্রেণী-বিভাগের পদ্ধতি, এটি এসেছে পাশ্চাত্য দেশ থেকে। তাই এই নামগুলির সবই ল্যাটিন শব্দ থেকে তৈরী। আমাদের দেশে যেমন সংস্কৃত, ওদেশে তেমনি ল্যাটিন কিনা! আমাদের কানে একটু খটমট লাগবেই। অবশ্য আমাদের দেশেও প্রাণিবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা এক সময়ে যথেষ্ট হয়েছে এবং প্রাণীদের এই শ্রেণী-বিভাগের ভারতীয় পদ্ধতির সঙ্গেও আমরা খানিকটা পরিচিত। কিন্তু, যে কারণেই হোক, সে চর্চা মাঝখানে প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। তাই শেষ পর্যন্ত আমাদের পাশ্চাত্য ধারাটিকেই অনুসরণ করতে হয়েছে আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য। তবে সংস্কৃত নামগুলি থেকেই আমরা হিন্দু প্রাণিবিজ্ঞানের কিছুটা ধারণা করতে পারি। অবশ্য পাশ্চাত্য নামগুলোরও কিছু কিছু বাংলায় তর্জমা করা হয়েছে এবং, বলা বাহুল্য, সে শব্দগুলো তৈরী হয়েছে সংস্কৃত শব্দেরই সাহায্য নিয়ে।

শুধু ফাইলাম বা পর্ব বললেই কিন্তু একটা প্রাণীকে ঠিক মত চেনা যায় না। ও থেকে ওর চেহারা বা চালচলনের একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যেতে পারে এই পর্যন্ত। এ জন্য

ফাইলামকেও আবার ভাগ করা হয়েছে ক্লাস বা শ্রেণীতে, ক্লাসকে ভাগ করা হয়েছে অর্ডার বা বর্গে, অর্ডারকে ভাগ করা হয়েছে ফ্যামিলি বা গোত্রে, ফ্যামিলিকে ভাগ করা হয়েছে জেনাস্ বা গণে এবং জেনাস্কে ভাগ করা হয়েছে স্পিসিস্ বা প্রজাতিতে। এই ভাবে ধাপে ধাপে ভাগ করে করে যখন স্পিসিসে এসে পৌঁছান গেল তখন দেখা যাবে প্রাণীটির চেহারা, শরীরের গড়ন, চালচলন, হাবভাব—সবই এমন ভাবে জানা যাচ্ছে যে অন্য শ্রেণী থেকে তাকে পৃথক্ করে চিনে নেবার কোনই অসুবিধা নেই।

একটা উদাহরণ দিলে বোধ হয় ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। ধর, প্রাণিজগতে মানুষের কি পরিচয় তা তুমি জানতে চাও। মানুষ প্রাণী, না উদ্ভিদ, না আর কিছু তাও উল্লেখ করে পরিচয়টা হবে এই ভাবে ঃ

কিংডাম্ বা রাজ্য—অ্যানিমেলিয়া (প্রাণী)
ফাইলাম বা বর্গ—কর্ডাটা
ক্লাস বা শ্রেণী—ম্যামেলিয়া (স্তন্যপায়ী)
অর্ডার বা বর্গ—প্রাইমেট
ফ্যামিলি বা গোত্র—হোমিনিডি
জেনাস্ বা গণ—হোমো
স্পিসিস্ বা প্রজাতি—সেপিয়ান্স

নামকরণ

কিন্তু নামকরণের সময় তো পর পর এতগুলি বলা যায় না, তাই কেবল শেষের দু'টি, অর্থাৎ জেনাস্ আর স্পিসিস্ ধরেই নামকরণের প্রথা চালু হয়েছে। তা হলে প্রাণিবিজ্ঞানের ভাষায় মানুষের নাম কি হ'ল বল তো? 'হোমো সেপিয়ান্স'। এই হোমো সেপিয়ান্স বলতে আমরা সব রকম মানুষকেই বুঝব—সাদা চামড়ার ইংরেজ, কালো চামড়ার নিগ্রো, হলদে চামড়ার চীনে, বাদামী চামড়ার ভারতীয়—সবাই হোমো সেপিয়ান্স, কারণ মানুষের যা কিছু বৈশিষ্ট্য তা এদের সবার মধ্যেই আছে। অবশ্য চেহারা, রং আর জাত বিচার করে এদেরও আবার নতুন করে ভাগ করা যেতে পারে—ককেশিয়, মোঙ্গোলিয়, নিগ্রো ইত্যাদি নানা জাতে। কিন্তু সেটা ঠিক প্রাণিবিজ্ঞানের আওতায় আসবে না—সেটা হচ্ছে নৃতত্ত্ব বা মানুষের বিজ্ঞানের বিবেচ্য বিষয়—যার ইংরেজী নাম অ্যান্থ্রপলজী। তবে হ্যাঁ, আদিম জাতের প্রায়-মানুষ বা উপমানুষ—যাদের কথা তোমাদের ইতিপূর্বে বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১-১৩৬) তাদের প্রাণিবিজ্ঞানের আওতায় অবশ্যই আনা যাবে। যেমন, নিয়ান্ডার্থাল ম্যান্, যাভা-ম্যান্ (নৃতত্ত্বের নাম পিথাক্যান্থ্রোপাস্ ইরেক্টাস্), পিকিং ম্যান (সিনান্থ্রোপাস্ পিকিনেন্সিস্)—এরা সবাই জেনাস্ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে এক, কিন্তু স্পিসিস্ আলাদা।

এমনি ভাবে অন্য জানোয়ারদেরও বৈজ্ঞানিক ভাবে নামকরণ করা হয়েছে। বাঘের জেনাস্ হচ্ছে প্যান্থেরা আর স্পিসিস্ হচ্ছে টাইগ্রিস। তাই বাঘের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে প্যান্থেরা টাইগ্রিস। সিংহও ঐ এক জেনাসেরই প্রাণী, কিন্তু স্পিসিস্ আলাদা,—লিও! তাই সিংহের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে প্যান্থেরা লিও।

যে সব প্রাণীর মেরুদণ্ড নেই

এবারে আমরা শিরদাঁড়া অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীদের কথায় আবার চলে আসছি। একুশটি
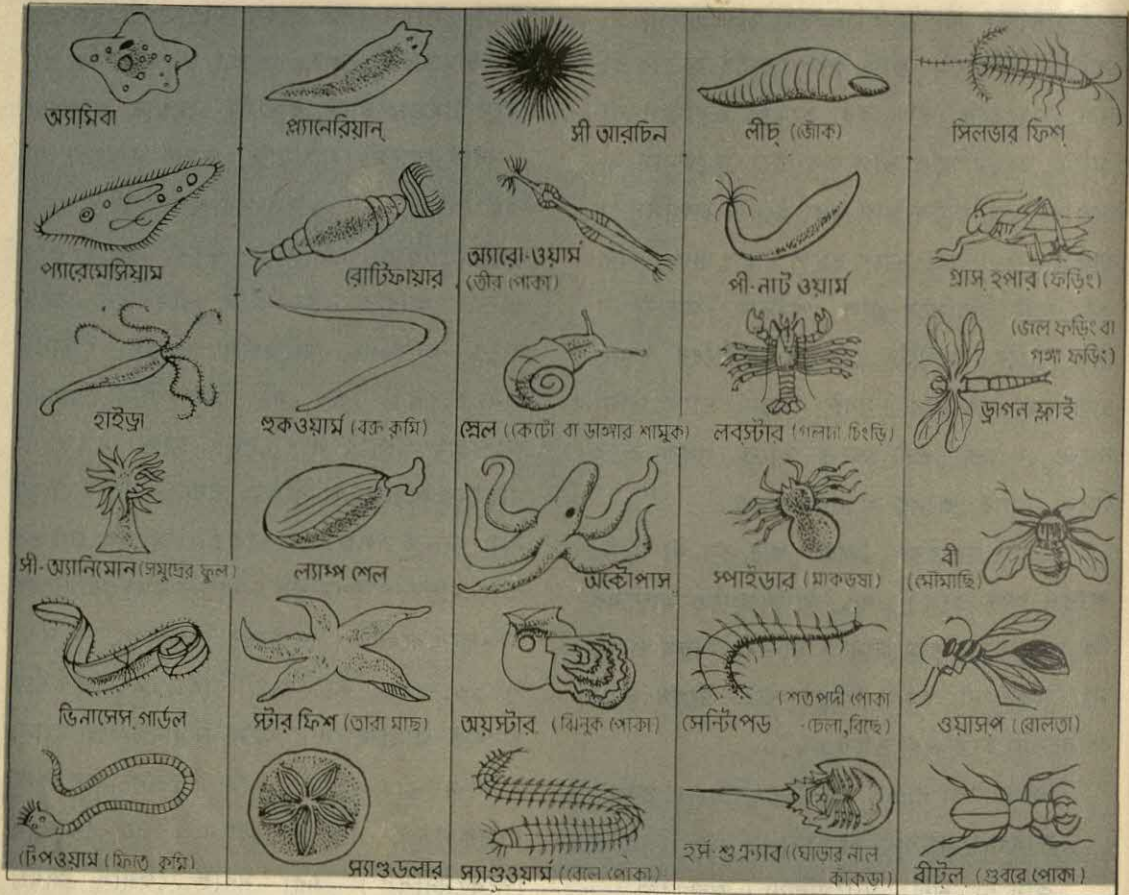
একুশটি ফাইলামে ছড়িয়ে আছে হাড়-ছাড়া প্রাণীর দল। তাদেরই 'সদস্য' এই ৩০টি প্রাণী।

ফাইলামে এদের ভাগ করা হয়েছে। যেমন ধর, প্রোটোজোয়া (প্রথম প্রাণী), মেসোজোয়া (মধ্য প্রাণী), পরিফেরা (সচ্ছিদ্র প্রাণী), সিলেন্‌টেরাটা (ফাঁপা-অন্ত্র প্রাণী), টেনোফোরা (চিরুণীওয়ালা প্রাণী), প্ল্যাটিহেলমিন্থেস্ (চ্যাপ্টা কৃমি), নেমেরটিনিয়া (গ্রীক পুরাণের জলপরী নেমেরটেস থেকে যাদের নাম দেওয়া হয়েছে), এন্‌টোপ্রোক্‌টা (ভিতর-খোলা প্রাণী), এস্-কেলমিন্থেস (বস্তা-পোকা), অ্যাকান্থোসেফালা (মাথায়-কাঁটা প্রাণী), ব্রায়োজোয়া (শ্যাওলা-প্রাণী), ফোরোনিডিয়া (গ্রীক্ পুরাণের কুমারী ফোরোনিস থেকে যার নাম দেওয়া হয়েছে), ব্রাকিওপোডা (বাহু-পদ বা অস্ত্র-পদ প্রাণী), একিনোডারমাটা (অংশুকায় বা কণ্টকচর্ম প্রাণী), চিটোগ্‌নাথা (আঁশ-চোয়ালে প্রাণী), মোলাস্কা (নরম-শরীর প্রাণী), অ্যানেলিডা (আংটি-ওয়ালা প্রাণী), সাইপানকিউলোয়ডিয়া (নলের মত প্রাণী), প্রায়াপিউলোয়ডিয়া (গ্রীক্ ও রোমান্ দেবতা প্রায়াপাস্ থেকে যার নাম হয়েছে), একিউরয়ডিয়া (অ্যাডার-পুচ্ছ প্রাণী), আরথ্রো-পোডা (সন্ধিপদ প্রাণী)। এদের নামের অর্থ সম্ভব মত পাশে পাশে দেওয়া হ'ল। তাই

থেকেই এদের চালচলনের একটু-আধটু আভাস পাওয়া যাবে। এদের সবগুলির কথা বলতে গেলে হয়তো তোমাদের কাছে নীরস লাগবে, তাই এদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে কয়েকটির কথাই শুধু বলব।

না-প্রাণী না-উদ্ভিদ্

তবে কতকগুলি জীব আছে যাদের ঠিক প্রাণী বলব না উদ্ভিদ্ বলব ঠিক করে ওঠা কঠিন। কারণ উদ্ভিদ্ আর প্রাণীর যা বৈশিষ্ট্য তার দু'টিরই কিছু কিছু এদের মধ্যে দেখা যায়। ফলে কেউ কেউ এদের বলেন উদ্ভিদ্, কেউ কেউ বলেন প্রাণী। কোনও কোনও জাতের ব্যক্‌টিরিয়া বা জীবাণুকে এই দলে ফেলা যায়। সমুদ্রের জলের ডায়াটম্-এর নাম তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। এদেরকেও উদ্ভিদ্ বা প্রাণী কোন্ দলে ফেলবেন তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতান্তর আছে—যদিও উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানীরা ওকে উদ্ভিদের মধ্যে ফেলবার জন্যই বেশী ব্যস্ত। তবে এই সব না-প্রাণী না-উদ্ভিদ জীবকে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ কোনটাই না বলে একটা মাঝামাঝি পৃথক্ জীব হিসেবে গণ্য করলেই ভালো হয় এবং আধুনিক বিজ্ঞানীদের অনেকে তাই-ই করেছেন। এদের নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটিস্ট। বলা বাহুল্য এই প্রোটিস্টরা সবই খুব সূক্ষ্মদেহ—কেবল মাত্র অণুবীক্ষণের নীচে রেখেই এদের চিনে নিতে হয়।

প্রথম প্রাণী—প্রোটোজোয়া

প্রোটোজোয়া হচ্ছে প্রথম প্রাণী এবং, এদের মধ্যেও, এমন কয়েকটিকে ঢোকানো হয়েছে যারা না-প্রাণী না-উদ্ভিদ্। সেগুলো প্রাণীদের মতই চলাফেরা করতে পারে, আবার সবুজ উদ্ভিদের মতই বাতাস থেকে সোজা নিজেদের খাবার—কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদি তৈরী করে নিতে পারে—যা কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য তাদেরও শরীরে গাছেদের মত সবুজ

ঘুম রোগের প্রোটোজোয়া

দানব-অ্যামিবা

আমাশয়ের অ্যামিবা
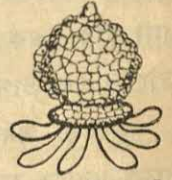
খোলস বাসী অ্যামিবা
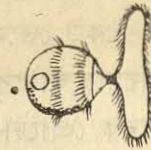
সিলিয়েট জাতের প্রোটোজোয়া

একটি প্রোটোজোয়া আর একটিকে খাচ্ছে

বিভিন্ন জাতের প্রোটোজোয়া

কণা ক্লোরোফিল দেখতে পাওয়া যায়। এদের কথা বাদ দিলে এই দলের আর যত সব জীব তাদের প্রাণীই বলা চলে।

প্রাণী হলেও খুব সরল চেহারার প্রাণীই বলতে হবে। একটি মাত্র কোষ বা সেল দিয়ে এদের প্রত্যেকেরই শরীর তৈরী হয়েছে, তাই এদের বলা হয় এককোষী প্রাণী। এর আগে তোমাদের প্রথম জীবন্ত প্রাণী অ্যামিবার

কথা বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২-১০৩)। অ্যামিবাও এই প্রোটো-জোয়াদের মধ্যেই পড়ে।

সরল হলেও প্রোটোজোয়াদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি হাজার রকমের প্রোটোজোয়ার সন্ধান পেয়েছেন। তবে আকারে সবই অতি ছোট—সামান্য কয়েক মাইক্রোন থেকে বড় জোর কয়েক মিলিমিটার হবে। এক মিলিমিটার হচ্ছে এক সেন্টিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ, আর এক মাইক্রোন হচ্ছে এক মিলিমিটারেরও হাজার ভাগের এক ভাগ,—ইঞ্চির হিসেবে বলা যায়—এক ইঞ্চির প্রায় পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ।

অনেক সময় এরা একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে থাকে—যাকে বলে উপনিবেশ গড়ে থাকা সেই রকম আর কি! অবশ্য দল-ছাড়া প্রোটো-জোয়ারও অভাব নেই। কেউ কেউ ভেসে বেড়ায়, কেউ কেউ আবার এক জায়গায় আটকে থাকে—গাছের মত। আবার অনেক প্রোটো-জোয়া আছে যারা বাস করে অন্য প্রাণীর শরীরে।

প্রোটোজোয়ার শরীর একটি মাত্র কোষ দিয়ে তৈরী বলেছি। কি আছে সেই কোষে? আছে থলথলে জেলির মত এক রকম পদার্থ যার নাম প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌। এই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ই হচ্ছে জীবের আসল প্রাণরস। প্রাণী বা উদ্ভিদ্‌—সমস্ত সজীব পদার্থেরই দেহকোষ এই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ দিয়ে ভর্তি। প্রোটোপ্লাজ্‌মের ভিতর খানিকটা অংশ খুব ঘন—তাকে বলা হয় নিউক্লিয়াস্‌, বাকি অংশটুকুর নাম দেওয়া হয়েছে সাইটোপ্লাজ্‌ম্‌। প্রোটোজোয়ার দেহ একটি মাত্র কোষে তৈরী হলেও সেই কোষের প্রোটোপ্লাজ্‌মে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস্‌ থাকতে পারে। এ ছাড়াও আছে কতকগুলি ফাঁকা জায়গা বা গহ্বর—যাকে বলা হয় ভ্যাকুওল। এর কোনটায় জল ভর্তি করা হয়—অর্থাৎ সেগুলো জলের গহ্বর, কোনটায় খাবার ভর্তি করা হয়—সেগুলো খাবারের গহ্বর। আবার কোন কোন গহ্বরকে দরকার হলে ছোট-বড়ও করতে পারে এরা।

মানুষ বা অন্যান্য উন্নত প্রাণীদের শরীর বহু কোষ দিয়ে তৈরী। কতকগুলি একই ধরণের কোষ একত্র হয়ে সেখানে তৈরী হয় টিস্যু—এবং এই টিস্যুগুলিরও প্রত্যেকের কাজ আলাদা। অর্থাৎ সেখানে বিভিন্ন কোষকে বিভিন্ন ধরণের কাজ করবার জন্য যেন আলাদা করে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রোটোজোয়া তার সমস্ত কাজ ঐ একটা কোষ দিয়েই হাসিল করছে। খাওয়া, চলা, নিঃশ্বাস নেওয়া, এমন কি বংশবিস্তার পর্যন্ত সমস্ত কাজ! কাজেই, বলা যেতে পারে, যে, প্রোটোজোয়ার শরীরের গড়ন অত্যন্ত সরল হলেও তার কোষটি সে রকম নয়। সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। একাই একশ', একাই সমস্ত কাজ নির্বিবাদে করে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, প্রোটোজোয়ারা জল-স্থল-অন্তরীক্ষ সর্বত্রই থাকতে পারে। পরিষ্কার জলে, পানা-পুকুরে, খানা-ডোবায়, সমুদ্রের নোনা জলে, মাটিতে, কাদায়, বরফের রাজ্যে, এমন কি গরম জলের ঝরণায় (৫১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা ১৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপেও) ওদের দেখা

গেছে। কেউ কেউ অন্য প্রাণীর শরীরের ভিতরেও বসবাস করতে পটু—সে কথা তো আগেই বলেছি।

নানা জাতের প্রোটোজোয়া

প্রোটোজোয়ার মধ্যেও আবার নানা রকম জাতিভেদ করা যায়। এর মধ্যে গুটি চারেকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফ্লাজেলেট, সার্কোডিনা, স্পোরোজোয়া আর সিলিয়েট। ফ্লাজেলেটদের সামনের দিকে এক বা একাধিক লম্বা লম্বা সূতোর মত শুঁড় বেরিয়ে থাকে। এগুলোকে বলে ফ্লাজেলাম্—যার থেকে ওদের নাম হয়েছে ফ্লাজেলেট। এই লম্বা শুঁড় দিয়ে জল নেড়ে নেড়ে ওরা চলাফেরা করে, জলে ঢেউ তুলে খাবার টেনে আনতে পারে, আবার হয়তো ঐ শুঁড় দিয়েই আশপাশের অবস্থার আঁচ করতে পারে।

এদের কেউ কেউ সময় বিশেষে শরীরের একটা অংশকে ফাঁপিয়ে খানিকটা প্রোটো-প্লাজ্‌ম্ এমন ভাবে বাড়িয়ে দিতে পারে যে দেখলে মনে হবে বুঝি ওর গা থেকে হঠাৎ একটা ঠ্যাং বেরিয়ে এল। সত্যি কিন্তু ওটা ঠ্যাং নয়, তাই ওর নাম দেওয়া হয়েছে 'সিউডোপড্' বা নকল পা। ভাল বাংলায় বলে 'ক্ষণপদ', অর্থাৎ কিনা যে পা ক্ষণকালের জন্য গজায়। আসলে খাদ্য শিকারের জন্যই ঐ নকল পা-টা হঠাৎ ঐ রকম গজিয়ে তোলা হয়, আবার প্রয়োজন শেষ হলেই গুটিয়ে ফেলে যে কে সেই! কোন কোন ফ্লাজেলেট আবার শরীরটাকে গুটিয়ে ফেলে একেবারে গোল দানার মত করে ফেলতে পারে। এই অবস্থায় ওদের শরীর থেকে এক রকম রস বেরিয়ে চারিদিকে একটা শক্ত আস্তর তৈরী করে ফেলে। তার পর হয়তো ভেতরের জল একদম শুকিয়ে যায়, শুকনো গুঁড়োর মত সেই প্রোটোজোয়া উড়তে থাকে বাতাসে—কখনও বা অন্য জন্তু-জানোয়ারের গায়ে লেগে চলে যায় দূর থেকে দূরান্তরে। কিন্তু তাতেও সে প্রোটোজোয়া মরে না। ঐ শক্ত আস্তরের নীচে দিব্যি বেঁচে থাকে—দীর্ঘ দিন।

এই ক্ষুদে প্রাণীদের মধ্যে কোন কোনটা আবার আমাদের পরম শত্রু। ট্রাইপ্যানো-সোমা নামে এক জাতের ফ্লাজেলেট প্রোটো-জোয়া আছে যেগুলো হচ্ছে ঘুম রোগের কারণ। লম্বা ছুঁচলো এদের দেহ, তেমনি লম্বা শুঁড়। যখন কারো শরীরে ঢোকে তাকে তো কাবু করেই, আবার কোন মাছি যদি সেই লোকটিকে কামড়ায় তা হলে সেই মাছির শরীরেও ঢুকে গিয়ে বাড়তে থাকে। তার পর সেই মাছি যদি আবার কাউকে কামড়ায় তা হ'লে তারও রেহাই নেই,—ওই মারাত্মক ঘুম রোগ,—ইংরেজীতে যাকে বলে 'স্লীপিং সিক্‌নেস্', তাকেও আক্রমণ করবে—মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে চলে যাবে তার মগজে। ঘুমুতে ঘুমুতেই ঘনিয়ে আসবে রোগীর মৃত্যু।

সার্কোডিনা

সার্কোডিনা জাতের প্রোটোজোয়ার মধ্যে অ্যামিবাও পড়ে। অ্যামিবার কথা তোমাদের আগেই বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২-১০৩)। এই এককোষী প্রাণীরা মুহূর্তে মুহূর্তে আকার বদলাতে পারে। অর্থাৎ

এক বা একাধিক সিউডোপড্ অর্থাৎ ক্ষণপদ বা নকল পা (কেউ কেউ বলেন আঙ্গুল) যখন তখন হঠাৎ গজিয়ে ওদের দেহের আকার বদলে দেয়। কারণটা তো আগেই বলেছি। সাধারণ অ্যামিবাকে বলা হয় অ্যামিবা প্রোটিউস্। গ্রীক্ পুরাণে গল্প আছে প্রোটিউস্ নামে এক দেবতা ইচ্ছেমত যখন তখন নিজের চেহারা বদলাতে পারতেন। সেই দেবতার মত চেহারা বদলাতে পারে বলে এই অ্যামিবারও নাম দেওয়া হয়েছে অ্যামিবা প্রোটিউস্।

সাধারণ অ্যামিবার শরীরে একটিমাত্র কোষ, একটি মাত্র নিউক্লিয়াস্। কিন্তু কেয়স বা দানব অ্যামিবা (জায়াণ্ট অ্যামিবা) নামে এক জাতের অ্যামিবার একটি কোষের মধ্যেই শত শত নিউক্লিয়াস্ দেখা যায়। এই দানব-অ্যামিবা পাঁচ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

ফ্লাজেলেটদের মত অ্যামিবাদেরও কেউ কেউ আমাদের সঙ্গে পরম শত্রুতা করতে ছাড়ে না। এন্ট্যামিবা হিস্টোলিটিকা নামে এক জাতের অ্যামিবা বাস করে মানুষের অন্ত্রে অর্থাৎ নাড়িভুঁড়ির মধ্যে। এদের শরীর থেকে এক রকম রস বেরিয়ে আমাদের অন্ত্রের ভিতরকার আস্তরণ গালিয়ে ফেলে। অ্যামিবা তারই সুযোগ নিয়ে চলে আসে একেবারে সেখানকার টিস্যু আর পেশীর মধ্যে—এমন কি লিভার বা যকৃতের মধ্যেও ঢুকে পড়তে পারে। সেখানে গিয়ে রক্তের লাল আর শ্বেতকণাগুলি দিয়ে সুরু হয় তার ভোজ। অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি (রক্ত-আমাশয়) রোগের কারণ হচ্ছে এই। আমাদের দাঁতের মাড়িতে যে পায়োরিয়া রোগ ধরে তারও কারণ এই রকম আর এক জাতের অ্যামিবার আক্রমণ। এরা এন্ট্যামিবাদের আর একটা স্পিসিস্ বা প্রজাতি।

ফোরামিনিফেরা নামে এক জাতের অ্যামিবা আছে যারা থাকে সমুদ্রের জলে। এরা সাধারণতঃ বাস করে খোলার মধ্যে। চূণা-পাথরের তৈরী এই খোলাগুলি ওদেরই শরীর থেকে নিঃসৃত রস দিয়ে তৈরী করে নেয় ওরা। কখনও কখনও সমুদ্রে ভাসমান অন্য প্রাণীর পরিত্যক্ত পাথুরে খোলার টুকরো নকল পা দিয়ে টেনে নিয়ে নিজেদের আঠাল গায়ের সঙ্গে যুড়ে নিতেও ছাড়ে না।

স্পোরোজোয়া ও সিলিয়েটা

স্পোরোজোয়ারা সকলেই পরজীবী অর্থাৎ পরগাছা জাতীয়,—বাস করে অন্য প্রাণীর শরীরে। এদের শরীর থেকে বীজ বা রেণুর মত এক রকম পদার্থ বেরোয়, তার নাম স্পোর্; আর সেই জন্যই এদেরও নাম স্পোরোজোয়া। এই জাতের মধ্যে প্লাজ্মোডিয়াম্ নামে এক রকম স্পোরোজোয়া আছে। এইগুলোই হচ্ছে ম্যালেরিয়া রোগের বীজ। অ্যানোফেলিস্ জাতের স্ত্রী-মশার কামড়ে এই বীজ তাদের শরীর থেকে মানুষের শরীরে ঢুকে তার দেহ—বিশেষ করে রক্তকোষগুলি আক্রমণ করে। মানুষ ছাড়া বাঁদর, পাখী, ব্যাঙ, বাদুড়, কাঠবেড়ালী, হরিণ প্রভৃতি বহু জাতের প্রাণীরও ম্যালেরিরা হ'তে দেখা গিয়েছে। মূল কারণ এই প্লাজ্মোডিয়ামের আক্রমণ।

সিলিয়েট বা সিলিয়েটা প্রোটোজোয়ার গায়ে থাকে অনেকগুলি ছোট ছোট লোমের মত পদার্থ। তাকে বলা হয় সিলিয়া।

ফ্লাজেলামের চাইতে এগুলি আকারে অনেক ছোট কিন্তু সংখ্যায় থাকে অনেক বেশী। এই সিলিয়ার সাহায্যেই এই জাতের প্রোটোজোয়ারা নড়া-চড়া, চলাফেরা করে।

স্পঞ্জের কাহিনী

এক-কোষী প্রাণী থেকে এবার আমরা নানা জাতের বহুকোষী প্রাণীর কথা একে একে আলোচনা করব। প্রথমেই যে দলের কথা মনে পড়ছে তাদের বৈজ্ঞানিক নাম
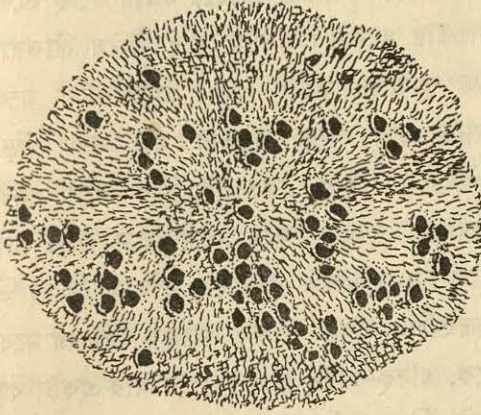
'সহস্রানন' স্পঞ্জ

পরিফেরা, যার বাংলা করলে হয় সচ্ছিদ্র প্রাণী। দল বলতে এখানে ফাইলাম বা পর্ব বুঝতে হবে। এই পর্বে আছে প্রায় পাঁচ হাজার রকমের প্রাণী। তার মধ্যে প্রধান বলা যায় স্পঞ্জ জাতের প্রাণীকে।

রাবণ রাজার ছিল দশটা মাথা, তাই তার নাম দশানন। সেই হিসেবে স্পঞ্জকে বলা চলে সহস্রানন। ঠিক হাজারটা মাথা না থাকলেও ওর আছে হাজারটা মুখ আর হাজারটা পেট। এক কথায়, এই প্রাণীর সমস্ত দেহ যুড়েই মুখ—সমস্ত দেহ যুড়েই পেট। একটা নয়, দু'টো নয়—অসংখ্য মুখ, অসংখ্য পেট। ঐ মুখ আর পেটের দৌলতে সমস্ত প্রাণীটারই দেহ ঐ রকম ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

সত্যি কথা বলতে কি, রবারের মত নরম, ফোঁপরা-দেহ এই বস্তুটিকে, বলে না দিলে, প্রাণী বলে অনুমান করাও কঠিন। রবারের মতই টিপলে বসে যায়, আবার আঙ্গুল ছেড়ে দিলে আগের আকারে চলে আসে। একটু জল ঢেলে দাও, ঐ ঝাঁঝরা শরীর দিয়ে সমস্ত জল তক্ষুনি শুষে নেবে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তা ধরে রাখবে! এ কেমন ধারা জানোয়ার?

বাস্তবিক স্পঞ্জ যে আসলে কি তা বিজ্ঞানীরা বহুদিন পর্যন্ত জানতেন না। কেউ কেউ মনে করতেন এগুলি বুঝি কোন জলজ উদ্ভিদ্। গাছের মতই নড়বার-চড়বার ক্ষমতা নেই, সমুদ্রের মধ্যে একটা ডুবো-পাথরের গায়ে আটকে রইল তো চিরকাল আটকেই রইল। জন্তুদের সঙ্গে ওদের যে কোন মিল থাকতে পারে এ বিশ্বাস করাও কঠিন বৈ কি! কেউ কেউ আবার ভাবতেন, নাঃ, উদ্ভিদ্‌ও নয়, ওগুলি নিশ্চয়ই সমুদ্রেরই অন্য কোন মরা জন্তুর খোলস-টোলস বা ঐ রকম কোনও পরিত্যক্ত অংশ হবে।

কিন্তু কোন রহস্যই যেমন চিরকাল রহস্য থাকে না, স্পঞ্জের বেলাও তেমনি রহস্যের মীমাংসা হ'ল একদিন। বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন—স্পঞ্জ জলের তলায় জ্যান্ত অবস্থায় বাস করে এবং ওরা এক রকম জলের প্রাণী ছাড়া আর কিছু নয়। চাল-চলন দেখে নাম-করণও হয়ে গেল ওদের।

বেশীর ভাগ স্পঞ্জই সমুদ্রের বাসিন্দা, তবে সময় সময় নদী বা পুকুরের মিষ্টি জলেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। জলের তলায় কাদার মধ্যে কিংবা কোন ডুবো-পাথরের গায়ে এরা স্থায়ী ভাবে লেপ্টে বাস করে—সময় সময় সঙ্ঘবদ্ধ হয়েও। শুধু সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নয়, তখন একটির সঙ্গে একটির শরীরও যায় যুড়ে, ফলে বহু স্পঞ্জ মিলে এক বিরাটাকার স্পঞ্জের উপনিবেশ গড়ে তোলে। সমুদ্রের জলে যে সব রাসায়নিক পদার্থ মেশানো থাকে তারই সাহায্যে তৈরী হয় স্পঞ্জের খোলস। খোলসের ভিতর আসল প্রাণীগুলি কিন্তু চট্‌চটে আঠার মত, গন্ধটিও তেমন মধুর নয়।

হঠাৎ দেখলে এই সব স্পঞ্জকে জিলেটিনের

বিচিত্র আকারের অতিকায় স্পঞ্জ

মত নরম ফাঁপা নলে তৈরী গাছ বলে ভুল হতে পারে। আকারও বিচিত্র। কোনটা ফুলদানীর মত, কোনটা চ্যাপ্টা বাটি বা গেলাসের মত। কোন কোনটা থেকে আবার ডালপালার মত শাখা-প্রশাখাও বেরুতে দেখা যায়। সময় সময় এগুলি বেশ বড়ও হয়। ছ' ফুট উঁচু স্পঞ্জও দেখা গেছে।

স্পঞ্জের জীবনযাত্রা

জলের তলায় স্পঞ্জ মাছের মতই অক্সিজেন নিতে পারে ; কিন্তু সবচেয়ে মজার হচ্ছে ওদের খাওয়ার ধরণটা। সারা দেহে ঐ যে ঝাঁঝরার মত অসংখ্য ফুটো ওর প্রত্যেকটির মধ্যে আছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতোর মত সরু শুঁড়। শুঁড়গুলো কিন্তু কোনটিই স্থির হয়ে নেই, ক্রমাগত নড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে জলে ঢেউ তুলে সে জলকেও ক্রমাগত ঢুকিয়ে দিচ্ছে ঐ ছিদ্রগুলির মধ্যে। ঐ জল স্পঞ্জের শরীরের মধ্যে ঢুকে, এদিক্-ওদিক্ ঘুরে, আবার আর একটা বড় ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ; কিন্তু ওরই ফাঁকে স্পঞ্জ তার কাজও হাসিল করে নিচ্ছে। সমুদ্রের জলের মধ্যে আছে অসংখ্য ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী আর ক্ষুদে ক্ষুদে উদ্ভিদ্। এত ক্ষুদে যে খালি চোখে তাদের দেখা যায় না, দেখতে হয় অণুবীক্ষণ দিয়ে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী আর উদ্ভিদ্‌কে বলা হয় প্ল্যাঙ্কটন। এই প্ল্যাঙ্কটনই হচ্ছে স্পঞ্জের খাদ্য। শরীরের ছিদ্র দিয়ে জল টেনে নেবার সময় অসংখ্য প্ল্যাঙ্কটনও ঐ ছিদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তার পর স্পঞ্জের দেহের অলিগলি সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে যাবার সময় স্পঞ্জ তাদের শুষে নেয়। শুষে

একেবারে হজম করে ফেলে। তা হলে স্পঞ্জে জল ঢুকবার ছিদ্রগুলোকে তার মুখ আর ভিতরকার অলিগলি সুড়ঙ্গ-পথকে তার পেট বললে ভুল বলা হবে কি ?

স্পঞ্জের গায়ের ফুটোগুলো কিন্তু আবার সব এক মাপের নয়। ছোট বড় দু'রকম ফুটো আছে। ছোট ফুটোগুলো দিয়ে তার মধ্যে খাবার সমেত জল ঢোকে, আর বড় ফুটোগুলো দিয়ে সে জল বেরিয়ে যায়; যাবার আগে খাবারগুলো জমা দিয়ে যায় স্পঞ্জের ভোজের জন্য। এই বড় ফুটোগুলোকে এক-একটি নালা বলা যেতে পারে। এর কোন কোনটা এত বড় হয় যে অনেক সামুদ্রিক প্রাণী, এমন কি কাঁকড়া পর্যন্ত ঐ নালার মধ্যে বাসা বেঁধে বাস করে।

আমাদের পুরাণে রক্তবীজ নামে এক রকম ভীষণ প্রাণীর কথা আছে—যাদের সহজে মরণ হ'ত না ; একটি রক্তবীজকে মারলে তার দেহ থেকে শত শত রক্তবীজ গজিয়ে উঠত। স্পঞ্জের সঙ্গে এক দিক্ দিয়ে এই রক্তবীজের খানিকটা মিল আছে। স্পঞ্জকেও মারা অত সহজ নয়। একটা স্পঞ্জকে যদি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো কর, তা হলেও সে মরবে না, ঐ প্রত্যেকটি টুকরো থেকেই গজিয়ে উঠবে এক-একটা নতুন নতুন স্পঞ্জ। শরীরের গড়ন খুব সাদাসিধে হওয়ায় আর কোষের সংখ্যা খুব বেশী না হওয়ার দরুণই এমনটা সম্ভব হয় বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তবে ডাঙ্গায় তুললে স্পঞ্জের আর বাঁচবার উপায় নেই। আমরা সাধারণতঃ যে সব স্পঞ্জ দেখি সেগুলি সবই মরা স্পঞ্জ—স্পঞ্জের খোলস। টেবিলে জল রাখার 'ড্যাম্পার' হিসেবে এবং স্নানের সময়ে গা রগড়াবার জন্য আমরা এই রকম স্পঞ্জের খোলসই ব্যবহার করি, জ্যান্ত স্পঞ্জ নয়।

স্পঞ্জের ব্যবসা বেশ লাভের ব্যবসা এবং পৃথিবীর মধ্যে গ্রীসের লোকেরাই এ ব্যবসায়ে সবচেয়ে ওস্তাদ্। এর কারণ, স্পঞ্জ সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় ওরই কাছাকাছি ভূমধ্যসাগরে আর লোহিত সাগরে। অবশ্য আমেরিকার ফ্লোরিডা অঞ্চলেও প্রচুর স্পঞ্জ পাওয়া যায়। পরিষ্কার সমুদ্রে জলের নীচে শ' চারেক ফুট নামতে পারলেই স্পঞ্জের দেখা মেলে। ডাঙ্গায় তুলে আসল জীবগুলোকে, অর্থাৎ ভিতরকার আঠাল অংশটুকু ধুয়ে এবং তারপর রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ভাবে বার করে দিয়ে খোলসটা বাজারে ছাড়া হয়।

স্পঞ্জ নড়াচড়া করতে পারে না বটে কিন্তু কোন কোন জাতের স্পঞ্জ ঘুরে বেড়াবার জন্য একটা অদ্ভুত কৌশলের সাহায্য নেয়। তারা জলের তলায় ডুবো-পাথরে লেপ্টে না থেকে আস্তানা গাড়ে কাঁকড়া-জাতীয় কোন সামুদ্রিক প্রাণীর পিঠে। ফলে কাঁকড়া যেখানে যায়, তারাও সেখানে গিয়ে নতুন নতুন খাবার সংগ্রহের সুযোগ পায়; আর কাঁকড়াও এই সাহায্য দেবার বদলে পায় গা ঢাকা দেবার একটা নিরাপদ ঢাকনা। কোন কোন জায়গায় আবার রং-বেরংয়ের বিচিত্র স্পঞ্জও দেখা গেছে।

সিলেনটেরাটা

সমুদ্রের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণী আরও নানা জাতের আছে। সী-অ্যানিমোন বা সমুদ্রের ফুল, সী-কিউকুম্বার বা সমুদ্রের শশা, জেলিফিশ,

প্রবাল ইত্যাদি হরেক রকম জন্তু। পরে যখন সামুদ্রিক প্রাণীদের কথা পৃথক্ ভাবে বলব তখন এদের গল্প ভাল করে শোনাব। তবে এটুকু জেনে রাখ যে এরা যে ফাইলাম বা পর্বের মধ্যে পড়ে তার নাম সিলেনটেরাটা। ওরা ছাড়া আরও বহু প্রাণী আছে ওর মধ্যে,—তা সবশুদ্ধ ন' হাজার হবে। এদের মধ্যে হাইড্রা নামে যে এক জাতের প্রাণী আছে তারা কিন্তু সমুদ্রে থাকে না—থাকে সাধারণ পুকুরে বা নদীর জলে। বাকি প্রায় সকলেই সমুদ্রের বাসিন্দা। তবে এই পর্বের বিশেষ এক ধরণের প্রাণীর কথা মনে আসছে। সামুদ্রিক প্রাণী হলেও তার কথা এখানেই বলে নেই।

প্রবালের কথা

খুকুর শরীর ভাল যাচ্ছে না, ডাক্তার-কবিরাজ হন্যে হয়ে গেলেন। শেষে এলেন এক জ্যোতিষী। হাত দেখে, কোষ্ঠী বিচার করে বললেন, 'ওর এখন মঙ্গলের দশা চলছে, একটা প্রবাল ধারণ করলেই ঠিক হয়ে যাবে।' সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করে আনা হ'ল একটা আংটি, ঈষৎ মেটে লালচে রংয়ের একটা চক্‌চকে পাথর বসানো তাতে। বেশ দামী পাথরই মনে হয়। ঐ পাথরেরই নাম প্রবাল, চলতি কথায় 'পলা'। ইংরেজীতে ওকেই বলে কোরাল্।

খুকুর অসুখ প্রবাল ধারণের পর সেরে গেল কিনা আমার ঠিক জানা নেই, তবে ঐ পাথরখানা কোথা থেকে এল তা জানবার জন্য তোমাদের মত আমারও কৌতূহল হয়েছিল প্রচুর। প্রবাল বা কোরাল্‌রা তো সমুদ্রের জীব বলেই শুনেছি, তবে পাথর হ'ল কি করে?
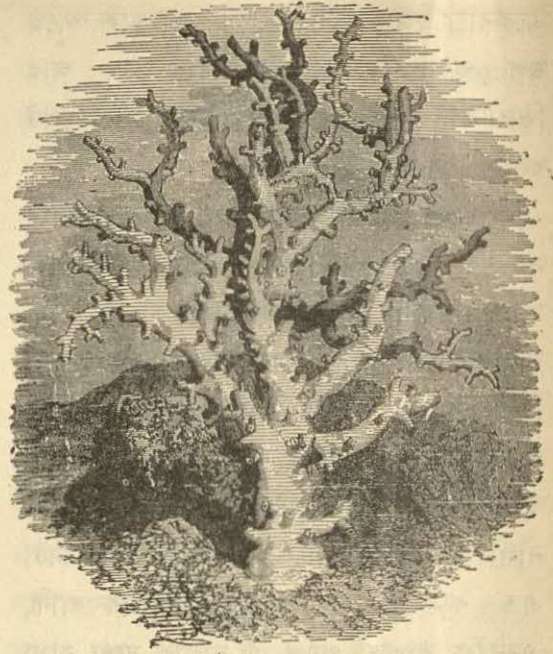
সমুদ্রের তলায় প্রবাল—ঠিক যেন পাথরের গাছ!

শুধু মূল্যবান্ পাথরই নয়, পাথরের ফুলের মত চেহারার প্রবালও আমরা অনেক দেখেছি। সমুদ্রের তলা থেকে ডুবুরীরা সেগুলো তুলে আনে, অনেক সময় জেলেদের জালেও উঠে আসে। পুরীর সমুদ্র-তীরে কিনতেও পাওয়া যায়। ঘর সাজাবার জন্যে এই পাথরের ফুল সংগ্রহ করে অনেকেই তা টেবিলে, আলমারিতে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু পাথরের জীব? কথাটা যেন কেমন কেমন লাগছে না?

সেকালকার লোকেরাও মনে করত প্রবাল বুঝি এক রকম সামুদ্রিক ফুল। কিন্তু ফুল যদি হয় তবে পাথরের মত এত শক্ত হবে কেন? কেউ কেউ বলত—জলের তলায় ওরা নরমই থাকে, ডাঙ্গায় তুললে হাওয়া লেগে শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এ উত্তরে খুসী হওয়া যায় কি? তখন একজন বিজ্ঞানী ঠিক করলেন তিনি

জলের তলায় নেমে হাতেনাতে পরীক্ষা করে দেখবেন। সত্যি একদিন ডুবুরীর পোষাক প'রে জলের নীচে নেমে গেলেন তিনি। গিয়ে দেখেন, ও মা! জলের নীচেও তো ওগুলো পাথরের মতই শক্ত! এ নিয়ে তখন সোরগোল উঠল, আরও পরীক্ষা—আরও গবেষণা চলল। শেষে একদিন সকল রহস্যের সমাধান হ'ল।

কি সমাধান? না—জানা গেল, প্রবাল এক রকম সামুদ্রিক প্রাণী—পোকাও বলতে পার, আর বলাও হয় তাই। তবে পোকা না বলে মিষ্টি করে আমরা বলি 'প্রবাল কীট'। এই প্রবাল কীটেরা যখন জন্মায় তখন নরমই থাকে —একেবারে কাদার মতই নরম বলতে পার। কিন্তু এদের আছে এক অদ্ভুত ক্ষমতা;—বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের জল থেকে এরা খাবার সংগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের থাকবার জন্য এক রকম আশ্চর্য খোলাও তৈরী করে যায়। খড়িমাটি বা চক্ যা দিয়ে তৈরী এই খোলাগুলিও তাই, বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে ক্যাল্সিয়াম কার্বনেট। এই খোলাই হচ্ছে প্রবাল কীটের বাসা। আর সে বাসা ওদের শরীরের সঙ্গেই যোড়া থাকে। আমরা প্রবাল বলে এই বাসাগুলিকেই ডাঙ্গায় তুলে আনি, তাই সেগুলোকে পাথরের মত শক্ত মনে হয়। এই প্রবাল-পাথর অনেক সময় রঙ্গিনও হয়। লালচে মেটে রঙ্গিন প্রবাল-পাথর কেটে নিয়েই তৈরী হয় মূল্যবান্ পলা—যা খুকুকে দিয়ে ধারণ করানো হয়েছিল জ্যোতিষীর পরামর্শে।

প্রবাল কীটেরা কিন্তু কখনও একা থাকে না। দল বেঁধে বাস করাই এদের স্বভাব। আর সে কি ছোটখাট দল? একসঙ্গে কোটি কোটি প্রবাল একত্র হয়ে এই বাসা তৈরীর কাজে লেগে যায়, তার পর একের বাসা অপরের বাসার সঙ্গে যুড়ে দিয়ে সমস্তটা একাকার করে ফেলে। একেই বলা হয় প্রবাল উপনিবেশ।

প্রবাল দ্বীপ

তার পর? তার পর আর কি, কেউ তো চিরজীবী নয়—প্রবাল কীটেরাও নয়। যথা সময়ে সেগুলি মরে যায়, ওদের শরীরের নরম অংশগুলিও নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু খোলাটা রয়ে যায় যেমন-কে-তেমনই। ক্রমে সেটা জমে জমে হয়ে যায় একেবারে জমাট পাথরের মত শক্ত।
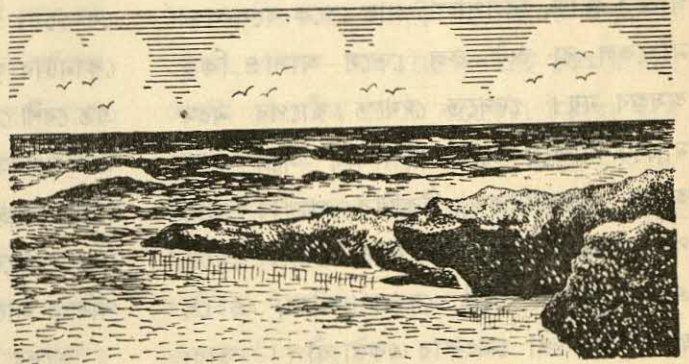
প্রবাল দ্বীপ

কখনও থাকে জলের নীচে, কখনও বা নদীর চরের মত সমুদ্রের জলের ওপর মাথা বার করে জেগে ওঠে। মাইলের পর মাইল এই শুক্‌নো ডাঙ্গার মত চরকে তখন আর চর বলা হয় না,— বলা হয় প্রবাল দ্বীপ (কোরাল্ আইল্যাণ্ড)।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে এই রকম একটি প্রবাল দ্বীপ আছে, সেটা প্রায় হাজার মাইল লম্বা।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বছরের পর বছর এই ভাবে কেটে যায়। সমুদ্রের জলে বিচিত্র পোকামাকড়ের অভাব নেই, তেমনি অভাব নেই নানা রকম জীবাণু বা ব্যাক্‌টিরিয়ার। এরা এসে প্রবাল দ্বীপের এখানে-সেখানে গর্ত করে গাঁথুনি ঢিলে করে দেয়। তার ওপর আছে ঢেউয়ের তোড়। ফলে ভাঙ্গা গাঁথুনি খসে খসে পড়ে—শক্ত পাথর গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে শেষ পর্যন্ত মাটিতে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে হয়তো কোন সামুদ্রিক পাখী ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় মুখে-করে-আনা কোনও গাছের ফল বা বীজ ওর ওপর ফেলে গেল, সমুদ্রের ঢেউও হয়তো ভাসিয়ে আনল কিছু। তা ছাড়া আশপাশের কোন বড় দ্বীপ থেকে ভাঙ্গা গাছের গুঁড়ি, ডালপালা, গাছ-থেকে-খসে-পড়া নারকেল বা অন্য ফল ভেসে আসাও কিছু অসম্ভব নয়। দেখতে দেখতে দ্বীপের নরম মাটিতে গজিয়ে ওঠে গাছপালা। সঙ্গে সঙ্গে আসে পোকামাকড়, টিকটিকি, পাখী। তার পর হয়তো নৌকো করে যেতে যেতে একদল মানুষ এসে দেখল—আরে, এ যে ফলে-ফুলে ভরা চমৎকার একটা দ্বীপ! তারা হয়তো সেখানেই নেমে পড়ল,—ঘর-বাড়ী বেঁধে বাস করতে সুরু করে দিল। এমনি ভাবেই ছোট্ট একদল সামুদ্রিক পোকা গড়ে তুলল পৃথিবীর বুকে নতুন নতুন দেশ—যা কোনও যুগে কোনও মানুষ নিজেরা গড়বার কল্পনাও করতে পারত না। এই রকম এক প্রবাল দ্বীপ সম্বন্ধেই কবি লিখেছিলেন :

"নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগ-নদী,
সোনার রেণু আনব ভরি
সেথায় নামি যদি।"

কীটপতঙ্গের রাজ্য—কৃমিকীটের কথা

নীচুতলার জলের প্রাণীদের কথা ছেড়ে এবার নীচুতলার ডাঙ্গার প্রাণীর রাজ্যে আসা যাক্। এরাই হচ্ছে কীটপতঙ্গ—যাদের আমরা চলতি কথায় বলি পোকামাকড়। এর আগে যে ২১টা পর্বের কথা বলেছি তারই কোন-কোনটার মধ্যে এরা পড়ে ; কিন্তু এদের সংখ্যা এত বেশী যে সবগুলির কথা বলতে গেলে সে এক সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই বেছে বেছে ওদের কয়েকটা সম্বন্ধেই বলব—বিশেষ করে যেগুলির সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচয় আছে।

এদের মধ্যে সবচেয়ে নীচুতলার প্রাণী বোধ হয় কৃমিকীট বা সংক্ষেপে কৃমি। কৃমিকে ডাঙ্গার প্রাণী বললেও ঠিক বলা হবে না—কারণ এরা বেশীর ভাগই পরগাছার মত,—পরজীবী প্রাণী। অর্থাৎ এরা থাকে অন্য প্রাণীর শরীরে। সেখানে তাদের ঘাড়ে চড়ে, তাদেরই খাবারে ভাগ বসিয়ে, তাদেরই শরীরের মধ্যে এরা পুষ্ট হয়—বংশ বিস্তারও করে সেইখানেই।

তবে পরজীবী নয় এমন কৃমিও আছে—যেমন প্ল্যানেরিয়া, যারা নাকি থাকে পুকুরে বা নালা-নর্দমায়।

যে সব কৃমি মানুষের দেহে বাস করে তাদের বেশীর ভাগই বেছে নেয় মানুষের অন্ত্র। এজন্য কৃমির আক্রমণ হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পেট ব্যথা, পেটের অসুখ এবং তা থেকে ক্রমে আরও নানা রকম ব্যাধি দেখা দেয়। ছোট ছেলেমেয়েরা কৃমির আক্রমণে ভোগে সবচেয়ে বেশী। কৃমির জন্য পেটের ব্যথায় চীৎকার করছে এ রকম ছেলেমেয়ে অনেকের বাড়ীতেই চোখে পড়বে। হবেই বা না কেন, একটা বা এক দঙ্গল জ্যান্ত পোকা যদি কারও পেটের মধ্যে বাসা বাঁধে তা হলে তা সহ্য করা সহজ কথা নয় তো!

কৃমিদের মধ্যে আবার গোল আর চ্যাপ্টা দু'রকম জাত আছে। চ্যাপ্টা কৃমিই বোধ হয় বেশী। বিজ্ঞানীরা এ রকম ৬ হাজার জাতের চ্যাপ্টা কৃমির খোঁজ পেয়েছেন। এদের মধ্যে ফিতে-কৃমি (টেপওয়র্ম্) আর লিভার-কৃমির নাম হয়তো তোমরা শুনেছ। আমি একবার এক পোকামাকড়ের প্রদর্শনীতে ১৪ ফুট লম্বা এই রকম একটা ফিতে-কৃমি দেখেছিলাম। সেটি একটি ছোট ছেলের পেটে পাওয়া গিয়েছিল। সাধারণতঃ শূয়োর-ভেড়ার শরীর থেকে এগুলি আসে। এ ছাড়া সুতোর মত, বঁড়শীর মত, আলপিনের মত, তুলোর আঁশের মত—নানা জাতের কৃমি আছে। হুক্-ওয়র্ম্ (আঁকশি-কৃমি) বলে এক রকম কৃমি আছে, যারা থাকে মাটিতে, কিন্তু সুযোগ পেলেই পায়ের তলা ভেদ করে মানুষের বা অন্য জীবের দেহে ঢুকে পড়ে।

কৃমিরা খায় কি করে? পণ্ডিতেরা বলেন, বেশীর ভাগ কৃমির মুখও নেই, খাদ্যনালীও নেই, এমন কি কোনও প্রত্যঙ্গই নেই। সমস্ত শরীরটাই ওদের মুখ। মনে হয় ওরা মানুষের পেটে থেকে একেবারে মানুষের হজম-করা খাবারের ওপর ভাগ বসায় আর সে খাবার সর্ব অঙ্গ দিয়ে শুষে নেয়। অর্থাৎ বলতে পার—সমস্ত দেহটাই ওদের পেট।

আংটিওয়ালা পোকা—অ্যানিলিডা

পর পর এক সারি আংটি একটার সঙ্গে একটা যুড়ে দিলে সবটা মিলে দেখায় একটা লম্বা নলের মত। এক জাতের পোকা আছে যাদের শরীর এই রকম আংটির মতই যোড়া দিয়ে দিয়ে তৈরী। এদের বৈজ্ঞানিক নাম অ্যানিলিডা। বাংলায় বলে অঙ্গুরীমাল। অঙ্গুরী বা অঙ্গুরীয় মানে আংটি তা জান নিশ্চয়ই? কেঁচো, জোঁক—এরা হচ্ছে সব এই রকম প্রাণী। একটা কেঁচোকে কেটে কয়েকটা টুকরো করে ফেল, কয়েক দিন পরে দেখবে কেঁচো মরে নি, প্রত্যেকটা টুকরো এক-একটা নতুন কেঁচো হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! জোঁকের বেলাও তাই। সমস্ত শরীরটা আংটি যুড়ে যুড়ে তৈরী হয়েছে বলেই এ রকমটা সম্ভব হয়।

কেঁচোকে আমরা খুব ঘেন্না করি। কিন্তু, সত্যি বলতে কি, কেঁচো আমাদের কোন অপকার তো করেই না—বরঞ্চ উল্টে আড়ালে থেকে অনেক উপকার করে। যে জমিতে প্রচুর কেঁচো বাস করে সে জমি ঐ কেঁচোর জন্যই উর্বরা হয়ে পড়ে। অদ্ভুত ফসল ফলে সেখানে। তাই কেঁচোকে বলা যায় চাষীর
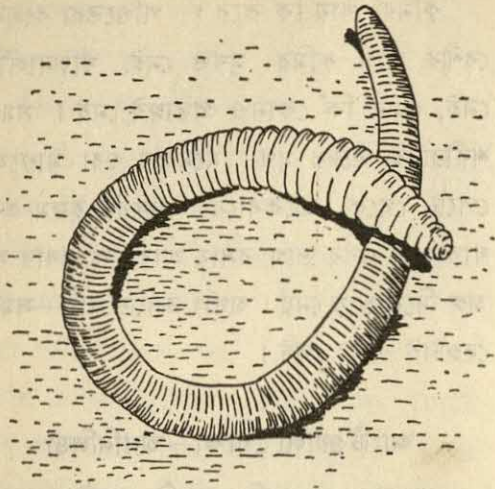
কেঁচোকে দেখলে ঘেন্না লাগে, কিন্তু ওরা আমাদের ভারী উপকারী বন্ধু

অজানা বন্ধু। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন —পাশাপাশি হু'সারি টব রেখে তার একটিতে যদি এক মুঠো কেঁচোর ছানা ছেড়ে দেওয়া যায়, আর অন্য সারিটি থেকে কৌশলে সব কেঁচো বার করে ফেলা যায়, আর তার পর তাতে গাছ পুঁতে দেওয়া যায়, তা হলে দেখা যাবে যে সারিতে কেঁচো ছাড়া হয়েছিল সেই টবগুলির গাছ তর্ তর্ করে বেড়ে যাচ্ছে আর যে সারি থেকে কেঁচো বার করে নেওয়া হয়েছিল সে টবগুলির গাছ সে তুলনায় একেবারেই নির্জীব হয়ে পড়েছে। আমেরিকার অনেক কৃষিক্ষেত্রে তাই আজকাল বৈজ্ঞানিক সারের বদলে কেঁচোর চাষ করে কেঁচো ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কেঁচোরা তেলাল খাবার ভালবাসে। ঐ রকম খাবার দিয়ে ওদের বংশ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ানো যায়। কিন্তু কেঁচো শুধু তেলাল খাবারই খায় না, খাবার সময়ে এরা বাগানের মাটি গিলে ফেলে। সেই মাটিতে থাকে গাছের পচা পাতা, ঝরে-পড়া বীচি, মরা পোকামাকড়ের দেহাবশেষ। মাটি থেকে খাবার টেনে নিয়ে কেঁচো আবার সে মাটি কুণ্ডলী করে বার করে দেয়। এগুলিকে আমরা বলি 'কেঁচোর মাটি' আর এগুলি দেখেই জমিতে কেঁচোর উপস্থিতি টের পাই।

কিন্তু কেঁচো জমি উর্বরা করে কি করে? কেঁচো ঐ রকম করে খাওয়ার ফলে নীচেকার মাটি ওপরে আর ওপরের মাটি তলায় চলে যায়,—ঠিক জমিতে লাঙ্গল দিলে যা হয়। অর্থাৎ কেঁচো জমিতে লাঙ্গল দেবার কাজ অনেকখানি করে দেয়। তা ছাড়া ওরা অনেক সময় মাটির ভিতর গর্ত করে পাঁচ-ছ' হাত নীচে চলে যায়। কেঁচো যত বেশী থাকবে গর্তও তত বেশী হবে। আর ঐ গর্তগুলি থাকাতে মাটির নীচে পাঁচ-ছ' হাত পর্যন্ত দিব্যি সরস থাকবে, জমিতে জল সেচ করার হাঙ্গামাও অনেক কমে যাবে। শুধু তাই নয়, ঐ গর্তগুলি গাছের শিকড়গুলিতে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন যোগাবে —যার ফলে গাছের জীবনীশক্তিও যাবে বেড়ে।

এক-একটা পূর্ণবয়স্ক কেঁচো লম্বায় ৮/১০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। আংটির সংখ্যা ১০০ থেকে ১২০। গোটা ১২ আংটির পর শেষ আংটি পর্যন্ত কতকগুলি ছিদ্র থাকে যা দিয়ে এক রকম রস বেরিয়ে কেঁচোকে সব সময়েই ভিজিয়ে রাখে। মাথার দিক্‌টা পেছনের চাইতে ছুঁচাল, তাই সহজেই এরা মাটির তলায় গর্ত করে ঢুকে যেতে পারে আর গর্ত করবার সময় মাটি খেতে খেতে চলে। ছুঁচাল মুখ থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত একটা লম্বা নল চলে গেছে। এটাই হচ্ছে কেঁচোর খাদ্যনালী।

কেঁচোর কি বুদ্ধি আছে? একটি ছোট্ট ছেলে আমাকে প্রশ্ন করেছিল। কেঁচোর গর্ত খুঁড়ে দেখা গেছে ওরা গর্ত খুঁড়ে এক টুকরো ইট বা পাথর এনে গর্তের মুখে চাপা দেয়—যাতে অন্য প্রাণী এসে ওদের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে। অনেক সময় শুক্‌নো পাতা এনে গর্তের মধ্যে বিছিয়ে দেয়—আরামে গা এলিয়ে দেবার জন্য। ওদের গায়ে কড়া আলো ফেললে বা জোরে শব্দ করলেও নাকি ওরা টের পায়। ধরে উল্টে দিলে ফের সোজা হয়ে যায়। তবে এগুলোকে ঠিক বুদ্ধি না বলে সহজাত প্রবৃত্তিই বলা উচিত।

কেঁচোর সম্বন্ধে যে প্রশংসাবাদ করা গেল, কেঁচোর জাতভাই জোঁক সম্বন্ধে কিন্তু তা করা সম্ভব হচ্ছে না। বরঞ্চ ঠিক উল্টো, এরা হচ্ছে হিংস্র, রক্তচোষা কীট। মানুষ, গরু, ছাগল—যাকে পায় তারই গায়ে আঁকড়ে ধরে তাদের রক্ত চুষে খায়। ধানক্ষেতে বা পানাপুকুরে এদের উপদ্রব খুব বেশী, একবার কামড়ে ধরলে সহজে ছাড়ানো যায় না। ছোট জাতের জোঁককে বলা হয় ছিনে জোঁক, বড় জাতের গুলোকে অনেকে বলেন মোষে জোঁক। এরা অসম্ভব রক্ত খেতে পারে। নিজের যা ওজন তার চেয়ে বেশী ওজনের রক্ত খেতেও এদের বাধে না। ফলে একবার পেট ভরে খেয়ে নিতে পারলে তার পর বেশ কিছুদিন না খেলেও এদের কোন কষ্ট হয় না। এজন্য কোন কোন দেশে জোঁক দিয়ে চিকিৎসা করার রেওয়াজ আছে। কারো রক্তের চাপ বেশী হ'লে জোঁক দিয়ে চুষিয়ে তার রক্ত বার করে দেওয়া হয়। প্রক্রিয়াটা একটু হাতুড়ে ধরণের, কিন্তু ফল না পাওয়া গেলে ওর চলই বা হ'ল কি করে?

যাদের পা যোড়া

এর পর যে পোকাদের কথা বলব তাদের নাম এক কথায় আর্থ্রোপোডা। বাংলায় বলা হয় সন্ধিপদ—অর্থাৎ যোড়া-দেওয়া-পা-ওয়ালা প্রাণী। প্রাণিরাজ্যে সংখ্যায় এরাই সবচেয়ে বেশী—কয়েক লক্ষ। আমাদের পরিচিত হাজার হাজার রকম প্রাণী এই পর্বের মধ্যে পড়ে। চিংড়ি থেকে সুরু করে কাঁকড়া-বিছে, মশা, মাছি, প্রজাপতি, আরশোলা, মৌমাছি, বোলতা, —এমন কি সবচেয়ে বুদ্ধিমান্ (?) পোকা পিঁপড়েও পড়ে এই দলে। নামের নমুনা থেকেই বুঝতে পারছ কত বিভিন্ন এদের আকৃতি আর কত বিচিত্র এদের চালচলন! কিন্তু বিজ্ঞানীরা এদের সবাইকেই এক পর্বে এনে ফেলেছেন,—সঙ্গত কারণেই। তবে এদের মধ্যে পতঙ্গ-দলের সংখ্যাই বেশী। মাছি, মশা, প্রজাপতি, বোলতা, —পিঁপড়ে এরা সবাই পতঙ্গ।

মাছি দিয়েই সুরু করি

গরম পড়বার সঙ্গে সঙ্গে মাছির উৎপাতও বেড়ে যায়। কেন বলতে পার? সে কাহিনী
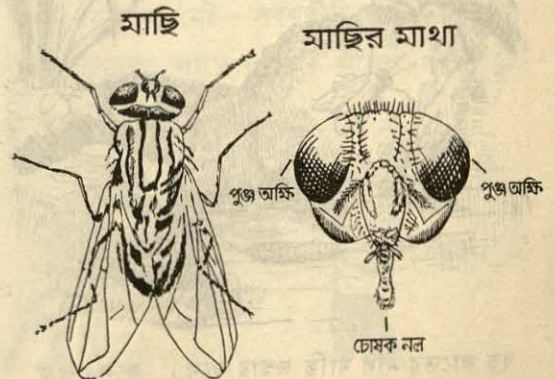
মাছি আর মাছির মাথা। মাথার মধ্যে অদ্ভুত চোখ লক্ষ্য কর।

জানতে গেলে মাছির জন্মবৃত্তান্তটা আগে জানা দরকার। মা-মাছিদের ডিম পাড়ার সবচেয়ে পছন্দসই জায়গা হচ্ছে ময়লার গাদা—ময়লা-ফেলা ডাস্টবিন্ ইত্যাদি। ডিম পাড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ডিম ফুটে মাছির ছানা বেরিয়ে আসে। কিন্তু মাছির সঙ্গে তার চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই। না আছে ডানা, না আছে চলবার-ফিরবার পা। সে এক কদাকার কিম্ভুত পোকা! ৩।৪ দিন ঐ অবস্থায় কাটিয়ে, আশপাশের নোংরা খেয়ে গায়ে একটু 'গত্তি লাগলেই' ওরা খাওয়া বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ওদের গায়ের চামড়া বা খোলস মোটা আর শক্ত হতে স্বরু করে এবং দেখতে দেখতে সমস্ত শরীরটাই সেই শক্ত খোলসের মধ্যে ঢাকা পড়ে যায়। মাছির ছানা

বড় জাতের নীল মাছি জন্মায় জলে। জলে থেকে বিভিন্ন অবস্থার পর মাছির ছানার পাখা গজাতেই সদ্যোজাত অবস্থায়ই সে উড়তে স্বরু করে।

সেই খোলসে (চামড়ার ঘরও বলতে পার, গুটিও বলতে পার) বন্দী থেকে ধীরে ধীরে নিজের চেহারা বদলে ফেলে। পা গজায়, মাথা গজায়, চোখ গজায়, ডানা গজায়। দেখা দেয় আরও কত সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! দেখতে দেখতে কদাকার পোকাটি একটি আস্ত মাছির রূপ ধরে শেষে খোলস ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এই যে পরিবর্তন—গ্রীষ্মকালে এটি ৩।৪ দিনের মধ্যেই ঘটে যায়, কিন্তু অন্য ঋতুতে এত তাড়াতাড়ি হয় না। এই জন্যই মা-মাছিরা গ্রীষ্মকালটাকেই ডিম পাড়ার উপযুক্ত সময় বলে মনে করে।

মাছির চেহারা এমনি দেখলে ভয়ানক কিছু মনে হয় না, কিন্তু অণুবীক্ষণের নীচে ফেলে যদি দেখ তবে ওর আসল স্বরূপ টের পাবে। লম্বা লম্বা তিন যোড়া ঠ্যাং আগাগোড়া ছোট ছোট কাঁটা দিয়ে ভর্তি। প্রত্যেক পায়ে হু'টো করে উঁচু উঁচু ঢিবি—সেগুলো কিন্তু আসলে শুঁয়ো দিয়ে তৈরী। মাছি আবার এই শুঁয়োগুলি থেকে এক রকম আঠাল রস বার করতে পারে। যখন কোন ময়লায় গিয়ে বসে তখন এই আঠাল শুঁয়োগুলির মধ্যে যত রকম ব্যারামের বীজাণু আটকে যায়—কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড—কোন্‌টা নয়? তার পর সেই মাছিই যখন তোমার খাবারে এসে বসল তখন ঐ শুঁয়ো থেকে সেগুলো বেরিয়ে এসে মিশে যায় খাবারের সঙ্গে। ফল কি হবে বুঝতেই পারছ। এর একমাত্র প্রতিকার মাছি-পড়া খাবার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেওয়া। আর তার চেয়েও ভাল ব্যবস্থা হচ্ছে বাড়ীঘর খুব পরিষ্কার রাখা। ময়লার গাদা ছাড়া মা-মাছিরা ডিম পাড়ে না। বাড়ীতে

মাছি থেকে সাবধান

মাছি কিভাবে জন্মায় আর কিভাবে রোগ ছড়ায়

মাছি ডিম পেড়েছে	মাছির শূক অবস্থা	গুটির মধ্যে বন্দী হ'ল	ডিম ফুটে মাছি বেরুল	মাছি সাবালক হয়েছে

গোয়াল ঘরে
খাটা পায়খানায়
ডাস্টবিনে
কাঁচা মাংসে
কাটা ফলে
শেষে খাবার টেবিলে
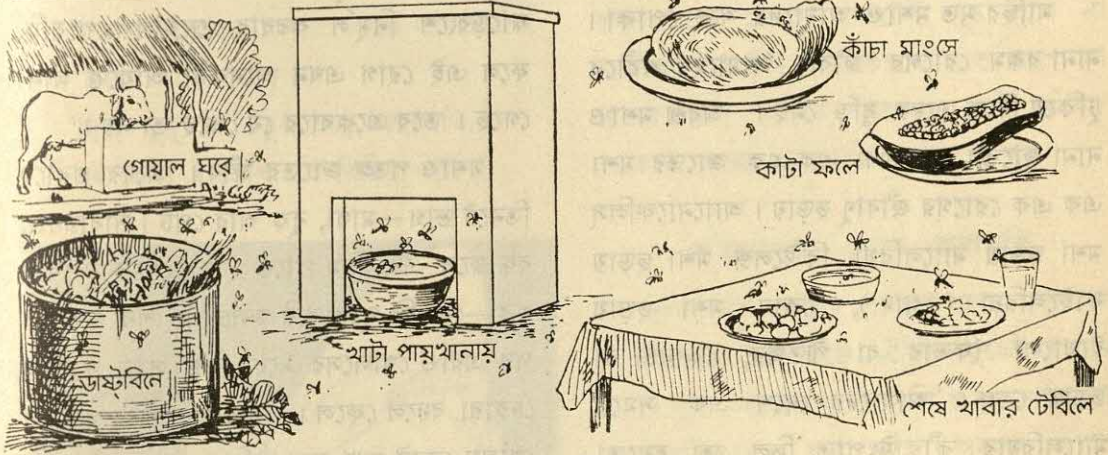
মাছি-চরিত্র

যদি ময়লা না জমতে দেওয়া যায় তা হ'লে মাছি জন্মাবেই না সেখানে, উৎপাত করবে কি করে?

মাছির কথা বলতে গিয়ে মাছির চোখের কথা না বললে কিছুই বলা হবে না। মাছির মাথা যদি ভাল করে লক্ষ্য কর—দেখবে সেখানে ২টি বড় বড় পর্দা রয়েছে—অসংখ্য ছিদ্রে ভরা সেই পর্দা। অন্ততঃ চার হাজার ছিদ্র তো আছেই! এই প্রত্যেকটা ছিদ্রই কিন্তু মাছির এক-একটা চোখ। ইন্দ্র যদি সহস্রাক্ষ হন—মাছি তা হলে চতুঃসহস্রাক্ষ (চতুঃ সহস্র অক্ষি যার) বলা চলে। কাজেই মাছির দৃষ্টি-শক্তি কি প্রখর আন্দাজ করা কঠিন নয়। এই জন্যই হাতের মুঠোয় মাছি ধরা বা চাপড় মেরে মাছি মারা অত সহজ নয়। এই ধরণের চোখকে বলা হয় পুঞ্জ-অক্ষি বা কম্পাউণ্ড আই।

আমাদের মত মাছির নাকি তেমন আলাদা কোন ফুস্‌ফুস্ নেই—সর্বশরীর যুড়েই নিঃশ্বাস নেবার ব্যবস্থা আছে ওদের। অনেক পতঙ্গেরই

মাছি দেখলেই তাড়াও। ওষুধ স্প্রে করে এ কাজ করা যেতে পারে।

তাই। আর মাছির ঐ ভন্ ভন্ শব্দ? ওটা আর কিছু না, ডানা নাড়ার শব্দ। মাছি সেকেণ্ডে কম করে ৬০০ বার এ রকম ডানা নাড়তে পারে আর সেই সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে উড়ে যেতে পারে—ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে।

মাছির পর মশা

মাছির মত মশাও আমাদের শত্রু পোকা। নানা রকম রোগের জীবাণু আমাদের শরীরে ঢুকিয়ে দিতে এদের যুড়ি নেই। অবশ্য মশাও নানা জাতের হয় এবং এক এক জাতের মশা এক এক রোগের জীবাণু ছড়ায়। অ্যানোফেলিস্ মশা ছড়ায় ম্যালেরিয়া, কিউলেক্স মশা ছড়ায় ফাইলেরিয়া (গোদ), কোন মশা ছড়ায় ইয়োলো ফিভার বা পীতজ্বর, কোনটা বা ছড়ায় ডেঙ্গু। আমাদের দেশে এক সময়ে ম্যালেরিয়ার কী উৎপাত ছিল তা হয়তো
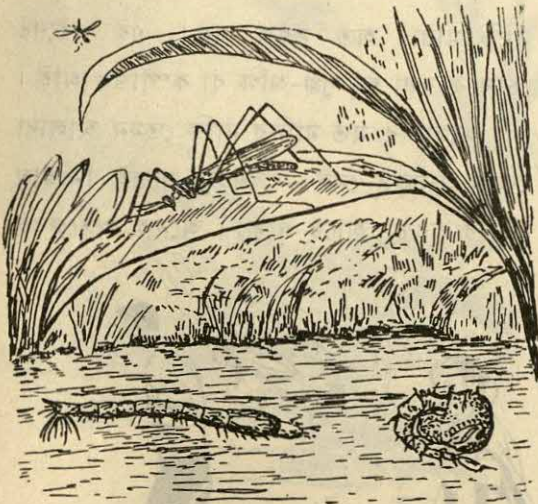
বদ্ধ জলে মশার জন্ম। মশারও তিন অবস্থা—শূক, গুটি এবং শেষে গুটি থেকে খোলস কেটে বেরোয় পাখাওয়ালা পূর্ণকায় মশা।

শুনেছ। কত গ্রাম-কে গ্রাম—শহর-কে শহর এই রোগে ছারখার হয়ে গিয়েছিল—কত লক্ষ লক্ষ লোক এই দুরন্ত রোগে প্রাণ হারিয়েছিল —সে এক বিভীষিকার ইতিহাস। একমাত্র কুইনিন ছাড়া ওর কোন ওষুধ ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ডি. ডি. টি. প্রভৃতি নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কারের পর আমরা মশাকে অনেকটা ঝাড়েবংশে নির্মূল করবার সুযোগ পেয়েছি, ফলে এই রোগ এখন অনেকটা আয়ত্তে আনা গেছে। তবে একেবারে যে গেছে তা নয়।

মশাও পতঙ্গ জাতের জীব। এদের শরীরে তিনটে ভাগ—মাথা, বুক আর পেট। সাধারণতঃ বদ্ধ জলে এরা ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বেরোয় শূক—যেগুলি পুরোপুরি জলচর। শূক অবস্থার পর এরাও খোলসের মধ্যে কিছু সময় কাটিয়ে চেহারা বদলে ফেলে। তার পর পাখা গজালে খোলস কেটে মশা হয়ে বেরিয়ে আসে। মশার বাচ্চা বা শূক জলে থাকার সময়েই সেই জলের ওপর কেরোসিন ঢেলে দিয়ে নিঃশ্বাসের বাতাস আটকে ওদের মেরে ফেলা যায়।

সব মশা-ই কিন্তু আমাদের কামড়ায় না। পুরুষ মশারা গাছের বা ফলের রস খেয়েই জীবনধারণ করে। যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে মেয়ে-মশা। ওদেরই মাথার সামনে থাকে রক্তচোষা নল, তাই চামড়ার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে এরা নিঃশব্দে মানুষের বা অন্য প্রাণীর রক্ত চুষে নেয় আর সেই সময়ে রোগের জীবাণুও (সাধারণতঃ প্রোটোজোয়া) দেয় ঢুকিয়ে।

কিউলেক্স আর অ্যানোফেলিস মশা চিনবার একটা সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। কিউলেক্স যখন কোথাও বসে, সমস্ত শরীরটাকে আসনের

ওপর সমান্তরাল ভাবে রেখে বসে। কিন্তু অ্যানোফেলিস বসবার সময় ও-ভাবে বসতে পারে না—শরীরটাকে তেরছা করে, আসনের সঙ্গে অর্ধেক সমকোণ অর্থাৎ ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে তবেই ওরা বসতে পারে।

আর আর পতঙ্গেরা

অন্যান্য পতঙ্গের কথা বলতে প্রজাপতির কথা আগে মনে পড়ছে।

"ফুর্ ফুর্ কি চতুর ওড়ে প্রজাপতি,
এই হেথা ঐ হোথা কি বিচিত্র গতি!"
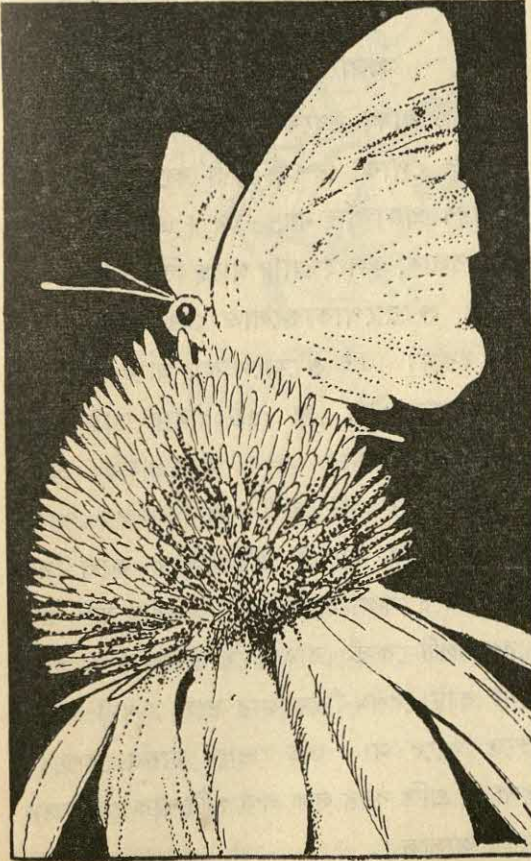
ফুলের গায়ে প্রজাপতি—একটি অপরূপ দৃশ্য।

—এ সব কবিতা আমাদের মত তোমরাও পড়েছ। বাস্তবিক প্রজাপতির মত অমন সুন্দর পোকা খুব কমই দেখা যায়। পাখার সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখলে অবাক্ লাগে। ফুলে ফুলে ওরা ঘুরে বেড়ায়—ফুলের মধুর খোঁজে।

কিন্তু এই প্রজাপতিই যখন আরও বাচ্চা অবস্থায়,—যাকে বলে শূককীট অবস্থায় থাকে তখন ওকে দেখলে মোটেই মুগ্ধ হবে না—বরঞ্চ গা ঘিন্ ঘিন্ করবে। শুঁয়োপোকা দেখেছ তো গাছের ডালে? এই শুঁয়োপোকাই হচ্ছে প্রজাপতির বাচ্চা বা শূক।

শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি

প্রজাপতি গাছের পাতার ওপর একসঙ্গে অনেকগুলো ডিম পাড়ে। ঐ ডিম ফুটেই বেরোয় ওদের শূক—যাদের আমরা বলি শুঁয়োপোকা বা ক্যাটারপিলার। সারা অঙ্গে অসংখ্য শুঁয়ো থাকার দরুণই ঐ নাম। তবে সব শুঁয়োপোকারই শুঁয়ো থাকে না। বিশেষতঃ যে বিশেষ জাতের প্রজাপতি বা মথ্ রেশম তৈরী করে তাদের শূকের গায়ে মোটেই শুঁয়ো দেখতে পাবে না।

এই শুঁয়োপোকাগুলো হচ্ছে ভীষণ পেটুক। রাতদিন গাছের পাতা খাচ্ছে তো খাচ্ছেই! খেতে খেতে যখন দিব্যি মোটা হয়ে পড়ে তখন হঠাৎ এরা খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে মুখ থেকে এক রকম লালা বার করতে থাকে আর সেই লালা দিয়েই নিজের শরীরের চারদিক্ ঢেকে ফেলে। দেখতে দেখতে সেই লালা জমে শক্ত হয়ে গুটির মত হয়ে যায়, আর শুঁয়োপোকা সেই গুটির মধ্যে নিজেকে বন্দী করে ফেলে। এই অবস্থায় তখন আর সে
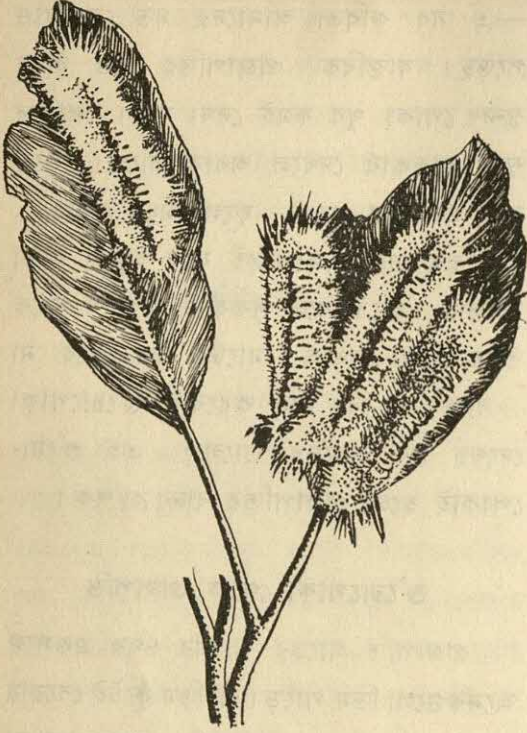
পাতার গায়ে শুঁয়োপোকা

শুঁয়োপোকা নয়—গুটিপোকা। এই গুটির মধ্যেই শুঁয়োপোকা তার চেহারা আমূল বদলে ফেলে এবং ঐখানেই তার ডানা গজায়। ডানা গজালে তখন সে নিজেই গুটি কেটে প্রজাপতির রূপ ধরে বেরিয়ে আসে।
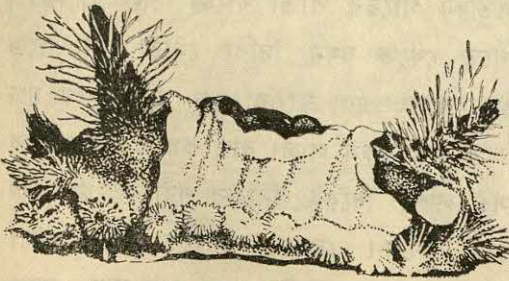
বিচিত্র চেহারার জীবটিকে চিনতে পার? এও এক জাতের শুঁয়োপোকা। চেহারার মতই বিচিত্র এদের গায়ের রং, কিন্তু ভারী বিষাক্ত এরা।
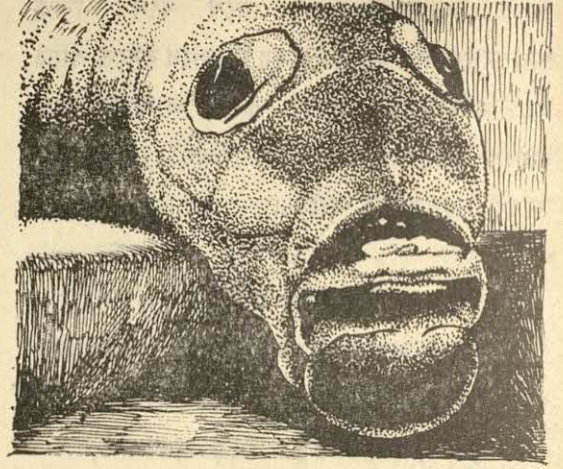
চেহারা দেখে ভয় পেও না। সাধারণ শুঁয়োপোকার মুখটা বড় করে দেখালে এই রকমই হবে।

প্রজাপতির জাতভাইরা

গুটিপোকা থেকেই আমরা রেশম পাই। যে সব পোকা রেশম তৈরী করে তারা ঠিক সাধারণ প্রজাপতি নয়,—মথ্। এরা সাধারণতঃ তুঁত, পলাশ, কুল ইত্যাদি গাছে ডিম পাড়ে আর এদের শুঁয়োপোকাগুলোও দেখতে হয় একটু অন্য রকম। এই শুঁয়োপোকা, যাদেরকে বলা হয় রেশম-কীট, যে গুটি বানায় তাই হচ্ছে রেশম-গুটি আর তার আঁশগুলিই হচ্ছে রেশম। এই গুটি তৈরী হলে, ভিতরের পোকা তা কাটবার আগেই গুটিগুলোকে জলে সিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়—কারণ একবার যদি ওরা রেশম-গুটি কেটে বেরিয়ে যেতে পারে তা হলে সেই কাটা রেশম দিয়ে আর ভাল রেশমী সূতো হতে পারে না। এই ভাবে মানুষ রেশমের লোভে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ গুটিপোকাকে হত্যা করে আসছে।

যে সব প্রজাপতি দিনের বেলায় দেখা দেয়

তাদেরই গায়ে নানা রকম রঙের খেলা দেখা যায় আর এগুলিকেই বলা হয় আসল প্রজাপতি। রাতের বেলাও এক জাতের প্রজাপতি তোমরা দেখে থাকবে—এগুলিকে বলা হয় মথ্। মথের গায়ে অত রঙের কারিকুরি নেই। এরা বসে

শুঁয়োপোকা থেকেই হয় প্রজাপতি। পাশাপাশি দেখলে বিশ্বাস হয় কি?

পাখা ছড়িয়ে আর আসল প্রজাপতি বসে পাখা মুড়ে—এও নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছ।

মৌমাছির গল্প

আর একটি পতঙ্গ জাতের প্রাণী হচ্ছে মৌমাছি। এরা হচ্ছে সামাজিক জীব—দল বেঁধে চাক তৈরী করে থাকে—এক সঙ্গে হাজার হাজার। এদের মধ্যে আবার তিন রকমের মৌমাছি আছে—স্ত্রী বা রাণী, পুরুষ আর ক্লীব বা কর্মী। কর্মী-মৌমাছিরাই যা কিছু কাজ করে
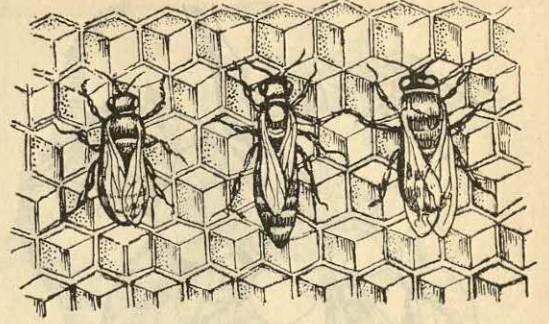
তিন জাতের মৌমাছি—বাঁ-দিকে কর্মী, মাঝখানে রাণী, ডান দিকে পুরুষ।

—উড়ে উড়ে বহু দূর থেকে ফুলের মধু সংগ্রহ করা, ফুলের রেণু বয়ে আনা, মোম দিয়ে চাক বানানো, বাচ্চাদের 'মানুষ' করা—যাবতীয় কাজ। স্ত্রী-মৌমাছি, যাকে বলা হয় রাণী,—তার প্রায় একমাত্র কাজ ডিম পাড়া। আর পুরুষেরা তো একদম অলস।

মধুর সন্ধান পেলেই মৌমাছি এসে চাকে খবর দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় তার নাচ। বিজ্ঞানীরা বলেন, এই নাচ দিয়েই সে মধুর নিশানা দেয় সঙ্গীদেরকে।

কর্মী-মৌমাছি ফুল থেকে মধু শুষে নিয়ে প্রথমটা গিলে ফেলে। তখন তার গলা থেকে এক রকম লালা বেরিয়ে এসে ঐ মধুকে আরও ঘন করে তোলে। এই মধুই ওরা আবার মুখ থেকে উগরে দিয়ে চাকের গর্তে গর্তে ভরে রাখে। আমরা যে মধু দেখি তা এই ঘন মধু। মধু ছাড়া কর্মী-মৌমাছিরা মোমও তৈরী করে। ওদের পেটের কাছে চার জোড়া মোমের থলি আছে, তা থেকে তরল মোম নিঃসৃত হয়। এই মোম লালার সঙ্গে মিশিয়ে তাই দিয়ে এরা দল বেঁধে অল্প সময়ের মধ্যে কী চমৎকার চাক বানিয়ে ফেলে! প্রত্যেক চাকে থাকে অসংখ্য ছ'-কোণা ঘর।

মৌমাছি ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করছে।

আত্মরক্ষার জন্য এবং শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য কর্মীদের পেটের পেছনে হুল থাকে। আক্রমণের সময়ে এই হুল ফুটিয়ে দিয়ে তারা তার মধ্যে খানিকটা বিষাক্ত অ্যাসিডও ঢেলে দেয়—যার ফলে হয় প্রচণ্ড জ্বালা। কিন্তু কাজটা ওদের পক্ষেও খুব আরামপ্রদ নয়—মরণ-আক্রমণই বলব। হুল একবার ব্যবহার করলে
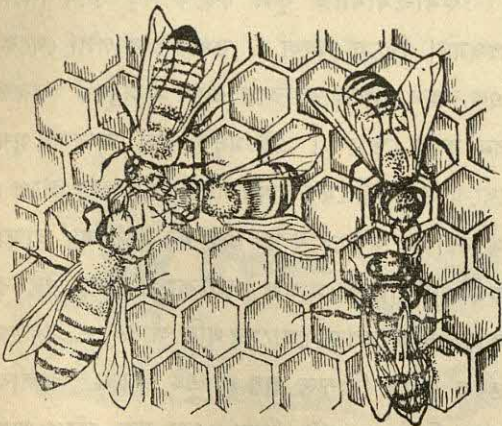
কোথায় কোন্ ফুলে রয়েছে মধু—মৌমাছি তার খবর নিয়ে এসেছে চাকের সঙ্গীদের কাছে। এর পরেই স্বরু হবে তার নাচ।

হুলের সঙ্গে ওদের পেটেরও খানিকটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে যে হুল ফোটায় তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়। তবে স্ত্রী অর্থাৎ রাণী-মৌমাছিদের হুল ও-রকম নয়, আর ওরা তা ব্যবহারও করে কদাচিৎ।
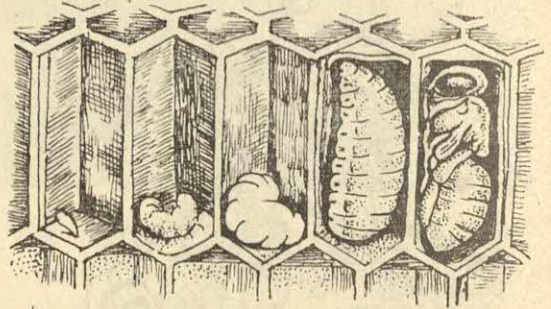
মৌচাকের এক এক কামরায় থাকে এক একটি বাচ্চা। ডিম থেকে প্রথমে শূক, তার পর গুটি, তার পর কি ভাবে তা মৌমাছিতে রূপান্তরিত হয় পাশাপাশি চাকে তাই দেখানো হয়েছে।

রাণী-মৌমাছির ডিম পাড়া—সে এক ভারী মজার ব্যাপার! প্রত্যেক চাকে একটি করে পরিণতবয়স্কা রাণী-মৌমাছি থাকে। ডিম পাড়ার সময় হলে রাণী চাকের প্রত্যেকটি কামরায় একটি করে ডিম পেড়ে যায়—বিদ্যুৎগতিতেই বলব, —মিনিটে প্রায় দু'টি করে। এই ভাবে চলে কয়েক সপ্তাহ। একটুও সে বিশ্রাম করে না এই সময়ে। এমন কি খাবারও ফুরসৎ হয় না তার। কর্মীরা এসে খাইয়ে দিলে তবেই সে খেতে পায়। রাণীর ডিম পাড়া হয়ে গেলে কর্মীদের কাজ আরও বেড়ে যায়। প্রত্যেকটি কামরার মৌমাছি-শিশুকে খাইয়েদাইয়ে লালনপালন করার ভার তো তাদেরই ওপর! তা ছাড়া ওদেরই আনা মধু আর ফুলের রেণু খেয়েই চাকের সমস্ত বাসিন্দা—মায় রাণী-মৌমাছি,

চাকের অধিকার নিয়ে দুই রাণী-মৌমাছির লড়াই

পুরুষ-মৌমাছি আর অন্যান্য কর্মীরা জীবন-ধারণ করে।

বাচ্চা স্ত্রী-মৌমাছি বড় হলে তারও রাণী হবার সাধ যায়। তখন চাকের অধিকার নিয়ে দুই রাণী-মৌমাছিতে লড়াই বাধে। যে জেতে চাক তার। দু'টি রাণীর স্থান নেই এক চাকে।

বোলতা, ফড়িং—এরাও সকলেই মৌমাছিরই জাতভাই, তবে চালচলন আলাদা, চেহারায়ও বেশ খানিকটা তফাৎ। বোলতা হলদে, ফড়িং তো নানা জাতের হয়! পঙ্গপালও আসলে ফড়িং।
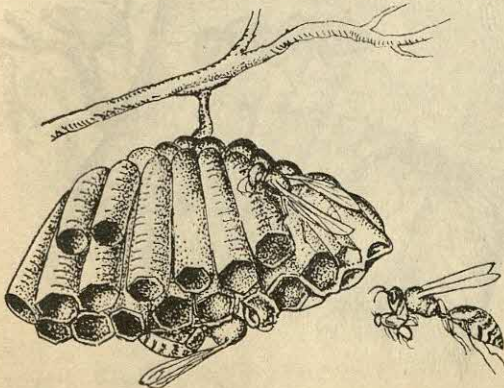
কাগুজে বোলতা শিকার সংগ্রহ করে চাকে ফিরছে।
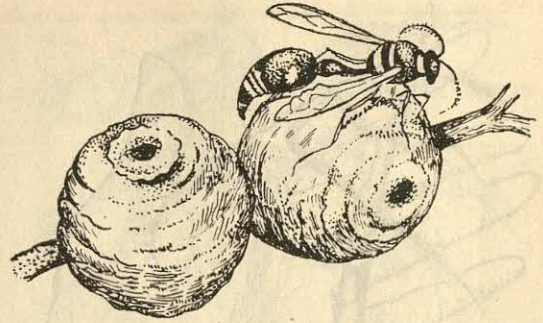
বোলতা মাটি দিয়ে চাক বেঁধেছে

পিঁপড়ে-জগতের বিচিত্র কাহিনী

আমাদেরই দেশের একজন নামকরা সাহিত্যিক 'পিঁপড়ে-পুরাণ' নামে একখানা বই লিখেছেন। তাতে আছে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর দখল নিয়ে অতিকায় পিঁপড়েদের সঙ্গে মানুষের লড়াইএর কথা। অত্যন্ত রোমহর্ষক কাহিনী হলেও সেটি নেহাৎই গল্প—যাকে আমরা আজকাল বলি "সায়ান্স ফিক্‌শন্"। কিন্তু সত্যি,
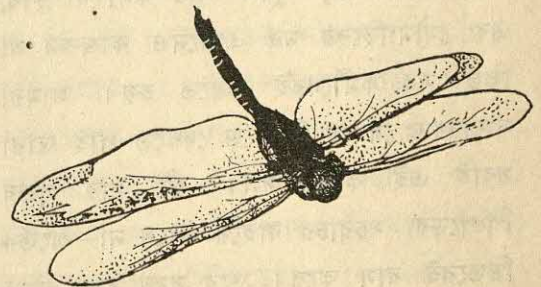
গঙ্গাফড়িং পতঙ্গেরই একটি। যখন শন্ শন্ করে উড়ে আসে, মনে হয় এরোপ্লেন ডাইভ দিল বুঝি! এরা নাকি সেই আদিমতম উড়ুক্কু প্রাণীদেরই খাঁটি বংশধর।

প্রাণিজগতে বুদ্ধির পাল্লায় মানুষ বা বানর জাতীয় জীবদের পরেই যাদের নাম করতে হয় তারা বোধ হয় আর কেউ নয়—ঐ ছোট্ট ক্ষুদে প্রাণী পিঁপড়ে।
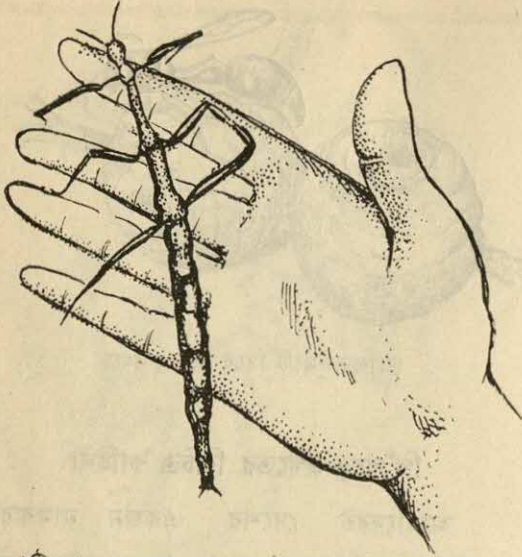
কাঠিপোকা—এরাও পতঙ্গেরই জাতভাই, কিন্তু দেখতে ঠিক কাঠির মত।

পিঁপড়ে পতঙ্গ জাতের প্রাণী তা আগেই বলেছি। কাজেই মৌমাছি বা অনুরূপ অন্যান্য পতঙ্গের সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে এদের প্রচুর মিল আছে। মৌমাছিদের মতন এরাও তিন রকম হয়—স্ত্রী, পুরুষ আর কর্মী বা ক্লীব, এবং মৌমাছিদের মত এখানেও কাজকর্ম যা কিছু সব কর্মীদেরই করতে হয়। আমরা সাধারণতঃ যে সব পিঁপড়ে দেখতে পাই তারা সবাই এই কর্মীর দল। স্ত্রী আর পুরুষ পিঁপড়েরা সচরাচর বাইরে আসে না—গর্তের ভিতরেই বাস করে। তবে সময় সময় বর্ষার দিনে বাদলা কেটে যাবার পর দেখা যায় দল বেঁধে একদল পাখাওয়ালা পিঁপড়ে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে আর পাখীরা এসে তাদের ধরে ধরে খাচ্ছে। আমরা ভাবি, বেচারাদের বুঝি পাখী হবার সাধ হওয়াতেই এই বিপত্তি। আর মুখেও বলি—"পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরিবার জন্য।" কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। এই পাখাওয়ালা পিঁপড়েদের পাখা হঠাৎ 'মরিবার জন্য' গজায় না, পাখা ওদের বরাবরই থাকে—কারণ ওরা কর্মী-পিঁপড়ে নয়, ওরা স্ত্রী আর পুরুষ-পিঁপড়ে, গর্তে থাকে বলে অন্য সময়ে আমরা ওদের খবর রাখি না। কর্মী পিঁপড়েদের অবশ্য পাখা দেখা যায় না।

মাছি, মশা, মৌমাছি ইত্যাদির মত পিঁপড়েকেও ডিম ফুটে বেরিয়ে কিছু সময় শূক অবস্থায় কাটিয়ে খোলসে বন্দী থাকতে হয়। খোলসের মধ্যেই ওদের চেহারা বদলে পিঁপড়ের চেহারায় রূপান্তরিত হয় আর তার পরই ওরা খোলস ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। পিঁপড়েরও আবার নানা জাত আছে। ছোট লাল পিঁপড়ে, কালো পিঁপড়ে, মাঝারি আকারের হুল-বসানো বিষ-পিঁপড়ে (যাদের কামড়ে ভীষণ জ্বালা), বড় আকারের কালো ডেয়ো পিঁপড়ে বা লাল কাঠ-পিঁপড়ে (এরাও কামড়াতে ওস্তাদ্) ইত্যাদি।

পিঁপড়েরা যে খুব বুদ্ধিমান্ প্রাণী তা এদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি লক্ষ্য করলেই জানা যায়।

কাঠ-পিঁপড়ে

কীটতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এ নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এবং তার ফলে যে সব তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা এক কথায় আশ্চর্য। লড আভেরি নামে একজন পণ্ডিতের পোকামাকড় সম্বন্ধে অদ্ভুত বাতিক ছিল। নিজের বাড়ীতে তিনি পোকামাকড়ের এক চমৎকার 'চিড়িয়াখানা' বানিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, মানুষের মত অনেক পোকামাকড়ের বুদ্ধি আছে, এমন কি চিন্তা করবার ক্ষমতাও আছে, আর এ জিনিসটা সবচেয়ে বেশী আছে পিঁপড়ের।

পিঁপড়ের বাড়ী—গ্রাম না শহর?

পিঁপড়েরা সামাজিক জীব—দল বেঁধে এক সঙ্গে অসংখ্য পিঁপড়ে বাস করে। পিঁপড়েদের বাড়ী—যাকে আমরা বলি পিঁপড়ের গর্ত—
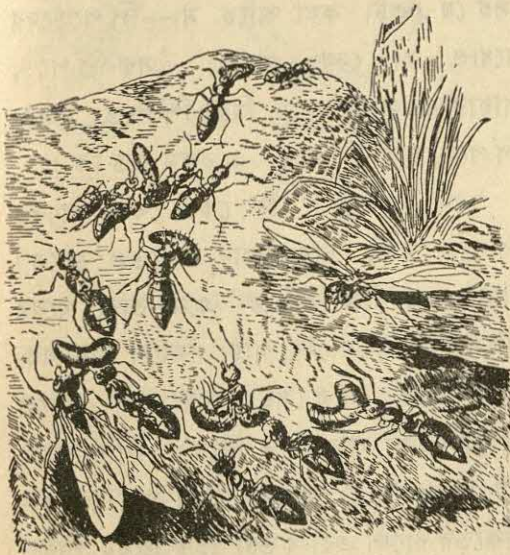
লড়াইএর পর
পিঁপড়েরা সামাজিক প্রাণী হলেও লড়াইবাজও কম নয়। এখানে পিঁপড়েদের একটি যুদ্ধের পরবর্তী দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বিজয়ীরা লুটের মাল—পরাজিতের ডিম ও মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে।
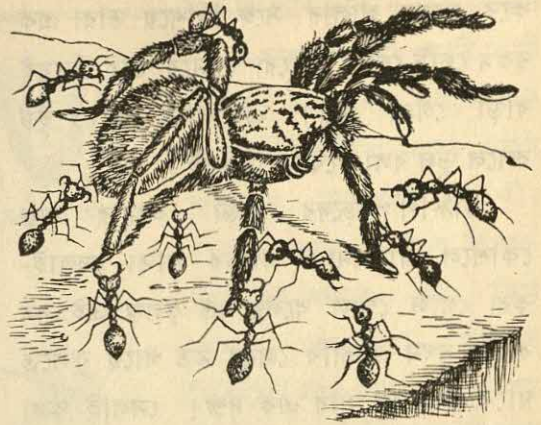
বিরাট শক্তিমান্ মাকড়ষা যুদ্ধে পিঁপড়েদের সম্মিলিত আক্রমণে ধরাশায়ী হয়েছে।

খুঁড়ে দেখলে মনে হবে এ তো বাড়ী নয়, এ যে দস্তুর মত গ্রাম বা শহর! একবার এক কীটতত্ত্ববিদ্ এই রকম একটা পিঁপড়ের গ্রাম খুঁড়ে বার করেছিলেন—যেটা ছিল সিকি মাইল লম্বা আর সিকি মাইল চওড়া। পাঁচ লক্ষ পিঁপড়ে ছিল সেই গ্রামের বাসিন্দা। আমাদের অনেক বড় বড় শহরেও অত লোক থাকে না। শুধু কি তাই? কলকাতায় আজকাল কিছু কিছু স্কাইস্ক্রেপার বা আকাশছোঁয়া বাড়ী দেখতে পাওয়া যায়—দশতলা, বারোতলা বা ঐ রকম। আমেরিকার বড় বড় শহরে বহুদিন আগে থেকেই ৪০।৫০ তলা বা আরও উঁচু বাড়ী তৈরী হচ্ছে। কিন্তু পিঁপড়েরাও যে ৪০।৫০ তলা বাড়ী তৈরী করতে ছাড়ে না সে খবর রাখ কি? তবে তফাৎ, মানুষ এই সব বাড়ী বানাতে সাহায্য নেয় যন্ত্রপাতির, পিঁপড়েরা নিজেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়েই সে কাজ হাসিল করে। কোন কোন পিপড়ে আবার 'ইট'ও তৈরী করতে জানে। অবশ্য আমাদের মত ইট নয়,—কাদা, গাছের পাতা, পচা কাঠ ইত্যাদি যোগাড়

করে মুখের লালার সঙ্গে মিশিয়ে তারা এক রকম ছোট ছোট টুকরো বানিয়ে তাই দিয়েই বাড়ী গেঁথে নেয়। এগুলোকে ওদের ইট বললে ভুল বলা হবে না নিশ্চয়ই ?

কাঠ-পিঁপড়েদের বাড়ী আবার অন্য কৌশলে বানানো। গাছের পাতা সেলাই-করা গোল গোল বলের মত ঝুলন্ত এই সব বাড়ী যখন বাতাবি লেবুর মত গাছে ঝুলতে থাকে তখন সে আর এক দৃশ্য ! সেলাই করা বলছি—সূতো পায় কোথায় ? সূতো ওরা যোগাড় করে ওদেরই বাচ্চা অর্থাৎ শূককীটদের কাছ থেকে। বাচ্চাদের ধরে এনে বসিয়ে দেয় পাতার ওপর, তার পর তাদেরই মুখের চট্‌চটে লালা নিয়ে সেই জমাট লালা সূতোর মত করে ব্যবহার করে পাতা যুড়বার কাজে।

পিঁপড়ের গরু, পিঁপড়ের ক্ষেতখামার

শুধু কি এই ? পিঁপড়েদের "গরুর" কথা শুনেছ ? আমরা যেমন টাটকা দুধ পাবার জন্য গরু পুষি, কোন কোন পিঁপড়েও সেই রকম এক জাতের পোকা পোষে। কপি, মূলো প্রভৃতি গাছে এ রকম ছোট্ট ছোট্ট পোকা তোমরা দেখেও থাকবে। এগুলোকে এক জাতের গেছো-উকুন বলতে পার। ইংরেজীতে এদের বলে অ্যাফিড্। পিঁপড়েরা এই সব পোকার ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে আসে তাদের বাড়ীতে, তার পর ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলে সেগুলিকে পরম যত্নে লালনপালন করে। এই পোকাগুলির শরীরের পেছন দিকে থাকে দু'টি নল। নলের তলায় সুড়সুড়ি দিলে নল দিয়ে এক রকম মিষ্টি রস বেরিয়ে আসে। পিঁপড়েরা দুধ দোয়ার মত করে সেই রস বার করে নিয়ে খায়। মেজর হিংস্টন নামে এক কীট-বিজ্ঞানী পিঁপড়েদের এই "গরুগুলি" সম্বন্ধে অনেক তথ্য বার করেছেন। পিঁপড়েরা নাকি এই সব "গরুর" জন্য ঘাস বুনে সেলাই করে "গোয়াল ঘর" বানিয়ে দেয় আর মানুষ রাখালের মত একদল পিঁপড়ে-রাখালের ওপর ভার থাকে এদের চরাবার। একবার হিংস্টন সাহেব দেখেন, এক পিঁপড়ের গ্রামে এই রকম এক 'গোয়াল-ঘর' কি করে ভেঙ্গে গেছে আর 'গরু'গুলি পিল্ পিল্ করে পালিয়ে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে একপাল ষণ্ডা ষণ্ডা পিঁপড়ে-রাখাল ছুটে এসে তাদের পথ আগলে দাঁড়াল, আর তাড়া দিয়ে ফের সবাইকে গোয়ালে পূরে দিল। 'ডিভিশন্ অব লেবার' অর্থাৎ 'শ্রমবিভাগ' বলে সেই যে একটা কথা আছে না—পিঁপড়েদের মধ্যেও তা দেখা গেছে। সৈন্য-পিঁপড়ে, পাহারাওয়ালা-পিঁপড়ে, মিস্ত্রী-পিঁপড়ে, মজুর-পিঁপড়ে, চাষী-পিঁপড়ে—এ রকম কত কি !

চাষী-পিঁপড়ে ? হ্যাঁ, কোন কোন জাতের পিঁপড়ে নাকি চাষ-আবাদ করতেও জানে ! নানা রকম বীজ কুড়িয়ে এনে তারা ঘরের আশেপাশে পুঁতে দেয়, গাছ গজালে তার যত্ন-আত্তি করে, শেষে সেই 'ক্ষেতে' ফসল ফললে তা তুলে এনে ঘরে মজুত করে। পিঁপড়েদের এই 'ক্ষেতখামার' থেকেই বোঝা যায় পোকা-মাকড়ের রাজ্যে এরা কতটা উন্নত স্তরের প্রাণী।

রাক্ষুসে পিঁপড়ে ড্রাইভার অ্যাণ্ট

পিঁপড়েদের কাহিনী বলতে গিয়ে আর এক জাতের দুরন্ত পিঁপড়ের কথা না বললে

পোকামাকড়ের অস্ত্র
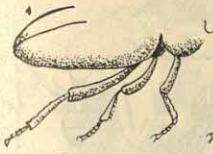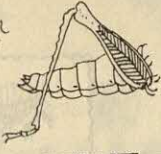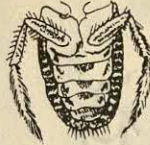
এই পিঁপড়েগুলোও ঠিক তেমনি —একসঙ্গে দল বেঁধে কোটি কোটি পিঁপড়ে একত্র হয়ে চলতে সুরু করে। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন 'ড্রাইভার অ্যাণ্ট'। বাংলায় অনুবাদ করলে "চালক পিঁপড়ে" বলতে হয় কিন্তু আসলে এদেরকে "রাক্ষুসে পিঁপড়ে" নাম দিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। এদের নিবাস আফ্রিকার জঙ্গলে।

এই ড্রাইভার অ্যাণ্ট যখন দল বেঁধে চলতে থাকে তখন মানুষ তো ছার,—সিংহ, গণ্ডার, হিপ্পোপটেমাস,—এমন কি বুনো হাতীও পালাবার পথ পায় না। কারণ, একবার এদের দ্বারা আক্রান্ত হলে গায়ের জোর কোনই কাজে আসবে না তো! স্রেফ্ সংখ্যার জোরে ওরা যে কোন জানোয়ারকে হত্যা করে তার মাংস খুবলে খুবলে খেয়ে নেবে। এদের কামড়ের জ্বালাও নাকি ভয়ঙ্কর।

একবার এক ইংরেজ শিকারী এদের আক্রমণের যে চিহ্ন দেখেছিলেন তার বর্ণনা শোন : শিকারীটি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় দু'টো পাহাড়ের মাঝখানে এসে পড়লেন। তার পরেই তাঁর নজরে পড়ল স্থানটির আশেপাশে কয়েক মাইল জায়গা যুড়ে অসংখ্য ছোট-বড় জন্তুর কঙ্কাল ছড়িয়ে আছে। সে কঙ্কাল আর গুণে শেষ
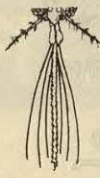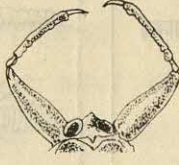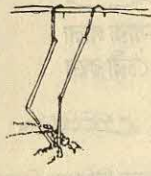
গল্প অসমাপ্ত থেকে যাবে। দুরন্ত বলতে আকারে বিরাট নয়—সংখ্যায় বিরাট। পঙ্গপালের নাম শুনেছ তো? ফড়িংএর মত ছোট্ট প্রাণী, কিন্তু একসঙ্গে কোটি কোটি একত্র হয়ে ঝাঁক বেঁধে যখন উড়ে চলে তখন তাদের সামনে কিছুই দাঁড়াতে পারে না। বড় বড় জঙ্গল, মাঠ, শস্যক্ষেত্র দেখতে দেখতে ছারখার হয়ে মরুভূমির মত হয়ে যায়। এমন কি তাদের পাখার আড়ালে সূর্যদেব পর্যন্ত ঢাকা পড়ে যান —দিনের বেলাই মনে হয় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল।

করা যায় না। মনে হয় অল্প কিছু আগেই এখানে একটা প্রচণ্ড খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। স্থানীয় লোকদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল মাত্র কয়েকদিন আগে ঐ জায়গাটা দিয়ে একদল ড্রাইভার অ্যাণ্ট চলে গেছে, আর যাবার সময় সেই ক্ষুদে পিঁপড়ে-গুলিই এমনি ভাবে সব কিছু উজাড় করে দিয়ে গেছে।

এই ড্রাইভার অ্যাণ্টরা মাঝে মাঝে কাফ্রীদের গ্রামেও ঢুকে পড়ে। তখন গ্রামবাসীদের ঘরদোরের মায়া ফেলে গ্রাম ছেড়ে পালানো ছাড়া আর গতি নেই। জলে নেমেও এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই। এই ভীষণ পিঁপড়েরা জড়াজড়ি করে নির্বিবাদে জলেও নামতে কসুর করে না, তার পর একসঙ্গে সাঁতরে অবলীলাক্রমে বড় বড় নদী, হ্রদ, বিল পার হয়ে যায়।

বন্ধু পোকা

যারা পচা জিনিষ খেয়ে ফেলে

যারা গাছেদের সাহায্য করে

যারা অন্য পোকা খেয়ে নেয়

যারা গালা তৈরী করে
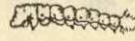
যারা রেশম বানায়
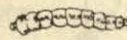
যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানে সাহায্য করে

শত্রু পোকা

যারা রোগ ছড়ায়

যারা গাছের অনিষ্ট করে

যারা ঘরে নানা উৎপাত করে

বন্ধু পোকা আর শত্রু পোকা

তবে এদের হাত থেকে রেহাই পাবার কি কোন উপায় নেই ? আছে। কেরোসিনের কাছে এরা কাবু। একমাত্র নাকি কেরোসিন ঢেলেই এদের কিছুটা আটকানো যায়। কেরোসিনের গন্ধও এরা সহ্য করতে পারে না, কেরোসিনের মধ্যে নিঃশ্বাসও নিতে পারে না। তা ছাড়া ওরা জব্দ হয় ঐ অঞ্চলেরই এক জাতের মাছির কাছে। ড্রাইভার অ্যাণ্টের ডিম হচ্ছে এই মাছিদের প্রিয় খাদ্য। যাদের প্রবল প্রতাপে স্বয়ং পশুরাজ বা বুনো হাতীর দলও পালিয়ে পথ পায় না—এই মাছিরা এসে ওপর থেকে ছোঁ মেরে মেরে তাদের ডিম নিয়ে পালায়।

পোকামাকড়ের কথা অনেক বললাম। এদের মধ্যে আমাদের শত্রু পোকা যেমন অনেক আছে তেমনি বন্ধু পোকাও কম নেই। বিধাতা এদের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র এদের শরীরেই দিয়ে দিয়েছেন। কি রকম অস্ত্র ? তার খানিকটা নমুনা আগের পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ।

কোন কোন পোকার পা শুধু ছুটবার জন্যই নয়,—লাফাবার জন্য, শিকার ধরবার জন্য এবং সাঁতরাবার জন্যও! তেমনি মুখ এবং দাড়াও ওরা ব্যবহার করে নানান্ কাজে।
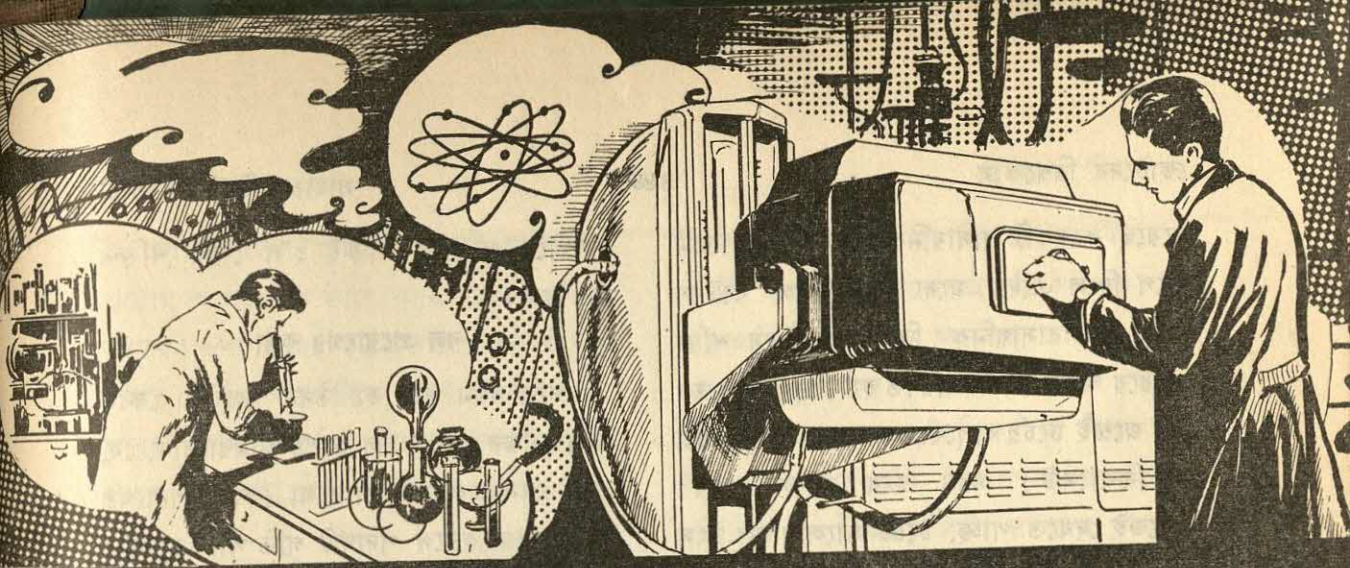
সাধারণ বিজ্ঞানের কথা

শক্তির মূল উৎস—সূর্য

পৃথিবীর দিকে দিকে শক্তির খেলা। তবে বিজ্ঞানীরা বলেন, সব রকম শক্তিরই মূল উৎস কিন্তু আমাদের সূর্য। সূর্যের আলো আর উত্তাপের অতি সামান্য অংশই এই পৃথিবীর ওপর এসে পড়ে, কিন্তু প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য ঐ সামান্য অংশই যথেষ্ট। সূর্যের আলোর সাহায্যে উদ্ভিদ্‌রা তাদের খাদ্য

সূর্যের আলোর সাহায্যে উদ্ভিদ্‌ তার খাদ্য তৈরী করে; প্রাণীরা আবার সে খাদ্যের ওপর ভাগ বসায়।

তৈরী করে এবং আমরা, প্রাণীরা, সেই উদ্ভিদের খাবারের ওপর ভাগ বসাই। কাজেই বলব, এই পৃথিবীর সৃষ্টি-স্থিতির জন্য সূর্যই দায়ী।

ভারতের প্রাচীন ঋষিরা সূর্যের এই বিপুল শক্তির কথা জানতেন। তাই তাঁরা সূর্যকে নানা ভাবে স্তব-স্তুতি করতেন।

সূর্যের দেহ থেকে যে শক্তি আমাদের কাছে আসছে তার একটি অংশ হ'ল তাপ। এই তাপ-শক্তিই বৃষ্টিপাত ঘটায়, শস্যশ্যামলা করে পৃথিবীকে। সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী প্রভৃতি থেকে জল বাষ্পে পরিণত হয়ে হয় মেঘ, সেই মেঘই আবার গলে জল হয়ে নেমে আসে বৃষ্টিধারায়; আমাদের শীতল করে, শস্য দান করে বাঁচিয়ে রাখে আমাদের। তেমনি ধারা পদার্থের মধ্যেও যখন কোন রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, তখন তার ভিতর থেকেও আলো, উত্তাপ ইত্যাদি রূপে বেরিয়ে আসে শক্তি। একে বলে রাসায়নিক শক্তি—ইংরেজী করে বললে কেমিক্যাল এনার্জি। উদাহরণ স্বরূপ টর্চের কথা বলা যেতে পারে। টর্চের ব্যাটারীর মধ্যে

রয়েছে কয়েকটি রাসায়নিক মশলা। বোতাম টিপে দিলে এদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে—সুরু হয় রাসায়নিক ক্রিয়া, ফলে যে শক্তি বেরিয়ে আসে তা-ই পরিণত হয় বিদ্যুৎশক্তিতে। এর জন্যেই টর্চের বাল্‌বের সরু তার (যাকে বলা হয় ফিলামেণ্ট) গরম হয়ে আলো দেয়। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, টর্চের আলোর মূল উৎস রাসায়নিক শক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

রাসায়নিক শক্তি ছাড়া আরও অন্য রকম শক্তি হচ্ছে বিদ্যুৎশক্তি, শব্দশক্তি, চুম্বকশক্তি। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। চুম্বকের এই যে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা একেই আমরা চুম্বক-শক্তি বলে থাকি। শব্দের মধ্যেও যে শক্তি আছে তার প্রমাণ পাই আমরা তখনই যখন শব্দটা হয় ভীষণ জোরে। সে শব্দে অনেক সময়ে কাচের জানালা-দরজা ভেঙ্গে যায়।

আর এক রকম শক্তির কথা তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। যাকে বলা হয় পারমাণবিক শক্তি বা অ্যাটমিক এনার্জি। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম অ্যাটম্ বা পরমাণু। এরও ভিতরে লুকিয়ে আছে অপরিসীম শক্তি। পরমাণুর ভিতরে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন নামে যে অংশটি থাকে তা উপযুক্ত ভাবে ভেঙ্গে দিতে পারলে তা থেকে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায়। আধুনিক কালের অ্যাটম্ বোমা, হাইড্রোজেন বোমার যে বিপুল ধ্বংসক্ষমতা তা পরমাণু ভেঙ্গেই পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখে বলেছেন, সূর্য যে কোটি কোটি বছর ধরে আলো এবং উত্তাপ দিয়ে এখনও দেউলিয়া হয়ে যায় নি তারও কারণ নাকি সূর্যদেহে পরমাণু ভাঙ্গাগড়ার কাজ। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, পরমাণুর কেন্দ্রীনে লুকানো শক্তিই হ'ল সৌর শক্তির মূল উৎস।

বল প্রয়োগের কথা

শক্তি যখন খরচ হয় তখন 'বল' বা ফোর্স এসে হাজির হয়। বল বলতে আমরা বুঝি, যে, এটা এমন একটা ব্যাপার যা কোন পদার্থের ওপর কাজ করলে পদার্থটি গতি পাবে বা গতি পেতে চেষ্টা করবে। রাম বাবুর কথাতেই একটি বার আসা যাক। রাম বাবু তাঁর সদ্য-কেনা গাড়ী চড়তে গিয়ে স্প্রিং-লাগানো দরজা টেনে খুলতে বল প্রয়োগ করলেন। রাম বাবুর বড় ছেলে টেনিস খেলতে গিয়ে র‍্যাকেট দিয়ে বল্ মারবার সময় বল প্রয়োগ করছে। আবার রাম বাবুর মেজ ছেলে বেহালা বাজাতে ওস্তাদ্। সে যখন ছড় দিয়ে বেহালা বাজায় তখনও তাকে বল প্রয়োগ করতে হয় বই কি!

বেহালা বাজানো, টেনিস খেলা, গুলতি ছোঁড়া—সব কাজেই বল প্রয়োগ দরকার।

তোমাদের মধ্যে যারা গুলতি ছুঁড়তে পার, তাদেরও কিন্তু ঐ বল প্রয়োগই করতে হয় ঐ কাজের জন্যে।

এবারে দেখা যাক এ কাজটি অর্থাৎ বল প্রয়োগ আমরা কি ভাবে করে থাকি। কোন পদার্থের ওপর আমরা দু'রকম ভাবে বল প্রয়োগ করতে পারি—পদার্থটিকে স্পর্শ করেও পারি, আবার সরাসরি স্পর্শ না করে দূর থেকেও পারি। ঘরের টেবিলটা ঠেলে সরিয়ে দিতে গিয়ে

বল প্রয়োগ করতে হলে পদার্থটি সরাসরি স্পর্শ করেও পারা যায়, আবার দূর থেকেও তা সম্ভব।

টেবিলটাকে সরাসরি স্পর্শ করেই বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। সেতার বাজাতে গিয়ে রাম বাবুর মেয়ে আঙুল দিয়ে সেতারের তার সরাসরি স্পর্শ করেই তারের ওপর তার শরীরের বল প্রয়োগ করছে। কিন্তু আকাশে একটা উড়োজাহাজ উড়ে যাচ্ছে—মাটির সঙ্গে তার কোন ছোঁয়াছুঁয়ি নেই। অথচ পৃথিবী কিন্তু তার ওপর বল প্রয়োগ করছে, তাকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে না। নিউটনের বিখ্যাত আবিষ্কার—পৃথিবী এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব প্রতিটি পদার্থকণিকা অন্য প্রতিটি কণিকাকে অনবরত আকর্ষণ করে চলেছে যুগযুগান্ত ধরে—এ তোমরা জান। বিজ্ঞানীরা একে বলেন 'অভিকর্ষ'। কিন্তু দু'টি পদার্থের আকর্ষণশক্তি বিচার করবার সময়ে যদি তার একটি হয় পৃথিবী, তা হলে পৃথিবীর এই আকর্ষণশক্তির একটা বিশেষ নাম দেওয়া হয়। সে নামটা হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ বা গ্র্যাভিটি। এই গ্র্যাভিটির জন্য পৃথিবীর ওপরকার যে কোনও জিনিস পৃথিবীর ওপরই পড়ে। অর্থাৎ পৃথিবী তাকে টেনে নেয়। উড়োজাহাজটির ওপর এই যে পৃথিবীর টান এটাও মাধ্যাকর্ষণ। সরাসরি উড়োজাহাজটিকে স্পর্শ না করেও এই টান প্রয়োগ করতে পৃথিবীর কোন বাধা নেই। চুম্বক যখন লোহাকে আকর্ষণ করে তখনও ঐ রকম দূর থেকেই সে বল প্রয়োগ করতে পারে।

এবারে মূল কথায় আসা যাক। এই দুনিয়ায় আমরা যা কিছু দেখছি, যা কিছু শুনছি বা যা কিছু স্পর্শ করছি, তাকেই পদার্থ বা শক্তি এর যে কোন পর্যায়ে ফেলা যায়। আলো দেখা যায়, শব্দ শোনা যায়, উত্তাপ অনুভব করা যায়। কিন্তু আলো, উত্তাপ ও শব্দ এদের কারোরই তো ওজন নেই বা এরা তো কেউই খানিকটা জায়গা দখল করে থাকে না! সুতরাং এদের আমরা বলতে পারি 'শক্তি'; আর ইট, কাঠ, পাথর—এরা 'পদার্থ'।

রসায়ন আর পদার্থবিদ্যা

আজ বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। আজ মহাশূন্যে স্পুটনিক উঠছে—অ্যাটম্ বোমার

ধ্বংসলীলার কথা শুনে আমরা আজ শিউরে উঠছি। গভীর সাগরের তলাকার কত অজানা রহস্য আজ আমরা জেনে ফেলেছি। কিন্তু বিজ্ঞানের আদিম যুগে এ রকমটি ছিল না। প্রকৃতির নানা ঘটনা দেখে সেকালের লোকে তাই অবাক্ হয়ে যেত, আর অদৃশ্য দেবতার কাজ ভেবে তাঁকে তুষ্ট করবার জন্য পূজো করত। আজ আর বজ্র-বিদ্যুৎ দেখে মানুষ ভয় পেয়ে ইন্দ্রদেবের পূজো করে না, অনাবৃষ্টি হ'লে বরুণদেবের তুষ্টির ব্যবস্থা করে না। মহামারী লাগলে দেবতার পূজো না করে আগে ডাক্তারের বাড়ী ছোটে। বহু শত বছরের অভিজ্ঞতায় —অক্লান্ত সাধনায় বিজ্ঞান আজ তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসে এমন একটা সময় ছিল যখন পদার্থ এবং শক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করা হ'ত এবং এই জন্যেই মূল বিজ্ঞানে গড়ে উঠেছে দু'টি প্রধান শাখা— পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্র। পদার্থের গঠন-বিধি, তার ধর্ম, রীতিনীতি নিয়ে বিচার করে বিজ্ঞানের যে বিভাগ তার নাম রসায়ন শাস্ত্র। আর শক্তি এবং তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়ে বিচার করে যে বিজ্ঞান তার নাম পদার্থবিদ্যা। রসায়নবিদ্ শুধু কোনও পদার্থের ধর্ম জেনেই খুসী হবেন না; তিনি জানতে চাইবেন কোনও বিশেষ পদার্থের বিশেষ ধর্মটি কেন হ'ল। কেন লোহা কঠিন, আবার সোডিয়াম্ একটি ধাতু হয়েও কেন নরম? কেন পারদ ধাতু তরল? গন্ধকের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে না, আবার ধাতুর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলে অবাধে। এর কারণ কি? শুকনো কাঠ পোড়ে, কিন্তু অ্যাস্‌বেস্‌টাস্ কেন পোড়ে না? এক টুকরো লোহা রেখে দিলে তাতে মরচে ধরে, কিন্তু সোনায় কেন মরচে ধরে না? এমনি হাজার হাজার 'কেন'র জবাব দিতে হয় রসায়নবিদ্‌কে।

আগেই বলেছি, পদার্থবিদের কারবার শক্তি এবং তার বিভিন্ন রূপ নিয়ে। পদার্থবিদ্যার আবার বহু বিভাগ। একদিকে বলবিদ্যা বা মেকানিক্স, অন্য দিকে আলো, উত্তাপ, শব্দ, বিদ্যুৎ, চুম্বক প্রভৃতি শক্তির ভিতরকার আচার-ব্যবহার, তাদের কার্যকলাপ প্রভৃতি পদার্থবিদ্যারই অংশ বিশেষ। পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে পরমাণু।
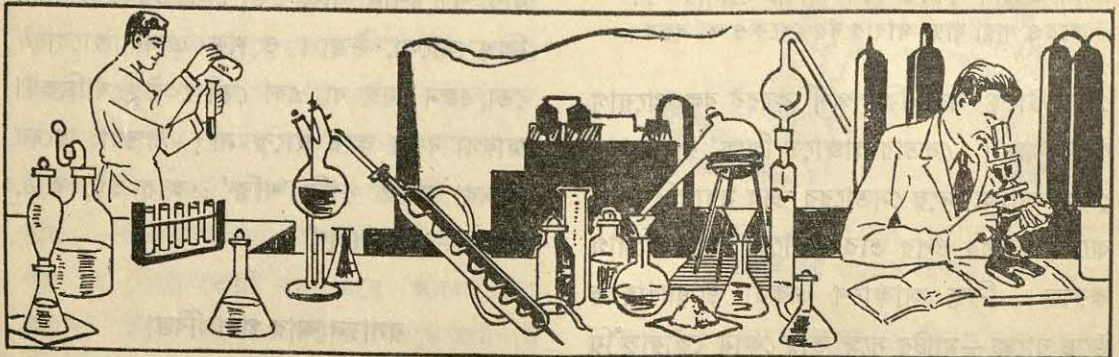
রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে বিভিন্ন পদার্থের গঠনবিধি, তাদের ধর্ম, রীতিনীতি নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন রসায়নবিদ্।
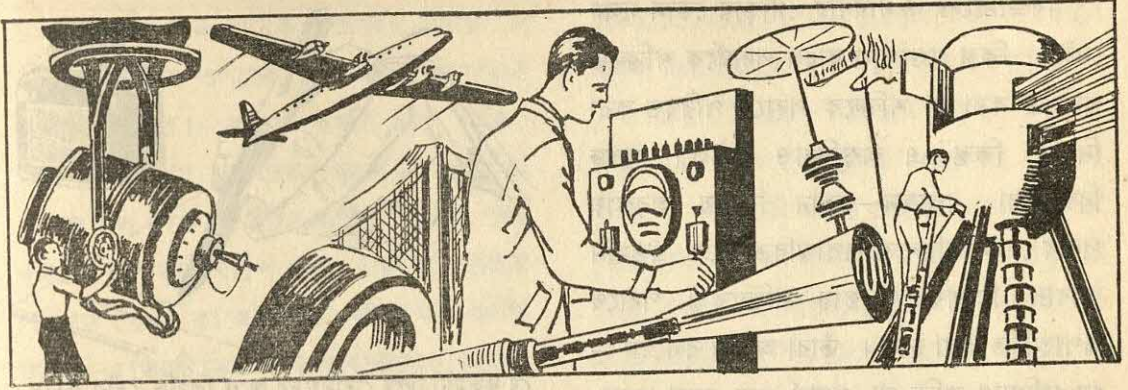
শক্তি এবং তার বিভিন্ন প্রকাশ নিয়েই নানা কাজ করে চলেন পদার্থবিদ্।

পরমাণুর কেন্দ্রীনে লুকিয়ে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই নতুন-জানা শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করাও পদার্থবিদ্যারই কাজ।

পদার্থ আর শক্তি সত্যিই কি আলাদা?

আগেই উল্লেখ করেছি, বিজ্ঞানের বহু ধারণার আস্তে আস্তে পরিবর্তন হয়ে আসছে বহুদিন থেকে। এক সময়ে ধারণা ছিল যে পদার্থ ও শক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। 'ছিল' এ কথাই বা বলি কি করে? এখনও পুরোনো মতের বিজ্ঞানীদের কাছে এই ধারণাই হয়তো সত্যি। কিন্তু গত কয়েক বছরের বিজ্ঞানের অগ্রগতি এ ধারণা ঠিক নয় বলেই প্রমাণ করেছে। কয়েক বছর আগেও বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বজগতে পদার্থের পরিমাণ সেই আদিম যুগ থেকে একই থেকে আসছে। শক্তির ক্ষেত্রেও বলা হ'ত, শক্তির পরিমাণও সেই আদিম যুগ থেকে একই রয়ে গেছে। পদার্থও যেমন রূপান্তরিত হচ্ছে, অর্থাৎ এক পদার্থ অন্য পদার্থে পরিণত হচ্ছে, শক্তিরও তেমনি রূপান্তর ঘটছে মাত্র; কিন্তু পদার্থ বা শক্তি কেউই চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। এক টুকরো কয়লা পোড়ালে পড়ে থাকে সামান্য একটু ছাই। কয়লা কি তা হ'লে ধ্বংস হয়ে গেল? আসলে তা নয়। কয়লার ভিতর আছে কার্বন নামে একটি মৌলিক পদার্থ বা এলিমেণ্ট। বায়ুর মধ্যে পোড়ালে কার্বন বায়ুর ভিতরকার অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক উপায়ে মিলিত হয়ে তৈরী করে কার্বন ডাই-অক্সাইড। কার্বন ডাই-অক্সাইড একটি গ্যাস—তাকে ধরে রাখতে হ'লে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাই তাকে ধরে রাখতে না পারলে সে উড়ে যায় বাতাসের মধ্যে। আমরা দেখি, কয়লা পুড়ে পড়ে আছে একটুখানি ছাই। কাজেই কয়লার কার্বন ধ্বংস হয়ে গেল—এ কথা কোনক্রমেই বলা চলে না। আবার কয়লা পুড়িয়ে আমরা পাই তাপ। তাপ দিয়ে জল ফোটালে তা জলীয় বাষ্প বা স্টীমে পরিণত হয়। এই স্টীমের সাহায্যে ডায়নামো ঘুরিয়ে আমরা পেতে পারি বিদ্যুৎ। তাপশক্তি এখানে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত হচ্ছে। কাজেই, এ থেকেই বোঝা যায় পদার্থ বা শক্তি অবিনশ্বর।

বিজ্ঞানীদের এ ধারণার গোড়ায় কোন গলদ নেই। কিন্তু গণ্ডগোল বাধল পদার্থকে শক্তিতে পরিণত করা বা শক্তিকে পদার্থে পরিণত করা নিয়ে। কিন্তু এ অসুবিধাও মিটল। আজ বিজ্ঞানীরা বলছেন—কোন বিশেষ অবস্থায় পদার্থ যেমন শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তেমনি আবার বিশেষ অবস্থায় শক্তিকেও পদার্থে রূপান্তরিত করা চলে। তাঁরা আরও বলছেন—যে পরিমাণ শক্তি বা পদার্থ ব্যয় করা হচ্ছে, ঠিক সে পরিমাণই পদার্থ বা শক্তি তৈরী হচ্ছে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নাম তোমরা শুনে থাকবে। তিনিই সর্বপ্রথম এ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করে এ ধারণার ভিত্তি দৃঢ় করেছেন। কাজেই সব দিক্ দিয়ে বিচার করলে বলা চলে, বিজ্ঞানীদের সেই পুরোনো ধারণাই অনেকটা চলে আসছে আজ পর্যন্ত, তবে তার একটা বিরাট রূপান্তর ঘটেছে, এই যা! আজ পদার্থ বা শক্তিকে আলাদা আলাদা বিচার করবার প্রয়োজন অনেক পরিমাণে কমে এসেছে। আমরা বলতে পারি, পদার্থ বা শক্তি আসলে একই ব্যাপারের ভিন্ন রূপ মাত্র। সুতরাং পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন শাস্ত্রও আজ আর তেমনটা আলাদা নয়—একই বিজ্ঞানের এরা দু'টি দিক্ মাত্র।

পদার্থের তিন অবস্থা

যত রকম পদার্থ আমরা দেখছি তাদের মধ্যে একটি সহজ পার্থক্য তোমরা সকলেই লক্ষ্য করে থাকবে। সামান্য ব্যাপার; আমি কঠিন, তরল এবং বায়বীয় অবস্থার কথাই বলছি। যে কলমটা দিয়ে তোমাদের জন্যে
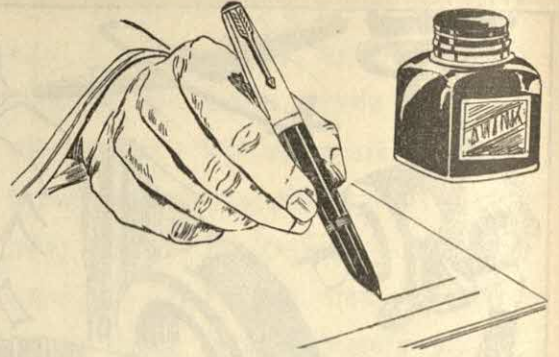
যে কলমটা দিয়ে তোমাদের জন্যে লিখছি সেটা কঠিন; কলমে যে কালি ব্যবহার করা হয়েছে তা তরল।

লিখছি সেটা কঠিন জিনিস; কলমে আমি যে কালি ব্যবহার করছি তা তরল। পদার্থের আর একটি অবস্থাও রয়েছে। একে বলা হয় বায়বীয় অবস্থা। বায়বীয় পদার্থটি যদি রঙিন না হয় তবে তা আমাদের চোখে পড়ে না, গন্ধ না থাকলে তা টের পাওয়াও চট্ করে সম্ভব নয়। ইট, কাঠ, পাথর—এ সব কঠিন পদার্থ; জল, তেল, পারা—এ সব পদার্থ তরল। যে বাতাসের সাহায্য নিয়ে প্রাণিজগৎ বেঁচে আছে তা বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থ। অবশ্য বাতাস আসলে প্রধানতঃ দু'টি গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণ। একটি নাইট্রোজেন, অন্যটি অক্সিজেন। এ দু'টি গ্যাসই বর্ণহীন বলে আমরা বাতাসকে চোখে দেখতে পাই না।
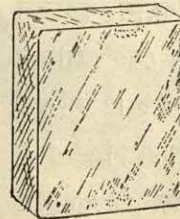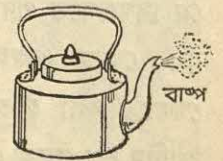
বরফ, জল এবং জলীয় বাষ্প—এ তিনটি কঠিন, তরল এবং বায়বীয় অবস্থায় থাকলেও এরা আসলে একই জিনিস—জল

আবার এমন অনেক পদার্থও আছে যা বিভিন্ন উষ্ণতায় ওপরের তিন রকম অবস্থায়ই থাকতে পারে। জলের কথাই ধরা যাক। সাধারণ অবস্থায় জল তরল পদার্থ। খুব ঠাণ্ডা করলে জল জমে হয় কঠিন বরফ। আবার গরম করলে জল ফুটে বাষ্পে অর্থাৎ বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়। কাজেই জল, বরফ আর জলীয় বাষ্প—এ তিনটি তিন অবস্থায় থাকলেও আসলে একই জিনিস—জল, বিভিন্ন উষ্ণতায় অবস্থান্তর ঘটেছে মাত্র। তেমন চেষ্টা করলে বেশীর ভাগ পদার্থকেই এই রকম তিন অবস্থায় আনা যেতে পারে।

এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে। পদার্থ বিভিন্ন অবস্থায় কেন থাকে? জলের ভিতরে এমন কি পরিবর্তন ঘটে, যার জন্যে জল কখনও তরল, কখনও বায়বীয়, কখনও বা কঠিন বরফে পরিণত হয়? এক কথায় কোনও জিনিস কঠিন, কোনও জিনিস তরল, আবার কোনও জিনিস বায়বীয় কেন? এর উত্তর পরে দিচ্ছি।

পদার্থ কি সবই এক রকম?

বিজ্ঞানীরা বলেন, আমরা চারদিকে যত জিনিস দেখি তার মধ্যে কতগুলো হ'ল মূল পদার্থ বা মৌলিক পদার্থ। ইংরেজীতে বলা হয় এলিমেণ্ট। তাঁরা আরও বলেন, মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বেশী নয়। এক শ'র কিছু বেশী। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, তামা, লোহা, পারা বা পারদ, ক্যাল্‌সিয়াম প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ। দু'টি বা দুই-এর বেশী মৌলিক পদার্থ একত্র হয়ে তৈরী হয়েছে দুনিয়ার অন্য সব কিছু। এদের বলা হয় যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। চক্ বা খড়িমাটির সঙ্গে তোমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। খড়িমাটি একটি যৌগিক পদার্থ। এর বৈজ্ঞানিক নাম ক্যাল্‌সিয়াম কার্বনেট। খড়িমাটি তৈরী হয়েছে ক্যাল্‌সিয়াম, কার্বন আর অক্সিজেন নামে তিনটি মৌলিক পদার্থ দিয়ে। এর মধ্যে ক্যাল্‌সিয়াম এবং কার্বন কঠিন, আর অক্সিজেন গ্যাসীয় পদার্থ। ছোটদের বিশ্বকোষ, প্রথম
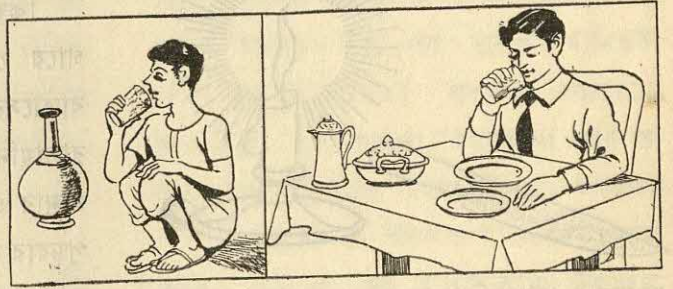
সাদামাঠা বাঙ্গালীর ঘরের জল আর কোন ধনীর কিচেনের জলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে কোন পার্থক্যই নেই।

খণ্ডে (পৃঃ ২৩৩) এ সব কথা কিছু কিছু বলা হয়েছে। সেখানে আরও একটা কথা বলা হয়েছে—যৌগিক পদার্থের মধ্যে মৌলিক পদার্থের অনুপাতটা সব সময়ই থাকে নির্দিষ্ট, এক চুলও এদিক্-ওদিক্ হবার যো নেই।

কত জায়গা থেকেই না জল পাওয়া যায়! নদী, সমুদ্র, ঝরণা, বৃষ্টি—আরও কত জায়গা! আবার রসায়নবিদ্ তাঁর পরীক্ষাগারেও জল তৈরী করতে পারেন। এর ওপর আবার দেশ-দেশান্তর তো আছেই। বাংলা দেশের লোকরাও জল খায়, বিলেত-আমেরিকার লোকরাও। কিন্তু বিজ্ঞানী বলেন, জল তুমি যেখান থেকেই

পাও না কেন, যতক্ষণ তা খাঁটি জল ততক্ষণ তার মধ্যেকার মূল পদার্থ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ থাকবে নির্দিষ্ট, অর্থাৎ ১ ভাগ ওজনের হাইড্রোজেন আর ৮ ভাগ ওজনের অক্সিজেন। পুকুরের জল আর গঙ্গার জল, সাদামাঠা বাঙ্গালীর ঘরের জল আর আমেরিকার কোন ধনী অধিবাসীর কিচেনের জলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন পার্থক্যই নেই।
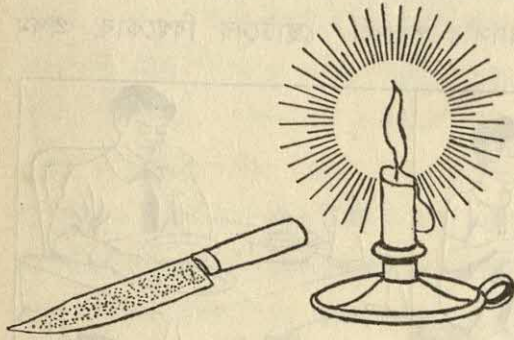
চক্‌চকে লোহার ছুরিখানায় মরচে ধরে ওজন বেড়েছে, আর কত বড় মোমবাতিটা পুড়ে এইটুকু হয়ে গেছে ! কিন্তু সত্যি সত্যি কোন ক্ষেত্রেই পদার্থ তৈরী বা নষ্ট হয় নি।

ধনী ব'লে তার জলের মধ্যে একটু বেশী হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন মিশিয়ে দেবার যো নেই। তা হলে যে জিনিসটি পাওয়া যাবে তাকে, আর যাই বলা হোক, জল আর বলা চলবে না। তার মানে জলের যে গুণ তা আর তার মধ্যে থাকবে না। রসায়ন শাস্ত্রের এটি একটি মূল কথা।

রসায়ন শাস্ত্রের আর একটি মূল কথা আগেই বলেছি,—পদার্থের অবিনশ্বরতা। কোন রাসায়নিক পরিবর্তনে কোন পদার্থ তৈরী করাও যায় না, তেমনি আবার নষ্ট করে দেওয়াও যায় না। পদার্থকে শুধু এক রূপ থেকে অন্য রূপে বদলে দেওয়া যায় মাত্র। চক্‌চকে লোহার ছুরিখানা ক'দিনেই কালচে বা বাদামী হয়ে গেছে, ধার গেছে নষ্ট হয়ে। আমরা বলি লোহায় মরচে ধরেছে। কত বড় একটা মোমবাতি জ্বলে জ্বলে এই এতটুকু হয়ে গেল ! যদি ওজন নিয়ে দেখ, দেখবে ছুরিখানার ওজন বেড়েছে, কিন্তু মোমের ওজন কমেছে। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে প্রথম ক্ষেত্রে কিছু পদার্থ তৈরী হয়েছে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিছু পদার্থ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই না ? তা হ'লে কেমন গোলমেলে হয়ে গেল না ?

কিন্তু সত্যি কোন গোলমাল নেই। ছুরিখানার গায়ে যে মরচে ধরেছে তা তৈরী হয়েছে বাতাসের ভিতরকার অক্সিজেনের সঙ্গে লোহার রাসায়নিক মিলনে। কাজেই এ ক্ষেত্রে ছুরিখানার ওজন বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আবার পুড়বার সময়ে মোমের ভিতরকার কার্বন বাতাসে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে তৈরী হয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস—যেমন হয় কয়লার বেলায়। শুধু তাই নয়, মোমের ভিতরকার হাইড্রোজেন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে তৈরী হয়েছে জল, উত্তাপে সে জলও বাষ্পে পরিণত হয়েছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প উড়ে মিশে গেছে বাতাসের সঙ্গে। কাজেই মোম তো ক্ষয় হয়ে যাবেই ! যদি মোম পোড়াবার সময়ে ঐ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প ধরে রাখবার ব্যবস্থা করা যেত তবে দেখা যেত মোমের ওজন যতটা কমেছে তৈরী কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের ওজন তার চেয়ে বেশী। কারণ বাতাসের ভিতরকার অক্সিজেনটাও যে আমাদের হিসেবে ধরা পড়ে যেত,—যেমন হয়েছিল ছুরির মরচে ধরার বেলা।

কাজেই রসায়নবিদ্ বলছেন, সৃষ্টির প্রথম থেকেই দুনিয়ায় পদার্থের পরিমাণ একই রয়ে গেছে। ঠিক তেমনি পদার্থবিদ্‌ও বলছেন, দুনিয়ায় শক্তির পরিমাণও একই রয়ে গেছে সেই আদিম কাল থেকে। তবে পদার্থকেও যে শক্তিতে বদলে নেওয়া যায় বা শক্তিকেও যে পদার্থে রূপান্তরিত করা যায় সে কথার উল্লেখ তো আমরা আগেই করেছি।

অণু ও পরমাণু

কতগুলো মৌলিক পদার্থ আর লক্ষ লক্ষ যৌগিক পদার্থ নিয়েই গড়ে উঠেছে আমাদের দুনিয়া। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে ধারণা করবার পর মনে জাগা স্বাভাবিক : পদার্থের ভিতরকার চেহারাটা কেমন ?
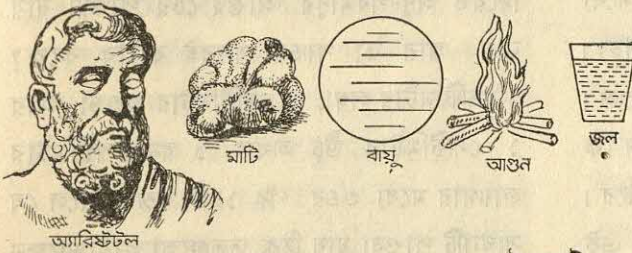
অ্যারিষ্টটল বললেন—মাটি, বায়ু, আগুন ও জল—এই চারটি মূল পদার্থ দিয়েই দুনিয়ার সব কিছু তৈরী হয়েছে।

প্রাচীন কালের দার্শনিকরাও এ সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ করে গেছেন। বিশেষ করে গ্রীক পণ্ডিতদের অবদান বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করার মত। তবে ভারতীয় দার্শনিক কণাদ গ্রীক পণ্ডিতদের আগেই বলেছিলেন, যে, সব রকম পদার্থই অতি ক্ষুদ্র সব কণিকা বা পরমাণু দিয়ে গঠিত। এরই নাম কণাদের পরমাণুবাদ।

আগেই বলেছি, মূল বা মৌলিক পদার্থ একশ'র কিছু বেশী। কিন্তু প্রাচীন কালের দার্শনিক পণ্ডিতদের এ সম্বন্ধে মত ছিল অন্য রকম। অ্যারিষ্টটল বলতেন, দুনিয়ার সব কিছুই তৈরী হয়েছে চারটি মূল পদার্থ দিয়ে। এরা হ'ল মাটি, বায়ু, আগুন ও জল। অনেকটা এমনি ধরণের ধারণা ছিল ভারতীয় দার্শনিক পণ্ডিতদেরও। তাঁদের মতে, মূল পদার্থ চারটি নয়, পাঁচটি—পঞ্চভূত বলা হয় এদেরকে। এরা হল ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্ অর্থাৎ মাটি, জল, তেজ (আগুন), বায়ু ও আকাশ (শূন্য)। হঠাৎ শুনলে এ যুগের ছেলেমেয়েরা হয়তো হাসবে—কিন্তু এর মধ্যেও খানিকটা সত্যি আছে বৈ কি! পদার্থের প্রাথমিক গুণ নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি তা হলে দেখব সেগুলো হচ্ছে উষ্ণতা, আর্দ্রতা, শুষ্কতা ও শীতলতা। আগুন হচ্ছে উষ্ণ এবং শুষ্ক, বাতাস হচ্ছে উষ্ণ এবং আর্দ্র, জল হচ্ছে শীতল এবং আর্দ্র আর মাটি হচ্ছে শীতল এবং শুষ্ক। আধুনিক বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়েছে যে পদার্থের এই প্রাথমিক গুণগুলি সত্যি সত্যিই নির্ভর করে পরমাণুর ভিতরকার গঠনের ওপর। কাজেই অ্যারিষ্টটল বা পঞ্চভূতকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

যাই হোক্, প্রাচীন দার্শনিকদের কথা ছেড়ে দিয়ে তার পরবর্তী কালের পণ্ডিতদের মত একত্র করে আমরা জানতে পারি যে সকল মূল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম পরমাণু বা অ্যাটম্। এ সব মত অবশ্য প্রথমটা সবই ছিল কল্পনার ওপর ভিত্তি করে। প্রাচীন

মতবাদ আর আধুনিক পরীক্ষার ফল একত্র করে জন ড্যাল্‌টনই প্রথম তাঁর অ্যাটমিক থিওরী বা পরমাণুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। সে সময়ে অণু বা মলিক্যুলের ধারণা ছিল না। সে ধারণা প্রবর্তন করেন অ্যাভোগ্যাড্রো।

অণু হচ্ছে এক বা একাধিক পরমাণু দিয়ে তৈরী। পরমাণু কখনও আলাদা ভাবে থাকতে পারে না, অর্থাৎ ওদের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। কোন একটা পরমাণু শুধু রাসায়নিক ক্রিয়ার সময়েই অংশ নেয়। যেমন ধর, হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুই আর একটি পরমাণুর সঙ্গে একত্র হয়ে তৈরী করে হাইড্রোজেনের একটি অণু— যার পৃথক্ ভাবে থাকতে কোন বাধা নেই। তা হ'লে একটা হাইড্রোজেন অণুর মধ্যে রয়েছে দু'টো পরমাণু। অণুকে ভাঙ্গা যায়, পরমাণুকে যায় না। অবশ্য অনেক অণু আছে যার মধ্যে একটি মাত্র পরমাণুই থাকে,—যেমন লোহা। এখানে অণু আর পরমাণু একই হয়ে যাচ্ছে। আবার কোন কোন অণুতে ৩টি, ৪টি—এমন কি তারও অনেক বেশী পরমাণু থাকতে পারে। এই অণুরই ইংরেজী হচ্ছে মলিক্যুল এবং এই অণু আর পরমাণুতে তফাৎ থাকলেও সময় সময় তারা এক।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু হলেও—যে ক্ষুদ্রতম অংশ স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে তাই হচ্ছে অণু বা মলিক্যুল। কোন পদার্থ আসলে তার অণুর সমাবেশ মাত্র। কাজেই কোন পদার্থের ধর্ম হ'ল তার অণুদের ধর্ম।

হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে হয় জল। ব্যাপারটা কি ভাবে ঘটে দেখা যাক। হাইড্রোজেন গ্যাস হ'ল অসংখ্য হাইড্রোজেন অণুর সমষ্টি, আবার অক্সিজেনও সেই রকম অসংখ্য অক্সিজেন অণুর সমষ্টি। নির্দিষ্ট পরিমাণ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশিয়ে তার ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ চালালে অতি সামান্য সময়ের জন্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অণুগুলো ভেঙ্গে তাদের নিজ নিজ পরমাণুতে পরিণত হ'ল। তারপর এ দু'জাতের পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক মিলন ঘটল। দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে একটি অক্সিজেন পরমাণুর যোগাযোগ ঘটল। তৈরী হ'ল জলের একটি অণু। অসংখ্য জলের অণুই যে আসলে জল সে কথা আগেই বলেছি।

পরমাণুরা কত ছোট? ওজনই বা তাদের কি রকম? খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও অণু-পরমাণুর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। আর তা পাওয়া যাবেই বা কি করে? ১ সেন্টিমিটার লম্বা, ১ সেন্টিমিটার চওড়া আর ১ সেন্টিমিটার উঁচু অর্থাৎ ১ ঘন সেন্টিমিটার জায়গার মধ্যে ৩এর পর ১৯টি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় ঠিক ততগুলো হাইড্রোজেন পরমাণুর জায়গা হতে পারে অনায়াসেই। ১ গ্রাম ওজনের জিনিস বলতে কতটুকু বোঝায় সে সম্বন্ধেও তোমাদের ধারণা আছে। ১-এর পর ২৪টি শূন্য বসালে যে সংখ্যাটি হয় তা দিয়ে যদি ১·৬৭কে ভাগ করা যায় তবে যে সংখ্যা দাঁড়ায় তত গ্রাম হ'ল একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন। যত মৌলিক পদার্থের খবর আমরা জানি হাইড্রোজেন হ'ল তার মধ্যে সব-চেয়ে হাল্‌কা। সবচেয়ে ভারী পরমাণু যা জানা ছিল তা হচ্ছে ইউরেনিয়ামের। অবশ্য ইউরে-

নিয়ামের চেয়েও ভারী পরমাণুর সন্ধান সম্প্রতি পাওয়া গেছে। ইউরেনিয়ামের এক একটি পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর চেয়ে ২৩৮ গুণ ভারী।

এত ছোট সংখ্যা নিয়ে কাজ-কারবার করতে ভারী অসুবিধে, তাই বিজ্ঞানীরা এর এক সহজ সমাধান করে নিয়েছেন। কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে একক হিসেবে ধরে নিয়ে একটি তুলনামূলক সংখ্যা দিয়ে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আগে হাইড্রোজেনের পরমাণুকেই এক ধরে নিয়ে এই তুলনা করা হ'ত, এখন হয় অক্সিজেন পরমাণুকে একক ধরে। অক্সিজেন পরমাণুর ওজন ধরা হয়েছে ১৬। এর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন ১·০০৮। বিভিন্ন জাতের পরমাণুদের এ ভাবে প্রকাশ করার সংখ্যাগুলোকে বলা হয় পারমাণবিক ওজন বা অ্যাটমিক ওয়েট। এই হিসেবে নাইট্রোজেনের অ্যাটমিক ওয়েট ১৪, ক্লোরিনের ৩৫·৫, ইউরেনিয়ামের ২৩৮।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। পরমাণুর ওজন নির্ভর করে তার ভিতরকার প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেক্ট্রনের সংখ্যার ওপর। সে কথায় পরে আসছি। কিন্তু এর কোনটারই পূরোটা না থেকে ভগ্নাংশ তো থাকতে পারে না! তবে হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন ভগ্নাংশ হ'ল কি করে?

হাইড্রোজেনের পরমাণুর কেন্দ্রীনে আছে ১টি প্রোটন ও বাইরে একটি ইলেক্ট্রন। ধর, এমন একটি হাইড্রোজেন পরমাণু পাওয়া গেল যার কেন্দ্রীনে আছে ১টি প্রোটন ও ১টি নিউট্রন, বাইরে ১টি ইলেক্ট্রন। তা হলে হিসেব মত এই জাতের হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন হবে দুই। এ রকম হাইড্রোজেন সত্যিই পাওয়া গেছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম্। (এমন কি পারমাণবিক ওজন ৩—এ রকম হাইড্রোজেনও পাওয়া গেছে।) এদেরকে বলা হয় হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। এ রকম সব মৌলিক পদার্থেরই আইসোটোপ হতে পারে। আর, বলতে কি, আমরা সচরাচর যে সব মৌলিক পদার্থ দেখি তা সবই এই রকম আইসোটোপের মিশ্রণ। কাজেই গড় পড়তার হিসেবে তাদের অনেকের পরমাণুর ওজন ভগ্নাংশ হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়।

অণুরা কি ভাবে রয়েছে পদার্থের মধ্যে

পদার্থের তিন অবস্থা—কঠিন, তরল আর বায়বীয়। পদার্থ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তার অণুদের কেউই চুপচাপ বসে নেই, অনবরত ছুটোছুটি করছেই। পদার্থের উষ্ণতা বাড়ালে অণুদের ছুটোছুটি অসম্ভব রকম বেড়ে যায়, আবার উষ্ণতা কমালে ছুটোছুটি যায় কমে। যে উষ্ণতায় জল জমে বরফ হয় তার চেয়ে ২৭৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা কমাতে পারলে এই ছটফটানি নাকি একদম বন্ধ হয়ে যাবে!

বিজ্ঞানীরা আরও বলেন, কঠিন পদার্থের অণুরা যার যার জায়গায় বসে বসেই ছটফট করে। তরল পদার্থের অণুদের ছুটোছুটি কিন্তু কঠিন পদার্থের অণুদের চেয়ে বেশ বেশী। কিন্তু বায়বীয় পদার্থের অণুরা যেন একদল দামাল ছেলে; অনবরত এদিক্-ওদিক্ ছুটোছুটি করছে। উষ্ণতা বাড়ালে তো কথাই নেই!

অণুরা যখন এত ছুটোছুটি করছে তখন তারা পদার্থের আওতার বাইরে চলে যায় না কেন? এর কারণ হ'ল—আণবিক টান বা মলিক্যুলার অ্যাট্রাক্‌শন। অণুরা একে অন্যকে টানছে; এই টানটাকেই বলে আণবিক টান। কঠিন পদার্থের বেলা এ টানটা খুবই বেশী, তরল পদার্থের বেলা এ টানটা অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু গ্যাসের অণুদের ক্ষেত্রে আণবিক টান বা আকর্ষণ একদম নেই বললেই চলে। কোন গ্যাসের উষ্ণতা যদি খুব করে কমিয়ে দেওয়া যায় তবে তার অণুগুলো বড্ড ঢিলে মেজাজের হয়ে পড়ে, ফলে এদের ভিতরকার টানটা যায় বেড়ে। উষ্ণতা আরও কমিয়েদিলে অণুগুলো বড় ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে। একেই আমরা বলি তরল অবস্থা। তরল পদার্থকে যদি আরও ঠাণ্ডা করা যায় তবে অণুদের ছুটোছুটি যায় একদম কমে, আর আণবিক আকর্ষণ যায় বেড়ে। তরল পদার্থ তখন কঠিন হয়ে পড়ে।

পরমাণুরাই কি পদার্থের শেষ কথা?

এই সেদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ—তাকে আর ভাঙ্গা যায় না। কিন্তু মাদাম কুরীর রেডিয়াম আবিষ্কার, টমসনের ইলেক্‌ট্রন আবিষ্কার, রাদারফোর্ডের প্রোটন আবিষ্কার, আর চ্যাডউইকের নিউট্রন আবিষ্কার ড্যালটনের পরমাণুর চেহারার খোল-নইচে বদলে দিয়েছে। আজ আমরা জানি, পরমাণুরাই পদার্থের শেষ কথা নয়। পরমাণুদের মধ্যেও রয়েছে নানা জাতের কণিকা, প্রধানতঃ ইলেকট্রন, প্রোটন অর নিউট্রন।

মাদাম কুরী

বিদ্যুৎ হচ্ছে এক রকমের শক্তি,—বিজ্ঞানের ভাষায় বলে বৈদ্যুতিক শক্তি বা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি। বিদ্যুৎ আবার দু'রকমের হয়—পজিটিভ আর নেগেটিভ। পজিটিভ বিদ্যুৎ-ভরা অতি ক্ষুদ্র পদার্থ-কণিকাকে বলা হয় প্রোটন। নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ভরা কণিকার নাম ইলেকট্রন। একটি প্রোটনের মধ্যে যতটুকু পজিটিভ বিদ্যুৎ রয়েছে একটি ইলেকট্রনের মধ্যে রয়েছে ঠিক ততটুকু নেগেটিভ বিদ্যুৎ। প্রোটন-কণিকার ভর (বা মাস্) একটি হাইড্রোজেন পরমাণুরই সমান। একটি ইলেকট্রনের ভর প্রোটনের প্রায় দু' হাজার ভাগের এক ভাগ। এ জন্যেই ইলেকট্রনের ভর হিসেবের মধ্যে এক রকম ধরাই হয় না। একটি ইলেকট্রনকে যদি একটি প্রোটনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় তবে এমন এক জাতের কণিকার সৃষ্টি

হবে যার ভর হবে প্রায় একটি প্রোটনেরই সমান (কারণ ইলেকট্রনের ভর তো ধরাই হচ্ছে না), কিন্তু তার মধ্যে কোন বিদ্যুৎশক্তি থাকবে না। কারণ ইলেকট্রন আর প্রোটনের বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুৎ একে অন্যকে নষ্ট করে দেবে। এ ভাবে যে কণিকা পাওয়া গেল তার নাম দেওয়া হয়েছে নিউট্রন।

এই তিন জাতীয় কণিকা পরমাণুর মধ্যে কি ভাবে রয়েছে শোন।

প্রতি পরমাণুর দু'টি অংশ। ভেতরের অংশের নাম কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যে রয়েছে কতকগুলো প্রোটন, বাকী সব নিউট্রন। (সাধারণ হাইড্রোজেনে নিউট্রন নেই।) নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতগুলো প্রোটন আছে ঠিক ততগুলো ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাইরে বিভিন্ন বৃত্তাকার পথে প্রচণ্ড বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ যেন ক্ষুদে এক সৌরজগৎ। সৌরজগতের কেন্দ্রেও রয়েছে নিউক্লিয়াসের মত সূর্য আর গ্রহেরা ইলেকট্রনের মত চারদিকে বিভিন্ন পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সৌরজগতের অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা, এখানে সেখানে কয়েকটা গ্রহ-উপগ্রহ রয়েছে মাত্র। পরমাণুর ভিতরটাও অনেকটা অমনি ধরণের। এর অধিকাংশ জায়গাই ফাঁকা—মাঝখানে নিউক্লিয়াস আর চারধারে কয়েকটা ইলেকট্রন ঘুরপাক খাচ্ছে এই যা। একটা পরমাণুতে যতটুকু জায়গা রয়েছে তার এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র জায়গা যুড়ে রয়েছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে বিজ্ঞানীরা গোল আকার বলেই ধরে নিয়েছেন। ওর ব্যাস সাধারণতঃ এক ইঞ্চির চার কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র।

কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসে যে প্রোটন আর নিউট্রন আছে তাদের বড় সহজে আলাদা করা যায় না ; কিন্তু কেন্দ্রীনের বাইরে যে ইলেকট্রনরা ঘুরছে তাদের সহজেই পরমাণুর আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে তেমন তেমন অস্ত্র জোগাড় করতে পারলে কেন্দ্রীনও ভাঙ্গা যায়, আর তা করতে গিয়ে যে উপরি-শক্তি পাওয়া যায় তা-ই হ'ল অ্যাটম বোমার মূল কথা।

এবারে দেখা যাক্, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনদের সংখ্যা কত ?

পরমাণুরা সাধারণ অবস্থায় বিদ্যুৎভাবাপন্ন নয়। আমরা জানি, সবচেয়ে হাল্কা মৌলিক পদাথের পরমাণু হ'ল হাইড্রোজেনের। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীনে রয়েছে একটি মাত্র প্রোটন, আর কেন্দ্রীনের বাইরে তার চারদিকে ঘুরছে একটি মাত্র ইলেকট্রন। হাই-ড্রোজেন পরমাণুর পারমাণবিক ওজন মোটামুটি ধরা হয়েছে এক। হাইড্রোজেনের চেয়ে ভারী যে পরমাণু তা হ'ল হিলিয়ামের। এর কেন্দ্রীনে রয়েছে দু'টি প্রোটন ও দু'টি নিউট্রন। কেন্দ্রীনের বাইরে ঘুরছে দু'টি ইলেকট্রন—একই পথে। হিলিয়ামের চেয়ে ভারী যে মৌলিক পদার্থটি তার নাম লিথিয়াম। এর কেন্দ্রীনে তিনটি প্রোটন আর চারটি নিউট্রন রয়েছে। কেন্দ্রীনের চারদিকের প্রথম পথটিতে ২টি এবং দ্বিতীয় পথটিতে ১টি ইলেকট্রন ঘুরছে। এমনি ভাবে ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রনের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে সব ক'টি মৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্টি হয়েছে। ভারী মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীনে আছে ৯২টি প্রোটন এবং ১৪৬টি নিউট্রন। বাইরের বিভিন্ন পথে ঘুরছে ৯২টি

ইলেকট্রন। হাইড্রোজেনের চেয়ে ইউরেনিয়াম তাই ২৩৮ গুণ ভারী।

পদার্থের বিপরীত পদার্থ আছে কি ?

তা হলে, ইলেকট্রন-প্রোটন-নিউট্রন—এরাই হ'ল পদার্থের মূল জিনিস। এদের বিপরীত-ধর্মী কণিকা থাকাও সম্ভব কি ?

গঠনের দিক্ দিয়ে বিচার করলে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুই হ'ল সবচেয়ে সহজ। এর কেন্দ্রীনে একটি প্রোটন আর বাইরে একটি ইলেকট্রন রয়েছে। এমন কোন পদার্থ-কণিকার সন্ধান পাওয়া যাবে কি যার কেন্দ্রীনে একটি
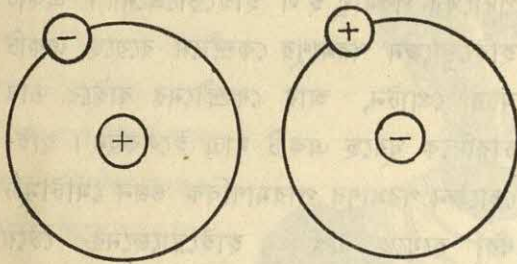
একটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং তার বিপরীত-ধর্মী একটি পরমাণু

প্রোটন না থেকে এমন একটি কণিকা থাকবে যার ওজন হবে প্রোটনেরই সমান, কিন্তু বিদ্যুৎ-ধর্মে সে হবে বিপরীত, অর্থাৎ নেগেটিভ বিদ্যুৎ-যুক্ত। আবার কেন্দ্রীনের বাইরে একটি ইলেকট্রনের বদলে এমন একটি কণিকা ঘুরবে, যার ওজন হবে ইলেকট্রনের সমান, কিন্তু বিদ্যুৎ হবে ইলেকট্রনের বিপরীত-ধর্মী,—অর্থাৎ যা পজিটিভ বিদ্যুৎযুক্ত।

বিজ্ঞানীরা সত্যি সত্যি তার সন্ধান পেয়েছেন। তিন জাতের মূল কণিকারই বিপরীত-ধর্মী কণিকার খোজ পাওয়া গেছে। এদেরই নাম দেওয়া হয়েছে 'বিপরীত পদার্থ' বা 'অ্যান্টি-ম্যাটার',—অ্যান্টি-প্রোটন, অ্যান্টি-নিউট্রন এবং অ্যান্টি-ইলেকট্রন।

ইলেকট্রনের মতই খুব ছোট এবং প্রায় ভর-শূন্য, অথচ পজিটিভ বিদ্যুৎযুক্ত কণিকার নাম অ্যান্টি-ইলেকট্রন না দিয়ে দেওয়া হয়েছে পজিট্রন। একটি পজিট্রন যদি একটি ইলেকট্রনের সঙ্গে যুড়ে দেওয়া যায় তবে উভয়ে উভয়কে ধ্বংস করে দেবে, উপরি পাওয়া যাবে খানিকটা শক্তি। ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের ভর অতি সামান্য হলেও, একটু তো আছেই! উভয়ের সেই ভর-টুকুই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

তেমনি প্রোটনের বিপরীত গুণবিশিষ্ট কণিকা হচ্ছে অ্যান্টিপ্রোটন। যখন একটি প্রোটন ও একটি অ্যান্টিপ্রোটনের মিলন ঘটে তখন এরা একে অন্যকে ধ্বংস করে দেয় সামান্য বিস্ফোরণ ঘটিয়ে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু শক্তি পাওয়া যায় অনেকটা। কারণ, প্রোটন আর অ্যান্টিপ্রোটন —এদের ভর তো নিতান্ত কম নয়! এ সময়ে অস্থায়ী এক ধরণের কণিকার সন্ধান পাওয়া যায়, যার নাম দেওয়া হয়েছে মেসন। অ্যান্টি-প্রোটন আবিষ্কারের জন্যে ১৯৫৯ সালে আমেরিকার সেগরী ও চেম্বারলেনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

এই আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের বর্তমান চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা। কে জানে, মহাশূন্যের কোন এক অংশের গ্রহ-নক্ষত্র সবই অ্যান্টি-ম্যাটার দিয়ে তৈরী কিনা! যদি তাই হয় এবং অ্যান্টি-ম্যাটারে তৈরী কোন বিশ্বের সঙ্গে যদি আমাদের পৃথিবীর মত কোন ম্যাটারে তৈরী বিশ্বের সংঘাত ঘটে, তবে যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটবে তার কথা কল্পনা করাও কঠিন।

দেশবিদেশের সেরা বই

মুদ্রারাক্ষসম্

'মুদ্রারাক্ষসম্' একখানি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক। নাটকটি রচনা করেছিলেন বিশাখ-দত্ত। ইনি নিজেও ছিলেন এক রাজপরিবারের ছেলে।

নাটকের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে দু'জন মন্ত্রীর কূটবুদ্ধির প্রতিযোগিতা। এঁদের একজন হচ্ছেন কূটনীতি-বিশারদ চাণক্য, যিনি নাকি ছিলেন মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা। চন্দ্রগুপ্তের ডান হাত। অপর জন হচ্ছেন রাক্ষস,— নন্দবংশের শেষ রাজার মন্ত্রী। এই নন্দবংশকে উচ্ছেদ করেই যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন এ তো ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানে। কিন্তু রাক্ষসও কম কূটনীতিক ছিলেন না। চাতুরীর খেলায় তাঁকে হার মানাতে অমন তুখোড়-বুদ্ধি চাণক্যকেও কম বেগ পেতে হয় নি। কবি-নাট্যকার বিশাখদত্ত এই দুই চতুর কূটনীতিকের চাতুরীর কাহিনী অবলম্বন করেই তাঁর বিখ্যাত নাটকটি রচনা করেন।

নাটকের গল্পটি এই রকম:

মগধে তখন নন্দবংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছেন। পাটলীপুত্র হচ্ছে তাঁর রাজধানী। একা চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সঙ্গে হয়তো এঁটে উঠতে পারবেন না, তাই চাণক্য প্রতিবেশী এক রাজা পর্বতেশ্বরকে দলে টানলেন। তার পর চন্দ্রগুপ্ত আর পর্বতেশ্বর একত্র হয়ে চাণক্যের কৌশল মত একদিন গিয়ে পাটলীপুত্র অবরোধ করলেন। যুদ্ধে মগধরাজের পরাজয় ঘটল। চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে নিহত করে পাটলীপুত্র দখল করলেন।

পর্বতেশ্বরের সঙ্গে চুক্তি ছিল, পাটলীপুত্র দখলে এলে পরে রাজ্যের অর্ধেক ভাগ তাঁকে দেওয়া হবে। কাজের সময় পর্বতেশ্বরকে দিয়ে কাজ হাসিল করে নিলেও চাণক্যের মোটেই ইচ্ছা ছিল না পর্বতেশ্বরকে রাজ্যের ভাগ দেওয়া হয়। তিনি মনে করতেন, কূটনীতিতে ছল-চাতুরী, কথার খেলাপ করা ইত্যাদি এমন কিছু দোষের নয়। কার্যোদ্ধার করতে হলে এ সব ন্যায়-অন্যায় মানলে চলে না। যাই হোক্, পর্বতেশ্বরকে যে তিনি বঞ্চিত করবেন সে মতলব তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন।

এদিকে নন্দবংশের মন্ত্রী রাক্ষস যে শুধু চালাকই ছিলেন তা নয়, প্রভুভক্তিও ছিল তাঁর অসীম। যে করেই হোক্, চন্দ্রগুপ্তকে তিনি উচিত শাস্তি দেবেনই—এই ছিল তাঁর পণ। এই পণ রাখতে হ'লে নিজেকে সংসারের মধ্যে জড়িয়ে রাখলে কাজের অসুবিধা হবে ভেবে তিনি নিজের পরিবারকে চন্দনদাস নামে এক বিশ্বস্ত মণিকারের আশ্রয়ে রেখে এলেন—আর সর্বদা ফিকির খুঁজতে লাগলেন কি করে কাজ হাসিল করা যায়।

অবশেষে একটা মতলব এল তাঁর মাথায়। সেটা প্রয়োগ করতে গিয়ে কিন্তু উল্টো ফল ফলল। চাণক্য সেই কৌশলটিকে ভাঙ্গিয়ে নিজের কাজে লাগালেন এবং তাতে করে শুধু রাক্ষসের মতলবটাই বানচাল হ'ল না, পর্বতেশ্বরকে সরিয়ে দেবার পথও প্রশস্ত হ'ল।

পর্বতেশ্বর নিহত হলেন আর সঙ্গে সঙ্গে চাণক্য প্রজাদের মধ্যে রটিয়ে দিলেন যে রাক্ষসই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। ফলে প্রজা-মহলে রাক্ষসের ওপর একটা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠল।

রাক্ষসই যে পর্বতেশ্বরের হত্যাকারী এ অপবাদ প্রজাদের মধ্যে রটিয়ে দিলেও পর্বতেশ্বরের ছেলে মলয়কেতুকে কিন্তু অন্য রকম বলা হ'ল। সেনাপতির ভাই ভাগুরায়ণ গিয়ে তাকে গোপনে বলল যে তার বাবাকে রাক্ষস হত্যা করান নি, করিয়েছেন চাণক্যই। মলয়কেতু যাতে ভয় পেয়ে অর্ধেক রাজ্যের দাবী না করে সেই জন্যই এ রকম বলা হ'ল, আর তলে তলে চাণক্যই ভাগুরায়ণকে দিয়ে ঐ রকম বলালেন।

শুনে মলয়কেতু পালিয়ে এল রাক্ষসের কাছে, আর রাক্ষস তার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন, কি করে চন্দ্রগুপ্তের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়। তিনি আরও পাঁচজন রাজাকে তাঁদের দলে টানলেন ; সবাই মিলে চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে কি করে যুদ্ধ সুরু করা যায় তারই পরামর্শ চলল। চাণক্যই যে চন্দ্রগুপ্তের যা কিছু বল-ভরসা তা রাক্ষসের বুঝতে বাকি ছিল না, তাই রাক্ষসের চেষ্টা হ'ল কোন গতিকে চাণক্যের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিরোধ বাধিয়ে দেওয়া যায় কিনা। চাণক্য কিন্তু সেটা ধরে ফেললেন।

আসলে কিন্তু চাণক্য রাক্ষসকে অপছন্দ করতেন না, বরঞ্চ তাঁর বুদ্ধি ও নানা গুণের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধই হয়েছিলেন। এমন একটি লোককে যদি চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীর পদে বসানো যায় তা হলে তাঁর কাজ অনেক হাল্কা হয়ে যায়। কিন্তু রাক্ষস তো আর সহজে তাতে রাজী হবেন না—চন্দ্রগুপ্ত যে তাঁর কাছে ঘোরতর শত্রু! তবু চাণক্য আশা ছাড়েন নি, চন্দ্রগুপ্তের তিনি শুভানুধ্যায়ী। চন্দ্রগুপ্তের অন্যান্য শত্রুদের নিপাত করে নিয়ে শেষ পর্যন্ত রাক্ষসের মন পরিবর্তন করা যায় কিনা সে চেষ্টা তিনি করবেন এই রকম একটা মতলব মনে মনে এঁটে রেখেছিলেন চাণক্য।

অবশেষে একদিন চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর সঙ্গে একটা কপট কলহের ভান করলেন—আর এমন ভাব দেখালেন যে তাঁর সঙ্গে আর তিনি কোনও সম্পর্ক রাখবেন না। বাইরের লোকদের দেখালেন যে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্বও তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। রাক্ষস এইটাই চাইছিলেন। তিনি খবরটা শুনে খুব খুসী। বেচারা তো জানতেন না যে সমস্ত ব্যাপারটাই চাণক্যের একটা ছল মাত্র, সত্যি নয় মোটেই!

এদিকে মলয়কেতুর সঙ্গে রাক্ষসের তখন খুব মাখামাখি। এ ভাব বজায় থাকলে রাক্ষস কোন দিনই চন্দ্রগুপ্তের দিকে ঝুঁকবেন না, তাই চাণক্য ঐ দু'জনের মধ্যে বিভেদ বাধাবার জন্য আবার কৌশলের জাল বিস্তার করলেন। চাণক্যের বাল্যবন্ধু ছিলেন ইন্দুশর্মা। তিনি জীবসিদ্ধি এই নাম নিয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে গিয়ে রাক্ষসের কাছে হাজির হলেন, তার পর তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে সেখানেই রয়ে গেলেন। চাণক্যের আরও একজন গুপ্তচর ছিল, নাম নিপুণক। নিপুণক লোকের বাড়ী বাড়ী গান গেয়ে বেড়াত, আর সেই সুযোগে বাড়ীর অন্তঃপুরেও ছিল তার গতিবিধি। একদিন সে মণিকার চন্দনদাসের বাড়ীতে গান গাইছে,

এমন সময় রাক্ষসের একটি ছোট ছেলে বাইরে এসে হাজির। তার মা, অর্থাৎ রাক্ষসের স্ত্রী, যিনি মণিকারের বাড়ীতে আত্মগোপন করে ছিলেন, তিনি ছেলেকে সামলাবার জন্য তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এলেন, আর সেই সময়ে তাঁর হাতের আঙ্গুল থেকে আচম্‌কা একটা আংটি খুলে পড়ে গেল। আংটিটা তাঁর স্বামী রাক্ষসের, আর তাতে রাক্ষসের নামও লেখা ছিল। রাক্ষসের স্ত্রী আংটিটা পড়ে যাবার কথা টের পেলেন না, নিপুণক সেটা চুপি চুপি তুলে নিল।

নিপুণক সেটা চুপি চুপি তুলে নিল।

আংটি নিয়ে নিপুণক সেটা চাণক্যের হাতে দিল, আর এও জানাল যে পাটলীপুত্রে রাক্ষসের দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু হচ্ছে চন্দনদাস আর শকটদাস। চন্দনদাসের পরিচয় তো আগেই জানা গেছে, শকটদাসের পরিচয়ও জানা গেল। সে ছিল একজন কায়স্থ, অর্থাৎ তার কাজ ছিল চিঠিপত্র নকল করা।

চাণক্যের মাথায় আবার একটা মতলব এল। তিনি একটা চিঠির খসড়া করে শকটদাসকে দিয়ে সেটা নকল করিয়ে আনালেন, তারপর সেই চিঠির ওপর রাক্ষসের নামাঙ্কিত সেই আংটির ছাপ দিয়ে সেটা দিয়ে দিলেন তাঁরই আর এক অনুচর সিদ্ধার্থকের হাতে। শুধু চিঠিই দিলেন না, সিদ্ধার্থককে কি করতে হবে তাও গোপনে বুঝিয়ে দিলেন।

তার পরেই শোনা গেল শকটদাসকে শূলে দেওয়া হচ্ছে। কারণ? কারণ আর কিছুই নয়, শকটদাস যে চন্দ্রগুপ্তের অহিত কামনা করে তার নাকি অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। আসলে কিন্তু এটাও চাণক্যের একটা চালাকি। সিদ্ধার্থকের ওপর তাঁর নির্দেশ ছিল—যখন শকটদাসকে প্রাণদণ্ডের জন্য শূলের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে ঠিক তখনই সিদ্ধার্থক গিয়ে সেখানে হাজির হবে এবং যেন তাকে উদ্ধার করতে এসেছে এমনি ভান করে কৌশলে সে সোজা শকটদাসকে নিয়ে তুলবে রাক্ষসের কাছে। রাক্ষসের নিতান্ত অন্তরঙ্গ এই শকটদাস, কাজেই তাকে ও-ভাবে রক্ষা করায় স্বভাবতঃই সিদ্ধার্থক রাক্ষসের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠবে। কৃতজ্ঞতা বলেও তো একটা জিনিস আছে!

ঠিক সেই ভাবেই কাজ হ'ল। সিদ্ধার্থকের বাহাদুরী দেখে রাক্ষস সত্যি সত্যি এত খুসী হয়ে উঠলেন যে তিনি তখনই তাঁর তিনটি বহুমূল্য অলঙ্কার খুলে তা সিদ্ধার্থককে দিয়ে দিলেন। ঐ অলঙ্কারগুলি মলয়কেতুই তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। সিদ্ধার্থক শুধু অলঙ্কারই পেল না, রাক্ষসের কাছে আশ্রয়ও পেল।

এদিকে চাণক্য ভাগুরায়ণকেও কাজে

লাগাতে ছাড়লেন না। গোপনে তার সঙ্গেও ষড়যন্ত্র করা হ'ল। তার পর একদিন প্রকাশ্যে, যেন ভাগুরায়ণ কত দোষই না করেছে এই রকম ভাব দেখিয়ে, তাকে বরখাস্ত করা হ'ল। পূর্ব ব্যবস্থা মত সে চলে এল মলয়কেতুর শিবিরে। মলয়কেতু তাকে নিজের প্রাণরক্ষক বলেই জানত; তাই তাকে একেবারে মন্ত্রীর পদে বসিয়ে দিল। এই ভাবে চাণক্য মলয়-কেতুকে একেবারে গুপ্তচর দিয়ে ঘিরে রাখলেন। শুধু তাই নয়, মৃত পর্বতেশ্বরের তিনটি অলঙ্কার, যা মলয়কেতুর প্রাপ্য,—তিনি এক বণিক্‌কে দিয়ে বেচে দিলেন রাক্ষসের কাছে।

চাণক্যে আর চন্দ্রগুপ্তে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে এই গুজব অল্প দিনেই নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। রাক্ষস এই সুসংবাদ শুনে সুযোগ এসেছে ভেবে তখনই যুদ্ধের আয়োজনে লেগে গেলেন; কিন্তু ভাগুরায়ণ এই অবসরে রাক্ষসের ওপর মলয়কেতুর মন বিষিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। সে মলয়কেতুকে বোঝাতে লাগল—রাক্ষসের এ আয়োজন মলয়কেতুর সাহায্যের জন্য নয়, তিনি চান চাণক্যকে সরিয়ে নিজেই চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীর পদে বসতে।

যুদ্ধ প্রায় সুরু হয় হয়। ভাগুরায়ণের ওপর মলয়কেতুর অগাধ বিশ্বাস—তার অনুমতি ছাড়া কেউ মলয়কেতুর শিবিরে ঢুকতেও পারে না, সেখান থেকে বেরোতেও পারে না। ইতিমধ্যে চাণক্যের অনুচরেরাও বসে নেই, তারাও তাদের নিজের নিজের ফন্দী-ফিকির অনুযায়ী কাজ সুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ একদিন জীবসিদ্ধি বলে বসলেন, তিনি আর রাক্ষসের আশ্রয়ে থাকবেন না। রাক্ষসই যে মলয়কেতুর বাপকে হত্যা করিয়েছে সে খবর তিনি পেয়েছেন; আবার এখন রাক্ষস যে কাজ করতে যাচ্ছেন তাতেও তিনি কিছুতেই সাড়া দিতে পারছেন না।

মলয়কেতু এই নতুন খবরে অবাক্ হয়ে গেল। তা হ'লে রাক্ষসই তার পিতৃহন্তা! ঠিক সেই সময়ে প্রহরীরা সিদ্ধার্থককে ধরে নিয়ে এল, সে নাকি অনুমতি ব্যতিরেকেই শিবির ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। খানাতল্লাস করে তার কাছে পাওয়া গেল চাণক্যের রচিত সেই চিঠি। চিঠিখানা লেখা হয়েছে চন্দ্রগুপ্তকে উদ্দেশ করে, আর তাতে আছে রাক্ষসেরই নামাঙ্কিত আংটির ছাপ। চিঠিতে লেখা—পাঁচটি রাজা যে মলয়কেতুর দলে যোগ দিয়েছে সেটা তাদের একটা ছল মাত্র—আসলে তারা সকলেই মলয়কেতুর শত্রু। তাদের নজর তার রাজ্য ও টাকার ওপর। সিদ্ধার্থকের কাছে আরও পাওয়া গেল রাক্ষসের দেওয়া সেই অলঙ্কারগুলো। এ অলঙ্কার আর চিঠি কোথায় পেল সে? জানতে চাইল মলয়কেতু। সিদ্ধার্থক বলল, পেয়েছে সে রাক্ষসেরই কাছে, আর রাক্ষসই তাকে ঐ চিঠি দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের কাছে পাঠাচ্ছিলেন।

মলয়কেতু তখন রাগে লাল হয়ে রাক্ষসকে ডেকে পাঠাল। রাক্ষস তখন যুদ্ধের সময় কি ভাবে ব্যূহ রচনা করতে হবে সেই পরামর্শ দিচ্ছিলেন। দেখা গেল রাক্ষস ঐ পাঁচজন রাজাকেই মলয়কেতুর দেহরক্ষী ঠিক করেছেন। শুধু তাই নয়, মলয়কেতু দেখতে পেল রাক্ষসের গায়ে তার বাপেরই সব অলঙ্কার। এই অলঙ্কারগুলো যে চাণক্যই ইতিপূর্বে কৌশলে রাক্ষসের কাছে বিক্রী করিয়েছিলেন তা

নিশ্চয়ই মনে আছে? রাক্ষস, কার সে অলঙ্কার সে বিষয়ে কোন মাথা না ঘামিয়েই, সেগুলো ব্যবহার করছিলেন। এবার আর মলয়কেতুর সন্দেহ রইল না যে রাক্ষসই তার পিতৃহন্তা এবং আসলে তিনি বিশ্বাসঘাতক।

মলয়কেতু এবার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল। ঐ পাঁচজন রাজাও তা হ'লে সত্যিই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেই বন্ধুত্বের ভান করে এসেছে! সে তখনই সেই পাঁচ রাজাকেই কেটে ফেলবার হুকুম দিল আর রাক্ষসকে দিল নির্বাসন দণ্ড।

বলা বাহুল্য মলয়কেতু তার হিতৈষীদের এ ভাবে সরিয়ে দিয়ে নিজেই দুর্বল হয়ে পড়ল আর তখন সেই সুযোগে ভাগুরায়ণ তার দলবল নিয়ে এসে তাকে বন্দী করে ফেলল।

এই ভাবে চাণক্যের প্রথম উদ্দেশ্য সফল হ'ল। এবার দ্বিতীয়টি সফল করার কাজে লাগলেন তিনি। চন্দনদাসকে আগেই তিনি বন্দী করে ফেলেছিলেন। রাক্ষস সে খবর পেয়েছিলেন। তাঁর মন ভীষণ খারাপ হয়ে ছিল, হয়তো আত্মহত্যাই করে বসতেন তিনি, কেবল চন্দনদাসের কথা ভেবেই কিছু করেন নি। একদিন পাটলীপুত্র শহরের এক পুরোনো বাগানে বসে বসে তিনি আপন মনে চিন্তা করছেন, এমন সময় দেখলেন একটি লোক দড়ির মাথায় ফাঁস বেঁধে একটি পছন্দ মত গাছের ডাল খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে লোকটি নিশ্চয়ই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করতে চায়। লোকটি কাছে আসতেই রাক্ষস অবাক্ হয়ে ব্যাপার কি জানতে চাইলেন। লোকটি বলল, "আমার অভেদাত্মা বন্ধু হচ্ছে বিষ্ণুদাস। সে পুড়ে মরবে ঠিক করেছে, কাজেই আমিও মরব ঠিক করেছি; কেন না বিষ্ণুদাসকে ছেড়ে আমার বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।"

লোকটি বলল, "আমার অভেদাত্মা বন্ধু হচ্ছে বিষ্ণুদাস······"

"কে বিষ্ণুদাস? আর সে পুড়ে মরবেই বা কেন?"

"বিষ্ণুদাস চন্দনদাসের প্রাণের বন্ধু। সেই চন্দনদাস যে আজ শূলে যাচ্ছে!"

"চন্দনদাস শূলে যাচ্ছে!" রাক্ষস চমকে উঠলেন, "কেন, কেন, কি তার অপরাধ?"

"অপরাধ আর কিছু নয়, রাক্ষসের পরিবার কোথায় আছে সে খবর চন্দনদাসই শুধু জানে, কিন্তু সে কিছুতেই তা বলবে না। সুতরাং রাজার হুকুমে তাকে শূলে যেতে হবে।"

আসলে এই লোকটিও সত্যিই আত্মহত্যা করতে আসে নি। এটাও চাণক্যেরই একটা

ছল। চাণক্যই তাকে ফন্দী করে ঐ কথা শোনাতে রাক্ষসের কাছে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানতেন বন্ধুর এই বিপদে রাক্ষস কিছুতেই স্থির থাকতে পারবেন না।

সত্যিই তাই। খবর শুনেই রাক্ষস ছুটে এলেন বধ্যভূমিতে।

কি দেখলেন সেখানে? দেখলেন বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য। বহু লোক জড় হয়েছে ব্যাপার কি দেখতে। ওদিকে চন্দনদাসকেও শূলের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার হাত-পা শক্ত করে বাঁধা। একটা উঁচু মঞ্চের ওপর প্রহরীরা তাকে পাহারা দিচ্ছে। আজ্ঞা পেলেই জল্লাদ এসে শূলে চড়িয়ে দেবে তাকে।

রাক্ষস সেখানে গেছেন খবর পেয়েই স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যও সেখানে এসে উপস্থিত। চন্দ্রগুপ্ত রাক্ষসের কাছে গিয়ে তাঁকে সবিনয়ে প্রণাম করলেন। চাণক্যও শতমুখে রাক্ষসের নানা গুণের কথা বলে, শেষে বললেন, "আমরা চন্দনদাসকে মুক্তি দিতে পারি একটি মাত্র সর্তে। সর্তটা আর কিছু না, আপনাকে চন্দ্রগুপ্তের বন্ধু হতে হবে। আমিও তা হলে বাকি জীবনটা নিশ্চিন্ত চিত্তে কাটাতে পারব।"

চাণক্যের কথা শুনে রাক্ষসের মন গলে গেল। তিনি চন্দ্রগুপ্তের বন্ধু হতে রাজী হলেন, তাঁর মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করলেন। চাণক্যের নির্দেশে চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতু ও অন্যান্য সমস্ত বন্দীকেই মুক্তি দিলেন। চন্দনদাসকেও সত্যি তাঁরা শূলে দিতে চান নি, সেটাও ছিল চাণক্যের একটা ছল।

"আমরা চন্দনদাসকে মুক্তি দিতে পারি একটি মাত্র সর্তে······"

কূটনীতিক চাতুরীতে চাণক্য রাক্ষসকে হারিয়ে দিলেও তাঁর বন্ধুত্ব অর্জন করলেন। এই ভাবে রাক্ষসকে পেয়ে মগধ রাজ্যে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনও সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। যেখানে যত বাধাবিঘ্নের কাঁটা ছিল তা সমস্ত সরিয়ে দিয়ে মৌর্য বংশ মগধে আসর জাঁকিয়ে বসল। চাণক্যও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন!
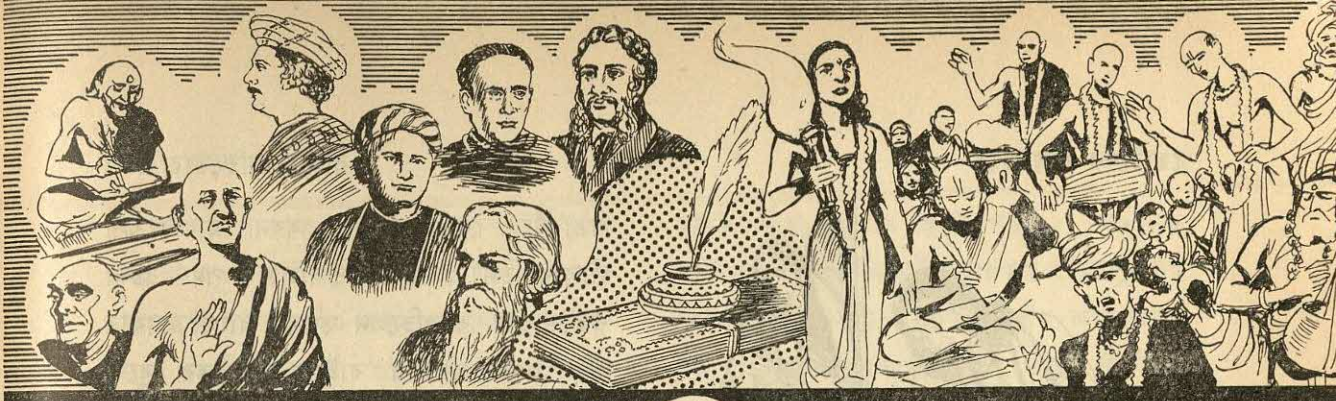
বাংলা সাহিত্যের কথা

বাংলা ভাষা কি করে এল

বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা, তাই আমাদের কাছে তা জননী ও জন্মভূমির মতই গরীয়সী। কিন্তু শুধু মাতৃভাষা বলেই বাংলা ভাষা আমাদের আদরণীয় নয়, এ ভাষা আজ পৃথিবীর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যেই আসন পেয়েছে।

বাংলা ভাষার মহিমা কোথায় যদি বুঝতে হয় তা হলে ভাল করে জানতে হবে বাংলায় রচিত কাব্য-সাহিত্যের কথা, আর জানতে হবে সেই সব কবি-মনীষীদের পরিচয় যাঁদের অক্লান্ত সাধনা যুগে যুগে এই ভাষা ও সাহিত্যকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তুলেছে।

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য আজকের নয়। যে ফুলটি প্রভাতের বাতাসে গন্ধ ঢালে তার পেছনে থাকে দীর্ঘ রাতের ফোটার ইতিহাস। তেমনি আজকের এই বিকশিত বাংলা সাহিত্যের আড়ালেও আছে বহু শতাব্দীর ক্রমবিকাশের বিবরণ। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে সংস্কৃত ভাষা থেকে প্রাকৃতের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব। প্রাচীন কালের সেই প্রথম বাংলা ভাষার রূপ কেমন ছিল, কেমন ছিল সে ভাষায় রচিত সাহিত্য—এ সব প্রশ্ন মনে জাগা খুব স্বাভাবিক। এর জবাব পেতে হলে আমাদের চলে যেতে হবে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগে।

এ দেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবারও আগে, দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে যখন পাল ও সেন রাজারা বাংলা দেশে রাজত্ব করছেন, সেই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত প্রাকৃত ভাষা আরও সহজ সরল রূপ ধারণ করে অপভ্রংশ ভাষায় পরিণত হ'ল। এই অপভ্রংশ ভাষা থেকেই জন্ম নিল বাংলা ভাষা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা—যেমন অসমীয়, ওড়িয়া, মৈথিলী, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি।

বাংলা ভাষার জয়যাত্রা

শুনলে আশ্চর্য মনে হবে, তবু এ কথা সত্যি যে সেই প্রাথমিক যুগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে অনেক বাঙ্গালীও সঙ্কোচ বোধ করতেন, কারণ তখনও পর্যন্ত সংস্কৃতই ছিল পণ্ডিতদের ভাষা—রাজসভার ভাষা। এই জন্যই হয়তো দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি এবং সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেব বাঙ্গালী হয়েও তাঁর বিখ্যাত কাব্য "গীতগোবিন্দ" রচনা করেছেন—বাংলা ভাষায় নয়, সংস্কৃত

কবি জয়দেব 'গীতগোবিন্দ' রচনা করছেন।

ভাষায়। অবশ্য এ সময়েই বাংলা দেশের একদল বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁদের ধর্মসাধনা সম্বন্ধে কতকগুলো পদ বা গান রচনা করেন বাংলা ভাষায়। কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালী সমাজে এর বিশেষ প্রচার ছিল না। ক্রমে ক্রমে মাতৃ-ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর এ দেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, সংস্কৃতের মর্যাদা রাজসভায় যখন আর তেমন রইল না, তখনই বাংলা ভাষার দিকে সকলের মন আকৃষ্ট হতে লাগল। তারপর একে একে বাংলায় বহু কাব্য রচিত হতে লাগল—বহু সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদও হতে লাগল বাংলা ভাষায়। এই ভাবে বাংলা সাহিত্য সকলের মন জয় করে নিল।

বাংলার বাইরে বাংলা ভাষা

বাংলা সাহিত্যের সুর এর পর ধীরে ধীরে বাংলার বাইরেও কোন কোন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব কবিরা যখন রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী নিয়ে সুললিত পদ রচনা করতে সুরু করেছিলেন তখনই বাংলা ভাষার সুর প্রথম বাংলার বাইরে ভারতের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরও বহুকাল পরে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের অলৌকিক জীবন-কাহিনী অবলম্বন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ "চৈতন্যচরিতামৃত" নামক আশ্চর্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করলেন। এই অসামান্য গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমগ্র ভারতে ভক্ত-ভাবুকদের কাছে সমাদৃত হতে লাগল। "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় রচিত টীকাই এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' নামক আশ্চর্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন।

ভারতের বাইরে বাংলা ভাষা

বাংলা সাহিত্যের মর্যাদা কিন্তু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ভারত অতিক্রম করে সমস্ত বিশ্বেই একদিন তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ যেদিন বিশ্ব-সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করে

বিশ্বকবিতে পরিণত হলেন সেদিন বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোর মধ্যে স্থান লাভ করল। বর্তমান যুগেও আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের অনেক রচনা পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

এই হচ্ছে বাংলা ভাষার জয়যাত্রার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বাংলা সাহিত্যে যুগ-বিভাগ

সেই প্রাচীনতম কাল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে ধারা বয়ে চলেছে তাকে প্রধানতঃ দু'টি অংশে ভাগ করা যায়—(১) প্রাচীন সাহিত্য, (২) আধুনিক সাহিত্য।

প্রাচীন কালে বাংলা ভাষায় যে সব সাহিত্য-গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তার অতি অল্পই খুঁজে পাওয়া গেছে। খুঁজে-পাওয়া সেই অল্প সঞ্চয়কে অবলম্বন করেই কিছুটা প্রমাণ, কিছুটা বা অনুমানের সাহায্যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয়েছে। এই ইতিহাসে প্রাচীন সাহিত্যকে সাধারণতঃ আদি যুগ ও মধ্য যুগ—এই দু'টি যুগে ভাগ করা হয়েছে।

আদি যুগ হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের জন্ম থেকে সুরু করে মুসলমান আমলের পূর্ব পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি; আর মধ্য যুগ হচ্ছে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান রাজত্ব থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ আমলের পূর্বকাল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অবধি।

আধুনিক সাহিত্যের যুগ ধরা হয়েছে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। আধুনিক সাহিত্যকেও প্রাচীন সাহিত্যের মত রবীন্দ্রপূর্ব যুগ ও রবীন্দ্র যুগ—এই দু'টি যুগে ভাগ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রপূর্ব যুগের সময় হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দী এবং রবীন্দ্র যুগ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

সাহিত্যে এই যুগ-বিভাগের অর্থ কি? একদিক্ থেকে ভাবতে গেলে সাহিত্যকে এ রকম কোনো বিশেষ যুগে ভাগ করা চলে না। কারণ সাহিত্যধারা হচ্ছে নদীর ধারার মতই, সর্বদা বয়ে চলেছে। একে ভাগ করা কঠিন। কিন্তু একটি নদী যে অবধি গিয়ে বাঁক ফিরেছে সে অবধি নদীর একটি অংশ—এ কথা বলতে বাধা নেই। সাহিত্যও নদীর মত বাঁক ফেরে। যে ভাব ও আদর্শ নিয়ে সাহিত্যধারার যাত্রা সুরু হয়, পরবর্তীকালে নানা কারণে সে ভাব ও আদর্শের মধ্যে বার বার পরিবর্তন ঘটে। এদিক্ থেকে বিচার করলে সাহিত্যকেও নানা যুগে নানা নামে চিহ্নিত করা ও ভাগ করা যেতে পারে বৈ কি!

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা বাংলা সাহিত্যকে নিম্নলিখিত ছকে ভাগ করব—
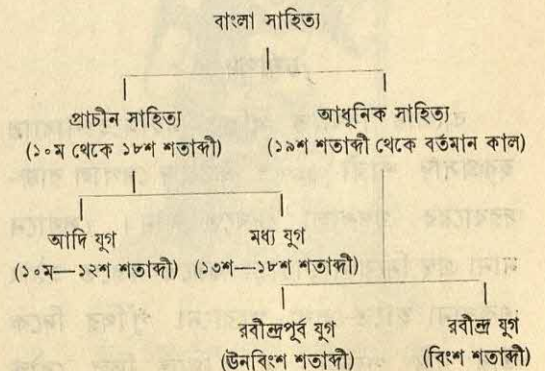
বাংলা সাহিত্যে আদি যুগ

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ সম্বন্ধে আমরা বহুকাল ধরে সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিলাম—কোন লিখিত সাহিত্যের খোঁজখবর পাই নি। লোকের মুখে মুখে নানা রকম ছড়া, গান, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি প্রচলিত থাকলেও তাদের কোন লিখিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায় নি। না পাওয়াই অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ তখন তো ছাপাখানা আবিষ্কৃত হয় নি, তাই হাতে-লেখা দু'-একখানা পুঁথিতেই রচনা সীমাবদ্ধ থাকত। এই পুঁথি অনেক সময়েই নষ্ট হয়ে যেত। কখনও হয়তো পোকায় কেটে ফেলত, কখন বা আগুনে পুড়ে যেত—কখনও বা অযত্নে ছিঁড়ে হারিয়ে যেত। পরবর্তী কালে মুসলমান আক্রমণের ফলেও আদি যুগের পুঁথিপত্র প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

তাই এ যুগে লিখিত চর্যাপদের পুঁথিখানা যখন হঠাৎ আবিষ্কৃত হ'ল, তখন আমরা অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেখা দেখতে পেলাম। কি করে এ পুঁথির আবিষ্কার হ'ল সে এক কাহিনী। এ সম্বন্ধে তোমরা ছোটদের বিশ্বকোষ ১ম খণ্ডে (পৃঃ ১৭১—১৭২) কিছু পড়েছ, আরও একটু বলি।

চর্যাপদ

বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল রাজ-দরবারের গ্রন্থশালা দেখতে যান। সেখানে নানা গ্রন্থ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একখানা হাতে-লেখা পুরোনো পুঁথির দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে। সে পুঁথিতে ছিল বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের লেখা কতকগুলো গান—অদ্ভুত তার ভাষা। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে হ'ল ঐ ভাষা যেন কিছুটা চেনা-চেনা ঠেকছে। প্রাচীন বাংলা নয় তো ওটা? পুঁথিখানা তিনি দেশে নিয়ে এলেন এবং দশ বছর পরে তা গ্রন্থাকারে ছেপে প্রকাশিত করলেন। তখন অনেকের মনে সন্দেহ ছিল এই রচনার ভাষা সত্যি সত্যিই বাংলা ভাষা কিনা। কিন্তু এ সন্দেহ বেশী দিন স্থায়ী হ'ল না। ভাষাতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অবশেষে সিদ্ধান্ত করলেন যে এই পদ বা গানগুলি হচ্ছে প্রাচীনতম বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন। এই গানগুলিই বাংলার চর্যাপদ এবং যে পুঁথিতে পদগুলি সংগ্রহ করা ছিল তার নাম "চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়"। বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে যে অপূর্ণতা ছিল এ গ্রন্থ তা অনেকখানি দূর করল।

হয়তো এ প্রশ্ন মনে জাগতে পারে যে চর্যাপদের ভাষা বাংলা কিনা তা নিয়ে আদৌ সন্দেহ হবার কারণ কি? কারণ অবশ্যই ছিল। যে সময়ে প্রাকৃত অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা সবে মাত্র জন্ম নিয়েছে, সে সময়ের (দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) ভাষাতেই চর্যাপদগুলো রচিত। আর বাংলা, ওড়িয়া এবং অসমীয়—এই তিনটি ভাষারই উদ্ভব হয়েছে পূর্বী প্রাকৃত বা মাগধী প্রাকৃত থেকে। সুতরাং সে যুগে এই তিনটি ভাষার মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল। এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার প্রভেদ যা ছিল তা অতি সূক্ষ্ম—সাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু বিশেষজ্ঞ যাঁরা তাঁদের চোখে তো কিছুই এড়ায়

না। তাঁরা এ ভাষা বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে বাংলা ভাষারই বিশেষ বিশেষ লক্ষণ খুঁজে পেলেন এবং সেগুলো যখন প্রমাণ স্বরূপ সকলের সামনে তুলে ধরলেন তখন আর কারও মনে সন্দেহের অবকাশ রইল না।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় গ্রন্থের প্রাপ্ত পুঁথিতে ৫০টি পদ উদ্ধৃত করা হয়েছিল, কিন্তু পুঁথিখানার পাতা মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যাবার ফলে কয়েকটি পদ খুঁজে পাওয়া যায় নি। ৪৬টি সম্পূর্ণ পদ এবং একটি পদের অর্ধেক পাওয়া গেছে। এই সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ নিয়েই চর্যাপদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মূল সংগ্রহ গ্রন্থে সর্ব সমেত ৫১টি পদ ছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।

প্রত্যেকটি চর্যাপদের শেষে কবি নিজের নাম উল্লেখ করেছেন। একে বলা হয় ভনিতা। এই ভনিতা থেকে ২৩ জন সাধক-কবির নাম পাওয়া যায়। এঁদের বলা হয় সিদ্ধাচার্য। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ২৪ জন সিদ্ধাচার্য মিলে চর্যাপদগুলো রচনা করেছিলেন। কবিদের নাম ভারি অদ্ভুত, যথা—ভুসুকুপাদ, ঢেণ্ঢণপাদ, তন্ত্রীপাদ, কুক্কুরীপাদ, শবরপাদ, চাটিলপাদ ইত্যাদি। সম্ভবতঃ এগুলো তাঁদের ছদ্মনাম। সবচেয়ে বেশী সংখ্যক পদ রচনা করেছেন কাহ্নুপাদ বা কৃষ্ণাচার্য। তাঁর পদসংখ্যা ১৩।

এই সব পদের আসল অর্থ আবিষ্কার করা খুবই কঠিন—কিছু বোঝা যায়, কিছু বোঝা যায় না। তাই এর ভাষাকে 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ ভাষা হচ্ছে সঙ্কেতের ভাষা—সন্ধ্যার মত আলো-আঁধারে মেশা। অনেকে বলেন, কথাটা আসলে 'সন্ধা' অর্থাৎ অভিসন্ধি বা অভিপ্রায়। ছোটদের বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ডে এর কিছু নমুনা তোমাদের দেওয়া হয়েছে। এখানে আর একটা দিচ্ছি ঃ

"সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥
বাহতু কামলী গঅণ উবেসেঁ।
গেলী জাম বাহুড়ই কইসেঁ॥" ইত্যাদি

অর্থ—সোনায় ভর্তি করুণার নৌকো। রূপো রাখবার (থুইবার) স্থান নাই (নাহিক ঠাবী)॥ কামলী, তুমি গগনের উদ্দেশ্যে (গঅণ উবেসেঁ) বেয়ে যাও (বাহতু)। গত জন্ম (গেলী জাম) কেমন করে (কইসেঁ) ফিরে আসবে (বাহুড়ই)॥ (৮নং চর্যা)।

এ যেন কবিতায় লেখা একটি হেঁয়ালী।

হেঁয়ালীর কথা এক জায়গায় কবি নিজেই ভনিতায় বলে দিচ্ছেন—"ঢেণ্ঢণপাএর গীত বিরলে বুঝঅ।" অর্থাৎ ঢেণ্ঢণপাদের গীত বিরলে বসে বুঝতে হবে।

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী ...

চর্যাপদগুলোর মধ্যে থেকে সেকালের সমাজ-জীবনের অনেক সুন্দর সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। বিবাহের বর্ণনা, গান-বাজনার বর্ণনা, দাবা খেলার বর্ণনা, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির জীবনযাত্রা—এ রকম অনেক কিছুই পদগুলোতে লিখিত আছে। কোন কোন

বহু পুরোহিত ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী···নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

চিত্র সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর। যেমন শবরীদের বর্ণনা :

"উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিন সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥"

(২৮ নং চর্যা)

অর্থ—উঁচু উঁচু পর্বত, তাতে বাস করে শবরী বালিকা। ময়ূরের পুচ্ছপরিহিতা শবরী, গ্রীবাতে (গলায়) তার গুঞ্জার মালা।

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগে চর্যাপদ ছাড়া আর কোন রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় নি। যদিও কেউ কেউ অনুমান করেন যে সে সময়ে শৈব এবং বৈষ্ণব পদও নিশ্চয়ই বাংলায় রচিত হয়েছিল, কিন্তু তার কোন সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের মূল্য অপরিসীম।

চর্যাপদ সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করবার আগে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দরকার। বাংলা ভাষায় রচিত এই চর্যাপদের পুঁথি নেপালে পাওয়া গেল কি করে? কারণটা সংক্ষেপে বলছি।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতের পূর্ব অঞ্চলে মুসলমান তুর্কীদের আক্রমণ সুরু হয়। বাংলা দেশে তাদের অত্যাচারের ফলে বহু মঠ-মন্দির প্রভৃতি ধ্বংস হয়। সে সময়ে মঠ-মন্দিরগুলো ছিল শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্র। অনেক মূল্যবান্ পুঁথিপত্র, পট, মূর্তি এবং রত্নাদি এ সব জায়গায় রক্ষা করা হ'ত। মন্দির বা মঠ আক্রান্ত হলে অনেক সময় প্রধান পুরোহিত বা সন্ন্যাসীগণ বিশেষ মূল্যবান্ পুঁথিপত্র এবং দেবমূর্তি প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে গোপন পথে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতেন। নেপাল ছিল স্বাধীন হিন্দু রাজ্য এবং বাংলা দেশ থেকে

সন্ন্যাসীগণ বিশেষ মূল্যবান্ পুঁথিপত্র এবং দেবমূর্তি নিয়ে গোপন পথে কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতেন।

নেপালে যাবার গোপন পথও ছিল। তাই বহু পুরোহিত ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এ যুগে পুঁথিপত্রাদি নিয়ে নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই ভাবেই চর্যাপদের পুঁথিও বাংলা থেকে নেপালে স্থানান্তরিত হয়েছিল। নেপালে রাজ-দরবারের গ্রন্থশালা থেকে অন্যান্য বাংলা এবং সংস্কৃত পুঁথিও খুঁজে পাওয়া গেছে। সুতরাং নেপাল থেকে চর্যাপদের আবিষ্কার এমন কিছু অসম্ভব ঘটনা নয়।

বাংলা সাহিত্যে মধ্য যুগ

বাংলা সাহিত্যে আদি যুগ শেষ হয়ে মধ্য যুগের শুরু হ'ল এক গভীর দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে। মুসলমান তুর্কীরা মগধ জয় করে বাংলার বুকে পা বাড়াল। চারদিকে চলল হত্যা, লুণ্ঠন ও ত্রাসের লীলা। মানুষের প্রাণ বিপন্ন, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এ অবস্থায় সাহিত্য-সাধনা কি করে সম্ভব হতে পারে? বোধ হয় এই জন্যই এ সময়ে প্রায় দু'শ' বছরের মধ্যে রচিত কোন বাংলা সাহিত্যের সন্ধান আমরা পাই নি।

চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার সুলতান শমসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন শুরু করলেন। তখন থেকেই ধীরে ধীরে দেশে শান্তির পরিবেশ ফিরে আসতে লাগল এবং জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্যরচনা শুরু করবার পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হ'ল।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে যে সব রচনার সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থখানির কথা। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এই গ্রন্থের পুঁথিখানি খুঁজে পান বনবিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রামের একটি বাড়ী থেকে। পুঁথিখানি খুবই পুরোনো। একমাত্র 'চর্যাপদ' ছাড়া এত পুরোনো পুঁথি আর পাওয়া যায় নি। ভাষা এবং লিপিও খুব প্রাচীন। সেদিক্ থেকেও চর্যাপদের পরেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের স্থান।

আসলে এই গ্রন্থখানির কি নাম ছিল তা কিন্তু জানা যায় নি; কারণ পুঁথির প্রথম দিকের, মাঝখানের ও শেষ দিকের অনেক পাতা ছিঁড়ে গেছে, তাই এর নামও হারিয়ে গেছে। তবে এর বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী বলে বইখানি প্রকাশ করবার সময়ে নাম দেওয়া হয়েছে "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন"।

কাব্যখানি কোন্ সময়ে রচিত হয়েছিল তা স্থির করার জন্যে পণ্ডিতেরা বইটি নিয়ে অনেক বিচার-বিবেচনা করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলে একমত হতে পারেন নি। তবে ভাষার দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে চর্যাপদের পরেই এ গ্রন্থের স্থান। তাই মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকেই প্রথম গ্রন্থ বলে ধরা যেতে পারে। প্রাচীন বাংলা ভাষা কেমন করে ধীরে ধীরে পরিবর্তন লাভ করেছিল তা জানতে হলে চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থের পরই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানির ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য একটি পালা-গান। নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে সেকালে এর অভিনয় হ'ত—এ রকম অনুমান করা যায়। সংক্ষেপে এর কাহিনী বলছি :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী

স্বর্গে দেবতাদের সভা বসেছে। কংসের অত্যাচারে সৃষ্টি নাশ হবার পথে—কি উপায় করা যায়?

"সব দেবেঁ মেলি সভা পাতিল আকাশে।
কংসের কারণে হএ সৃষ্টির বিনাশে॥
ইহার মরণ হএ কমণ উপাএ।
সম্ভোই চিন্তিআঁ বুয়িল ব্রহ্মার ঠাএ॥"
(জন্মখণ্ড)

দেবতারা ব্রহ্মাকে নিয়ে ক্ষীরোদ সাগরে শায়িত শ্রীহরির কাছে গেলেন। নারায়ণ তাঁদের নিবেদন শুনে সাদা ও কালো দু'গাছি কেশ দিলেন এবং বললেন যে বসুদেবের ঘরে হলী (বলরাম) ও বনমালী রূপে জন্ম নিয়ে তিনি কংসকে বধ করবেন।

যথাকালে প্রথমে বলরাম ও পরে কৃষ্ণের জন্ম হ'ল। বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রেখে তাঁর নবজাত কন্যাকে নিয়ে এলেন। কংস কন্যাকে হত্যা করতে গেলে কন্যা আকাশবাণী করল—

"কংসকে বুলিলে কণ্যা আকাসে থাকিআঁ॥
নান্দোঘরে বালা বাঢ়ে তোহ্মা বধিবারে।
গুণী কংসে কৃত্যা কৈল কাহ্ন বধিবারে॥"
(জন্মখণ্ড)

কিন্তু কৃষ্ণকে বধ করবার জন্যে কংসের সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল।

এদিকে দেবতাদের অনুরোধে লক্ষ্মী গোকুলে রাধা রূপে জন্ম নিলেন। আইহণের সঙ্গে রাধার বিবাহ হ'ল এবং তাঁকে দেখাশুনা করবার জন্য বৃদ্ধা পিসী বড়ায়িকে রাধার সঙ্গিনী করে দেওয়া হ'ল।

বড়ায়িকে সঙ্গে নিয়ে রাধা এবং তাঁর সখীরা মথুরায় দুধ-দই বিক্রী করতে যান। যাবার পথে একদিন বড়ায়িকে পেছনে ফেলে রাধা এবং সখীরা অনেক এগিয়ে গেলেন। তাঁদের খুঁজতে খুঁজতে কৃষ্ণের সঙ্গে বড়ায়ির দেখা হ'ল। বড়ায়ি রাধার বর্ণনা করল এবং কৃষ্ণ তাঁকে দেখেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করল।

বড়ায়ির মুখে রাধার রূপ-গুণের কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন।

বড়ায়ির মুখে রাধার রূপ-গুণের কথা শুনে কৃষ্ণ তাঁকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন এবং রাধার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু রাধা তাঁকে আমল দিলেন না।

এইভাবে দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড প্রভৃতির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বাদানুবাদ এবং নানা প্রকার লীলা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণ রাধাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তিনি ভগবান্ নারায়ণ।

"তীন ভুবনে রাধা আহ্মে অধিকারী।
* * * *
সকট ভাঁগিল আহ্মে শুণিআছ তোহ্মে।
জমল অর্জ্জুন তরু উপাড়িল আহ্মে॥
কংস বধিবারেঁ মোএঁ কৈলোঁ আবতার।"
(ভারখণ্ড)

রাধা কিন্তু এ সব কথায় সহজে কান দেন নি। তিনি কৃষ্ণকে গোয়ালার ছেলে বলেই উপহাস করেছেন, এমন কি নিজের ভার বহনেও নিযুক্ত করেছেন।

"সকল গোআল জাতী দধিভার বহে।
তাহাত কাহারো লাজ কথাঁহো ত নহে॥
তোহ্মে কেহ্নে ভার বহিতেঁ করহ বিমতী।
হেন বুঝোঁ তোহ্মে নহ গোআল জাতী॥"
(ভারখণ্ড)

এর পর বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখণ্ড প্রভৃতিতে বিচিত্র লীলা বর্ণনা করার পর বাণখণ্ডে রাধার প্রতি কৃষ্ণের পুষ্পবাণ নিক্ষেপ কবি বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণের বাণে রাধা মূর্চ্ছা গেলেন। বড়ায়ি ভয় পেয়ে কৃষ্ণকে অনেক গালমন্দ করল এবং বেঁধে রাখল। অবশেষে কৃষ্ণ রাধাকে স্পর্শ করলে রাধা চেতনা ফিরে পেলেন।

বাণখণ্ডের পর বংশীখণ্ড। কৃষ্ণ এক মোহনবাঁশী নির্মাণ করে মধুর সুরে তা বাজালেন। সেই বাঁশীর সুর শুনে রাধার অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি বললেন—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন্ জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥"
(বংশীখণ্ড)

রাধার মন এবার বদলে গেল। বৃন্দাবনে গিয়ে অনেক সন্ধানের পর রাধা কৃষ্ণের দেখা পেলেন। কিন্তু রাধা পথশ্রমে ঘুমিয়ে পড়লে কৃষ্ণ রাধাকে বড়ায়ির কাছে রেখে মথুরায় চলে গেলেন।

বহুদিন কেটে যাবার পর রাধার অনুরোধে বড়ায়ি মথুরায় গিয়ে কৃষ্ণকে সব কথা জানাল। কিন্তু কৃষ্ণ বললেন—

"মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাশ॥"

পুঁথিখানা এখানেই শেষ, এর পর পাতা ছিঁড়ে গেছে। মনে হয় পালাটি কংসবধে শেষ হয়েছিল।

চণ্ডীদাস সমস্যা

"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন বড়ু চণ্ডীদাস। গ্রন্থের মধ্যে বহুবার তাঁর ভনিতা আছে। মনে হয় তিনি দেবী বাশুলী বা বিশালাক্ষীর (শক্তির এক রূপ) ভক্ত ছিলেন। কারণ তিনি ভনিতায় বলেছেন—

"বাসলীচরণ শিরে বান্দীআঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।"

বড়ু চণ্ডীদাস নাম শুনে মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে চণ্ডীদাস তা হলে ক'জন ছিলেন? বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাসের নাম বহুকাল ধরেই অতি বিখ্যাত। পদাবলীর ভনিতায় তাঁর নাম নানা ভাবেই পাওয়া যায়— দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, আদি চণ্ডীদাস, কবি চণ্ডীদাস ইত্যাদি। এ থেকেই পণ্ডিতদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে এই সব বিভিন্ন ভনিতা একই চণ্ডীদাসের কিনা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে 'বড়ু চণ্ডীদাস' ভনিতা দেখে সেই প্রশ্ন এখন গভীর সন্দেহে পরিণত হ'ল। বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব

ও ভাষার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাব ও ভাষার পার্থক্যও সমালোচকদের ভাবিয়ে তুলল। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে এত কাল যে রহস্য ছিল তা এখন সমস্যায় পরিণত হ'ল। চণ্ডীদাস ক'জন ছিলেন এ প্রশ্ন নিয়ে নানা জনে নানা মত প্রকাশ করতে লাগলেন।

চণ্ডীদাস যে একাধিক ছিলেন এ কথা প্রায় সকলেই মেনে নিলেন, কিন্তু কেউ কেউ বললেন চণ্ডীদাস তিনজন ছিলেন—বড়ু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং দীন চণ্ডীদাস। আবার কেউ কেউ দীন ও দ্বিজ চণ্ডীদাসকে একই লোক ধরে নিয়ে বললেন, চণ্ডীদাস ছিলেন দু'জন—একজন হচ্ছেন চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী বড়ু চণ্ডীদাস, অন্য জন হচ্ছেন চৈতন্যদেবের পরবর্তী পদাবলী-রচয়িতা দীন বা দ্বিজ চণ্ডীদাস। যাই হোক, এ সমস্ত জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা শুধু ধরে নেব যে চণ্ডীদাস একাধিক ছিলেন।

বড়ু চণ্ডীদাস

বড়ু চণ্ডীদাস গ্রন্থের কোন কোন ভনিতায় নিজেকে 'অনন্ত' বলেছেন। মনে হয় তাঁর আর এক নাম অনন্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থের সম্পাদক বসন্তরঞ্জন বাবুর মতে বড়ু চণ্ডীদাসের দেশ বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রাম। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁর মতে কবি যে দেবীর আরাধনা করতেন, তিনি বাশুলী ন'ন,—বাসলী, অর্থাৎ বাগীশ্বরী বা সরস্বতী।

বড়ু চণ্ডীদাস সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন বলে মনে হয়, কারণ তাঁর রচিত কাব্যে অনেক সংস্কৃত শ্লোক আছে। তা ছাড়া জয়দেব-রচিত গীতগোবিন্দের কয়েকটি সংস্কৃত পদ তিনি তাঁর কাব্যে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বিভিন্ন পুরাণ থেকেও তিনি নানা বিষয় গ্রহণ করেছেন।

ধর্ম নিয়ে সাহিত্য : বৈষ্ণব পদাবলী

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থের পর মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে যে সব রচনার সন্ধান পাওয়া যায় তা বিভিন্ন ভাবভঙ্গীতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত। অবশ্য প্রাচীন কালে সাহিত্য রচনাই হোক্ বা শিল্প রচনাই হোক্—সব কিছুর সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল ধর্মের ও সাধনার। এ শুধু আমাদের দেশে নয়—সমস্ত দেশেই। তবুও মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যকে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—(১) বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, (২) অনুবাদ সাহিত্য, (৩) মঙ্গল কাব্য। কেউ কেউ বলেন, পাঁচালী সাহিত্য।

পদাবলী সাহিত্য এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতা হিসাবে এর স্থান অতি উঁচুতে। শুধু তাই নয়, ভাব ও ভাষার সৌন্দর্যে এবং আবেদনের গভীরতায় বৈষ্ণব পদাবলী বিশ্বসাহিত্যে মর্যাদা পাবার যোগ্য।

এই পদগুলি সবই রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী নিয়েই রচিত। পরবর্তী কালে অবশ্য মহাপ্রভুকে অবলম্বন করেও বহু পদ রচিত হয়েছিল। পদগুলোর ভাষা কিন্তু সব একই ধরণের নয়। কোন কোন পদ খাঁটি বাংলায় লেখা। যেমন—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥"

(চণ্ডীদাস)

অথবা—

"আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥"

কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর বহু পদই এক ধরণের মিশ্র ভাষায় রচিত। তার মধ্যে বাংলা, মৈথিলী, ওড়িয়া, অসমীয় প্রভৃতি নানা ভাষার শব্দই স্থান পেয়েছে। এ ভাষাকে বলা হয় 'ব্রজবুলি'। ব্রজবুলি ব্রজের ভাষা নয়, শুধুমাত্র বৈষ্ণব পদাবলীতেই এর ব্যবহার দেখা যায়।

বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির পদে আমরা প্রথম ব্রজবুলির সন্ধান পাই। পরবর্তী কালে বহু কবি এ ভাষায় অসংখ্য পদ রচনা করেন। এমন কি আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই ভাষায় তাঁর 'ভানুসিংহের পদাবলী' রচনা করেছেন।

ব্রজবুলিতে রচিত পদের উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারা যাবে এ ভাষার মধ্যে কি সৌন্দর্য এবং মাধুর্য আছে। বিদ্যাপতি বলছেন—

"মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনু ন ছোড়বি মোয় ॥"

[হে মাধব, তোমাকে আমি বহু মিনতি করছি। তিল ও তুলসী দিয়ে এ দেহ তোমাকে সমর্পণ করলাম। তোমার দয়া যেন আমাকে ছেড়ে যায় না অর্থাৎ ত্যাগ করে না।]

অথবা—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥"

[জন্ম অবধি আমি ওই রূপ নিরীক্ষণ করলাম, তবু নয়ন তৃপ্ত হ'ল না। সেই মধুর বাণী শ্রবণে শুনলাম, তবু শ্রুতিপথে যেন তার স্পর্শ পেলাম না, অর্থাৎ অনেক শুনেও তৃপ্তি পেলাম না।]

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি

যে সব ভক্ত কবি পদাবলী রচনা করেছেন তাঁদের বলা হয় 'পদকর্তা' বা 'মহাজন'। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এঁদের মধ্যে খুব প্রাচীন এবং পরবর্তী সকল বৈষ্ণব কবিরই আদর্শস্থানীয়।

সহজ ভাষায় গভীর ভাব প্রকাশে চণ্ডীদাস ছিলেন অদ্বিতীয়। শোনা যায় চণ্ডীদাসের পদ মহাপ্রভুর খুব প্রিয় ছিল। পদাবলী-রচয়িতা এই চণ্ডীদাস যে কোন্ চণ্ডীদাস তা সঠিক ভাবে জানা যায় নি। অনেকেই এঁকে বড়ু চণ্ডীদাস থেকে ভিন্ন বলে মনে করেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের ভাব ও ভাষার সঙ্গে পদাবলীর ভাব ও ভাষার পার্থক্য অনেক। কেউ কেউ বলেন, ইনি হচ্ছেন দ্বিজ চণ্ডীদাস—বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্তী এবং মহাপ্রভুর সমসাময়িক। কেউ কেউ আবার মনে করেন, মহাপ্রভু চণ্ডীদাসের পদাবলীর অনুরাগী কি করে হবেন—কারণ ইনি চৈতন্যদেবের পরবর্তী দীন চণ্ডীদাস থেকে অভিন্ন। চণ্ডীদাস সম্বন্ধে নানা রকম গল্প-কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু তার কতটা যে সত্যি আর কতটা কল্পনা তা বলা কঠিন।

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার কবি এবং তাঁর জন্ম হয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে। তিনি

সংস্কৃত এবং অপভ্রংশ ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রচিত বিখ্যাত বৈষ্ণব পদগুলির জন্যই তিনি অমর হয়ে আছেন। মনে হয়, এই পদগুলি তিনি মৈথিলী ভাষাতেই রচনা করেছিলেন কিন্তু এই সব পদের প্রচলন ছিল বাংলা দেশেই বেশী। তাই বাংলা দেশে এবং উড়িষ্যা ও আসামে এই পদগুলির ভাষা কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়ে অবশেষে ব্রজবুলি ভাষায় পরিণত হয়। বিদ্যাপতির পদগুলি বাংলা দেশের মানুষকেই সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল এবং পরবর্তী কালে বাংলার বহু কবি তাঁর অনুকরণে ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। তাই বিদ্যাপতিকে আমরা বাংলার কবি বলেই গ্রহণ করেছি। তা ছাড়া সেকালে বাংলা এবং মিথিলার মধ্যে যোগাযোগও ছিল খুবই বেশী—দুই ভাষায় মিলও ছিল যথেষ্ট পরিমাণে। এ সব কারণেই বিদ্যাপতির কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে বাংলার মানুষ তাঁকে আপন বলে মনে করেছিল। বাঙ্গালীর মনের মধ্যে চিরকালই তিনি বাঙ্গালী কবি।

বিদ্যাপতি রাজা শিবসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত বহু পদে রাজা শিবসিংহ এবং রাণী লখিমা বা লছিমার নাম আছে। বিদ্যাপতির রচনায় ভাষার কারুকার্য অতি অপরূপ। আবার শেষ দিকের রচনায়, বিশেষতঃ প্রার্থনা পদগুলিতে ভাষা কিছুটা সরল কিন্তু ভাব অনেক গভীর। বিদ্যাপতির পদে উপমার ব্যবহার ভারী সুন্দর। যেমন—

"চিকুরে গলয়ে জলধারা।
জনু মুখশশী ভয়ে রোদয়ে আন্ধারা॥"

রাধা স্নান করে উঠেছেন। তাঁর চিকুর থেকে জলধারা ঝরে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন রাধার মুখশশীর ভয়ে অন্ধকার রোদন করছে। কারণ চাঁদের আলোয় অন্ধকার বিনষ্ট হয়।

বিদ্যাপতি শিবদুর্গা সম্বন্ধেও কতকগুলো পদ রচনা করেছিলেন। কোনও ধর্মের প্রতিই তাঁর গোঁড়ামি ছিল না।

অনুবাদ-সাহিত্য

মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছে অনুবাদ-কাব্যগুলি। প্রধানতঃ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ এ সময় থেকেই সুরু হয়। এতদিন শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাংলা ভাষার দিকে ততটা দৃষ্টি দেন নি। এখন যে তাঁদের নজর এদিকে পড়ল তার অনেক কারণ আছে।

প্রথমতঃ, মুসলমান তুর্কীরা এ দেশ জয় করে রাজা হবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে তাঁদের ধর্মও একটু একটু করে প্রসার লাভ করতে লাগল। তখন হিন্দুরাও নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করবার জন্যে প্রাচীন শাস্ত্র-পুরাণের আলোচনা ও প্রচার সুরু করলেন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ তো আর সংস্কৃত বুঝবে না, তাই তাদের জন্য পণ্ডিতেরা ধর্মগ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ করা প্রয়োজন মনে করলেন।

দ্বিতীয়তঃ, রাজসভায়ও বাংলা ভাষার আদর হতে লাগল। তার কারণ, মুসলমান রাজারা কিছুকাল এ দেশ শাসন করে হিন্দুদের সঙ্গে মিশে তাদের ধর্ম, আচার, রাজনীতি সব জানতে কৌতূহলী হলেন। কিন্তু তাঁরা তো আর সংস্কৃত বোঝেন না, তাই পণ্ডিতদের বললেন,

তোমাদের ধর্ম ও শাস্ত্র আমাদের বাংলায় বুঝিয়ে দাও। রাজার কথা অমান্য করা যায় না, তা ছাড়া সম্মান এবং পুরস্কারের লোভও আছে। অগত্যা সুরু হ'ল বাংলা অনুবাদ। যাঁরা এ কাজে হাত দিতেন গোঁড়া পণ্ডিতেরা তাঁদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। কৃত্তিবাস, কাশীরাম প্রভৃতি রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা অনুবাদ করেছিলেন বলে কোন কোন গোঁড়া পণ্ডিত তাঁদের 'সর্বনেশে' আখ্যা দিয়েছিলেন।

সে সময়ের কোন অনুবাদই মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ নয়, কবির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই সে সব রচনায় বেশী প্রকাশ পেত। মূল কাহিনী ও চরিত্রের সঙ্গে নিজের কল্পনা ও ভাবধারা মিলিয়ে তাঁরা নতুন করে কাব্য রচনা করতেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এ ভাবেই রচিত।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ

রামায়ণ অবলম্বনে বাংলায় বহু কাব্য রচিত হয়েছিল। এর মধ্যে বোধ হয় সর্বপ্রথম এবং নিঃসন্দেহ সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। সেই কোন্ যুগ থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত এই গ্রন্থ বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হয়ে আসছে। সবচেয়ে জনপ্রিয় আর সবচেয়ে প্রচলিত এই গ্রন্থ বাংলার জাতীয় কাব্যে পরিণত হয়েছে।

কৃত্তিবাসের লেখা একটি আত্মবিবরণ পাওয়া গেছে, যদিও কেউ কেউ এটি তাঁর নিজের লেখা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। যাই হোক, এই বিবরণ থেকে জানা যায়, গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে মুখুটি বংশে তাঁর জন্ম হয়। পিতামহের নাম মুরারি ওঝা। পিতা বনমালী। মাঘ মাসে রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ-কাব্য যে ঠিক কোন্ সময়ে রচনা করেছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। আত্মবিবরণে আছে যে তিনি গৌড়েশ্বরের আদেশে এই রামায়ণ রচনা করেছিলেন, কিন্তু ঐ গৌড়েশ্বরের নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। অনেকে মনে করেন, এ গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ। যদি তাই হয়, তবে গ্রন্থের রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এই গৌড়েশ্বর হচ্ছেন তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। কংসনারায়ণ সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর লোক। তা হলে রামায়ণের রচনাকালও দাঁড়ায় সে সময়ই। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের মতেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ পঞ্চদশ শতাব্দীতে রচিত।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের ভাষা সহজ, সরল ও সুন্দর। এ ভাষার সঙ্গে সকলেরই কিছু না কিছু পরিচয় আছে। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ থেকে এখানে কয়েক ছত্র তুলে দেওয়া হ'ল ঃ

"পাটের চাঁন্দয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসের খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজা বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে ॥
রাজার ঠাঞি দাণ্ডাইলাম চারি হাত অন্তর।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর ॥"

তবে কৃত্তিবাসের রামায়ণে আমরা বর্তমানে যে সহজ সরল ভাষা পাই কবি ঠিক সে ভাষাতেই লিখেছিলেন কিনা সন্দেহ। এ গ্রন্থের প্রচলন
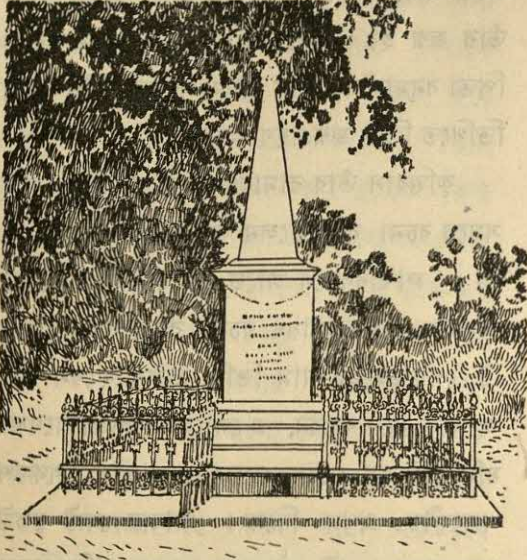
কৃত্তিবাস-স্মৃতিস্তম্ভ, ফুলিয়া

খুব বেশী ছিল বলে ভাষা বিভিন্ন যুগে পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমান সহজ রূপে এসে পৌঁছেছে। যথেষ্ট সংস্কারও করা হয়েছে ওকে।

কৃত্তিবাস বাংলার সব কবিরই প্রণম্য। এমন কি তাঁকে 'বাংলার আদিকবি' বলে বলা হয়েছে। ফুলিয়ায় বছর পঞ্চাশেক আগে নির্মিত তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের নীচে লেখা আছে ঃ

"হেথা দ্বিজোত্তম
আদিকবি বাঙ্গালার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিল জনম।"

মালাধর বসু রচিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'

এ যুগের আর একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। 'ভাগবত' গ্রন্থ অবলম্বনে এই কাব্য রচনা করেন মলাধর বসু। শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের অন্য নাম 'গোবিন্দ-বিজয়' বা 'গোবিন্দ-মঙ্গল'। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে একটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। কবি স্পষ্ট ভাবে এই কাব্যে তাঁর রচনার সময় নির্দেশ করেছেন। যথা—

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ তুই শকে হৈল সমাপন॥"

১৩৯৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করতে আরম্ভ করেন এবং ১৪০২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে তা সমাপ্ত হয়। মালাধর বসু 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি বলেছেন—

"গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান।"

এখানেও গৌড়েশ্বরের নাম কবি উল্লেখ করেন নি। তবে সময় ধরে হিসাব করলে দেখা যায় সে সময়ে গৌড়ের বাদশাহ ছিলেন রুক্নুদ্দীন বার্বক শাহ্। সম্ভবতঃ তাঁরই কাছ থেকে কবি উপাধি লাভ করেছিলেন।

এই কাব্যে কবির ভক্তিভাব অতি সুললিত ভাষায় প্রকাশিত। এই জন্য এই কাব্য মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ছিল। মালাধর বসু এক স্থানে লিখেছেন—"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।" এ কথা মহাপ্রভুরই অন্তরের কথা। শোনা যায় মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খানের নিকট মহাপ্রভু অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে কবির নাম উল্লেখ করেছিলেন।

মালাধর বসুর ভাষার উদাহরণ—

"প্রভাতে ভোজন করি শিঙ্গা বাজাইয়া।
পিছে পিছে চলে যত বাছুর চালাইয়া॥
একত্র হইল সবে যমুনার তীরে।
নানা মত ক্রীড়া করে যায় দামোদরে॥
কথাতে কোকিল পক্ষীগণে নাদ করে।
তার সঙ্গে নাদ করে দেব গদাধরে॥"

মালাধর বসুর নিবাস ছিল কুলীনগ্রামে
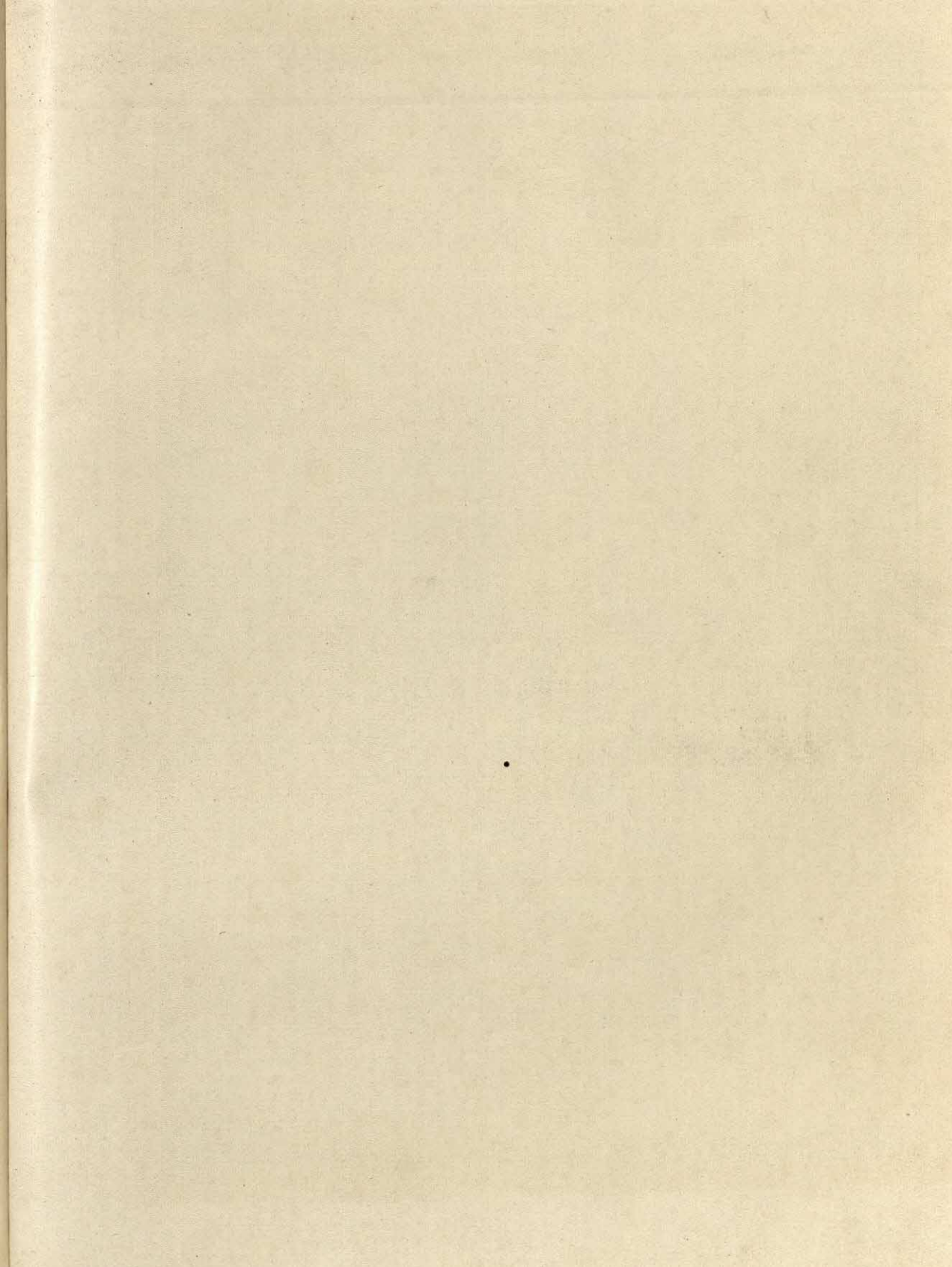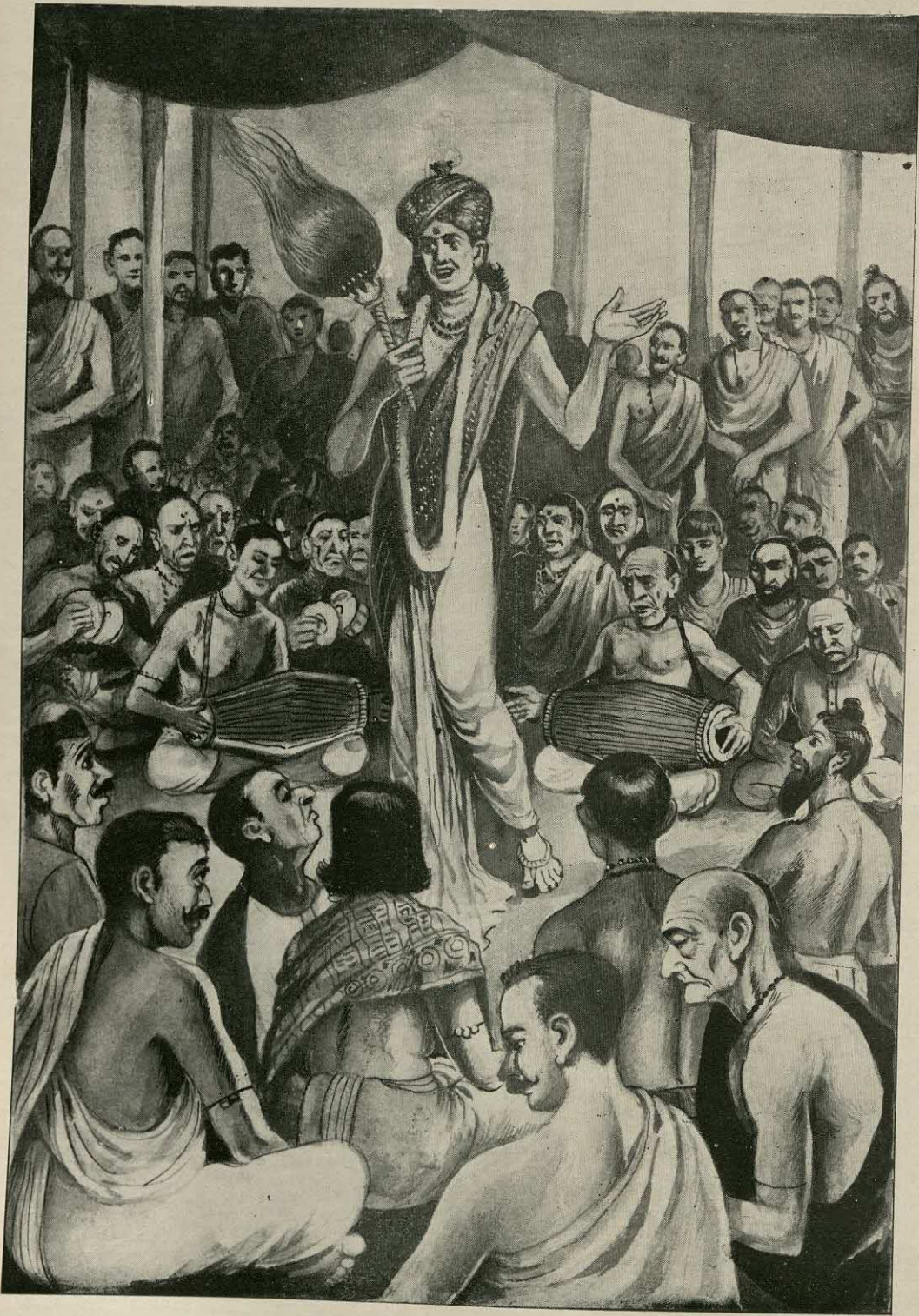
মঙ্গল গানের আসর

বাংলা সাহিত্যের কথা : পৃঃ ৫০১

(বর্ধমান জেলায়)। ইতি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। পিতার নাম ভগীরথ, মাতা ইন্দুমতী। কবির কাব্য থেকেই তাঁর এ সব পরিচয় জানা যায়।

মঙ্গলকাব্য

মধ্য যুগে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যেই আমরা খাঁটি বাংলা কাব্যের পরিচয় পাই। বাংলা বৈষ্ণব কবিতার পথ প্রদর্শন করেছিল সংস্কৃত গীতিকবিতা। বাংলা রামায়ণ, ভাগবত প্রভৃতি রচিত হয়েছিল সংস্কৃত গ্রন্থেরই অনু-করণে। কিন্তু মঙ্গলকাব্যগুলি ঠিক কোন সংস্কৃত গ্রন্থের আদর্শে লিখিত হয় নি, এর কাহিনীও বাংলার নিজস্ব। বহুকাল ধরে জনসমাজে যে সব কাহিনী প্রচলিত ছিল তাই অবলম্বন করে এই সব মঙ্গলকাব্য রচিত হয়। পরে কিছু কিছু পৌরাণিক কাহিনীও এসে সঙ্গে যুক্ত হয়।

মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়েছে কোন-না-কোন দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে। এই দেবদেবীরা ছিলেন মূলতঃ অনার্যপূজিত দেবতা এবং উচ্চ সমাজে এঁদের তত প্রসিদ্ধি ছিল না। পরে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলে এই সব অনার্য দেবতা আর্যদের দেবতার সঙ্গে অনেক অংশে মিশে যান। তখনই ধীরে ধীরে সমাজে তাঁদের পূজা স্বীকৃত হতে থাকে। মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর মধ্যেই এই ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়।

মঙ্গল গানের আসর

মঙ্গলকাব্যগুলিকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করা যেতে পারে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—(১) মনসামঙ্গল, (২) চণ্ডীমঙ্গল, (৩) ধর্মমঙ্গল। তা ছাড়া শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতিও রচিত হয়েছিল।

তখনকার মানুষের ধারণা ছিল যে এই সব কাব্য গান করলে বা শুনলে অমঙ্গল দূর হয়। তাই এদের নাম মঙ্গলকাব্য।

মনসামঙ্গল

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বিজয় গুপ্ত রচিত 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি এই কাব্যে সুলতান হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। সুতরাং বোঝা যায় এই কাব্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে, সম্ভবতঃ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল।

মনসার গীত এর আগেও প্রচলিত ছিল। বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে লিখেছেন—"প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত"। কিন্তু হরি দত্তের কাব্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। তবে নারায়ণ দেব নামে আর এক কবির রচিত 'মনসামঙ্গল'ও খুব প্রাচীন বলে জানা গেছে এবং কাব্যসম্পদেও এটির স্থান খুব উঁচু।

মনসামঙ্গলের দেবী মনসা অতি প্রাচীন কাল থেকেই পূজা পেয়ে

আসছেন। বহু আদিম জাতির মধ্যে নাগপূজার প্রচলন ছিল। মোহেন-জো-দাড়োতেও তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মনে হয়, মনসা দেবতা ছিলেন অনার্য দ্রাবিড়দের সর্পদেবতা। পরে এঁকে আর্যদেবতা শিবের কন্যারূপে গ্রহণ করা হয় এবং মহাভারতের বাসুকিভগিনী ও জরৎকারু মুনির পত্নীর সঙ্গে এক করে দেখা হয়। মনসাকে পদ্মা, বিষহরি প্রভৃতি নামেও কাব্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

বেহুলা লখীন্দরকে নিয়ে কলার ভেলায় ভেসে যাচ্ছেন।

বিজয় গুপ্ত বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সনাতন গুপ্ত। কবি লিখেছেন যে স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেয়ে তিনি এই কাব্য রচনা করেন।

শিবভক্ত চাঁদ সদাগর কিছুতেই মনসার পূজা করবেন না। শেষে মনসার চক্রান্তে বিবাহ-বাসরে চাঁদের পুত্র লখীন্দরের মৃত্যু হলে মনস্বী বেহুলা মৃত স্বামীর সঙ্গে কলার ভেলায় ভেসে ভেসে স্বর্গে গিয়ে কি করে নেচে-গেয়ে দেবতাদের তুষ্ট করে মৃত স্বামীকে বাঁচিয়ে তুললেন তারই গল্প নিয়ে এই কাব্য। লখীন্দরের পুনর্জীবন লাভের শর্ত হ'ল চাঁদকে মনসার পূজা করতে হবে। ফলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচারিত হ'ল।

এ যুগের আর একখানি বিখ্যাত মনসা-মঙ্গল হচ্ছে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর লেখা। এ গ্রন্থের রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৪৯৫ খ্রীঃ। কবি বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের লোক ছিলেন। তাঁর কাব্যে প্রথম কলকাতার নাম পাওয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডী দেবীর মহিমা প্রচার করা হয়েছে। এই চণ্ডী দেবীও মনসা দেবীর মত মূলে ছিলেন অনার্য ব্যাধদের দেবতা। পরে আর্যদেবতা পার্বতীর সঙ্গে এঁকে এক করে দেখা হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুটি আলাদা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে—প্রথমটি ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী, দ্বিতীয়টি বণিক ধনপতি সদাগরের কাহিনী।

চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম কবি হিসাবে মাণিক দত্তের নাম পাওয়া যায়। তাঁর আবির্ভাবকাল ঠিক জানা যায় না, তবে অনুমান করা হয় যে তিনি চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কবি। চণ্ডীমঙ্গলের বিখ্যাত কবিরা চৈতন্যদেবের পরবর্তী কালে কাব্য রচনা করেছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচিত চণ্ডীমঙ্গল বা "কবিকঙ্কণ চণ্ডী"ই চণ্ডীমঙ্গলগুলির মধ্যে সব-চেয়ে মনোহর। শুধু মঙ্গলকাব্য হিসেবেই নয়—বাংলা সাহিত্যেরও এটি একটি স্মরণীয় গ্রন্থ।

আমাদের শরীরের কথা

মাংসপেশীর কথা

আমাদের শরীরে কোথায় কি হাড় আছে আর কোথায় কোথায় অস্থিসন্ধি আছে সে কথা তোমাদের এর আগেই বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৯—২৪৪)। কিন্তু শুধু হাড় আর অস্থিসন্ধি হলেই যে আমরা চলতে পারতাম তা নয় ; এর জন্য চাই হাড়-গুলিকে চালাবার মত বড় বড় মাংসপেশী। চলতি কথায় এগুলিকেই আমরা মাংস বলি। পাঁঠার মাংস আসলে তার মাংসপেশী ছাড়া আর কিছু নয়। এই মাংসপেশীগুলি একটা হাড় থেকে উঠে আর একটা হাড়ে গিয়ে লাগে, আর যখনই এই মাংসপেশী টান দেয় তখনই একটা হাড় আর একটা হাড়ের কাছে চলে আসে। প্রায় বেশীর ভাগ সময়েই দেখা যায় দু'রকমের মাংসপেশী একসঙ্গে কাজ করে—যখন একটা টান দেয় তখন আর একটা হয়ে যায় আলগা। যেমন, হাতের গুলি যখন ফুলে ওঠে তখন আবার বাহুর পেছনের মাংসপেশী হয়ে যায় সোজা। যার ফলে মাংসপেশীদের লাফিয়ে লাফিয়ে কাজ করতে হয় না, বেশ সহজেই কাজ করে ওরা।

আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে—"কলের কাজ কৌশলে করে, হাওয়া কিনে বস্তা ভরে।" অর্থাৎ অসাধারণ কাজ করবার জন্য কৌশলের দরকার হয়। মাংসপেশী, হাড় ও অস্থিসন্ধি মিলেও তৈরী হয় এক আজব যন্ত্র—ভার তোলবার জন্য যা আমরা সবাই ব্যবহার করি। বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম "লীভার"।
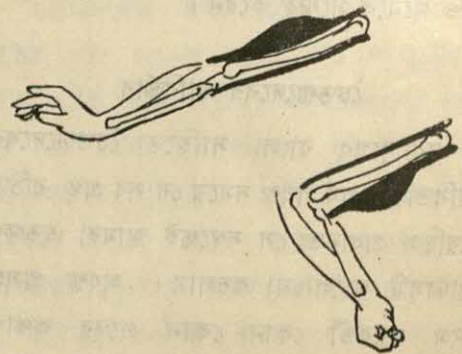
হাতের সামনের গুলি যখন ফুলে ওঠে তখন আবার বাহুর পেছনের মাংসপেশী হয়ে যায় সোজা।
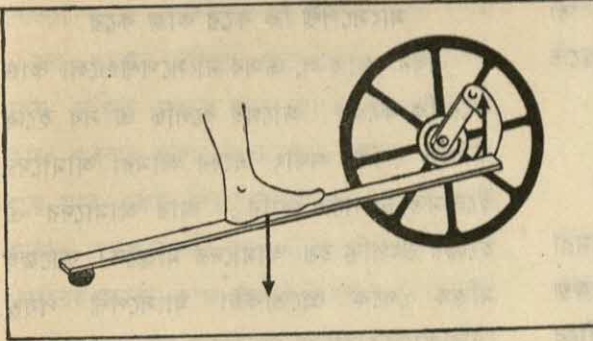
বাঁয়ে—এ যন্ত্রটা নিশ্চয়ই তোমরা দেখেছ। একটা লোক পা চালিয়ে ছুরি-কাঁচি ধার দেয়।
ডাইনে—আমাদের হাতেও তাই, মাংস অল্প একটু কুঁচকেই অনেক কাজ করা যায়
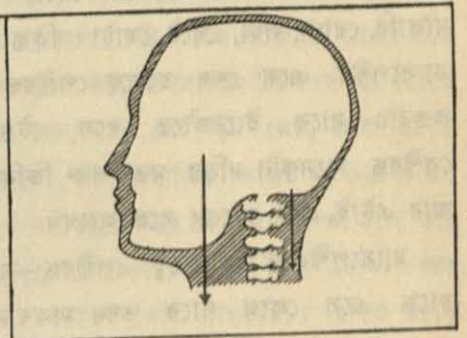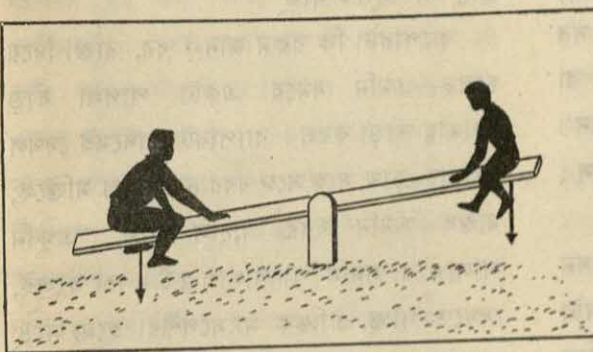
বাঁয়ে—সি-স হচ্ছে লীভার, যার ফলে বাঁ দিকের ছেলেটি ভাঁরী হলেও ডান দিকের ছেলেটিকে তুলতে পারে।
ডাইনে—আমাদের মাথাও হচ্ছে সি-স'র মত।
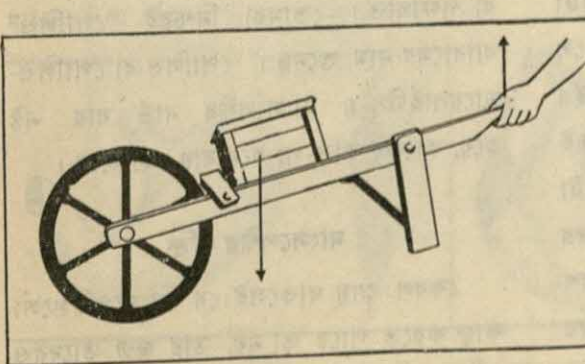
বাঁয়ে—আর এক রকমের লীভার—যাতে একটা লোক অনেক ভার নিয়ে যেতে পারে।
ডাইনে—আমাদের পা-ও কাজ করে ঐ লীভারেরই মত।

লীভার দিয়ে কি করে ভার তোলে তা আগের পৃষ্ঠার ছবিগুলি দেখলেই ভাল বুঝতে পারবে।

যে মাংসপেশী ইচ্ছেমত চালানো যায়

এই ধরণের মাংসপেশীগুলো আমরা আমাদের ইচ্ছেমত চালাতে পারি। সে জন্য এদের বলা হয় "ঐচ্ছিক"। আমাদের শরীরে এ রকম প্রায় ৬০০ মাংসপেশী আছে। কাজেই, বুঝতে পারছ, কাজের সুবিধার জন্য নানা রকমের মাংসপেশী হতে পারে—ছোট, বড়, মাঝারি, রোগা, লম্বা, বেঁটে, মোটা। কিন্তু সব মাংসপেশীই এসে শেষ হয়েছে পেশীবন্ধ বা কণ্ডরায়—যাকে ইংরেজীতে বলে টেণ্ডন। পেশীবন্ধ অনেকটা দড়ির মত শক্ত জিনিস; আর এটাই এসে হাড়ের সঙ্গে লাগে।

মাংসপেশীর দু'মাথায় দুই পেশীবন্ধ—যখন হাড়ে এসে লেগে থাকে তখন মাঝখানটা হয়ে যায় আলগা। কাজেই পেশী সঙ্কুচিত হলে মাঝখানটা ফুলে উঠতে অসুবিধা হয় না।

কোন মাংসপেশীকে যদি ভালো করে পরীক্ষা করা যায় তা হলে দেখা যাবে প্রত্যেকটা পেশীতে আছে ছোট ছোট কোষ, আর সে কোষগুলি সূতোর মত লম্বা লম্বা হয়ে আছে। তাদেরই গোছা গোছা দিয়ে তৈরী হয়েছে এই মাংসপেশী। ঐচ্ছিক পেশীগুলোতে আর একটা মজার জিনিস দেখা যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এদের মনে হয় ডোরা কাটা কাটা—একটা ভাগ বেশ কালো, আর একটা ভাগ সাদা। সেজন্য এদের আর একটা নাম হ'ল ডোরাকাটা (ষ্ট্রাইপ-দেওয়া) মাংসপেশী।

মাংসপেশী কি করে কাজ করে

এখন কথা হ'ল, এ সব মাংসপেশীগুলো কাজ করে কি করে? আগেই বলেছি এ সব হচ্ছে ঐচ্ছিক পেশী, অর্থাৎ এদের আমরা আমাদের ইচ্ছেমত চালাতে পারি; আর আমাদের ঐ ইচ্ছের উৎপত্তি হয় আমাদের মস্তিষ্কে। কাজেই মস্তিষ্ক থেকে প্রত্যেকটা মাংসপেশী পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তারের মত আছে স্নায়ু (নার্ভ্) আর ঐ স্নায়ু দিয়েই পেশীকে চালনা করা হয়। এই স্নায়ু বা নার্ভ্ গুলোকে তাই বলা যায় 'চালক-স্নায়ু' বা 'চালক-নার্ভ্'।

ব্যাপারটা কি রকম জান? ধর, রাস্তা দিয়ে চলেছ—এমনি সময়ে একটা পাগলা ষাঁড় তোমায় তাড়া করল। ব্যাপারটা প্রথমেই দেখল তোমার চোখ, সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল মস্তিষ্কে, মস্তিষ্ক অমনি খবর পাঠাল পায়ে, "এক্ষুনি পালাও"। অমনি পা লাগাল ছুট। তা হলেই, দেখতে পাচ্ছ, ঐচ্ছিক মাংসপেশীরা হচ্ছে নার্ভ্ বা স্নায়ুর চাকর। তাই কোন রকমে নার্ভ্ যদি নষ্ট হয়ে যায় তা হলে মাংসপেশী হয়ে পড়ে অকেজো। তাকেই আমরা বলি প্যারালিসিস্ বা পক্ষাঘাত। তোমরা নিশ্চয়ই "পোলিও" ব্যারামের নাম শুনেছ। পোলিও বা পোলিও-মায়েলাইটিস্-এ মাংসপেশীর নার্ভ্ যায় নষ্ট হয়ে, কাজেই হাত-পা হয়ে যায় অকেজো।

মাংসপেশীর শক্তি

কেবল স্নায়ু থাকলেই যে মাংসপেশীগুলো কাজ করতে পারে তা নয়, তার জন্য তাদেরও চাই খাবার। তোমরা হয়তো জান, রক্ত দিয়ে আমাদের শরীরের সব জায়গায় খাবার পৌঁছে

দেওয়া হয়। মাংসতেও তাই হয়, আর মাংস এ সব খাবার জমিয়ে রেখে দেয়। তার পর যখন মস্তিষ্ক থেকে তার কাছে এসে পৌঁছয় কাজ করবার হুকুম, তখন তার সারা শরীরে বয়ে যায় একটা বিদ্যুতের শিহরণ আর তাতেই খাবার ভেঙ্গে তৈরী হয় শক্তি; সেই শক্তির জোরেই তারা কাজ করতে সমর্থ হয়। আবার যখনই, যে কোন জায়গায়, শক্তি কাজ করে—সেখানেই তৈরী হয় উত্তাপ। তোমরা হয়তো দেখেছ মোটর গাড়ীর এঞ্জিন ঠাণ্ডা করবার জন্য দরকার হয় জল আর তাপ-পরিবাহক যন্ত্র রেডিয়েটর। আমরা কিন্তু এই উত্তাপকে নষ্ট করি না—শরীরের তাপসাম্য রাখবার জন্য এদের কাজে লাগাই। কিন্তু খাদ্য খরচ করলে সঙ্গে সঙ্গে মাংসপেশীতে কতগুলি রাসায়নিক জিনিসও তৈরী হয়—কার্বন ডাই-অক্সাইড আর ল্যাক্‌টিক্ অ্যাসিড। রক্তের কাজ হ'ল এ সব দূষিত পদার্থ সরিয়ে নেওয়া। কিন্তু যদি কোন পেশী এত তাড়াতাড়ি কাজ করে যাতে এ সব দূষিত জিনিসগুলি সব সরানো সম্ভব না হয়, তখনই আমাদের শরীর খারাপ লাগে, গা ম্যাজ ম্যাজ করতে থাকে, থেকে থেকে খালি খালি ঘুম পায়। তখনই আমরা কাজে ইস্তফা দিয়ে একটু বিশ্রাম করে নেই।

যে মাংসপেশী ইচ্ছে ছাড়াও চলে

ঐচ্ছিক মাংসপেশী ছাড়াও আর এক রকমের পেশী আমাদের শরীরে আছে যাদের কাজ আমাদের ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে না। এদের তাই বলা হয় "অনৈচ্ছিক"। এরা আমাদের শরীরের ভিতরকার নানা যন্ত্রপাতি চালায়। যেমন হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী। এরা যেন স্বয়ংক্রিয়, এদের যেন কোন রকম নতুন খবর দেবার দরকার নেই। যেন আমাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এদের কাজের বোতাম টিপে দেওয়া হয়েছে আর এরা, রাত নেই দিন নেই, কাজ করেই যাচ্ছে। কী সাংঘাতিক কাজই না এরা করে! কেউ যদি সত্তর বছর বেঁচে থাকে তা হলে তার হৃৎপিণ্ড কোঁচকায় অন্ততঃ পক্ষে ২৫,০০০ লক্ষ বার। কাজেই বোঝ ব্যাপারটা। যদিও এরাও স্নায়ুর চাকর এবং স্নায়ুর ব্যারামে এদেরও কাজে গণ্ডগোল হয়, কিন্তু তবু, বুঝতেই পারছ, আমাদের ইচ্ছের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।
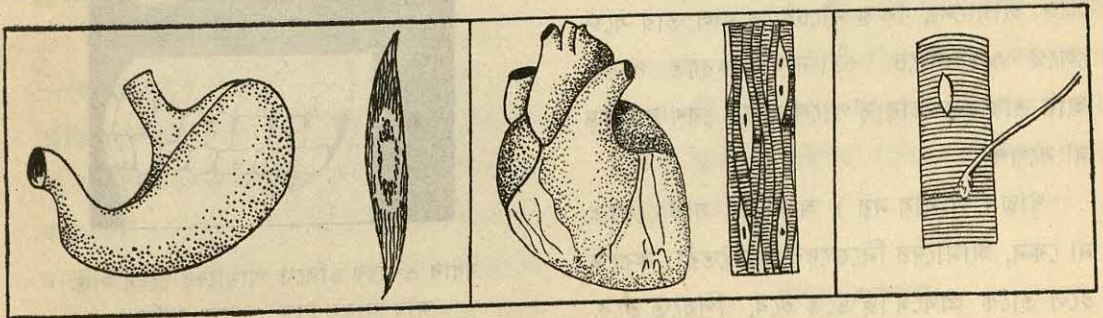
বাঁয়ে—অনৈচ্ছিক মাংসপেশীর একটি কোষ ; পাকস্থলী এ রকম কোষ দিয়ে তৈরী।
মধ্যে—হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী, ডোরা কাটা দেখা যাচ্ছে।
ডাইনে—প্রত্যেক মাংসপেশীর সঙ্গে একটি করে স্নায়ু থাকে।

এদের আবার দু'রকম ভাগ আছে—যেমন হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী আর পাকস্থলীর মাংসপেশী। পাকস্থলীর মাংস ডোরাকাটা নয়, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের মাংসে ডোরা ডোরা দাগ দেখতে পাওয়া যায়।

খাওয়াদাওয়ার কথা

হাড়-মাংসের কথায় তোমাদের বলেছি, আমাদের দেহের সব কোষগুলিরই বেঁচে থাকবার জন্য, বাড়বার জন্য দরকার খাবার। কিন্তু আমরা যে ডাল-ভাত খাই, আমাদের কোষরা কি সেগুলি সেই অবস্থায় নিজেদের কাজে লাগাতে পারে? মোটেই না। আমাদের খাবারগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে এমন অবস্থায় নিয়ে আসতে হয় যাতে তা জলে একেবারে গুলে যায় এবং কেবল তখনই আমাদের দেহের কোষগুলি তাদেরকে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।

মুখ আর দাঁত

আমাদের সব খাবারই প্রথমে আমরা মুখে ফেলে দি। মুখের ওপরের দিক্‌টা মাথার খুলির সঙ্গে লাগানো, কিন্তু নীচের চোয়াল তার সঙ্গে লেগে ওপর-নীচে ওঠা-নামা করতে পারে, আর তার জন্য তার দু'পাশে আছে বেশ বড় বড় মাংসপেশী।

খাদ্য (পানীয় নয়) আমাদের যাই হোক না কেন, আমাদের নিজেদের জন্য তৈরী করতে হলে তাকে প্রথমে ছিঁড়তে হবে, পিষতে হবে, কাটতে হবে, তা দিয়ে মণ্ড তৈরী করতে হবে। এর জন্য দরকার হচ্ছে দাঁতের। আর দাঁতও তো এক রকম নয়—সামনের দিকের দাঁত কাটবার, ধরবার জন্য, আর পেছনের দাঁত হচ্ছে পিষবার জন্য। আমাদের দাঁত আবার দু'বার ওঠে—একবার ৬ মাস থেকে ৯ মাসের ভেতর, আর একবার ৬ বছর বয়সের পরে। প্রথম বারে ওঠে কুড়িটা দাঁত—তাদের নাম হ'ল দুধের দাঁত। এগুলি কিন্তু স্থায়ী দাঁত নয়। একে একে সবই পড়ে যায়। তার পরে ৬ বছর থেকে যে দাঁত উঠতে থাকে সেগুলিই শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। এদের সংখ্যা ৩২, তাই আমরা বলি বত্রিশ পাটি
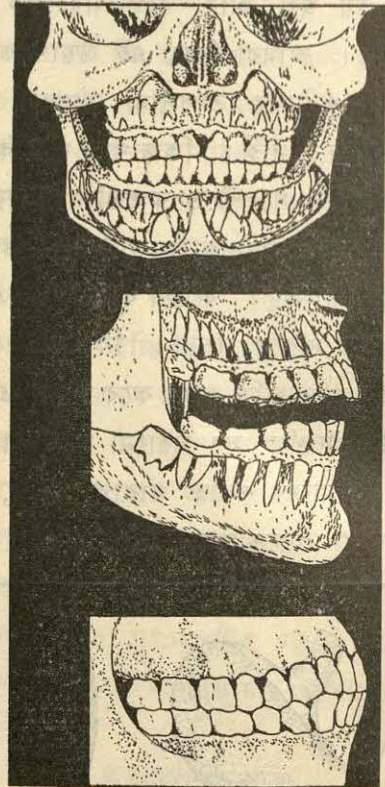
সবার ওপরের ছবিতে আমাদের দুধের দাঁত আর আসল দাঁত দেখতে পাচ্ছি। নীচের দু'টি ছবিতে দেখতে পাবে যে আমাদের ওপরের পাটির দাঁত ঠিক নীচের পাটির বরাবর পড়ে না।

দাঁত। অবশ্য শেষ চারটি দাঁত—এক এক চোয়ালে একটি, অনেকের ওঠেই না—আর যখন ওঠে তখন অনেককেই বেশ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। সে জন্যই বুঝি এদের বলা হয় "আক্কেল দাঁত"।

ভালো করে দেখলে দেখতে পাবে আমাদের ওপরের পাটির দাঁতগুলি নীচের পাটির ঠিক ঠিক বরাবর পড়ে না। এরও কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তা না হ'লে তো আমাদের এক একটি দাঁত ভেঙ্গে বা পড়ে গেলে তার জোড়ার দাঁতটাও হয়ে যেত অচল। ঠিক নীচে নীচে না থাকার জন্য আশপাশের দাঁতের সঙ্গে লেগে তাদের কিছু-না-কিছু কাজ চলতে থাকে।

জিভে জল

পেটুকের জিভে জল আসা নিয়ে আমরা ঠাট্টা করি। কিন্তু সামনে এক থালা রসগোল্লা রাখলে শুধু পেটুক কেন, আমাদের সকলেরই জিভ জলে ভরে যায়। এই জল কোত্থেকে আসে? আসে আমাদের গালের দু'পাশে দু'টো আর আমাদের নীচের চোয়ালের নীচে দু'টো, এই চারটে লালাগ্রন্থি থেকে।

এ জলকেই আমরা সাধারণ ভাষায় থুতু বলি —তা শুনতে যতই বিশ্রী লাগুক না কেন। এর প্রায় শতকরা নিরানব্বই ভাগই জল—ক্ষারীয় বা ক্ষার-জল, ইংরেজীতে যাকে বলে 'অ্যাল্‌কালাইন'। আর তার সঙ্গে থাকে টায়ালিন নামে একটা এন্‌জাইম। এর কাজ হ'ল আমাদের খাবারের ভিতর যে সব শর্করা অর্থাৎ চিনি জাতীয় জিনিস আছে তাদের বদলে দেওয়া। যেমন যেমন আমরা খাবার চিবুতে থাকি, তেমনি
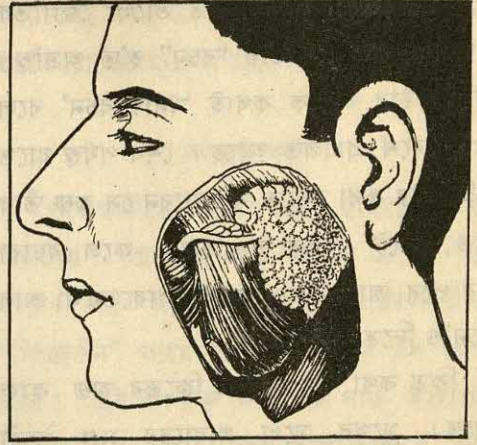
আমাদের গালের পাশের লালাগ্রন্থি

তেমনি খাবারের সঙ্গে এই লালা মিশে যায়। অবশ্য যে অল্প সময়ের জন্য খাবার আমাদের মুখে থাকে তার মধ্যে টায়ালিন তার কাজ শেষ করতে পারে না, পাকস্থলীতে গিয়েও তার কাজ চলতে থাকে।

এই লালার কিন্তু এ ছাড়া আরও কাজ আছে। আমাদের মুখে ও জিনিসটা না থাকলে আমাদের খাবারের মণ্ড তৈরী করতে পারা যেত না। তা ছাড়া আমাদের মুখে ঐ লালা না থাকলে জিভ আর ঠোঁট হয়ে যেত শুকনো—আমাদের কথা বলার দফাটি হয়ে যেত ঠাণ্ডা।

এ ছাড়া আরও কাজ আছে লালার। গরম খাবারকে এই লালাই ঠাণ্ডা করে দেয়, আর খাবার যদি টক হয় বা ঝাল হয় তা হলে তাদের সঙ্গেও মিশে সেগুলিকে খাওয়ার উপযুক্ত করে তোলে এরাই।

জিভের কাজ

জিভের একটি প্রধান কাজ হ'ল কথা বলা, কেমন? আমাদের দেশে প্রবাদ আছে খনা

নামে এক বিদূষী মহিলা এত ভালো জ্যোতিষ শাস্ত্র জানতেন যে তাঁর "বচন" হ'ত অভ্রান্ত। আজও তাঁর অনেক কথাই 'খনার বচন' বলে বাংলা দেশে প্রচলিত আছে। শেষ পর্যন্ত যাতে তিনি আর কথা বলতে না পারেন সে জন্য তাঁর জিভ কেটে দেওয়া হয়েছিল। ফলে বেচারা তার পরে আর কথাও বলতে পারতেন না আর 'বচন'ও দিতে পারতেন না।

কিন্তু কথা বলা ছাড়াও জিভের অন্য কাজ আছে। মুখের মধ্যে খাবারের মণ্ড তৈরী করবার সময় এক দাঁত থেকে অন্য দাঁতে নিয়ে যাওয়া, ভালো করে লালা লাগিয়ে খাবার নরম করে তোলা এবং সে খাবার গিলবার উপযোগী হলে তাকে গলায় নিয়ে পৌঁছে দেওয়া—এ সবই জিভের কাজ। জিভ না থাকলে এর কোন কাজই আমরা করতে পারতাম না।
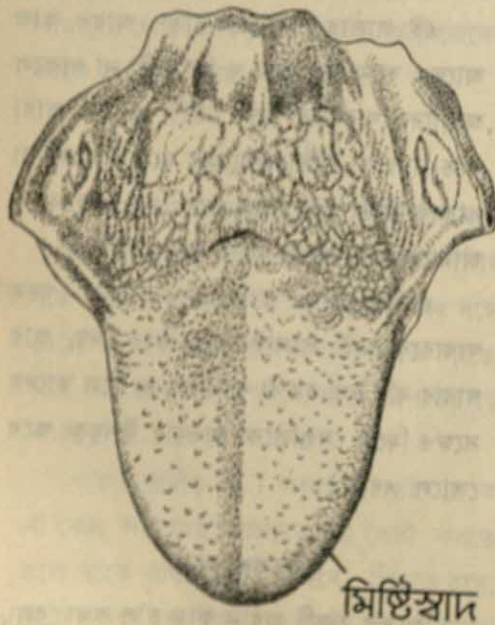
জিভের সামনের দিক দিয়ে বুঝি মিষ্টি স্বাদ, আর পেছন দিয়ে তেতো।

এ ছাড়া জিভের আর একটা বড় কাজ হ'ল আমাদের খাবারের স্বাদ গ্রহণ করা। স্বাদ ঠিক করবার রাশি রাশি গ্রন্থি আছে। খাবার টক, ঝাল না মিষ্টি তা আমরা জানতে পারি জিভের গুণে। জিভেতেই আছে স্বাদ ঠিক করবার ঐ রাশি রাশি গ্রন্থি। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে আমরা জিভের ডগা দিয়ে মিষ্টি স্বাদ গ্রহণ করি আর তেতো স্বাদ বুঝতে পারি জিভের পেছন দিয়ে।

পাকস্থলী

খাবার যেই নরম হয়ে গিলবার উপযোগী মণ্ড তৈরী হয়ে গেল অমনি জিভ আর মুখ তাকে ঠেলে দিল গলায়।

গলা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত আছে অন্ননালী বা ঈসফেগস্, এর ভিতর দিয়ে খাবার গিয়ে পৌঁছয় পাকস্থলীতে।

পাকস্থলীকে বলতে পার একটা মাংস-পেশীর থলি। এই থলি থাকে আমাদের পেটে, —বাঁ-দিকে। এর বাইরেটা একটা চাদরের মত জিনিস দিয়ে ঢাকা; তার ভিতরে আছে মাংসপেশী, আর সবার ভিতরে রয়েছে শ্লেষ্ম-ঝিল্লী বা মিউকাস্ মেমব্রেন।

শ্লেষ্ম-ঝিল্লীটি যেন একটি রাসায়নিক কারখানা। এর ভিতরে ভিতরে আছে ছোট ছোট গ্রন্থি যারা তৈরী করে শ্লেষ্মা, আর এক দল তৈরী করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। এ ছাড়া আরও একদল আছে, তারা তৈরী করে পেপসিন নামে এক রকম এন্‌জাইম্।

এখন, এ সবগুলিরই কাজ হচ্ছে আমাদের খাবার হজম করিয়ে শরীরের নানা কাজে
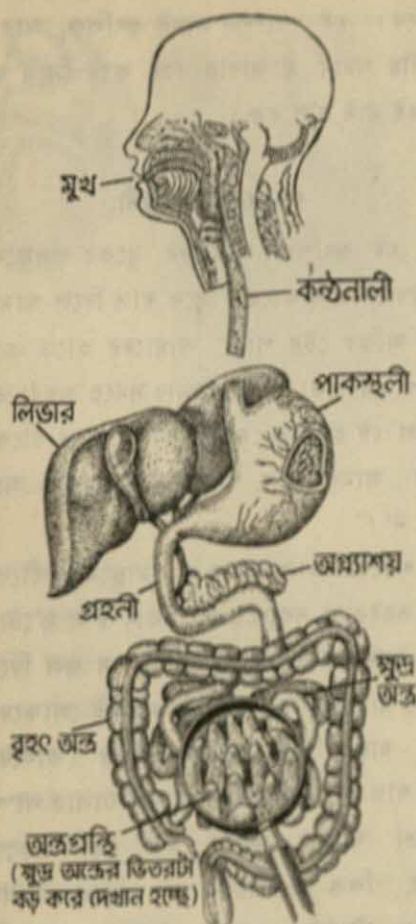
আমাদের শরীরের ভিতরকার কলকব্জা

লাগাবার উপযুক্ত করা। সুতরাং যাতে এ সব রস বেশ ভালো করে খাবারের সঙ্গে মিশে যেতে পারে সে জন্য পাকস্থলীর মাংসপেশীরা খাবারের মণ্ডটাকে পাকস্থলীর চারদিকে ঘোরাতে থাকে।

প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খাবারের ওপরে কাজ করে তাদের তৈরী করে তোলে পেপসিনের জন্য। পেপসিন এদের নিয়ে বেশ ভালো ভাবে পচন ও পাচন শুরু করে দেয়। তারপর যেই সে খাবার অন্ত্রে যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে যায়, তখন একটু একটু করে তাকে গ্রহণী বা ডিয়োডেনাম্-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অন্ত্রের কাজ

পাকস্থলীতে তৈরী হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। গ্রহণীতে যখন খাবার এসে পৌঁছয় তখন তার অ্যাসিড গ্রহণীর শ্লেষ্ম-ঝিল্লীতে "সিক্রেটিন" নামে আর এক রকম রস উৎপন্ন করে। এই রস রক্ত দিয়ে চলে যায় অগ্ন্যাশয়ে (ইংরেজীতে যাকে বলে প্যাংক্রিয়াস্), চলে যায় লিভার বা যকৃতে, চলে যায় আমাদের অন্ত্রের ভিতরে ভিতরে যে রাশি রাশি ছোট ছোট গ্রন্থি আছে তাদের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যাশয়, লিভার আর অন্ত্রগ্রন্থি পাঠিয়ে দিতে থাকে নানা রকম পচন ও পাচন রস। এই সব রসে হজম হয়ে আমাদের খাবার গলে একেবারে জলের মত হয়ে যায় এবং এর মধ্যে যে সব জিনিস আমাদের শরীরের পক্ষে দরকার তা টেনে নেয় রক্ত। আর যে অংশে আমাদের কোন কাজে লাগবে না তা আস্তে আস্তে বৃহৎ অন্ত্রের ভিতর দিয়ে নিয়ে পরিত্যক্ত মল হিসাবে বাইরে বার করে দেওয়া হয়।

রক্ত-চলাচলের কথা

আমাদের খাদ্য অন্ত্রে গিয়ে গলে গেল। এবারে আমাদের দেহের কোষগুলি এ সব খাদ্য নিয়ে নিজেদের কাজে লাগাতে পারে—বড় হতে পারে, নতুন কোষের সৃষ্টি করতে পারে, দেহের জন্য নিজের কর্তব্য যা কাজ তাও করতে পারে। কিন্তু এ সব খাবার এই কোষ অবধি পৌঁছনো চাই তো!

আমাদের শহরেও এ রকম ধরণের সমস্যার সমাধানের দরকার হয়—ভালো জল শহরের চারিদিকে সরবরাহ করবার বেলা। কলকাতায় দেখ, টালা থেকে পাম্প করে সেই সুদূর টালিগঞ্জেও জল পৌঁছে দেওয়া যায়। আমাদের দেহেও সেই রকম ব্যবস্থা আছে। তেমনি একটি পাম্প আমাদের শরীরের নিভৃততম কোণে অন্ত্রে-হজম-হওয়া খাদ্য পৌঁছে দিতে পারে। এই পাম্পের নামই হৃৎপিণ্ড, আর যে জলীয় পদার্থ ঐ খাবার বহন করে নিয়ে যায় তারই নাম হ'ল রক্ত।
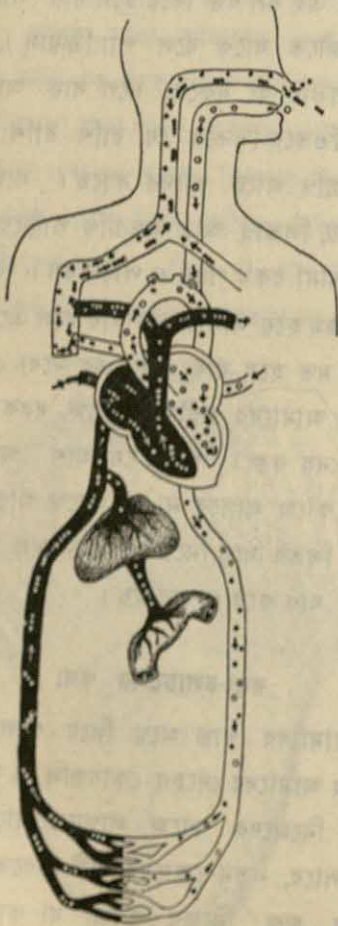
আমাদের দেহে রক্ত-চলাচল ; সাদা ভাগ ভাল রক্ত আর কালো অংশ দূষিত রক্ত।

হৃৎপিণ্ডের কাহিনী

এই হৃৎপিণ্ড আমাদের বুকের ফুসফুসের মাঝখানে বসে আছে। বুকে হাত দিলে আমরা এর অস্তিত্ব টের পাই, আমাদের হাতে এসে লাগে এর ধাক্কা। উত্তেজনার সময়ে অথবা ভয় পেলে এই হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে চলতে থাকে। আর আমরা বলি, "বুকের ধুকপুকুনি আর যায় না!"

শহরের জল সরবরাহ আর মানুষের শরীরের রক্ত সরবরাহে সবচেয়ে বড় তফাৎ হ'ল দু'টো। এর একটা হ'ল—জলের বেলা, সে জল দিনে দু'বার বা তিনবার সরবরাহ করলেই লোকদের চলে যায়, কিন্তু দেহের জীবন্ত কোষদের জন্য খাদ্য চাই অবিরত। কাজেই টালার পাম্প হয়তো খানিক ক্ষণের জন্য বন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের তা হবার উপায় নেই। জীবনের প্রথম দিন থেকে তার কাজ সুরু, আর মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত তার কাজ চলতে থাকে।

সাধারণ মানুষের হৃৎপিণ্ড মিনিটে প্রায় ৬০ থেকে ৮০ বার রক্ত পাম্প করে, আর প্রত্যেক বারে প্রায় ⅛ পাঁইট রক্ত তাকে পাম্প করতে হয়। অর্থাৎ সারা দিনে সে পাম্প করে ২,২০০ গ্যালন রক্ত, আর সারা জীবনে গড়ে প্রায় ছাপ্পান্ন কোটি গ্যালন। কাজেই বুঝতে পারছ কী সাংঘাতিক কাজই না করতে হয় হৃৎপিণ্ডকে! দুনিয়ায় বোধ হয় আর কোন এঞ্জিনই কোন
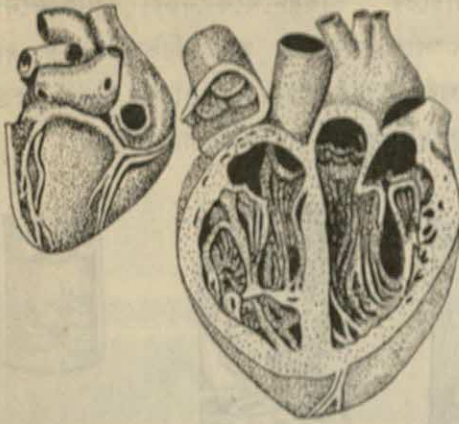
কেটে ফেললে দেখা যাবে হৃৎপিণ্ডের আছে দু'টো ভাগ

রকম খবরদারী না করে এত কাজ করতে পারে না। হিসেব ক'রে দেখা গেছে যদি হৃৎপিণ্ড একটা মোটর এঞ্জিন হ'ত তা হলে প্রতি বারে সে ১ কিলোগ্রাম ওজনের জিনিসকে মাটি থেকে দু'ফুট ওপরে তুলতে পারত।

রক্তের আরও অনেক কাজ আছে। তার মধ্যে একটা হ'ল অক্সিজেন সরবরাহ করা। আমাদের শরীরে সমস্ত কাজের জন্যই দরকার অক্সিজেন,—অক্সিজেন না হলে আমাদের দেহের জীবন্ত কোষগুলি বাঁচতে পারে না। কাজেই খাবারের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে দিতে হয় অক্সিজেন। রক্তে এ কাজটা করে রক্তকণিকারা, আর তাদের লাল রং-এর কারণও হচ্ছে তাদের এই কাজটি। প্রতিটি রক্তকণিকার ভিতর আছে হিমোগ্লোবিন বলে এক রকম রাসায়নিক পদার্থ—অক্সিজেন তার সঙ্গেই একত্র হয়ে চলে যায় কোষে কোষে। আবার সেখান থেকে যখন ফিরে আসে তখন সে নিয়ে আসে কার্বন ডাই-অক্সাইড। হিমোগ্লোবিনে যখন অক্সিজেন মিশে যায় তখন তার রং হয় টকটকে লাল, আর কার্বন ডাই-অক্সাইড মিশলে হয়ে যায় নীলাভ।

হৃৎপিণ্ডকে যদি ওপর থেকে নীচে কেটে ফেলা যায় তবে দেখা যাবে যে এর আছে দু'টো ভাগ—ডান দিক্ আর বাঁ-দিক্। এ দু'টির মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। আবার ঐ প্রতিটি দিকেরও আছে দু'টি করে ভাগ—ওপরের ভাগ দু'টি অপেক্ষাকৃত ছোট আর পাৎলা, নীচের ভাগ বড় আর বেশ জোরালো। এর কারণ, ওপরের ভাগের কাজ হ'ল রক্ত জমা করা আর নীচের ভাগের কাজ পাম্প করা। ওপরের ভাগকে বলা হয় অরিক্‌ল্, আর নীচের ভাগের নাম হ'ল ভেন্‌ট্রিক্‌ল্।

কল্পনা করা যাক যে হৃৎপিণ্ডে রক্ত এসে জমা হচ্ছে। একে বলা যায় বিরাম বা ডায়াস্টল; অরিক্‌লের ভিতর দিয়ে এসে ভেন্‌ট্রিক্‌লে রক্ত চলে আসছে। প্রায় যখন ভেন্‌ট্রিক্‌ল্ ভর্তি হয়ে এল তখন অরিক্‌ল্‌রা নিজেরা কুঁচকে গিয়ে ভেন্‌ট্রিক্‌লের ভিতর সমস্ত রক্তকে পাঠিয়ে দেয়। এখন, অরিক্‌ল্ আর ভেন্‌ট্রিক্‌লের ভেতর আছে এক-একটা করে দরজা; ভাল্‌ব্ দিয়ে তাদের বন্ধ করা যায়। যেই না ভেন্‌ট্রিক্‌ল্ গেল ভরে, অমনি পাল্লাগুলি যায় বন্ধ হয়ে—যাতে ভেন্‌ট্রিক্‌ল্‌রা যখন কুঁচকে গিয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তকে বাইরে পাঠাবে তখন তারা আবার না অরিক্‌লে ফিরে যেতে পারে। ভেন্‌ট্রিক্‌ল্ কুঁচকে যাওয়ায় রক্ত সব বেরিয়ে যায় হৃৎপিণ্ড থেকে—ডান দিক্ থেকে যায় ফুসফুসে আর বাঁ-দিক্ থেকে যায় ধমনী বা আয়োর্টাতে।

বাঁ-দিক্‌ থেকে যে মস্ত বড় ধমনীতে প্রথম রক্ত যায় তার নাম আয়োর্টা। এই আয়োর্টা প্রথমেই দু'টি ছোট ছোট ধমনী দিয়ে খাবার পরিবেশন করে হৃৎপিণ্ডকে। তারপর দু'টি বড় বড় ভাগে ভাগ হয়ে এক ভাগ চলে যায় হাত, গলা, মাথাকে খাবার যোগাবার জন্য, আর এক ভাগ যায় নীচের দিকে—আমাদের পাকস্থলী, অন্ত্র, পেট, বুক, পিঠ আর পায়েতে রক্ত সরবরাহের কাজে। বড় বড় ধমনী থেকে ছোট ছোট ধমনী বেরিয়ে প্রতিটি কোষের কাছে যখন পৌছয় তখন দেখা যায় তারা হয়ে গেছে খুবই ছোট—চেহারাও বদলে গেছে। তাদের নাম তখন ঝিল্লী।

ঝিল্লী

ঝিল্লীর কাজ কি? এই ঝিল্লীর রক্ত আসে প্রতিটি কোষের সংস্পর্শে, তাদের খাবার আর অক্সিজেন দেয়, সেই সঙ্গে নিয়ে নেয় দূষিত পদার্থগুলি আর কার্বন ডাই-অক্সাইড। তারপর তারা আবার একত্র হয়ে তৈরী করে শিরা। সেই শিরাগুলি আবার একত্র হতে হতে হয়ে যায় দু'টো বড় শিরা। একটা আনে দূষিত রক্ত মাথা, গলা, হাত থেকে, অন্যটা আনে নীচের অঙ্গ—পা, পেট, বুক থেকে। এরা এসে রক্ত জমা করে ডান অরিকলে।

আগেই বলেছি যে ডান দিক্‌ থেকে রক্ত যায় ফুসফুসে। ফুসফুসে গিয়ে রক্তনালী ঠিক ধমনীর মতই ঝিল্লী হয়ে যায়। আর এখানে বাইরের হাওয়া-থেকে-নেওয়া অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে হয়ে যায় পরিষ্কার, ছেড়ে দেয় কার্বন ডাই-অক্সাইড। তারপর সেই রক্ত ফুসফুস থেকে ফিরে আসে বাঁ অরিকলে।
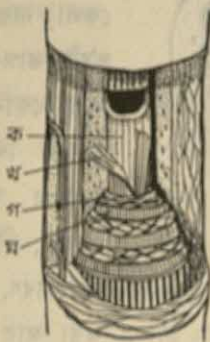
বাঁয়ে—একটা আর্টারীর দেয়াল, 'ক, খ, গ, ঘ' এই চারটি হচ্ছে এর চার অংশ। মধ্যে—ঝিল্লী। ডাইনে—শিরার ভিতর দিক্‌।

কাজেই আসলে হৃৎপিণ্ড কাজ করে দু'টো পাম্পের। একটা শরীরের চতুর্দিকে রক্ত সরবরাহের কাজ, আর একটা হচ্ছে ফুসফুসে রক্ত সরবরাহের কাজ।

এ ছাড়া আরও এক ভাবে রক্ত সরবরাহ হয়ে থাকে—তাকে বলা হয় পোর্টাল সার্কুলেশন। ধমনী থেকে যে রক্তনালী পাকস্থলী ও অন্ত্রে যায় তারাও ছোট হয়ে হয়ে ঝিল্লীতে পরিণত হয়। এখানে রক্ত কোষের উপযোগী খাবার সংগ্রহ করে, কিন্তু সরাসরি হৃৎপিণ্ডে যায় না। এ সব রক্ত প্রথমে যায় যকৃৎ বা লিভারে। এখানে যে সব দূষিত পদার্থ আসে লিভার সেগুলিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শোধন করে, ভবিষ্যতের জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্য নিজের কোষে জমা করে রাখে। তারপর সেই পরিশোধিত রক্ত পাঠায় হৃৎপিণ্ডের ডান দিকে—শরীরের অন্যান্য দূষিত রক্তের সঙ্গে।

ভাষা ও লিপির কথা

লেখা আবিষ্কারের আগে

ভাষা সৃষ্টির পর প্রাচীন মানুষের জীবনে আরও যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার কিছু কিছু ছোটদের বিশ্বকোষ প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৭৪) আমরা আলোচনা করেছি। যেমন—কোন নির্দিষ্ট বিষয় মনে রাখা যাবে কি করে, কি করে দূরের কাউকে খবর পাঠানো যাবে, নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি চিনে নেওয়া যাবে কি করে ইত্যাদি। এ সব সমস্যার সমাধান মানুষ কি করে করবার চেষ্টা করেছিল এবারে সেই কথাই বলি। লেখার কথা মানুষ তখন কল্পনাও করতে পারে নি, তাই তাদের ব্যবস্থা ছিল নেহাৎ সাদাসিধে।

কোন কথা মনে রাখবার জন্য আমরা অনেক সময়ে রুমালে গিঁট বাঁধি। বাড়ীতে টেলিফোন নেই, তাই অফিসে গিয়ে হয়তো একটা জরুরী ফোন্ করতে হবে। পাছে কাজের চাপে ভুল হয়ে যায়, তাই এই সতর্কতা। পকেট থেকে রুমাল খুলে মুখ মুছতে গেলেই গিঁটটি নজরে পড়বে, টেলিফোন করবার কথাও মনে পড়বে। বাড়ীর গিন্নীরাও ঠিক ঐ একই কারণে, কোন কথা পাছে ভুলে যান তাই, আঁচলে গিঁট বেঁধে রাখেন।

সেকালের মানুষ তো আর রুমাল ব্যবহার করত না, তাই তারা দড়ি বা চামড়ার ফিতেয় গিঁট বেঁধে রাখত। যতগুলি ঘটনা বা বিষয় মনে রাখতে হবে গিঁটের সংখ্যাও হবে ততগুলি। অবশ্য গিঁটের সংখ্যা খুব বেশী হলে তখনকার ক্ষীণ-স্মৃতি মানুষের পক্ষে সবগুলি গিঁটের কারণ মনে রাখা কতটা সম্ভব হ'ত বলা কঠিন।

হিরোডোটাসের লেখা ডেরিয়াসের সাইথিয়া আক্রমণের যে বর্ণনা পাওয়া গেছে তাতেও এই ধরণের গিঁট-বাঁধা দড়ির উল্লেখ আছে। ডেরিয়াস্ গ্রীক্ সেনাদের উপর একটি সেতু রক্ষার ভার ও তাদের হাতে একটি গিঁট-বাঁধা দড়ি দিয়ে বলে যান, এক-একটি দিন গেলে যেন এক-একটি গিঁট খুলে ফেলা হয়। শেষ গিঁটটি খোলার দিন পর্যন্ত তিনি যদি ফিরে না আসেন তবে যেন সেতুটি ধ্বংস করে তারা দেশে ফিরে যায়।

গিঁট বাঁধার এই সাধারণ ব্যবস্থাটি

গিঁট-বাঁধা দড়ি

আমেরিকার আদিবাসীদের হাতে একটি চমৎকার চারুকলায় পরিণত হয়। একটি দড়ির পরিবর্তে এ কাজে তারা একাধিক রঙ্গীন দড়ি বা চামড়ার ফিতে ব্যবহার করত। সেগুলি একটি লম্বা লাঠিতে বাঁধা অবস্থায় লম্বালম্বি ঝুলত, আর একাধিক রঙ্গীন দড়ি দিয়ে এক-একটি গিঁট বাঁধা হ'ত। শেষ পর্যন্ত এই গিঁট বাঁধা ও তার অর্থোদ্ধার করবার জন্য এক শ্রেণীর লোকও তৈরী হয়েছিল।

দুঃখের বিষয়, এ ধরণের গিঁট-বাঁধা যে সব প্রাচীন দড়ি বা চামড়ার ফিতে আবিষ্কৃত হয়েছে তার সঠিক অর্থোদ্ধার করা আজ আর সম্ভবপর নয় বলে এ কথা জোর করে বলা চলে না—এই দড়িগুলি শুধু সংখ্যার, না বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্মারক হিসেবেও ব্যবহৃত হ'ত। তিব্বত, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশেও এ ধরণের দড়ির—ইংরেজীতে যাকে কুইপাস (Quipus) বলা হয়—প্রচলন ছিল

ডালে দাগ কাটা

আর একটি ব্যবস্থাকেও কুইপাস বা দড়ির গিঁটের মতই বলা যেতে পারে। একটা গাছের ডালে ধারালো পাথর দিয়ে কতকগুলি দাগ কাটা হ'ত। এক-একটি দাগ হ'ত এক-একটি সংবাদের স্মারক। যে লোক ডালটি বয়ে নিয়ে যাবে দাগগুলি তার সামনেই কাটা হ'ত এবং যার কাছে ডালটি যাবে তাকে কি কি বলতে হবে লোকটিকে তা বেশ করে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ত।

যত দূর মনে হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই দাগগুলি স্মারক-চিহ্ন হিসাবেই ব্যবহার করা হ'ত, সংবাদ হিসাবে নয়। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে আজও এ প্রথা প্রচলিত আছে।

দাগ কেটে কেটে কোন কিছু মনে রাখা, এ আমাদের দেশে আজও চলে। জাহাজে মাল বোঝাই বা খালাস করা যদি দেখে থাক তবে লক্ষ্য করে থাকবে, নিরক্ষর কুলিরা এক-একটা বোঝা নামায় আর একটা কাঠের উপর খড়ি দিয়ে এক-একটা দাগ কাটে। তার মানে, যতগুলি দাগ কাটা হ'ল ততগুলি বোঝা বোঝাই বা খালাস করা হ'ল।

চিত্রিত নুড়ির সাহায্যে খবর পাঠানো

কোন কিছু মনে রাখার মত দূরে সংবাদ পাঠাবার জন্যও সে যুগের মানুষ নানা ফন্দীর সাহায্য নিয়েছে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে দূরের

চিত্রিত নুড়ি

মানুষের কাছে চিত্রিত নুড়ির সাহায্যে খবর পাঠিয়ে দেওয়া। এ রকম চিত্রিত নুড়ি অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে। এদের গায়ে দু' রকমের চিত্র দেখা গেছে, কতকগুলি দাগ আর কতকগুলি রেখাচিত্র। দাগগুলি সম্ভবতঃ সংখ্যাজ্ঞাপক আর রেখাচিত্রগুলি সংবাদ।

চিত্র-লিপি

মানুষের চিন্তাশক্তির যতই বিকাশ হতে লাগল, সমাজ বা গোষ্ঠীর পরিধি যতই বিস্তার লাভ করতে লাগল, ততই মানুষ তার চিন্তাকে বাইরে রূপ দেবার উপায় খুঁজতে লাগল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই সৃষ্টি হ'ল চিত্র-লিপি। এই চিত্র-লিপিকেই আমরা বলতে পারি মানুষের চিন্তার আদিমতম বহিঃপ্রকাশ।

গোড়ার দিকে অবশ্য মানুষ তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য-পিপাসা মেটাবার জন্য আপন মনে পাথরের গায়ে ছবি আঁকত। জীবজন্তু, শিকার— এ সবই ছিল আঁকবার বিষয়বস্তু। চিত্রশিল্পের কথায় তোমরা তা পড়েছ। প্রথমটা পাহাড়ের মসৃণ গাত্রই ছিল সেই আঁকবার জায়গা, কারণ মানুষ তখনও গিরিগুহার অধিবাসী।

সৌন্দর্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ছাড়াও ওই চিত্রগুলির আর একটা দিক্ ছিল। শিল্পী যখন বল্গা-হরিণ বা বাইসনের ছবি আঁকত তখন তার সঙ্গীসাথীরা সহজেই বুঝতে পারত যে সে মনে মনে বল্গা-হরিণ বা বাইসনের কথাই ভাবছে। এইভাবে একজনের মনের ভাব আর একজনকে বোঝাবার ব্যাপারে এই সব ছবি আজকালকার ছাপা বইয়ের ভূমিকা গ্রহণ করল।
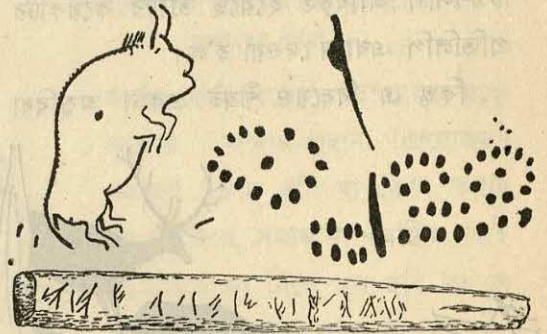
আদিম যুগের চিত্র-লিপি

মনে কর, আমি গরু কথাটি বোঝাতে চাই। দু' ভাবে তা করা যায়। হয় একটি জ্যান্ত গরু এনে দেখাব, নয়ত একটি গরুর ছবি আঁকব। প্রথম প্রথম গরুর সম্পূর্ণ ছবিটিই আঁকব। কিন্তু ছবি আঁকার ব্যাপারে সবার দক্ষতা কিছুতেই এক রকম হতে পারে না। তাই একই গরুর ছবি এক-একজনের হাতে এক-এক রূপ নেবে। তবে সব ক'টি ছবিই অন্ততঃ এমন হওয়া চাই যে তা দেখে সেগুলি

যে গরুর ছবি, ঘোড়া বা মোষের ছবি নয়, তা বোঝা যায়।

এর পরের ধাপ হ'ল, গোটা গরুটির ছবি না এঁকে শুধু তার বৈশিষ্ট্যটুকু আঁকা। ধরা যাক্ সে বৈশিষ্ট্য হ'ল এক জোড়া বাঁকা শিং। এখন থেকে গোটা গরুটার ছবি আঁকবার আর দরকার রইল না, এক জোড়া বাঁকা শিং আঁকলেই সবাই বুঝতে সুরু করল যে গরুর কথা বলা হচ্ছে।

একটা পাখী বোঝাবার জন্য প্রথম দিকে গোটা পাখী, শেষে শুধু তার ঠোঁট বা পালক এঁকেই তাকে বোঝাবার চেষ্টা চলল। লেখার এই যুগকে আমরা বলব চিত্র-লিপির যুগ। আদিম যুগের যে সব চিত্র বা চিত্র-লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের কয়েকটির প্রতিলিপি এখানে দেওয়া হ'ল।

কিন্তু এ বিষয়েও শীঘ্রই একটা অসুবিধা

আদিম যুগের চিত্র-লিপি

আদিম যুগের আর একটি চিত্র-লিপি

দেখা দিল। এ যাবৎ চিত্র-লিপির সাহায্যে চোখে দেখা যায় শুধু এমন জিনিস বা প্রাণীকেই বোঝানো হ'ত। কিন্তু যে জিনিস চোখে দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়, তার বেলায় কি হবে?

তা ছাড়া চোখে দেখা যায় এমন জিনিসও কি সব সময় চিত্র-লিপির সাহায্যে সহজে বোঝানো যায়? মনে করা যাক্, একই ধরণের একই গড়নের তিনটে হাঁড়ি আছে। তার একটায় দুধ, একটায় ধান এবং তৃতীয়টায় গম আছে। এখানে শুধু হাঁড়ির ছবি আঁকলেই চলবে না, কোন্ হাঁড়িতে কি আছে তাও বোঝাতে হবে।

যে হাঁড়িতে দুধ আছে তার গায়ে আঁকা হ'ল এক জোড়া বাঁকা শিং। এতে বোঝানো হ'ল এই হাঁড়িতে আছে দুধ। এমনি ভাবে ধানের হাঁড়িতে ধানের ছড়া, গমের হাঁড়িতে গমের শীষ এঁকে বোঝানো যেতে পারে যে একটায় ধান, আর একটায় গম আছে।
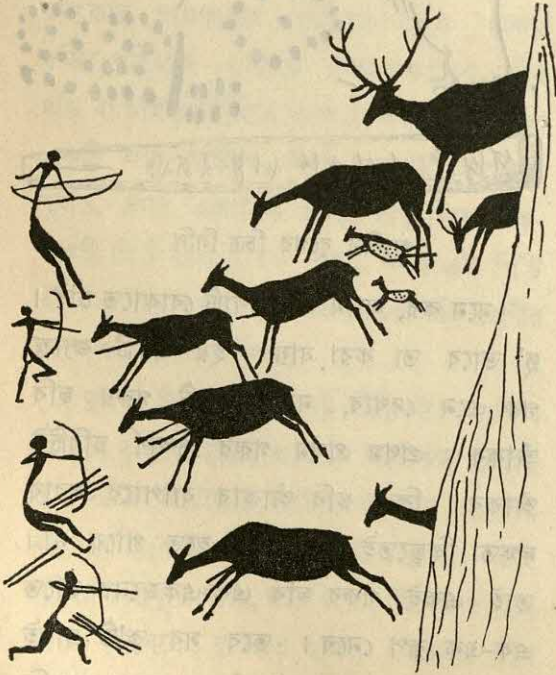
এর পরের স্তরে ব্যাপারটাকে আরও সহজ

করা হ'ল। হাঁড়ি বোঝাবার জন্য গোটা হাঁড়ি না এঁকে শুধু তার কানাটা আঁকলাম। তারপর দুধ বোঝাবার জন্য কানার গায়ে দিলাম একটা দাগ, ধান বোঝাতে দু'টি দাগ, আর গম বোঝাতে তিনটি দাগ। এখন থেকে হাঁড়ির কানায় এক দাগে দুধ, দুই দাগে ধান, তিন দাগে গম বুঝতে হবে।

ব্যাপারটা যদি আরও সহজ করা যায়, তবে মাত্র একটি দাগে দুধ, দু'টি দাগে ধান, তিনটি দাগে গম—এও বোঝানো যেতে পারে। এখানে হাঁড়ির ছবি স্রেফ বাদ পড়ে গেল।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠবে। আমি না হয় এক দাগে দুধ, দুই দাগে ধান, তিন দাগে গম বুঝলাম। আর সবাই তা কি করে জানবে?

আগেই বলেছি, মানুষ সমাজবদ্ধ জীবন
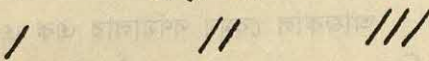
একই ধরণের তিনটে হাঁড়িতে তিনটি জিনিস
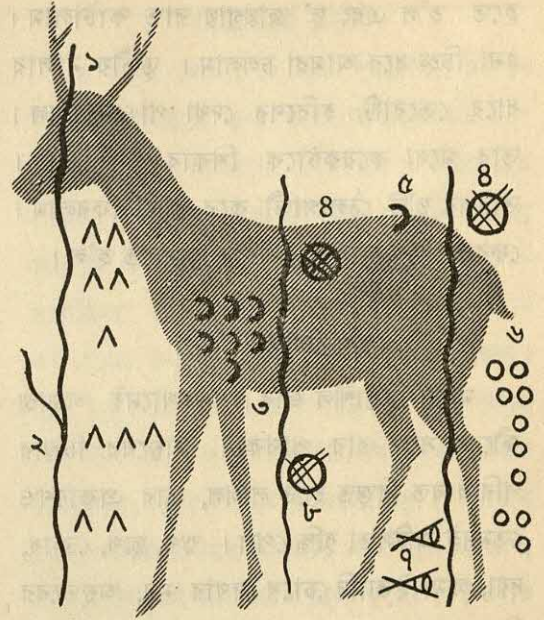
হরিণের গায়ে নানা রকম চিহ্ন এঁকে শিকারের বর্ণনা

যাপন করে বলেই পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান প্রয়োজন। কাজেই কোন্ ছবি বা কোন্ কথার কি অর্থ হবে, সমাজ বা গোষ্ঠীর সবাই তা মেনে না নিলে সে ছবি বা সে কথার কোন মূল্যই থাকে না।

এবার ওপরের চিত্র-লিপিটি একটু মন দিয়ে দেখ। একটা হরিণের ছবির ওপর নানা রকমের কতগুলি দাগ বা চিহ্ন। এতে একটি শিকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তা হ'ল: যেখানে একটি নালা দু'ভাগ হয়েছে আমরা তার উল্টো দিকে শিবির স্থাপন করলাম। সেখানে থাকবার জায়গা হ'ল তেরোটি। দলের মধ্যে শিকারী ছিল আটজন। পথে দু'টি নালা পার

হতে হ'ল এবং দু' জায়গায় রাত কাটালাম। ৫নং চিহ্ন ধরে আমরা চললাম। তৃতীয় নালার ধারে তেরোটি হরিণের দেখা পাওয়া গেল। তার মধ্যে কয়েকটাকে শিকার করা হ'ল। তারপর দু'টি ঠেলাগাড়ী করে বাড়ী ফিরলাম। ফেরার পথে আবার একরাত ঘুমোতে হ'ল।

ভাব-দ্যোতক লিপি

মানুষ চিন্তাশীল জীব। এইখানেই অন্যান্য জীবের সঙ্গে তার পার্থক্য। মানুষের চিন্তার পরিধি যত বিস্তৃত হতে লাগল, তার প্রকাশেও তেমনই জটিলতা বৃদ্ধি পেল। সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি চোখে দেখার নয়, অনুভবের বিষয়। এদের প্রকাশ কি ভাবে করা যাবে? চিত্র-লিপির সাহয্যেই এদেরও প্রকাশের চেষ্টা চলল। ফলে চিত্র-লিপি আর এক ধাপ এগিয়ে গেল। এই ধরণের চিত্র-লিপিকে আমরা ভাব-দ্যোতক লিপি বলব। (অর্থাৎ যে লিপি দিয়ে ভাব বোঝানো হয়)। এই ভাব-দ্যোতক লিপির বৈশিষ্ট্য এই যে ছবি এখানে অনেকাংশে গৌণ, তার পরিবর্তে রেখা বা চিহ্নের প্রাধান্য। একটু আগেই যে এক হাঁড়ি দুধ, ধান ও গমের ছবি দেওয়া হয়েছে তার প্রথম ধাপকে বলা যায় চিত্র-লিপি, আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপকে বলা যায় ভাব-দ্যোতক লিপি।

দুঃখ

"দুঃখ"—এই ভাবটিকে যদি ভাব-দ্যোতক লিপিতে প্রকাশ করতে হয় তা' হলে আমরা কি করব? একটা চোখের রেখা এঁকে তার থেকে জল পড়ছে দেখাব। কারণ, দুঃখ পেলে মানুষের চোখে জল আসে। তাই চোখের জলকে দুঃখের প্রতীক হিসাবে নেওয়া যেতে পারে।

ধ্বনি-লিপি

আমাদের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে যে ধ্বনি সৃষ্টি করি তাই আমাদের কথা বা ভাষার ভিত্তি। কিন্তু এ পর্যন্ত যে চিত্র-লিপি বা ভাব-দ্যোতক লিপির কথা বলেছি তাদের সাহায্যে চোখে দেখা বা অনুভব করার অনেক বিষয় বোঝানো গেলেও, এদের সঙ্গে এ যাবৎ ধ্বনিকে যুক্ত করার কোন চেষ্টা হয় নি। চিত্র-লিপির উন্নত পর্যায়ে এবার সে চেষ্টাও সুরু হ'ল। ফলে সৃষ্টি হ'ল ধ্বনি-লিপির। লেখার ইতিহাসে মানুষ আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল।

কিন্তু এখনও বাকী রইল এমন একটা লিখন-পদ্ধতির সৃষ্টি যা সমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকলেরই বোধগম্য হয়। সে জন্যই চাই এই লিখন-পদ্ধতিরও সামাজিক স্বীকৃতি। তা নইলে সর্ব্বজনগ্রাহ্য কোন পদ্ধতিরই সৃষ্টি হতে পারে না।

বর্ণমালার সৃষ্টি

আদিম মানবের চিত্র-লিপি থেকে ক্রম-বিকাশের পথে কি ভাবে ধ্বনি-লিপির উদ্ভব হয়েছে আমরা আগেই তার আলোচনা করেছি।

আজকাল যেমন বর্ণমালার এক একটি বর্ণ দিয়ে বাক্‌যন্ত্রের এক একটি বিশেষ ধ্বনিকে বোঝায়, ধ্বনি-লিপির গোড়ার দিকে তা ছিল না। তখন দু'টি, তিনটি বা তারও বেশী ধ্বনি

মিলিয়ে যে এক একটি শব্দ তৈরী হয়, ধ্বনি-লিপির সাহায্যে তাই-ই প্রকাশ করা হ'ত। ফলে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য তখন হাজার হাজার চিত্র-লিপি বা সঙ্কেত-লিপির প্রয়োজন হ'ত। এতে অনেক বেশী চিত্র বা সঙ্কেত আঁকতে হ'ত, অথবা অনেক সময়ের অপচয় ঘটত। তা ছাড়া এতগুলি লিপি বা সঙ্কেত মনে রাখাও সহজ ব্যাপার ছিল না।

এর পরের ধাপ হ'ল, ছবি বা সঙ্কেতের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ শব্দ প্রকাশ না করে তার অংশকে প্রকাশ করা। এর মস্ত সুবিধা এই যে এই ধরণের লেখায় ছবি বা সঙ্কেতের প্রয়োজন অনেক কম। হাজার হাজারের জায়গায় মাত্র কয়েক শ' ছবি ও সঙ্কেতেই কাজ চলে যায়।

কিন্তু কয়েক শ' ছবি বা সঙ্কেতও ত' কম নয়! একে আরও কমানো যায় কিনা মানুষ সে চেষ্টা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তারা এক একটি সঙ্কেত দ্বারা এক একটি ধ্বনিকেই বিশুদ্ধ-ভাবে প্রকাশ করতে সমর্থ হ'ল। লেখার ইতিহাসে তখন থেকেই নূতন যুগের সূচনা হ'ল বলা চলে।

আধুনিক জগতের সমস্ত ভাষার বর্ণমালারই এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা বর্ণমালার কথাই ধরা যাক। এখন 'অ' বলতে শুধু 'অ' —এই বিশেষ ধ্বনিকেই প্রকাশ করা হয়। 'ক' বলতেও শুধু 'ক' এই বিশেষ ধ্বনিকেই বোঝানো হয়, অন্য কোন ধ্বনিকে নয়। এর মস্ত সুবিধা এই যে এতে বর্ণের সংখ্যা খুবই কমে গেল। যেমন বাংলায় বর্ণমালার সংখ্যা মাত্র ৪৮, ইংরেজীতে আরও কম,—মাত্র ২৬।

কিউনিফর্ম লিপি

এ যাবৎ লেখার যে সব পুরোনো নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতমটি হ'ল সুমের দেশে পাওয়া। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস্ নদীর বাহুবন্ধনের মধ্যে যে ছোট দেশটি আছে, প্রাচীন গ্রীক্‌রা তার নাম দিয়েছিল মেসো-পটেমিয়া বা দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ—বর্তমানের ইরাক, ইজরাইল প্রভৃতি অঞ্চল। কিন্তু সুদূর অতীতে মেসোপটেমিয়া বলে কোন নাম ছিল না। তার পরিবর্তে তখন উত্তরে ছিল আসিরিয়া, আর দক্ষিণে ব্যবিলোনিয়া। আবার ব্যবিলোনিয়ার উত্তর অংশটির নাম ছিল আক্কাদ, আর দক্ষিণ অংশটির নাম ছিল সুমের। লেখার ইতিহাসে সুমের ও আক্কাদ-এর স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সুমের দেশে যে ধরণের লেখা পাওয়া গেছে, আক্কাদেও সেই একই ধরণের লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে। শুকনো মাটির চাকতির উপর কীলক আকারে লেখা। এগুলিরই নাম দেওয়া হয়েছে কিউনিফর্ম লিপি। এগুলির জন্ম-কাল খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ বলে পণ্ডিতদের অনুমান। সুমেরীয়রাই এই লেখার আবিষ্কর্তা। প্রথমে সুমের এবং সেখান থেকে আক্কাদ, এলাম, ব্যাবি-লোনিয়া, আসিরিয়া প্রভৃতি দেশের প্রাচীন অধি-বাসীদের মধ্যে এই লিপির প্রচলন হয়। পার্শি লিপিরও মূল এই কিউনিফর্ম লিপি। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে মিশরের টেল্-এল্-আর্মানায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে যে সব মাটির চাকতি পাওয়া গেছে তার লেখা দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই কিউনিফর্ম লিপি খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশে এবং

আর্মেনিয়া থেকে পারস্যোপসাগর পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

কিউনিফর্ম লিপি নাম কেন দেওয়া হ'ল? কাদামাটির নরম চাকতির উপর নলখাগড়া বা অন্য কোন শক্ত জিনিসের ছুঁচালো মুখ দিয়ে বাণ বা কীলকের আকারে লেখা হ'ত বলে এই লিপি বাণমুখো বা কীলকাকৃতি লিপি বলে পরিচিত। তাকেই ইংরেজীতে বলা হয় কিউনিফর্ম লিপি।

১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দে সিরিয়ার অন্তর্গত প্রাচীন উগারিটে (বর্তমান রাস্ সাম্‌রায়) যে বাণমুখো
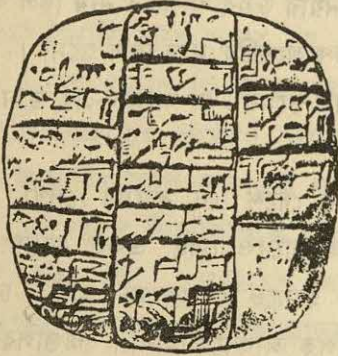
উগারিটে আবিষ্কৃত বাণমুখো চাক্‌তি

লেখা চাকতিটি আবিষ্কৃত হয়েছে তার ছবি এখানে দেওয়া হ'ল। এতে ত্রিশটি ছবি বা বর্ণ আছে। আমাদের চোখে এগুলি কতকগুলি অর্থহীন রেখামাত্র মনে হবে। কিন্তু তখনকার দিনে এগুলির অর্থ ছিল। পণ্ডিতেরা গবেষণা করে
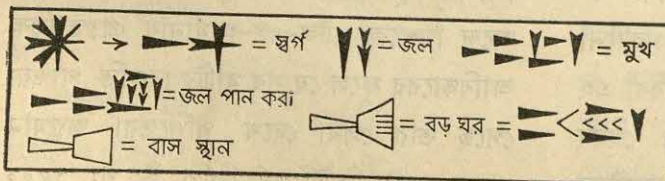
কয়েকটি কিউনিফর্ম লিপি ও তার অর্থ

সে অর্থ উদ্ধারও করেছেন। এই সঙ্গে কয়েকটি কিউনিফর্ম লিপি ও তার অর্থ দেওয়া গেল।

ছবি বা সঙ্কেত দ্বারা শব্দাংশ প্রকাশ করার রীতি প্রচলিত হওয়ার ফলে ছবি বা সঙ্কেতের সংখ্যা অনেক কমে যায়। খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে যেখানে প্রায় ২০০০ সঙ্কেত ব্যবহৃত হ'ত, খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে সেখানে সে সংখ্যা মাত্র ৬০০তে দাঁড়ায়।

কিন্তু সুমেরীয়দের এই কিউনিফর্ম লিপি শব্দাংশকে প্রকাশ করার ধাপ পর্যন্ত এসে আর এগুতে পারে নি। অর্থাৎ, প্রতিটি ধ্বনির জন্য যে এক একটি চিহ্ন স্থির করা, তা আর হয়ে ওঠে নি।

চীন দেশের চিত্র-লিপির অগ্রগতি আরও মন্থর। সেখানে ভাব-দ্যোতক লিপি পর্যন্ত এগিয়েই তার গতি থেমে যায়। ফলে আজও চীনে ভাষায় একটা সাধারণ বই পড়তে গেলে অন্ততঃ ৩০০০ চিত্র-লিপির জ্ঞান থাকা দরকার, আর সে ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে অন্ততঃ ১৫,০০০ চিত্র-লিপির ওপর দখল থাকা চাই।

মিশরের চিত্র-লিপি বা হায়ারোগ্লিফ্

সুমের দেশে চিত্র-লিপি উদ্ভবের বেশ কিছু দিন পর (খ্রীঃ পূঃ ৩০০০) মিশর দেশেও লেখার প্রচলন হয়েছিল। সেখানে তখন ভাষার নাম ছিল দেব-ভাষা। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিশরের সেই আদি চিত্র-লিপির কোন নমুনা এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। তাই এই লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এক শ্রেণীর মত, এই লিপি যারা প্রবর্তন করে সুমেরীয় কিউনিফর্ম

রোজেটা পাথর

আঙ্গুল, ডালের টুকরো এবং ছোট-বড় পাথর দিয়ে সংখ্যা বোঝানো

সংখ্যাটি কি ভাবে লেখা হ'ত বোঝা যাবে। তার পরের ছবিতে মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে ১ থেকে ১০০০ পর্যন্ত সংখ্যা এবং তারই তলায় ৬২৫ সংখ্যাটি দেখানো হয়েছে।

তার পর ক্রমবিবর্তনের ফলে আজকাল সংখ্যা লিখতে যে দশমিক লিপি ব্যবহৃত হয় তার উদ্ভাবনার গৌরব এই ভারতেরই। এখান থেকে আরব এবং সেখান থেকে নানা দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে।

সিন্ধু উপত্যকার লিপি

পশ্চিম ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় মহেন্‌জো-দাড়ো ও হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ নূতন তথ্য জানা গেছে। প্রধানতঃ বাঙ্গালী প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই যুগান্তকারী আবিষ্কার এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতই সুপ্রাচীন। এ সভ্যতা
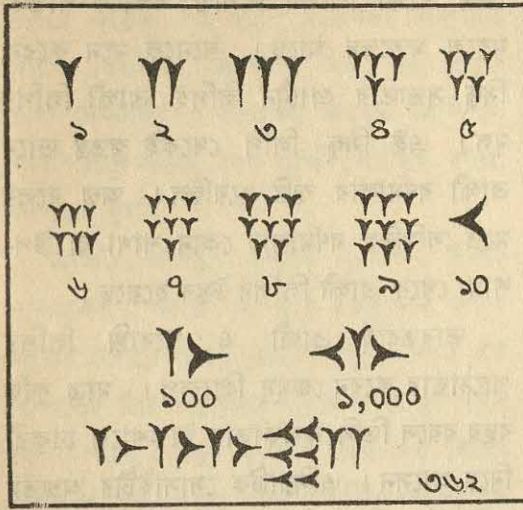
কিউনিফর্ম লিপিতে বিভিন্ন সংখ্যা লেখার পদ্ধতি
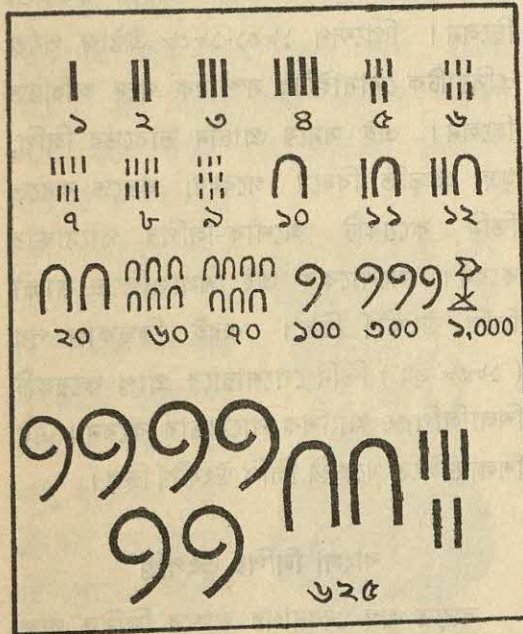
হায়ারোগ্লিফিক লিপি দিয়ে সংখ্যা লেখা

তার নিজস্ব—অন্য দেশ থেকে ধার করা নয়। এই আবিষ্কার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থান এটা নয়, তবে এখানে যে সব সীলমোহর পাওয়া গেছে (যাদের কিছু কিছু ছবি ছোটদের বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ডের ১৬৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে) তাতে এমন এক রকম লেখা আছে, পৃথিবীর অন্য কোন লিপির সঙ্গে যার কোনই মিল নেই। মহেন্‌জোদাড়ো আবিষ্কারের পর আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী কেটে গেছে, কিন্তু পৃথিবীর কোন পণ্ডিতই শত চেষ্টা সত্ত্বেও এ যাবৎ এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারেন নি। এই সব পণ্ডিতদের মধ্যে হাণ্টারের মতে সিন্ধু উপত্যকার এই লিপিই পরবর্তী কালের ব্রাহ্মী লিপির জননী। অর্থাৎ ঐ লিপি থেকেই এসেছে ব্রাহ্মী লিপি। ল্যাংডন সাহেবেরও তাই মত। কিন্তু হিটাইট লিপির পাঠোদ্ধারকারী রোজ্‌নীর অন্য মত। তিনি বলেন, হিটাইট লিপির সঙ্গে সিন্ধু লিপির অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এই লিপি নিয়ে এখনও গবেষণার শেষ হয় নি। যেদিন এই লিপির যথার্থ পাঠোদ্ধার হবে সেদিন পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার অনেক নূতন তথ্যে সমৃদ্ধ হবে, এ আশা দুরাশা নয়।

তবে সিন্ধু লিপি সম্বন্ধে এ যাবৎ যতটুকু জানা গেছে তা থেকে এটুকু অনুমান করা যায় যে এই লিপিও সম্ভবতঃ বর্ণমালার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি। কারণ পণ্ডিতদের মতে এই লিপিতেও আড়াইশ' থেকে চারশ' চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। কোন বর্ণমালায়ই এত বর্ণের প্রয়োজন হয় না বা দেখা যায় না। এই লিপিতে একদিকে যেমন মাছ, পাখী, মানুষ প্রভৃতির বিভিন্ন ভঙ্গীর ছবি এঁকে চিত্র-লিপির মূল রীতি রক্ষা করা হয়েছে, তেমনি আবার কতকগুলি চিহ্নের সাহায্যে ভাব এবং ধ্বনি প্রকাশেরও চেষ্টা চলেছে। কাজেই সুমেরীয়

লিপি যে স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গতি হারিয়েছিল, সিন্ধু লিপিও খুব সম্ভবতঃ তার বেশী অগ্রসর হতে পারে নি।

ভারতবর্ষ—ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপি

ভারতবর্ষে যে প্রাচীনতম আর্যলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে পণ্ডিতেরা তাদের নমে দিয়েছেন খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। খরোষ্ঠী লিপি শুধু পাঞ্জাবেই প্রচলিত ছিল। এটি অল্প দিনের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে ভারতবর্ষে এই লিপির আর প্রচলন দেখা যায় নি।

কিন্তু ব্রাহ্মী লিপির বেলায় তা হয় নি। বর্তমানে ভারতবর্ষে যে সমস্ত লিপি প্রচলিত আছে তার সবগুলিই এই ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত। শুধু ভারতবর্ষে কেন, ভারতের বাইরের অনেক লিপিও এই ব্রাহ্মী লিপি থেকেই জন্মলাভ করেছে।

বৈদিক যুগে আর্যদের কোন লিখিত লিপি ছিল না বলেই মনে হয়, কারণ সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে লিপির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তখনও গুরুর মুখে শুনে শুনে শিষ্যেরা শাস্ত্র শিখত, তাই বেদের আর এক নাম "শ্রুতি"। বৌদ্ধ যুগের আদিতেই ভারতে সর্বপ্রথম লিপির সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে বৌদ্ধ যুগের কিছু কাল আগে (আনুমানিক খ্রীঃ পূর্ব ৯০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে) ভারতে বর্ণ-লিপির উদ্ভব হয়েছিল।

উত্তর সেমিটিক বর্ণ-লিপির আরামিক শাখা থেকেই খরোষ্ঠী বর্ণ-লিপির উদ্ভব হয়েছিল— পণ্ডিতেরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিত-মহলে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন লিপিই ব্রাহ্মী লিপির মূল। এই সিন্ধু লিপি থেকেই স্বতন্ত্র ভাবে ব্রাহ্মী বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছিল। অন্য দলের মতে সেমিটিক বর্ণমালার কোন শাখা বা উপ-শাখা থেকে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভব হয়েছে।

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির পাঠোদ্ধার করেন জেম্‌স্ প্রিন্সেপ। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি কলকাতার টাকশালে চাকরী নিয়ে আসেন। এসিয়াটিক সোসাইটীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ডাক্তার উইলসন্ তখন টাকশালের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। প্রিন্সেপ ১৮৩১-১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এসিয়াটিক সোসাইটীর সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে প্রাচীন ভারতের লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করতে করতে তিনি কয়েকটি অশোক-লিপির পাঠোদ্ধার করেন। অশোকের এই শিলাগুলিতে ব্রাহ্মী লিপি উৎকীর্ণ ছিল। এরই কিছুকাল পর (১৮৩৮ খ্রীঃ) তিনি পেশোয়ারে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপিরও আংশিক পাঠোদ্ধার করেন। এই শিলাগুলিতে খরোষ্ঠী লিপি উৎকীর্ণ ছিল।

বাংলা লিপির উৎপত্তি

সংস্কৃত গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে লিখিত বলে অনেকের ধারণা দেবনাগর লিপি থেকেই বাংলা লিপির উৎপত্তি হয়েছে। এ ধারণা ভুল।

প্রথমতঃ সংস্কৃতের নিজের কোন লিপি নেই। আগে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে সংস্কৃত পুঁথি ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে লিখিত হ'ত। দেবনাগরী

অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণ অনেকটা আধুনিক রীতি। দ্বিতীয়তঃ, দেবনাগর লিপি নয়, প্রকৃত পক্ষে দেবনাগর ও ভারতের অন্যান্য লিপি যে লিপি থেকে উদ্ভূত, সেই ব্রাহ্মী লিপিই বাংলা লিপিরও মূল।

ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীন নিদর্শন সম্রাট্ অশোকের সময়ে ও তার কিছুকাল আগে থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। সম্রাট্ অশোক এই লিপিতেই তাঁর অনুশাসন প্রস্তর ও স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ করে গেছেন। অশোকের এই লিপি-গুলিই বহুদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন বলে গণ্য করা হ'ত। কিন্তু নেপালের পিপ্রাওয়া নামক স্থানে একটি স্তূপের ভিতর বুদ্ধদেবের অস্থি-সমেত একটি পাত্র পাওয়া গেছে। এই পাত্রের উপর খোদিত অনুরূপ লিপি থেকে জানা যায়, শাক্যরা বুদ্ধদেবের অস্থি ঐ স্তূপের মধ্যে রক্ষা করেছিলেন। পণ্ডিতদের ধারণা খ্রীঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বুদ্ধদেবের নির্বাণের পরই এই অস্থি সংরক্ষিত হয়েছিল। সে হিসাবে এই পাত্রে উৎকীর্ণ লিপি অশোক-লিপির চেয়েও প্রাচীন।
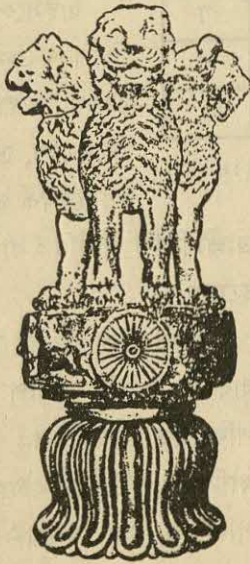
অশোকস্তম্ভের চূড়া
এই স্তম্ভের গায়ে যে লিপি উৎকীর্ণ তা হচ্ছে ব্রাহ্মী

ব্রাহ্মী লিপির দু'টি প্রধান শাখা—উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়। দক্ষিণ ভারতীয় শাখা থেকে তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্ ইত্যাদি লিপির সৃষ্টি হয়েছে। এই দক্ষিণী শাখার সঙ্গে বাংলা লিপির কোন সম্পর্ক নেই।

বাংলা লিপির ক্রমবিকাশ উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপির সঙ্গেই হয়েছে বলা যেতে পারে। সম্রাট্ অশোকের সময়ে উত্তর ভারতের ব্রাহ্মী লিপি বেশ পরিণতি লাভ করে। এই লিপি তখন বেশ সরল ও মাত্রাবিহীন। কুষাণ ও গুপ্ত যুগে এই লিপির অনেক পরিবর্তন হয়। গুপ্ত যুগের অবনতির পর খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে এই লিপি তিন শাখায় বিভক্ত হয় ও তিনটি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। এই তিন শাখার নাম উদীচ্য, প্রতীচ্য ও প্রাচ্য। এই সময়েই বর্ণের উপর মাত্রা দেওয়ার রীতিও প্রচলিত হয়।

উদীচ্য শাখার নাম শারদা লিপি। এর থেকেই কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের গুরুমুখীর উৎপত্তি। প্রতীচ্য লিপির নাম নাগর লিপি। এই নাগর লিপি থেকেই দেবনাগরীর উৎপত্তি। গুজরাতী, মারাঠী, রাজস্থানী প্রভৃতি লিপি এই দেব-নাগরীরই রূপান্তর। প্রাচ্য লিপির নাম কুটিল লিপি। এর মাত্রা ও বর্ণ কুটিল বলে এই লিপির এই নামকরণ হয়েছে। এই কুটিল লিপি থেকেই আধুনিক বাংলা, অসমীয়, ওড়িয়া ও মৈথিলী লিপির উদ্ভব।

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে কুটিল লিপি ক্রমবিকাশের পথে রূপান্তরিত হয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলা লিপিতে পরিণত হয়।

খ্রীষ্টিয় নবম শতকে বাংলা দেশের পাল রাজা নারায়ণ পালের যে তাম্রশাসন ভাগলপুরে পাওয়া গেছে তার কতকগুলি অক্ষরের সঙ্গে

ভাগ হয়ে গেল সে কথা তো আগেই বলেছি। যে শাখাটি থেকে বাংলা লিপি এসেছে সেটির দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর পরিবর্তন লক্ষ্য কর।

লেখার বয়স

মানব জাতির আবির্ভাবের বহু পরে ভাষার জন্ম, তারও বহুকাল পরে লেখার সৃষ্টি। বর্ণমালার উদ্ভব তারও হাজার দেড় হাজার বছর পর। পণ্ডিতদের মতে লেখার বয়স ৬০০০ বছরের বেশী নয়। প্রাচীন ফিনীসিয়ানদের কাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বর্ণমালার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে বর্তমানে প্রচলিত বর্ণলিপির সংখ্যা প্রায় ৯০। বিভিন্ন বর্ণমালায় অক্ষর-সংখ্যা বিভিন্ন। যেমন বাংলায় ৪৮, ইংরেজীতে ২৬, জাপানীতে ৪৭, রুশ ভাষায় ৩১। তবে ইয়োরোপীয় বর্ণমালা বাংলা বর্ণমালার মত তেমন পরিশুদ্ধ নয়। কারণ বাংলা বর্ণমালায় এক-একটি অক্ষরে সাধারণতঃ এক-একটি ধ্বনিকেই প্রকাশ করে, কিন্তু ইংরেজী বা অন্যান্য বর্ণমালায় তা দেখা যায় না। সেখানে একই অক্ষরের একাধিক উচ্চারণ,—তার মানে একই অক্ষরকে একাধিক ধ্বনির প্রতীক্ রূপে ব্যবহার করা হয়।

অশোক	কুষান	গুপ্ত	হরিয়ুজি	সপ্তম শতাব্দী	দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী	বর্তমান বাংলা
						চ
						ছ
						জ
						ঝ
						ঞ
						ট
						ঠ
						ড
						ঢ
						ণ
						ত
						থ
						দ
						ধ
						ন
						প
						ফ

লিপির ক্রমবিকাশের আরও কিছু নমুনা (২য় চিত্র)

বর্ণমালার জন্মভূমি

এখন, কথা হচ্ছে, বর্ণমালার জন্মভূমি কোন্ দেশ ?

এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। একটি মত হচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছ'টি বিভিন্ন জাতি স্বাধীন ভাবে লিখনপদ্ধতির আবিষ্কার করে—যা চিত্র-লিপি থেকে বর্ণমালায় পরিণত হয়। সে ছ'টি জাতি হ'ল—সুমেরীয় ও ব্যাবিলোনীয়, মিশরীয়, হিটাইট্, চীন এবং আমেরিকার মায়া ও এজটেক্।

অন্য মত হচ্ছে, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সিনাই, ক্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে যে বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, পরের যুগের

অশোক	কুষান	গুপ্ত	হরিয়ুজি	সপ্তম শতাব্দী	দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী	বর্তমান বাংলা
						ব
						ভ
						ম
						য
						র
						ল
						ব
						শ
						ষ
						স
						হ

লিপির ক্রমবিকাশ (৩য় চিত্র)

বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালা তাই থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই মতের অনুকূলে যুক্তি এই যে প্রধানতঃ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে খ্রীঃ পূর্ব ১৮০০ থেকে খ্রীঃ পূর্ব ৯০০ পর্যন্ত ন'শ' বছরে বর্ণমালার আদি থেকে, শেষ পরিণত অবস্থা অবধি সব ক'টি পর্যায়েরই সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার নমুনা আব্দো লিপি থেকে ফিনীসিয় লিপি ও তা থেকে গ্রীক্ বর্ণমালার বিবর্তন এত সুস্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে বড় একটা মতভেদ নেই। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের ভৌগোলিক অবস্থানও এ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে মেসোপটেমিয়া ও পশ্চিমে মিশর—এই তু'টি সভ্যতার সেতু স্বরূপ ছিল সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন্। স্মরণাতীত কাল থেকে যুগের পর যুগ ওই তু'টি দেশের ওপর দিয়ে অসংখ্য মানুষের আনাগোনা চলে। এই তু'টি প্রাচীন সভ্যতার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদির আদান-প্রদানও এই তু'টি দেশের বুকের ওপর দিয়েই ঘটেছিল। এই তু'টি দেশের ওপর দিয়েই অসংখ্য অভিযানকারী তাদের জয়-পরাজয়ের অভিযান চালিয়েছিল। এই সব কারণে এই তুই দেশে বর্ণমালার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তার ফলেই ওই তুই দেশে বর্ণমালার আবিষ্কার খুবই স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে আবিষ্কৃত বর্ণমালার মোট সংখ্যা ছিল ২২। সব ক'টিই ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ একটিও ছিল না। কেন ছিল না, আজও তা জানা যায় নি। তবে স্বরবর্ণ না থাকায় একটা মস্ত সুবিধাও হয়েছিল। যারা পরে এই বর্ণমালা গ্রহণ করে তাদের সকলেই প্রয়োজন মত এতে স্বরবর্ণ যুক্ত করে নিতে পেরেছিল। কারণ বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর স্বরবর্ণ উচ্চারণে অনেক প্রভেদ থাকে।

ব্রাহ্মী লিপি সম্পর্কে আলোচনায় আগেই বলা হয়েছে যে এ লিপি সিন্ধু লিপি থেকে স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত হয়েছে—এ মতবাদেও একদল পণ্ডিত বিশ্বাসী। এ বিশ্বাস অহেতুক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তবে এমনও হতে পারে যে পশ্চিমাগত অসম্পূর্ণ, অপরিশুদ্ধ বর্ণমালাকে তারা নিজেদের অসাধারণ প্রতিভা ও মেধার ফলে সম্পূর্ণ নিজের করে নিয়েছিল।

বড় হয়ে যদি তোমরা এ বিষয়ে চর্চা কর তবে আরও অনেক কথা জানতে পারবে।

ধর্মের কথা

হিন্দুধর্মের কথা

হিন্দুধর্মের কথা দিয়েই সুরু করছি।

মধ্য-এশিয়ায় এক সময়ে বাস করত এক জাতের মানুষ। তারা নানা কারণে নানা সময়ে দলে দলে সে দেশটা ছেড়ে আসতে থাকে। তার মধ্যে কতকগুলি দল এল এ দেশে। তারা নিজেদের বলত 'আর্য', আর এ দেশের যে সব জায়গায় তারা বাস করত তার নাম দিল 'আর্যাবর্ত'। 'ভারতবর্ষ' নামটা এসেছে পরে। আর্যাবর্ত হ'ল সিন্ধু নদের পূর্বের দেশ। আর, ওপারের দেশের নাম হ'ল 'পারস্য', কেন না সিন্ধু 'পার' হয়ে সে দেশে যেতে হয়। সেখানেও অনেক দল এসেছিল মধ্য-এশিয়া থেকে। তারা এই আর্যদের নাম দিল 'হিন্দু'। 'সিন্ধু' কথাটা তারা ঠিকমত উচ্চারণ করতে পারত না। 'স'-ক বলত 'হ', তাই সিন্ধু হয়ে দাঁড়াল হিন্দু। কাজেই, বুঝতে পারছ, আযাবতের লোকদের যে 'হিন্দু' নাম, সেটা তাদের নিজেদের ভাষার শব্দ নয়—সে নামটা তারা পেল তাদের ভিন্‌-দেশীয় ভাইদের কাছ থেকে।

এই হিন্দুরা যে ধর্ম মানেন তাকেই বলে হিন্দুধর্ম। প্রথমে এর কোনও আলাদা নাম ছিল না, কেন না তখন আর কোনও ধর্মও ছিল না। বৌদ্ধ বল, জৈন বল, খৃষ্টান বল, মুসলমান বল, সব ধর্মই এসেছে অনেক পরে। আর, সব ধর্মেরই এক একজন প্রবর্তক আছেন, মানে কোনও না কোনও মহাপুরুষ সেটাকে প্রথম চালিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্মের কোনও প্রবর্তক নেই। হিন্দুরা বলেন যে এটা কারু থেকে আরম্ভ হয় নি, এটা চিরকালের। তাই হিন্দুধর্মকে বলা হয় 'সনাতন ধর্ম'। সনাতন কথাটার মানে 'চিরকালের'।

হিন্দুধর্ম ঠিক 'একটা ধর্ম' নয়

বেশ। কিন্তু সেই ধর্মটা কী?

হিন্দুদের ধর্মটা ছিল একটা দেশের ধর্ম। তাই এটাকে ঠিক 'একটা ধর্ম' বলা যায় না। অনেকগুলো ধর্ম নিয়ে হিন্দুধর্ম গড়ে উঠেছে। অন্য কোনও ধর্মে এমন নেই। এক ঈশ্বর মানলেও হিন্দু হতে পারে, বহু দেবতাকে পূজা

তিনি ফিরে গেলে ইন্দ্র এলেন। ইন্দ্র আসতেই ব্রহ্ম অন্তর্ধান করলেন। তখন এক

যাঁকে জানতে এসেছ তিনিই ব্রহ্ম।

দেবী এসে ইন্দ্রকে বললেন, 'যাঁকে জানতে এসেছ, তিনিই ব্রহ্ম। তাঁরই শক্তিতে তোমরা যুদ্ধ জিতেছ।'

তাইতে দেবতারা জানলেন যে শক্তি সবই সেই ব্রহ্মের—তাঁদের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশিত হয়, এই মাত্র।

এক ব্রহ্ম থাকলেও সেই সঙ্গে আবার অনেক দেবতা থাকে কি করে সেই কথাটা এই গল্পে বেশ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই গল্পটি আছে 'কেন উপনিষদে'।

এ রকম আরও নানা গল্প আছে অন্যান্য উপনিষদে। এর মধ্যে উপনিষদের নচিকেতার গল্প তোমরা আগেই শুনেছ (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১—১৯২)।

নচিকেতা ছিল একটি ছোট ছেলে, কিন্তু যমের কাছে গিয়ে সে কি করে আত্মজ্ঞান জেনে এসেছিল তারই গল্প। যম প্রথমটা কিছুতেই বলবেন না,—নানা প্রলোভন দেখিয়ে তাকে ফেরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নাছোড়-বান্দা নচিকেতা আত্মজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নেবে না, কারণ আর সবই তুচ্ছ জিনিস, আজ আছে কাল নেই। একমাত্র আত্মতত্ত্ব জেনেই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করতে পারে।

ঠিক এইভাবে আর সব ছেড়ে শুধু জ্ঞান চেয়েছিলেন আর একজন। তাঁর নাম মৈত্রেয়ী। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বনে যাবেন। তাঁর যা কিছু আছে তা তাঁর দুই স্ত্রীকে দিয়ে যাবেন বললেন। এক স্ত্রী মৈত্রেয়ী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ সব পেলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করব?' যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, 'না'। তখন মৈত্রেয়ী বললেন, 'যা দিয়ে আমি অমৃতত্ব পাব না, এমন সব জিনিস নিয়ে আমি কী করব? যা থাকবে, যা আমাকে মরণের পারে নিয়ে যাবে, আমাকে সেই কথা বলুন, সেই জ্ঞান দিন।' বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই গল্পটি আছে।

উপনিষৎ অনেকগুলি

উপনিষৎ অনেকগুলি। কেউ কেউ ১০৮ খানা পর্যন্ত উপনিষদের নাম করেন, কিন্তু তার মধ্যে সত্যিকার উপনিষৎ খুবই কম। বেদের মধ্যে পাওয়া যায়, এমন উপনিষৎ মোট এই সাতখানা: 'ঈশা, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য আর বৃহদারণ্যক। আর

এ সব পেলে কি আমি অমৃতত্ব লাভ করব ?

কয়েকখানা সম্বন্ধে ঠিক করে বলা যায় না যে তারা বেদের অংশ কিনা—যেমন, শ্বেতাশ্বতর। বাকিগুলো নামেই উপনিষৎ। উপনিষদের ভাবগুলি তাতে আছে বলে, কিংবা হয়তো শুধু শুধুই তাদের নাম উপনিষৎ দেওয়া হয়েছে।

এমন কি, তোমরা তো আগেও শুনেছ যে 'আল্লোপনিষৎ' বলে একটি উপনিষৎ লেখা হয়েছিল, তাতে মুসলমান ধর্ম থেকে ভগবানের 'আল্লা' নামটি নিয়ে তাঁর বিষয়ে লেখা হয়েছে। এইভাবে আল্লাকে হিন্দুধর্মের দেবতা করে নেবার চেষ্টা হয়েছিল। হিন্দুধর্ম এ ভাবে বাইরের অনেক কিছুকে আপন করে নিয়েছে। যেমন, বুদ্ধকে ভগবানের দশ অবতারের মধ্যে টেনে নেওয়া হয়েছিল।

এ সব অনেক পরের কথা। সে সব পরে বলব।

চীন দেশের ধর্মগুরু কনফুসিয়াস

চীন দেশে প্রধানতঃ তিনটি ধর্ম প্রচলিত—কনফুসিয়াসের ধর্ম, তাও বা তাওচি ধর্ম, আর বৌদ্ধধর্ম। তার মধ্যে প্রথমটিকেই মেনে চলে সব চাইতে বেশী লোক। তাই তার কথাই প্রথমে বলি।

অধিকাংশ ধর্মের মত এ ধর্মেরও একজন প্রবর্তক ছিলেন। ইউরোপের লোকেরা তাঁকে বলে 'কনফুসিয়াস', আমরাও সেই নামই বলব। তাঁর আসল নাম জানি না, তবে তাঁর বংশের নাম ছিল 'কুং', আর তাঁর দেশের লোক তাঁকে বলে 'কুং-ফু-ৎজি', মানে 'গুরুদেব কুং'। যেমন, সুভাষচন্দ্রকে আমরা সব সময়েই 'নেতাজী' বলি, সেই রকম।

কনফুসিয়াস

কনফুসিয়াসের জন্ম সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য কাহিনী আছে। ৫৫১ খৃষ্টপূর্বাব্দে, মানে আজ থেকে ২৫১৫ বছর আগে চীনের লু-রাজ্যে তিনি জন্মেছিলেন। তাঁর জন্মের আগের রাত্রে তাঁর মা এক স্বপ্ন দেখে পরদিন 'নি' পর্বতে যান। সেখানে যক্ষ আর অপ্সরারা তাঁকে একটি গুহায় নিয়ে যায়। অপ্সরাদের কাছে সেই দিনই তাঁর একটি ছেলে হয়। যক্ষরা তাঁকে বলে যে এ ছেলেটি কালে একজন মহাপুরুষ হবে। সেই ছেলে নিয়ে তিনি বাড়ী ফিরে আসেন।

কনফুসিয়াসের বাবার নাম ছিল হেই। তাঁর অদ্ভুত গায়ের জোরের বিষয়ে একটি গল্প আছে। একবার তিনি একদল সৈন্য নিয়ে পেই-ইয়াং শহরে ঢুকছেন, এমন সময় শহর-ঘেরা প্রাচীরের প্রকাণ্ড দরজাটা ওপর থেকে নেমে আসতে লাগল। ঢুকবার পথ বন্ধ হয়ে যায় আর কি! কিন্তু না, খানিক দূর নেমে দরজার কপাটটা থেমে গেল। চীনের ভীম হেই সেই অসম্ভব ভারী দরজাটাকে তাঁর মুগুরের মত দুই হাত দিয়ে ঠেলে ধরেছিলেন।

মুগুরের মত দুই হাত দিয়ে ঠেলে ধরেছিলেন।

কনফুসিয়াসের ধর্ম

খুব অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে আর সঙ্গীতে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন কনফুসিয়াস। চীন দেশের তখন বড় গোলমালের সময়। রাজ্যে শান্তি নেই, রাজা, প্রজা সবাই খারাপ লোক। তিনি ভেবে ঠিক করলেন যে আগেকার দিনে যে সব নিয়ম ছিল, পুরোনো শাস্ত্রে যে সব কথা আছে, তা মেনে চললেই সকলের ভাল হতে পারে।

তাই তিনি বাইশ বছর বয়সেই একটি স্কুল খুলে শেখাতে আরম্ভ করলেন রাজাদের কি ভাবে দেশ শাসন করা উচিত, আর সাধারণ লোকদের কি ভাবে চলা উচিত।

অনেক শিষ্য জুটে গেল তাঁর। তিনি বলতেন, রাজা হচ্ছেন স্বর্গের প্রতিনিধি। রাজা ভাল হলেই প্রজারা ভাল হবে, তাতে সারা দেশটার ভাল হবে। খারাপ রাজা থাকলে দেশের মঙ্গল নেই।

একবার তিনি শিষ্যদের নিয়ে টাই পর্বত পার হচ্ছিলেন। এমন সময় দূরে কান্না শুনে সেখানে গিয়ে দেখেন যে একটি স্ত্রীলোক কাঁদছে। কেন কাঁদছে জিজ্ঞাসা করায় স্ত্রীলোকটি বলল যে এ-দেশে বড় বাঘের উৎপাত—তার শ্বশুরকে, স্বামীকে আগেই বাঘে খেয়েছে, এখন তার ছেলেকেও খেল। শিষ্যরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "এর আগে তুমি পালিয়ে গেলে না কেন? পালিয়ে

গিয়ে দেখেন যে একটি স্ত্রীলোক কাঁদছে।

তাচ্ছিল্য করতে থাকায় তিনি দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। গিয়ে, রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে ঘুরে তাঁর ধর্ম—মানে কিসে মানুষের ভাল হবে সে সম্বন্ধে তাঁর মত—বলে বেড়াতে লাগলেন।

তাঁর বহু শিষ্য হয়েছিল। তার মধ্যে ৭০।৮০ জন সব সময়ে তাঁকে ঘিরে থাকত। তাঁর প্রতিটি কথা তারা লিখে রাখত। প্রধান শিষ্যদের মধ্যে চার জনের নাম করা যেতে পারে। তাঁরা হলেন ইয়েন-ইয়েন, ইয়েন-হু্ ইহ্ু ই, ৎজি-লু আর ৎজি-কুং।

গেলেই তো বাঘের হাত থেকে রেহাই পেতে পারতে, নয় কি?" স্ত্রীলোকটি বলল, "পালাব কেন? এখানকার রাজা যে ভাল!" তাই শুনে কনফুসিয়াস শিষ্যদের বললেন, "এর কাছে তোমরা শিখলে তো যে বাঘের চাইতেও ভয়ঙ্কর যদি কিছু থাকে তো সে হচ্ছে খারাপ রাজা?"

শেষে বাহান্ন বছর বয়সে তিনি সুযোগ পেলেন। লু-রাজ্যের রাজা তাঁর পরামর্শে চলতে রাজী হলেন। দেখতে দেখতে রাজ্যের লোকেরা একেবারে বদলে গেল। তাদের মন্দ স্বভাব কমে যেতে লাগল আর ভাল গুণ সব ফুটে উঠতে লাগল কনফুসিয়াসের ব্যবস্থার গুণে। তাঁর নাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল, লোকের মুখে মুখে গানে গানে ফিরতে লাগল তাঁর নাম।

কিন্তু বেশী দিন এ অবস্থা রইল না। রাজা তাঁর শত্রুদের চক্রান্তের ফলে কনফুসিয়াসকে

তেরো বছর বাইরে কাটিয়ে আবার তিনি লু-রাজ্যে ফিরে আসেন। তার পর বই লেখায় মন দেন। কেন না, তাঁর কথা মেনে চলতে চায় এমন একজন রাজাকেও তিনি পেলেন না।

মোটে একখানা বই পুরোপুরি তাঁর লেখা। তার নাম 'চুন বিউ' (বসন্ত ও শরৎ)। আগেকার দিনের শাস্ত্র সংগ্রহ করে তিনি 'লি-কিং' বইখানা লেখেন। 'শু-কিং' আর 'শিহ্-কিং' বই দু' খানারও কিছু কিছু তাঁর লেখা। তাঁর উপদেশ একসঙ্গে করে শিষ্যরা এক খানা বই করেছিলেন, তার নাম 'লুন-ইআই'। এ সবই চীনের অতি পবিত্র গ্রন্থ।

কনফুসিয়াসের মৃত্যুর আগে একটা আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল। তাঁর এক শিষ্য পাহাড়ে শিকার করতে গিয়ে অদ্ভুত একটি প্রাণীকে নিয়ে এল—এমন প্রাণী কেউ কখনও দেখে নি। তার একটি শিং, তাতে এক ফিতে বাঁধা।

তাকে দেখেই কনফুসিয়াস চিনলেন। এ হ'ল 'কি-লিন'। তাঁর জন্মের আগের রাত্রে তাঁর মা স্বপ্নে একেই দেখেছিলেন, আর স্বপ্নেই নাকি এর মাথায় এই ফিতেটি বেঁধে দেন।

তিনি বুঝলেন যে তাঁর শেষ ঘনিয়ে এসেছে। একদিন সে কথা তিনি ৎজি-কুংকে এইভাবে বললেন: 'পর্বতও গুঁড়ো হয়ে যায়, প্রকাণ্ড কড়িকাঠও ভেঙে পড়ে, আর জ্ঞানী মানুষও ঘাসের মত শুকিয়ে যান।' এই বলে তিনি বিছানা নিলেন, আর উঠলেন না। ৪৭৮ খৃষ্টপূর্ব অব্দে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

কনফুসিয়াস কি বলতেন

কনফুসিয়াস শুধু তাঁর বেঁচে থাকার সময়ে নয়, তারপর এই আড়াই হাজার বছর ধরে তাঁর দেশের সবচেয়ে জ্ঞানী লোক বলে সম্মান পেয়ে আসছেন। তাঁর সমাধির ওপর লেখা আছে— "সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিতুল্য আচার্য, সর্বগুণময় এবং সর্বজ্ঞানময় রাজা"। পরে অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে তিনি স্থান পেয়েছেন, তাঁরও পূজা করে চীনেরা।

তিনি কিন্তু নিজেকে দেবতা বলা দূরে থাকুক, এমন কথাও বলেন নি যে ভগবান্ তাঁকে কোনও বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সময়েরও অনেক আগে থেকেই চীন দেশে ভগবানের ('শাং-টি') কথা প্রচলিত ছিল, তিনিও ভগবান্‌কে মানতেন। কিন্তু তিনি বলতেন যে ভগবানের কথায় মানুষের কাজ নেই, পরিবারের মধ্যে আর সমাজের মধ্যে সে কিসে ভাল থাকবে শুধু তাই দেখলেই তার পক্ষে যথেষ্ট। মানুষ আসলে ভাল, ভাল পথ দেখতে পেলেই সে তা ধরে চলবে। শুধু সেই পথটা বলে দিতে—গুরুর কাজ করতে তিনি এসেছেন। সেই পথের কথা আছে পুরোনো সব শাস্ত্রে। স্বর্গের ('টিয়েন') আর পৃথিবীর পূজা কর, পূর্বপুরুষদের পূজা কর। রাজাকে মেনে চল, বাবাকে মেনে চল, স্বামীকে মেনে চল। ভালবাসা, ন্যায়, শ্রদ্ধা, জ্ঞান আর আন্তরিকতা থাকা চাই সকলের সব কাজে আর সব ব্যবহারে। আর যে ব্যবহার তুমি নিজে পেতে চাও না সে ব্যবহার তুমি কারও সঙ্গে ক'রো না। এই নিয়মটিকে বলা হয় কনফুসিয়াসের 'সোনার নিয়ম' (গোল্ডেন রুল)।

কনফুসিয়াসের ধর্মের ব্যাখ্যা করে পরে অসংখ্য লোকে বই লেখেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর নাতি ৎজি-ৎজি, আর একজন মহাপুরুষ মেনসিয়াসের নাম করা যেতে পারে। মেনসিয়াসের জন্ম ৩৭২ খৃঃ পূঃ, আর মৃত্যু ৩১৯ খৃঃ পূঃ। সব ধর্মেই যেমন হয়েছে, কনফুসিয়াসের ধর্মেও সেই রকম অনেক নতুন কথা এসে ঢুকেছে এই সব নানা মুনির নানা মত প্রচার করবার ফলে। যেমন, কনফুসিয়াসের পূজা।

চীন চেশে ৪০/৫০ কোটি লোক এই ধর্ম মানে। এই ধর্মে পূর্বপুরুষদের পূজা প্রায় সবচেয়ে বড় কথা। চীন দেশে পিতৃ-ভক্তির মত গুণ আর নেই। পিতৃভক্তির অনেক সুন্দর সুন্দর কাহিনী আছে সে দেশে। তার একটি কাহিনী তো তোমরা এই বইয়েই পড়েছ (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৩৫-৩৩৭)।

বিশ্বসাহিত্যের কথা

মহাভারত

বাল্মীকির রামায়ণের মতই মহর্ষি ব্যাস-দেবের মহাভারত বিশ্বসাহিত্যের একখানি অপরূপ গ্রন্থ। বিরাট বই। আঠারোটি পর্ব। মোট শ্লোক আছে এক লক্ষ দশ হাজার। হিন্দুর ধর্মকথা, ইতিহাস, নীতিকথা, পুরাণ, দর্শন—সব কিছুই আছে এই বইখানিতে। বাংলায় একটি কথা চলিত আছে—'যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে'। প্রথম 'ভারত' বলতে 'মহাভারত' বইটি বোঝাচ্ছে, দ্বিতীয়টি বোঝাচ্ছে 'ভারতবর্ষ'কে। অর্থাৎ ভারতভূমির এমন কোন তথ্য নেই যা মহাভারতে পাওয়া যাবে না। মূল মহাভারত সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তবে ভারতের প্রত্যেকটি প্রধান ভাষায় এর একাধিক অনুবাদ আছে। আর, শুধু ভারতই বা বলি কেন, পৃথিবীর আরও বহু ভাষায় এই মহাভারত অনূদিত হয়েছে।

মহাভারতে একটি মূল বড় গল্প আছে, আর তার সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে ছড়িয়ে আছে শত শত ছোট ছোট গল্প। সমস্ত নিয়েই এই মহাভারত। মূল গল্পটি হ'ল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের গল্প।

পুরাকালে দিল্লীর কাছে হস্তিনাপুর নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁরই নাম থেকে এ দেশের নাম ভারতবর্ষ। এই ভরত রাজার বংশে জন্ম হয় দুই ভাইএর—ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু। ধৃতরাষ্ট্র জন্ম থেকেই অন্ধ, সে জন্য ছোট ভাই পাণ্ডু হলেন রাজা। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলে ছিল একশ'টি—দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি। আর পাণ্ডুর ছেলে পাঁচটি—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। ধৃতরাষ্ট্রের ছেলেদের বলত কৌরব, আর পাণ্ডুর ছেলেদের বলা হ'ত পাণ্ডব।

পাণ্ডু অল্প বয়সে মারা যান। ছেলেদের তখনও রাজা হবার বয়স হয় নি, কাজেই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রই হলেন সকলের অভিভাবক। এদিকে, কৌরব ও পাণ্ডবেরা একসঙ্গেই লেখাপড়া ও যুদ্ধবিদ্যা শিখতে লাগলেন। সব বিষয়েই পাণ্ডবেরা তাঁদের ছাড়িয়ে উঠছেন দেখে কৌরবদের হ'ল হিংসে। তাঁরা পাণ্ডবদের মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। গালা দিয়ে এক ঘর তৈরী হ'ল,—জতুগৃহ। সেখানে ছল করে কৌরবেরা পাণ্ডবদের পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ঘরখানি পুড়িয়ে দিয়ে কৌরবেরা

ভাবলেন পাণ্ডবেরা মারা গেছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভাই বিদুরের চেষ্টায় পাণ্ডবেরা আগেই সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করলেন।

ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে পাণ্ডবেরা দ্রুপদ রাজার সভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে অর্জুন রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় ধনুর্বিদ্যার অসাধারণ কৌশল দেখিয়ে লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে লাভ করলেন। মা কুন্তীর আদেশে দ্রৌপদী হলেন পাঁচ ভাইয়েরই স্ত্রী।

কৌরবেরা এবার পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য তাদেরকে ভাগ করে দিতে বাধ্য হলেন। বড় ভাই যুধিষ্ঠির হলেন রাজা। তাঁর রাজধানী হ'ল ইন্দ্রপ্রস্থ। প্রজারা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা দেখে তাঁর নাম দিল ধর্মরাজ।

কৌরবদের হিংসা আরও বেড়ে গেল। মামা শকুনির সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরা পাণ্ডবদের পাশা খেলতে ডাকলেন। বাজী রেখে পাশা খেলা হ'ল। বাজীতে যুধিষ্ঠির হেরে গেলেন। শর্ত অনুসারে পাণ্ডবদের বারো বছরের জন্য বনবাস ও এক বছরের জন্য অজ্ঞাতবাসে যেতে হ'ল।

তেরো বছর বাদে ফিরে এসে পাণ্ডবেরা কৌরবদের কাছ থেকে রাজ্য ফিরে চাইলেন, কিন্তু দুর্যোধন রাজী হলেন না। ফলে যুদ্ধ বেধে গেল। এই যুদ্ধই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও গীতা

যুদ্ধে এসে অর্জুন আত্মীয়দের সঙ্গে লড়াই করতে চাইলেন না। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের রথের সারথি, তিনি অর্জুনকে বোঝালেন—কেউ কাউকে মারতে পারে না, ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক সকলকেই একদিন মরতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যারা মরবে, যুদ্ধ না করলেও তারা চিরকাল বাঁচবে না। যুদ্ধ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। কাজেই অর্জুনের বিহ্বল হবার কোন কারণ নেই।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজের দেহের মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়ে দিলেন: শত শত সূর্য, তাদের ঘিরে কত শত গ্রহ-উপগ্রহ ঘুরছে! কত প্রাণী সেই সব গ্রহে-উপগ্রহে!—বিরাট অনন্ত বিশ্ব। তাঁর করাল দ্রংষ্ট্রারেখার মধ্যে সমস্ত প্রাণী ঢুকে যাচ্ছে—পিষে যাচ্ছে। এই বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন বুঝলেন শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ভগবান্। তার পর জগৎ সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নানা উপদেশ দিলেন। এরই নাম 'গীতা'। গীতার মধ্যে হিন্দুধর্ম ও দর্শনের সব কথাই আছে।

অর্জুন শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নামলেন। কুরু-ক্ষেত্রের মাঠে প্রচণ্ড সংগ্রাম হ'ল। আঠারো দিনের যুদ্ধে কুরুবংশ ধ্বংস হয়ে গেল। তারই সঙ্গে নিহত হ'ল আঠারো অক্ষৌহিনী সৈন্য।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ

পাণ্ডবেরা রাজ্য পেলেন, কিন্তু এত বড় হত্যা-কাণ্ডের পর মনে শান্তি পেলেন না। অবশেষে তাঁরা হিমালয়ের পথে স্বর্গযাত্রা করলেন। পথে একে একে দ্রৌপদী ও চার ভাই মৃত্যুবরণ করলেন। যুধিষ্ঠির অতি পুণ্যবান্ ছিলেন, কেবলমাত্র তিনিই একটি আশ্রিত কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে সশরীরে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছুলেন। ঐ কুকুরটি হচ্ছে স্বয়ং ছদ্মবেশী ধর্মরাজ।

গ্রীস দেশের মহাকাব্য

আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন রামায়ণ আর মহাভারত, তেমনি গ্রীক্ ভাষায়ও অনুরূপ ছ'খানি মহাকাব্য হচ্ছে 'ইলিয়াড্' আর 'অডিসি'।

ইয়োরোপের সবচেয়ে পুরোনো সভ্য দেশ-গুলির একটি হচ্ছে গ্রীস্। সেখানে থিবস্ নামে এক নগর ছিল। এই নগরের তোরণে একজন অন্ধ চারণ কবি গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করতেন।
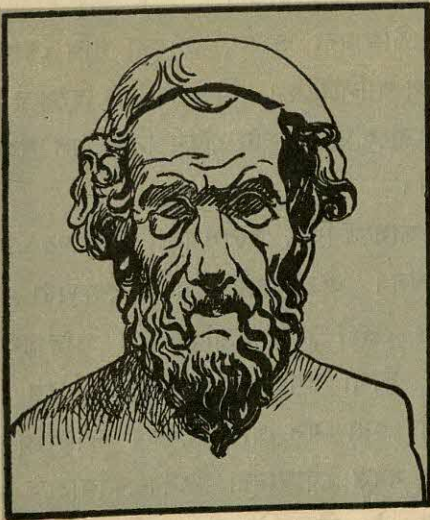
মহাকবি হোমার

রাজ-রাজড়ার কাহিনী নিয়ে তিনি গান বাঁধতেন। কাহিনীগুলি এমনই চিত্তাকর্ষক যে হাজার হাজার বছর পরেও লোকে তা ভোলে নি। ভোলে নি সেই অন্ধ চারণ কবির নামটিও। ইনিই হচ্ছেন ইলিয়াড্ ও অডিসির রচয়িতা মহাকবি হোমার।

এই ইলিয়াড্ আর অডিসি আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের মতই ছ'খানি মহাকাব্য, আর আমাদের দেশের রামায়ণ-মহাভারতের মতই বই ছ'খানি ওদেশে আদর পেয়ে আসছে। শুধু আদরই পায় নি, যুগে যুগে কত কবি —কত সাহিত্যিককে প্রেরণাও যুগিয়েছে! হাজার হাজার বছর ধরে লোকে সেই বিস্ময়কর কাহিনী শুনতে শুনতে কৌতূহলে, বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়েছে,—হর্ষে, বিষাদে ভরে গেছে তাদের মন। পৃথিবীর কত ভাষায় যে বই ছ'টি অনূদিত হয়েছে তার ঠিক নেই। রামায়ণ-মহাভারতের মতই বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এ ছ'টি বইএর সমকক্ষ বই খুব কমই আছে।

ইলিয়াডের কাহিনী

গ্রীক্‌দের দেবতা স্বর্গের রাজা জিয়ুস্। একদিন এক ভোজসভায় সমস্ত দেবদেবীকে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু বাদ পড়লেন একজন। তিনি হচ্ছেন অশান্তির দেবী। অশান্তি দেবী ক্ষুণ্ণ হলেন। আড়াল থেকে দেবতাদের সভায় তিনি একটি সোনার আপেল ফেলে দিলেন, আর আপেলটির গায়ে লিখে দিলেন 'সবার চেয়ে যে সুন্দরী এ আপেলটি তার জন্য'।

এখন, দেবীদের মধ্যে তিনজন ছিলেন পরমা সুন্দরী—হীরা, অ্যাথিনী আর অ্যাফরোডাইট। তিনজনেই দাবী করলেন আপেলটি। শেষে যখন নিজেদের মধ্যে মীমাংসা হ'ল না তখন তাঁরা নেমে এলেন পৃথিবীতে। ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিস—পরম সুন্দর পুরুষ বলে তাঁর অসম্ভব খ্যাতি। পাহাড়ের ওপর বসে তিনি পিতার মেষ পাহারা দিচ্ছিলেন। তিন দেবী এসে বিচারের ভার দিলেন তাঁরই ওপর।

কিন্তু সেই সঙ্গে তিনজনই নানারকম লোভ দেখাতেও ছাড়লেন না। হীরা দেবরাজ জিউসের পত্নী, তিনি লোভ দেখালেন ক্ষমতার। অ্যাথিনী লোভ দেখালেন জ্ঞান ও বিদ্যার। আর অ্যাফরোডাইট? তিনি লোভ দেখালেন ভালবাসার। বললেন, "ক্ষমতা আর বিদ্যা দিয়ে কি হবে প্যারিস, আমাকে যদি তুমি সব-সেরা সুন্দরী মেনে নিয়ে আপেলটি দাও তা হলে আমি পৃথিবীর সব-সেরা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।"

প্যারিস আর দ্বিরুক্তি না করে অ্যাফরো-ডাইটকেই দিয়ে দিলেন আপেলটা। ফলে অ্যাফরোডাইট যেমন তাঁর ওপর খুসী হলেন তেমনি আর দু'জন গেলেন ভীষণ চটে। তাঁরা ঠিক করলেন প্যারিসকে এর শাস্তি দিতে হবে।

গ্রীস দেশে স্পার্টা রাজ্য, তারই রাজা মেনেলাস্। তাঁর স্ত্রী হেলেন ছিলেন তখন পৃথিবীর সব-সেরা সুন্দরী। অ্যাফরোডাইটের চক্রান্তে প্যারিস স্পার্টা-রাজের অতিথি হলেন, তার পর একদিন সুযোগ বুঝে হেলেনকে নিয়ে পালিয়ে এলেন নিজের দেশ ট্রয়ে।

গ্রীক্‌রা এ অপমান সহ্য করতে রাজী হ'ল না। মেনেলাসের দাদা আগামেম্‌নন্ ছিলেন গ্রীসের সম্রাট্। তিনি গ্রীসের সমস্ত রাজাদের একত্র করলেন। সদলবলে ট্রয় আক্রমণ করল গ্রীক্‌রা। অবরোধ করে রাখল প্রাচীর-ঘেরা শহর।

সুরু হ'ল যুদ্ধ। বিখ্যাত ট্রয় যুদ্ধ। এই নিয়েই লেখা হোমারের ইলিয়াড কাব্য। ট্রয়ের আর এক নাম ইলিয়াম্। তাই থেকেই বইএর ঐ নাম। অধিবাসীদের বলা হ'ত ট্রোজান্। দশ বছর ধরে যুদ্ধ চলল। হাজার হাজার গ্রীক্ ও ট্রোজান বীর নিহত হলেন। তাঁদের মধ্যে ট্রোজান্‌দের বীর সেনাপতি হেক্‌টর এবং গ্রীক্‌দের শ্রেষ্ঠ বীর অ্যাকিলিসও ছিলেন। কিন্তু জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হ'ল না। তার পর হঠাৎ একদিন গ্রীক্‌রা লড়াই ছেড়ে দিয়ে দেশে ফেরার জন্য জাহাজে গিয়ে উঠল। নগরের বাইরে যুদ্ধের মাঠে পড়ে রইল একটা প্রকাণ্ড কাঠের ঘোড়া।

ট্রোজান্‌রা ভাবল, গ্রীক্‌রা বুঝি ঘোড়াটা ফেলে পালিয়েছে। বিজয়ের চিহ্ন হিসেবে মহা সমারোহে তারা সেটা টেনে নিয়ে এল শহরের মধ্যে।

আসলে কিন্তু সেটাও ছিল গ্রীক্‌দের একটা কৌশল। ঐ বিরাট কাঠের ঘোড়াটা এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছিল যে তার পেটটা ছিল ফাঁপা আর তার মধ্যে লুকিয়ে ছিল বাছাই-করা যত গ্রীক্ সৈন্য। রাত দুপুরে, যখন সমস্ত ট্রোজান্‌রা উৎসব-কোলাহলে মত্ত, তখন ঐ গ্রীক্ সৈন্যেরা চুপি চুপি ঘোড়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে নগরের ফটক খুলে
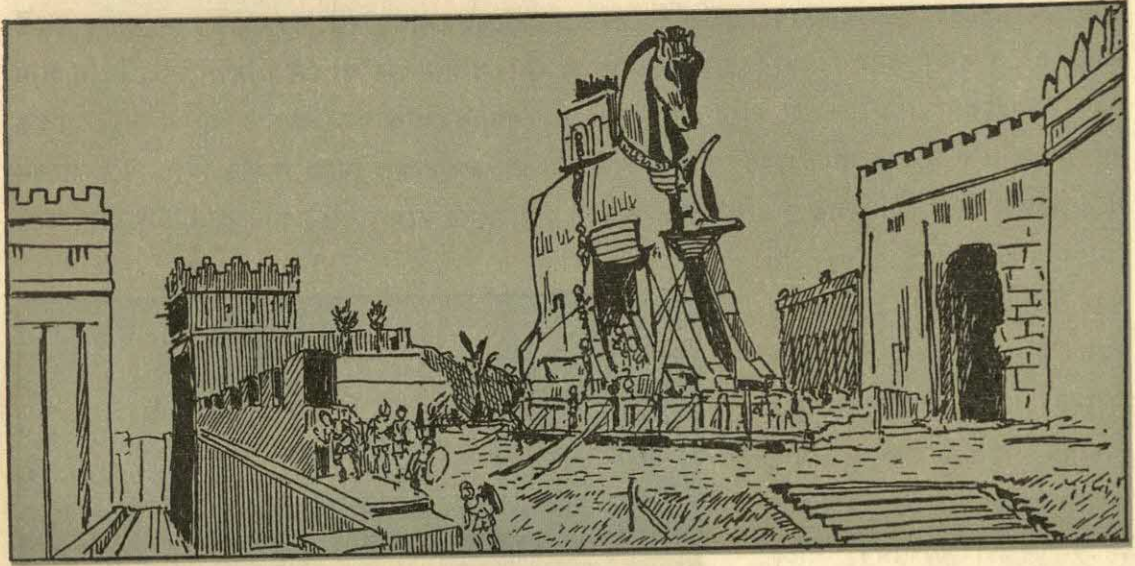
ঘোড়াটা···টেনে নিয়ে এল শহরের মধ্যে।

দিল। অন্য গ্রীক্ সৈন্যেরা সত্যি সত্যি জাহাজে চড়ে পালায় নি, তারা কাছে-পিঠেই লুকিয়ে ছিল। ফটক খুলতেই তারা দলে দলে নগরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তার পর? তার আর কি, সুরু হ'ল হত্যাকাণ্ড, লুঠপাট। আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত শহর পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিল তারা।

এইভাবে শেষ হ'ল দশ বছরের ট্রয় যুদ্ধ। হেলেনকে উদ্ধার করে গ্রীক্‌রা ফিরে এল নিজেদের দেশে।

অডিসির গল্প

হোমারের অপর মহাকাব্য হচ্ছে অডিসি—ট্রয় যুদ্ধের অন্যতম গ্রীক্ নায়ক অডিসি বা ওডিসিউসকে নিয়ে লেখা। ঠিক ইলিয়াডের পরবর্তী ঘটনা নিয়েই রচিত এই মহাকাব্য।

ট্রয় যুদ্ধের পর ফেরার পথে একখানা জাহাজ ঝড়ের মুখে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সেই জাহাজে ছিলেন ইথাকার রাজা অডিসি বা ওডিসিয়ুস। পথভ্রান্ত হয়ে ওডিসিয়ুস সাগরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জাহাজ আজ এ দ্বীপে গিয়ে লাগে, কাল ও দ্বীপে। এক-এক রকম দ্বীপে এক-এক রকম বিপদ্ দেখা দেয়। বুদ্ধি, সাহস কিংবা শক্তি দিয়ে ওডিসিয়ুস সে বিপদ্ কাটিয়ে ওঠেন। এই ভাবে কেটে যায় কয়েক বছর।

এক দ্বীপে বড় বড় পদ্ম ফোটে, সেই পদ্মের মধু খেলে মানুষ মাতালের মত শুধুই পড়ে পড়ে ঘুমোয়। জাহাজের লোকজন দ্বীপে নেমে সেই পদ্মমধু খেয়ে অসাড় হয়ে পড়ে রইল। বহু কষ্টে ওডিসিয়ুস তাদেরকে আবার জাহাজে নিয়ে গিয়ে তুললেন।

এক দ্বীপে থাকে সাইক্লোপ্‌স্ নামে একচোখ-ওয়ালা এক দানব। মানুষ পেলেই সে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের গুহায় বন্দী করে রাখে, তার পর এক-একটিকে ধরে আগুনে

ঝলসিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলে। ওডিসিয়ুসের দলকেও সে বন্দী করল। তার চোখ থাকতে তার নজরকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না বুঝে ওডিসিয়ুস এক মতলব আঁটলেন। দানব যখন ঘুমোচ্ছিল তখন একটা জ্বলন্ত ছুঁচলো লাঠি তার চোখে ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে অন্ধ করে দিলেন। দানব কিন্তু তাতেও দমল না, সে গুহার মুখে বসে পাহারা দিতে লাগল। কিন্তু দানবের ছিল অনেকগুলো ছাগল, তাদের চরবার জন্য গুহার বাইরে ছেড়ে দেওয়া দরকার। পাছে কেউ ছাগলের পিঠে চড়ে পালায় এ জন্য দানব পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পরীক্ষা করে করে তাদের ছাড়তে লাগল। আর এদিকে ছাগলদের পেটের তলায় ঝুলতে ঝুলতে ওডিসিয়ুস দলবল নিয়ে বেরিয়ে এলেন গুহা থেকে। দানব টের পেল না যে ছাগলগুলোর পেটের নীচে মানুষ ঝুলছে।

জাহাজে উঠে ওডিসিয়ুস দানবকে টিটকিরি দিতেই দানব তার আত্মীয়দের নিয়ে ছুটে এল, আর তীর থেকে জাহাজ লক্ষ্য করে বড় বড় পাথর ছুঁড়তে লাগল। কোন রকমে প্রাণ নিয়ে তাঁরা জাহাজ ছেড়ে দিলেন।

মাঝসমুদ্রে রাতের অন্ধকারে মায়াবিনী জলকন্যারা গান গায়। পাগল-করা সেই গান শুনলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না— মুগ্ধ হয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় জলে পাথরের মত। ওডিসিয়ুস সঙ্গীদের কান আগে-ভাগেই মোম দিয়ে বন্ধ করে দেন যাতে কেউ না সে গান শুনতে পায়। নিজে কিন্তু তিনি গান শোনার লোভ দমন করতে পারেন না। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন মাস্তুলের সঙ্গে। তবু গান শুনে আত্মহারা হয়ে

নিজেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন মাস্তুলের সঙ্গে।

ছটফট করতে থাকেন তিনি। কিন্তু সঙ্গীরা কেউ বাঁধন খুলে দিতে নারাজ—কারণ সেই রকমই নির্দেশ দেওয়া ছিল তাদেরকে। আর কানে মোমের ছিপি আঁটা থাকায় তারা তো কেউ গান শুনতে পাচ্ছিল না।

আর এক দ্বীপে থাকে এক যাদুকরী, তার নাম সার্সি। মানুষ পেলেই সে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে যাদুর কাঠি ছুঁয়ে তাদের শুয়োর বানিয়ে রাখে। ওডিসিয়ুসের সঙ্গীদেরও সে শুয়োর বানিয়ে খোঁয়াড়ে পুরে রাখল। তারপর

অভিযাত্রীরা একটা জলন্ত ছুঁচালো কাঠি দৈত্যের চোখে ঢুকিয়ে দিলেন

—সিন্দবাদের কথা। পৃঃ ২২২

ওডিসিয়ুস স্বয়ং গিয়ে কৌশলে তাকে জব্দ তো করলেনই, শেষ পর্যন্ত যাত্নকরী তাঁর এমন ভক্ত হয়ে পড়ল যে তাঁর সঙ্গীদের এবং আরও যে সব লোককে সে জানোয়ার বানিয়ে রেখেছিল তাদের সবাইকে সে তো মুক্তি দিলই, উপরন্তু ওডিসিয়ুসকেও কিছুতেই ছাড়তে রাজী হ'ল না। ওডিসিয়ুস বেশ কিছুদিন তার আতিথ্যে আমোদ-আহ্লাদ করে কাটিয়ে ফের সমুদ্রে ভাসলেন। সার্সি সজল নয়নে তাঁকে বিদায় দিল আর সেই সঙ্গে পথের বিপদ্ থেকে তাঁদেরকে রক্ষা করবার জন্য যাত্নবলে সমস্ত প্রতিকূল বাতাসগুলোকে একটা থলিতে আটকে সঙ্গে দিয়ে দিল—যাতে সেগুলো কোন উপদ্রব করতে না পারে। কিন্তু ওডিসিয়ুসের সঙ্গীদেরই কারো কারো হ'ল দুর্বুদ্ধি ; কৌতূহলের বশে তারা থলি খুলতেই হু-হু করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে এল আর জাহাজ ফের ঝড়ের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে ভেসে চলল বিপথে।

যাই হোক্, এই ভাবে আরও নানা বিপদ্-আপদ্ কাটিয়ে, সঙ্গীদের অনেককেই পথে হারিয়ে অবশেষে একদিন ওডিসিয়ুস ইথাকায় এসে পৌঁছলেন।

এদিকে প্রায় কুড়ি বছর ওডিসিয়ুস দেশ-ছাড়া। এই সুযোগে নানা জায়গা থেকে একদল যুবক (তাদের মধ্যে অনেক রাজপুত্রও আছে) এসে জুটেছে রাজবাড়ীতে। তারা বলছে, রাজা ওডিসিয়ুস মারা গেছেন। এখন বিধবা রাণী পেনেলোপী তাদের কাউকে বিয়ে করুন, সেই হবে নতুন রাজা।

রাণী পেনেলোপীর কিন্তু আর বিয়ের ইচ্ছে নেই। তাঁর ছেলে টেলিমেকাস্‌ও বড় হয়ে উঠেছে। রাণী একখানি কাপড় বুনতে সুরু করলেন, বললেন, "এটা হবে আমার বিয়ের পোশাক। বোনাটা শেষ হলেই আমি স্বয়ম্বর-সভা ডাকব।"

এদিকে দিনের বেলা রাণী যেটুকু বোনেন, রাত্রে আবার চুপি চুপি তা খুলে ফেলেন। কাপড় বোনা আর শেষ হয় না। এ দেখে সেই যুবকের দল অধৈর্য হয়ে হৈ-চৈ সুরু করল।

ওডিসিয়ুস ভিখারীর ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনলেন এবং দেখলেন। তারপর সুরু হ'ল তাঁর তাণ্ডব লড়াই ওই বিবাহেচ্ছু যুবকদের সঙ্গে। তাদের মেরে-ধরে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি আবার ইথাকার সিংহাসনে এসে বসলেন। তারপর স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখে রাজত্ব করতে লাগলেন।

বিষ্ণুশর্মা আর পঞ্চতন্ত্র

গ্রীক্ সাহিত্য ছেড়ে আবার আমরা ফিরে আসছি ভারতীয় সাহিত্যের আসরে।

দক্ষিণ ভারতে মহিলারোপ্য নামে একটি নগর ছিল। সেখানে অমরশক্তি নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর তিনটি ছেলে—বসুশক্তি, উগ্রশক্তি আর অনেকশক্তি। তিনটিই মহামূর্খ ; লেখাপড়া তাদের মাথায় একদম ঢোকে না। রাজা বড় ভাবিত হয়ে পড়লেন, মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, "এর একটা বিহিত তো না করলে নয়!"

মন্ত্রী তখনই রাজ্যের সমস্ত পণ্ডিতদের ডেকে পাঠালেন। পণ্ডিতেরা সব শুনে বললেন, "আগে বারো বছর ধরে ব্যাকরণ মুখস্থ করতে হবে ; তারপর মনু, চাণক্য, বাৎস্যায়ন, ধর্মশাস্ত্র,

অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি প্রভৃতি শেষ করতে আরও বেশ কয়েক বছর লাগবে।"

কথাটা রাজার মনঃপূত হ'ল না। পণ্ডিতদের মধ্যে একজন ছিলেন বিষ্ণুশর্মা। রাজা তাঁকে বললেন,—"আমার ছেলে তিনটিকে অল্প দিনে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করে দিন। আমি আপনাকে একশ'টি গ্রাম প্রণামী দেব।"

বিষ্ণুশর্মার বয়স হয়েছে আশী বছর। শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, গায়ের চামড়া হয়ে গেছে শিথিল। কিন্তু মনটি তাঁর তেমনি সতেজ। তিনি হেসে বললেন, "আমার আশী বছর বয়স, শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে শক্তি হারাচ্ছে। এখন আর অর্থে আমার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া আমি বিদ্যা বিক্রি করি না,—একশ' গ্রাম দিলেও না। তবে আপনার ছেলে ক'টিকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি কথা দিচ্ছি, ছ'মাসের মধ্যে রাজপুত্রদের সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করে তুলব। যদি না পারি, তবে নিজের নামই ত্যাগ করব।"

বিষ্ণুশর্মা রাজপুত্রদের শেখাবার জন্য কতকগুলি গল্প রচনা করলেন আর সেই সব ছোট ছোট গল্পের ভিতর দিয়ে সমস্ত শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের সার কথা ছ'মাসে রাজপুত্রদের পড়িয়ে দিলেন।

এই গল্পগুলিই হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। এই পঞ্চতন্ত্র বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ্ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর যে কোন একটি গল্প পড়লেই বিষ্ণুশর্মার অসাধারণ প্রতিভার কথা বোঝা যায়।

পঞ্চতন্ত্রের একটি গল্প ঃ ধর্মবুদ্ধি-পাপবুদ্ধি-কথা

দুই বন্ধু। গলায় গলায় ভাব। একজন খুব ধার্মিক, আর একজনের সর্বদাই দুষ্ট বুদ্ধি। ধার্মিককে লোকে বলত ধর্মবুদ্ধি, আর দুষ্টের নাম দিয়েছিল পাপবুদ্ধি।

দুই বন্ধু বিদেশে গেল ব্যবসা করতে। কিছু দিনের মধ্যেই দু'জনে মিলে অনেক ধনসম্পদ্ রোজগার করল। তারপর সেই সব ধন নিয়ে ফিরল দেশে।

একটি বন পার হয়েই তাদের গ্রাম। বনের মধ্যে এক গাছতলায় বসে পাপবুদ্ধি বলল, "এত টাকা নিয়ে বাড়ী ফেরা ঠিক হবে না, বাড়ীতে ডাকাত পড়বে, আত্মীয়েরাও হিংসা করবে। কিছু টাকা সঙ্গে রাখি আর বাকিটা এই গাছতলায় পুঁতে রেখে যাই। যেমন যেমন দরকার হবে, এসে তুলে নেব।"

তাই করা হ'ল।

দিন যায়।

একদিন পাপবুদ্ধি এসে বলল, "আমার টাকার দরকার। চল, গাছতলা থেকে কিছু তুলে নিয়ে আসি।"

ধর্মবুদ্ধি বলল, "আমারও দরকার, চল।"

দুই বন্ধু বনে এল। গাছতলা খুঁড়ল, কিন্তু টাকা তো নেই! অত টাকা কোথায় গেল?

পাপবুদ্ধি বলল, "আমরা দু'জন ছাড়া এই টাকার কথা তো কেউ জানে না! আমি যখন নিই নি, তখন তুমিই নিয়েছ।"

দুই বন্ধুতে ঝগড়া বেধে গেল। শেষে দু'জনে গেল বিচার-সভায়। বিচারকেরা বললেন, "কোন সাক্ষী আছে?"

পাপবুদ্ধি বলল, "বনদেবতাকে সাক্ষী মানতে পারি। তিনি তো সবই জানেন।"

"বেশ, তা হ'লে বনদেবতারই সাক্ষ্য নেওয়া হোক।"

পাপবুদ্ধি বাড়ী এসে তার বাবাকে সব কথা বলল। আরও বলল, "টাকাগুলো আমিই চুরি করেছি; ধর্মবুদ্ধিকে আমি এক পয়সাও দেব না। এখন তুমি এক কাজ কর—।"

তার বাবাও তেমনি। বললেন, "কি কাজ?"

—"সেই শমীগাছটায় একটা কোটর আছে। সেই কোটরের মধ্যে তুমি লুকিয়ে থাকবে। বিচারকদের সঙ্গে আমরা গাছ-তলায় যাব। গাছকে জিজ্ঞাসা করব, কে চোর। তুমি তখন বলবে—ধর্মবুদ্ধি চোর।"

পরদিন সকালে বিচারকেরা সদলবলে এলেন বনে। সঙ্গে ধর্মবুদ্ধি আর পাপবুদ্ধি। সবাই সেই শমীগাছের সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করা হ'ল, "হে বনের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, আপনি বলুন, কে এই টাকা চুরি করেছে।"

নিস্তব্ধ বন কাঁপিয়ে হঠাৎ গাছের ভিতর থেকে সাড়া এল—"চুরি করেছে ধর্মবুদ্ধি।"

অকাট্য প্রমাণ। বিচারকেরা বললেন, ধর্মবুদ্ধির সাজা হবে। কি সাজা দেওয়া যায় তাই নিয়ে তাঁরা আলোচনা সুরু করলেন।

ইত্যবসরে ধর্মবুদ্ধি কতকগুলি কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে সেই শমীগাছের গুঁড়িতে জড় করল। তারপর দিল তাতে আগুন ধরিয়ে। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন।

আর যায় কোথা! পরক্ষণেই আর্তনাদ করতে করতে গাছের কোটর থেকে পাপবুদ্ধির

গাছের কোটর থেকে পাপবুদ্ধির বাবা বেরিয়ে এল।

বাবা বেরিয়ে এল। শরীরের অর্ধেকটা তার তখন ঝল্‌সে গেছে, চোখ দু'টো যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে।

পাপবুদ্ধির বাবা খুলে বলল সব কথা। ধর্মবুদ্ধির তারিফ করে বিচারকেরা পাপবুদ্ধির উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করলেন।

এই গল্প থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কোন ব্যাপারেই শেষ পর্যন্ত দুষ্টবুদ্ধি সফল হয় না। ধর্ম চিরকালই জয়ী হয়।

জাতকের গল্প

আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গৌতম বুদ্ধ এ দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষকে সৎভাবে জীবন যাপন করার জন্য যে সব ধর্মকথা বলে যান তাই নিয়েই তৈরী হয়েছে বৌদ্ধশাস্ত্র, আর ঐ ধর্মের নাম হয়েছে বৌদ্ধধর্ম। বুদ্ধদেব বলতেন, কেউই এক জন্মে বড় হয় না, বহু জন্ম ধরে পুণ্যসঞ্চয়

করতে হয়। বুদ্ধদেব নিজেও ঐ রকম অনেকবার জন্মগ্রহণ করেন এবং এক এক জন্মে এক একটি সৎকাজ করতে করতে তিনি ক্রমশঃ আত্মোন্নতি করেন। বুদ্ধদেব শিষ্যদের গল্পচ্ছলে এই সব উপদেশমূলক পূর্বজন্মের কাহিনী শোনাতেন। এই কাহিনীগুলিকেই বলা হয় জাতক, আর বুদ্ধদেবকে ঐ সব জন্মে বলা হয়েছে বোধিসত্ত্ব। পালি ভাষায় রচিত এই জাতকগুলি বিশ্বসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে।
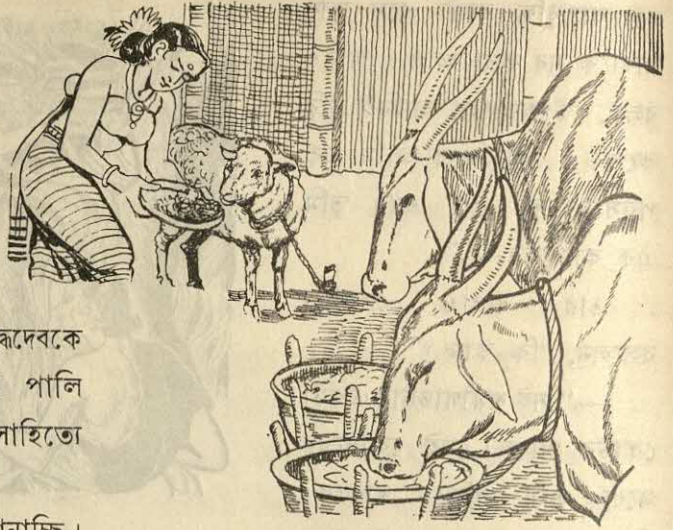
এখানে জাতক থেকে একটি গল্প শোনাচ্ছি।

সব জন্মেই যে বোধিসত্ত্ব মানুষ হয়ে জন্মেছিলেন তা নয়—কখনও হরিণ, কখনও বৃষ ইত্যাদি হয়েও জন্মেছিলেন। একবার বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে এক বলদ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল মহালোহিত।

মহালোহিতের সঙ্গে আরও একটি বলদ থাকত, তার নাম চুল্ললোহিত। এক গৃহস্থের বাড়ীতে তারা ছিল। জমি চষত, গাড়ী টানত। তাদের গোয়ালের পাশেই থাকত একটি ভেড়া। বাড়ীর গিন্নী প্রতিদিন নিজের হাতে সেই ভেড়াকে আদর করে খাওয়াত পাকা ফলের খোসা, ছোলা, মটর, ভাত ও নানা সুস্বাদু খাদ্য। পাশেই বলদ দু'টি ঘাস চিবুত আর ভেড়ার আদর দেখত।

একদিন চুল্ললোহিত মনের দুঃখে ঘাস-বিচালি খাওয়া ছেড়ে দিল। মহালোহিত বলল, "কি হ'ল, অসুখ করেছে?"

চুল্ললোহিত বলল, "না, অসুখ করে নি। দেখছি গিন্নী-মার ব্যবহার। একটা নিষ্কর্মা

নিজের হাতে ভেড়াকে আদর করে খাওয়াত।

ভেড়াকে নিজের হাতে যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন, আর আমরা এত কাজ করি তবু আমাদের পানে একবার ফিরেও তাকান না!"

—"নিশ্চয়ই এর কোন কারণ আছে।"

কিন্তু চুল্ললোহিত কোন যুক্তিই শুনল না।

দিন কয়েক পরেই গৃহস্থের মেয়ের বিয়ে। বিয়ের দিন সকালে দু'জন লোক সেই ভেড়াটির ঘরে ঢুকল একটা বিরাট খাঁড়া নিয়ে। তারপর ভেড়াটিকে মেরে তার মাংস কাটতে বসল। চুল্ললোহিত সভয়ে দেখতে লাগল সে দৃশ্য। মহালোহিত তখন বলল, "এবার দেখ, ভেড়াটাকে খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করা হচ্ছিল কেন। বেশী মাংস পাওয়া যাবে বলেই না? তুমি মিছেমিছি রাগ করছিলে। পরিশ্রম করে মোটামুটি খেয়ে বেঁচে থাকা অনেক—অনেক ভালো। রাজভোগের মত অনেক সুখাদ্য খেয়ে ভেড়ার মত মোটা হয়ে অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া বুদ্ধির কাজ নয়।"

চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা

মিশর দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞান

প্রাচীন ভারতবর্ষের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা এর আগে আলোচনা করেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭১-২৭৭), এবারে শোন প্রাচীন মিশর দেশে কি ভাবে চিকিৎসা করা হ'ত।

আমাদের দেশে যেমন তালপাতা বা ভূর্জ-পাতার ওপর পুঁথি লেখা হ'ত মিশরে তেমনি লেখা হ'ত প্যাপিরাস পাতায়। প্যাপিরাস হচ্ছে এক রকম জলজ উদ্ভিদ্, ইংরেজী পেপার কথাটা ওর থেকেই এসেছে। যাই হোক, এই রকম প্যাপিরাসের ওপর লেখা খান ছয়েক পুঁথি পাওয়া গেছে যার মধ্যে সে যুগে ওখানকার চিকিৎসা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এগুলি ১৫৫০ থেকে ১৪০০ খৃঃ পূর্বে লেখা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

এগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো হচ্ছে এবার্স্ প্যাপিরাস্। এর বিষয়বস্তু লেখা ছিল পাথরের ফলকে, আর থট নামে একজন চিকিৎসকের কর্তৃত্বে সেগুলি লেখা হয়। এই থট ছিলেন অনেকটা আমাদের ধন্বন্তরির মত। তাঁকে বলা হ'ত ঐশী শক্তিসম্পন্ন চিকিৎসক বা ডেমি-গড্। কেউ কেউ আবার বলেন, ইনাহে-তেপ (মিশরী ভাষায় যার অর্থ চিকিৎসক) নামে কোন চিকিৎসক মেম্‌ফিস্ দেবতার মন্দিরে এই শিলালিপিগুলি খোদাই করিয়েছিলেন।

এবার্স্ প্যাপিরাস কোন একজনের লেখা পুঁথি নয়—কয়েকজনের লেখা পুথির সংগ্রহ। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফিনীসিয়ার বিবল্‌স্ শহরের অধিবাসী। তিনি ছিলেন চোখের ডাক্তার। মনে হয় এই পুঁথি লেখা হয়েছিল হেলিওপোলিস শহরে—যেখানে ছিল নানা রকম চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষা দেবার একটি বড় কেন্দ্র। পুঁথিগুলির মধ্যেও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহু শাখার বহু প্রকার চিকিৎসার আর ওষুধের বিবরণ পাওয়া যায়—বিশেষ করে পাকস্থলী, অন্ত্র আর মূত্রাশয় সম্পর্কে। এ ছাড়া চোখের অসুখ, নাকের ও কানের অসুখ, স্নায়ু, হৃদ্‌যন্ত্র এবং ফোঁড়া-পাঁচড়া ইত্যাদি চর্মরোগের চিকিৎসা সম্পর্কেও নানা উপদেশ আছে এতে। এর ওপর আছে নানা রকম পোকামাকড়, মশা-মাছির কামড়ে যে সব রোগ হতে পারে তারও বিবরণ। এক রকম কৃমি-রোগের কথাও আছে এতে, যার নাম ইংরেজীতে লিখতে গেলে

লিখতে হয় তিনটে 'এ' দিয়ে—'A A A'। এই কৃমি হচ্ছে মানুষের অন্ত্রের কৃমি। অনেকে মনে করেন আজকাল যাকে আমরা হুক্‌ওয়ার্ম বা আঁকশি-কৃমি বলি—এটি তারই কোন প্রকারভেদ হবে। অবশ্য ওর চেয়েও বড় জাতের কৃমি—যেমন টেপ্‌ওয়ার্ম বা ফিতে-কৃমি, রাউণ্ড ওয়ার্ম বা গোল কেঁচোর মত কৃমি—এ রকম কিছু হওয়াও বিচিত্র নয়। ডেণ্ডেরা মন্দিরে একটি অসুখের নাম খোদাই করা আছে ইংরেজী অক্ষরে যাকে বলা যায় A A T। এটি সম্ভবতঃ ম্যালেরিয়া জাতীয় কোন রোগের প্রতিশব্দ বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এবারস্‌ প্যাপিরাসগুলির মধ্যে চল্লিশখানি

প্রাচীন মিশর দেশে ওষুধ তৈরীর দৃশ্য

পুঁথি পাওয়া গেছে। তার মধ্যে কায়-চিকিৎসা, নানারকম অস্ত্রোপচার অর্থাৎ অপারেশনের যন্ত্র, অ্যানাটমি এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রয়োগ-প্রণালীর কথাও আছে।

এ ছাড়া অন্য যে ক'খানা প্যাপিরাস্ পুঁথি পাওয়া গেছে, যেমন হার্স্ট প্যাপিরাস, বার্লিন প্যাপিরাস ইত্যাদি,—তার মধ্যেও ঐ রকম নানা রোগের ব্যবস্থাপত্র, ওষুধ সংগ্রহ করবার পদ্ধতি, এমন কি মন্ত্রতন্ত্রও লেখা আছে। বার্লিন প্যাপিরাসে এর ওপর আছে অনেক রকম চর্মরোগ, কুষ্ঠ ইত্যাদি ব্যারামের প্রাথমিক চিকিৎসার কথা, গাছগাছড়ার রস থেকে কি করে মলম, প্রলেপ ইত্যাদি তৈরী করা যেতে পারে তার কথা। অবশ্য এর মধ্যেও পাওয়া যায় নানা রকম মন্ত্রতন্ত্র এবং ইন্দ্রজাল সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব।

তবে এটা ঠিক, যে, মিশরীয় চিকিৎসকেরা রক্ত-চলাচলের মূল কথা হার্ভির (যাঁকে রক্ত-চলাচল প্রণালীর মূল আবিষ্কর্তা বলা হয়) কয়েক হাজার বছর আগেও জানতেন। পথ্যবিচার, দিনচর্যা, স্নান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা ইত্যাদি সম্বন্ধেও তাঁদের সম্যক্ জ্ঞান ছিল। অবশ্য মিশরীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের—ঠিক যাকে বলে ধারাবাহিক ইতিহাস—সে রকম কিছু পাওয়া যায় নি। পরবর্তী যুগে এটি আরবী, গ্রীক্ এবং রোমান্ চিকিৎসা-প্রণালীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

ইজরেল দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞান

ইজরেল বা ইজরাইল দেশের লোকেরা হচ্ছে য়িহুদী। এই য়িহুদীরাও খুব পুরোনো জাতি এবং সেই আদিযুগ থেকেই এরা যে

চিকিসা-শাস্ত্র চর্চা করে আসছে তার বিবরণ পাওয়া যায় ক্রীশ্চানদের ধর্মপুস্তক বাইবেল আর ঐ য়িহুদীদেরই ধর্মপুস্তক তালমুদে। বাইবেলের "বুক অব্ নাম্বার"এ অগ্নিসর্পের ব্যাধি (প্লেগ্ অব্ ফায়ারী সারপেন্টস্) নামে যে অসুখের বিশেষ বর্ণনা আছে তা খুব সম্ভবতঃ বর্তমানে সুপরিচিত এক বিশেষ কৃমি-রোগের বিবরণ—যাকে বলা হয় গিনি ওয়ার্ম (বৈজ্ঞানিক নাম ড্র্যাকুনকুলাস্ মেডিনেন্‌সিস্)। মোজেস্ (মুসা) য়িহুদীদের উপদেশ দিয়েছিলেন —এই রোগ হলে গায়ের চামড়ার ক্ষতমুখ থেকে ধীরে ধীরে একটি কাঠিতে জড়িয়ে তার কৃমিগুলি টেনে তুলে ফেলতে। এ থেকেই মনে হয় ওই কৃমিগুলি গিনি ওয়ার্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

বাইবেলেরই আর এক জায়গায় এক মহা-মড়কের বিবরণ আছে যার ফলে আশোডড গথ, এক্রন বেথ-শেমেশ প্রভৃতি শহরগুলিতে পঞ্চাশ হাজার লোক মারা যায়। এই মহামড়ক সম্ভবতঃ প্লেগ্ ছাড়া আর কিছু নয়। এই ব্যারামে 'এমেরড্' বলে যে গ্রন্থিস্ফীতির কথা বলা হয়েছে তা প্লেগেরই একটি বিশেষ লক্ষণ। তা ছাড়া এই মড়কের বর্ণনায় মানুষ আর ইঁদুর একই সঙ্গে মরতে থাকে বলে বলা হয়েছে। এ থেকেও বোঝা যায় যে মড়কটা হয়েছিল প্লেগের। ইঁদুরের গায়ের পোকা 'ফ্লী' থেকেই তো প্লেগ ছড়ায়! ফলে ইঁদুর মরে, মানুষও মরে।

য়িহুদীদের চিকিসা-শাস্ত্রে পরিচ্ছন্নতার ওপর খুব জোর দেওয়া হয়েছিল, বিশেষ করে মুসার সময়ে। এমন কি বলি দেবার জন্য যে পশু আনা হ'ত তাদেরকে 'শুচি' আর 'অশুচি' এই দুই ভাগে বাছাই করে নেওয়া হ'ত। নীরোগ পশুদেরই বলা হ'ত শুচি। যে সব জন্তুর পেটে কোন রকম কৃমি পাওয়া যেত তাদের বলা হ'ত অশুচি। এ রকম পশু বলি-দানের অযোগ্য বলে বিবেচিত হ'ত।

রোগের শ্রেণী-বিভাগ ছিল খুব সরল। তরুণ ব্যাধি—যেগুলিকে এখন আমরা বলি 'অ্যাকিউট'—তাকে প্লেগ বলে গণ্য করা হ'ত। আর যেগুলি বেশী দিন ধরে চলত তাকে এখনকার মত 'ক্রনিক' বলেই ধরা হ'ত। তা ছাড়া যে সব রোগে গায়ের চামড়ায় কোন বর্ণ-ব্রণের গুটি বা ফোঁড়া বেরোত তাকেই বলা হ'ত কুষ্ঠ বা 'লেপ্রসী'। এ সব ব্যারাম হলে রোগীকে অস্পৃশ্য করে রাখার নিয়ম ছিল এবং

একজন য়িহুদী চিকিৎসক

তা বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই পালন করা হ'ত। এতে অবশ্য রোগীর খুবই অসুবিধা হ'ত, কিন্তু জনসাধারণ ছোঁয়াচে রোগ থেকে রক্ষা পেত।

য়িহুদীরা যখন ব্যাবিলনে অবরুদ্ধ হয় তখন তারা নানা দেশের প্রভাবে প্রভাবিত হয়। এ সব দেশের মধ্যে ছিল ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, গ্রীস্ এবং ভারত। এর পর আনুমানিক ১৫০ খৃঃ পূর্বাব্দে প্যালেস্টাইনে একটি বিশিষ্ট চিকিৎসক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে—যাদের বলা হ'ত 'এসেন্স্' (হিলার্স্ বা থেরাপিউ-টিস্ট্স্)। তালমুদ বইখানি আরও পরে লেখা হয়। সে বইএ আমরা মেডিসিন (কায়চিকিৎসা), সার্জারি (অস্ত্র-চিকিৎসা), প্যাথলজি, অ্যানাটমি ইত্যাদি অনেক কিছুর বিবরণ পাই। তবে তার অধিকাংশই সম্ভবতঃ গ্রীসীয় প্রভাবে প্রভাবিত। পরবর্তী কালে য়িহুদীদের চিকিৎসা-বিজ্ঞান আলেকজেন্দ্রীয় ও আরবীয় চিকিৎসার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যায়।

গ্রীস্ দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞান

ভারতবর্ষে যেমন বলা হয় চিকিৎসা-শাস্ত্রটা এসেছে দেবতাদের কাছ থেকে, গ্রীসেও ঠিক তাই। সে কথা ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ডেও বলেছি। সূর্যদেব অ্যাপোলোই নাকি প্রথম এই বিদ্যা শিখিয়েছিলেন সেণ্টার চীরনকে। এই চীরনকে অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অবশ্য চীরন ছিল সেণ্টার—যারা ঠিক মানুষ নয়—কাল্পনিক মিশ্রজীব। এদের শরীরের নীচের দিক্‌টা ঘোড়ার মত, ওপর দিক্‌টা মানুষের মত। চীরন আবার এই বিদ্যা শেখালেন অ্যাস্‌লিপিয়াস্‌কে। মহাকবি
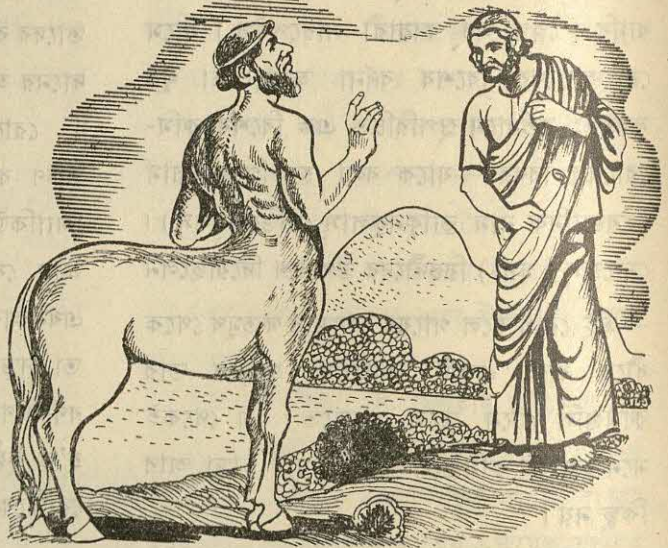
চীরন ও অ্যাস্‌লিপিয়াস্

হোমার এঁরই বংশধরদের শল্যচিকিৎসক বলে বর্ণনা করে গেছেন। যাই হোক, অ্যাস্‌লি-পিয়াস্-বংশধরই হচ্ছেন স্বনামধন্য গ্রীক্ চিকিৎসক হিপোক্র্যাটিস্। এঁর জন্ম অনুমান করা হয় খৃঃ পূর্ব ৪৬০।

ইস্‌কিউলেপিয়াসের পরে গ্রীস্ দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞান কিছুদিনের জন্য চলে যায় দার্শনিকদের হাতে। এই দার্শনিকদের মধ্যে পিথাগোরাসের নাম হয়তো অনেকেই শুনে থাকবে। অ্যাস্‌লিপিয়াসের চিকিৎসাধারা একটি বংশগত ধারায় চলতে থাকে। এই ভাবেই কস্ নামে একটি জায়গায় যে স্বাস্থ্য-মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল হিপোক্র্যাটিস তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন।

দার্শনিক পিথাগোরাস্

আমাদের দেশে ব্যাস এই নামটি বহু ঋষির নামের সঙ্গে উপাধির মত জড়িয়ে আছে। হিপোক্র্যাটিস নামটিও ঠিক তাই। ঐ নামে আমরা আটজন চিকিৎসকের উল্লেখ পাই। এ দের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁকেই বলা হয়

ট্রোজান্‌দের সঙ্গে গ্রীক্‌দের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতেও চিকিৎসার কথা আছে। ছবিতে গ্রীক্ বীর অ্যাকিলিস তাঁর বন্ধু পেট্রোক্লাসের পা ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছেন। একটি পুরোনো পাত্রের গায়ে ছবিটি পাওয়া গেছে।

আসল হিপোক্র্যাটিস। চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহু বিষয়ে এঁর দান অতুলনীয় বলা যেতে পারে। নানা রকমের জ্বর—সবিরাম বা পালা জ্বর, অবিরাম জ্বর, নিত্যকার জ্বর, একদিন, দু'দিন বা তিনদিন অন্তর জ্বর (রিলাপ্‌সিং ফিভার), গ্রীষ্ম-কালের জ্বর, শীতকালের জ্বর, ফিরে-ফিরে-আসা জ্বর—এই ভাবে ইনি রোগের শ্রেণী-বিভাগ করে গেছেন। এ ছাড়া আরও কত কি! চিকিৎসা-বিজ্ঞানে হিপোক্র্যাটিসের অবদান এত বেশী যে তাঁকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক (ফাদার অব মেডিসিন) বলা হয়ে থাকে। তবে ঐতিহাসিকরা এ কথাও উল্লেখ করেন যে তিনি ভারতীয় ও মিশরীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আলেকজেন্দ্রিয়ার চিকিৎসা-বিজ্ঞান

সেকেন্দর শাহ্, যাঁকে বলা হয় আলেক-জেন্দার দি গ্রেট,—কি ভাবে দিগ্বিজয় করে বিরাট্ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন সে কথা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানে। তাঁরই নাম থেকে আলেকজেন্দ্রিয়া শহরের নামকরণ হয়েছে। আলেকজেন্দারের মৃত্যুর পর ম্যাসিডন রাজ্য বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানও মিশরে টলেমিদের হাতে চলে যায়। এঁরাই আলেকজেন্দ্রিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। কাজেই এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানকেও বলা হয় আলেকজেন্দ্রীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

খৃঃ পূঃ ১৭০ অব্দে এখানে অ্যাগাথারকাইড্‌স্ নামে একজন চিকিৎসক খ্যাতি অর্জন করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞান নিয়ে তিনি যে পুঁথি লেখেন তার মধ্যে য়িহুদীদের সেই কৃমি-রোগ গিনি

ভেসালিয়াস (১৫১৪—১৫৬৪ খ্রী) এ বিষয়ে গবেষণা করেন এবং তিনিই শরীর চর্চায় অ্যানাটমিকে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শুধু শরীরের চিকিৎসা নয়, শরীরের ওপর মনের ক্রিয়া নিয়েও গ্যালেন যথেষ্ট আলোচনা করে গেছেন। মানসিক ব্যাধি—যাতে শরীর নয়, মনই অসুস্থ হয়ে প'ড়ে বিপর্যয় ঘটায়, তাই নিয়েও তিনি চর্চা করতে ছাড়েন নি। তাঁর একটি পরীক্ষার কথা এখানে বলা যেতে পারে। একবার তাঁর কাছে একটি রোগিণী এল। রোগিণীর শরীরে কোন অসুখের প্রকাশ নেই, কিন্তু মন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। গ্যালেন তার নাড়ী পরীক্ষা করতে করতে নানা রকম গল্প জুড়ে দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তার পরিচিত বহু নর-নারীর কথা তুললেন আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে লাগলেন ঐ আলোচনার সময়ে হঠাৎ কখনও নাড়ীর গতি পরিবর্তিত হচ্ছে কিনা। গল্প করতে করতে তিনি লক্ষ্য করলেন, যখনই বিশেষ কোন একটি লোকের কথা উঠছে তখনই রোগিণীর নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে রোগিণীর মানসিক ব্যাধির কারণ ধরা পড়ল। গ্যালেনও সেই অনুযায়ী তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

শরীরের মধ্যে রক্তবাহী শিরাগুলি কি ভাবে আছে, কি ভাবে রক্ত চলাচল করছে—এরও তাঁরই সুন্দর একটি চিত্র দিয়ে গেছেন গ্যালেন। হার্ট বা হৃৎযন্ত্রকে ঠিক পাম্প হিসেবে দেখাতে না পারলেও বাগানে জল সেচ করবার পয়ঃপ্রণালীর সঙ্গে তুলনা করে তিনি এর যে ছবি এঁকেছেন তা দেখলে অবাক্ হতে হয়।

মোট কথা, তাঁর মত আর কোন চিকিৎসক অত দীর্ঘ দিন ধরে চিকিৎসা-জগৎকে অতখানি প্রভাবিত করে রাখতে পারেন নি। পরবর্তী প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে ওদেশে তাঁর শিক্ষাই চিকিৎসা-বিদ্যার গোড়া এবং শেষ বলে ধরা হ'ত। তাঁকে আরও বলা হ'ত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জনক (ফাদার অব রিসার্চ মেথড্স্)।

রোমের স্বাস্থ্য-বিভাগ কি করতেন

গৌরবোজ্জ্বল রোম যে শুধু প্রতাপেই শ্রেষ্ঠ ছিল তা নয়, রোমের পৌর-বিভাগ জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও কম নজর রাখতেন না। জনসাধারণ আর সৈন্য বিভাগের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব অবশ্য পৃথক্ পৃথক্ কর্মচারীদের ওপর ন্যস্ত থাকত।

প্রাচীন পম্পিয়াই শহরের একটি দেয়ালচিত্র। একজন শল্য-চিকিৎসক ইনিয়াসের উরু থেকে একটা তীরের টুকরো চিমটে দিয়ে টেনে বার করছেন।

শহরে জল সরবরাহ, জল বের করে দেবার জন্য শ্বেত-পাথরের পরিচ্ছন্ন পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল একেবারে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত। এদিক্ দিয়ে রোমের পৌরসভা নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারতেন। তাঁদের তৈরী স্নানাগার ও প্রাকৃতিক স্নানের জায়গাগুলোও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের গৌরব বলা যেতে পারে।

সৈন্যবিভাগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও কর্তৃপক্ষ খুবই সজাগ ছিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নততর চিকিৎসার জন্য আলাদা হাসপাতাল থাকত। রণাঙ্গনেও থাকত চিকিৎসা-শিবির—যাকে বলা হয় 'বেস্ হস্‌পিটাল'। রোগী ও যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের নিয়ে যাবার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদির গোড়াপত্তনও হয়েছিল সেখানে সেই যুগে।

ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পম্পিয়াই নগরীর ধ্বংসের কাহিনী তোমরা সকলেই জান। পরবর্তী কালে পম্পিয়াই খুঁড়ে সে যুগের বহু জিনিসপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে—ঠিক অগ্ন্যুৎপাতের সময় যেটি যেমন ছিল। এই সব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রোমান্ চিকিৎসকদের ব্যবহৃত যে সব অস্ত্রোপচারের অর্থাৎ অপারেশনের যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে তাও দেখবার মত। কি ভাবে ঐ সব যন্ত্র অস্ত্রোপচারের সময় প্রয়োগ করা হ'ত তাও কতকটা জানা গেছে।

রোমান্ চিকিৎসকদের ব্যবহৃত অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি

আরব দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞান

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি আর গবেষণা নিয়ে যাঁরা বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত থাকেন তাঁরা হচ্ছেন আরব দেশের চিকিৎসক। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অ্যাভিসেনা (আবু আলিয়েল্ হোসেন ইবন আবদুল্লা ইবন সিনা)। ইনিও বিভিন্ন রকমের ম্যালেরিয়া জ্বরের—অবিরাম, সবিরাম ও পালাজ্বরের বিবরণ দিয়ে গেছেন। এ ছাড়া নানা রকমের কুষ্ঠ রোগের কথাও বলেছেন। কুষ্ঠ রোগের বর্ণনা করতে গিয়ে ইনি জুগম, জুডম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। অ্যাভিসেনার জন্ম হয় বোখারায়—৯৮০ খৃষ্টাব্দে। ইনি ৫৭ বছর বেঁচে ছিলেন।

অ্যাভিসেনা

এই সময়ে আরবরা নানা দিকে তাঁদের কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। আরবীয় ছাত্রেরা গ্রীক্ বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখাই শিখে নেন এবং শ্রেষ্ঠ ছাত্রেরা এগিয়ে আসেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চর্চায়। অ্যাভিসেনাই ছিলেন এঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান্। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি সম্পূর্ণ কোরাণখানি কণ্ঠস্থ করে ফেলেন। আরবীরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'ভিষক্-রাজ'। তিনি খলিফাদের (কালিফ) গৃহ-চিকিৎসক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং রাজকীয় সাহায্যে বহু দেশ পর্যটন করেছিলেন। তাঁর লেখা একখানি বই বহুদিন পর্যন্ত গ্রীকো-রোমান্ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হ'ত।

ক্রমে আরবীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান পশ্চিম ইয়োরোপ, সিসিলি, দক্ষিণ ইতালী এবং সুদূর স্পেন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। স্পেন তখন মুসলিম মূরেরা অধিকার করে রেখেছে। স্পেনের কোন কোন গ্রন্থকার আরবীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বই ল্যাটিন ভাষায়ও অনুবাদ করে গেছেন। এঁদের মধ্যে জেরার্ডের নাম উল্লেখযোগ্য।

সুমের বা ব্যাবিলনের চিকিৎসা-বিজ্ঞান

সুমেরীয় সভ্যতার কথা এর আগেই বলা হয়েছে। এই সভ্যতা ইরাকে বা মেসোপটেমিয়া থেকে প্রসার লাভ করে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যারা সমতল-ভূমিতে বাস করত তাদের বলা হ'ত সুমেরীয়, আর যারা পাহাড়ে অঞ্চলে থাকত তাদের বলা হ'ত অ্যাক্কেডিয়ান। এদের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা-শিল্পের সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানও প্রসার লাভ করে। প্রাচীনতায় এরা প্রায় মিশরীয় সভ্যতারই সমসাময়িক।

তবে এদের চিকিৎসা-বিদ্যাটাকে খুব অগ্রসর বিদ্যা বলা চলে না। কারণ চিকিৎসার সঙ্গে নানা রকম ইন্দ্রজাল, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি মিশে গিয়েছিল। পুরোহিতরাই চিকিৎসকের কাজ করতেন এবং ভূত, পিশাচ, অপদেবতা ইত্যাদি দূর করবার জন্য তাঁরা সমানে ঝাড়ফুঁক, জলপড়া, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি ওষুধ প্রয়োগ করতেন।

এই সভ্যতা বিকাশ লাভ করে প্রধানতঃ ব্যাবিলনিয়া, ক্যালডিয়া এবং অ্যাসিরিয়া নগরে। ক্রমে য়িহুদী-সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতা মিশে যায়। এদের ইতিহাসে দু'টি ভয়ঙ্কর মহামারীর উল্লেখ পাওয়া যায়—একটি নান্তার প্লেগ, অন্যটি ইডপা বা ছোঁয়াচে-জ্বর।

সুমের দেশের চিকিৎসকদের মধ্যে তিন ধরণের চিকিৎসক ছিল বলে জানা যায়। এক—খাতুমিন। এরা অনেকটা ওঝা জাতের চিকিৎসক, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিই ছিল এদের চিকিৎসা-পদ্ধতি। দুই—আসাফিন। এরা ছিল মন্দিরের পুরোহিত কিন্তু সেই সঙ্গে চিকিৎসাও করত। তিন—চাকামিন। এরাই ছিল সত্যিকারের রোগ-চিকিৎসক।

প্রাচীন চীন দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞান

প্রাচীন চীন হাজার হাজার বছর আগে নানা দিক্ দিয়ে উন্নত হলেও তাদের দেশে সেকালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যে খুব উন্নতি হয়েছিল এমন মনে হয় না; বরঞ্চ সুমেরীয়

চিকিৎসার মতই তাদের মধ্যেও চিকিৎসা-বিছাটা সাধারণতঃ মন্ত্রতন্ত্র, ভূত-তাড়ানো এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে নানা রকম তাগা-তাবিজ, জড়িবুটি ধরণের বিধিও ছিল দেদার।

কিন্তু, এ সব সত্ত্বেও, কিছু কিছু সত্যিকার ওষুধ এবং গাছগাছড়ার বিবরণ আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর আগেকার চীনেও পাওয়া যায়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সম্রাট্ চীন-নঙএর নাম উল্লেখযোগ্য। ন্যু-কিন্

চীন দেশের 'হিপোক্র্যাটিস' চ্যাং-চুং-চিন্

নামে একটা চিকিৎসা-গ্রন্থ হুয়াং-টি দ্বারা আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৬৩৭ অব্দে লিখিত হয়। শল্য বিজ্ঞানের (সার্জারী) দেবতার নাম ছিল ই-কুয়াং-তাই-উওং ; ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের দেবতা ছিলেন যোঃ উওং-চু-স্থ। এ ছাড়া পিএন্-চিয়াওকেও কায়চিকিৎসার (মেডিসিন) দেবতা বলে বলা হ'ত। চ্যাং-চুং-চিন্ ছিলেন চীনের
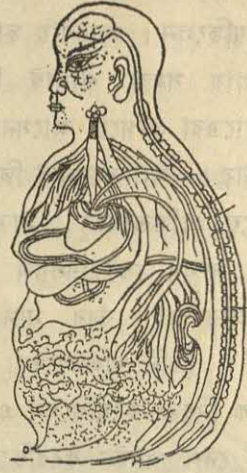
প্রাচীন চীনের চিকিৎসকেরা মনে করতেন আমাদের শরীরের ভিতরকার যন্ত্রপাতি এইভাবে আছে।

খুব নাম-করা একজন চিকিৎসক। তাঁকে বলা হয় "চীন দেশের হিপোক্র্যাটিস্"।

চীন দেশের কয়েকখানি প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থ হচ্ছে এৎস্থং-কিং-কান্, চাস্-সাঙ, চিঙ-চে-চাম্-চিঙ। শেষেরটি ৪০ খণ্ডে বিভক্ত ব্যবহারিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিরাট গ্রন্থ।

সূচীভেদ চিকিৎসার খুব চলন ছিল চীন দেশে। পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে এই প্রণালী প্রায়ই ব্যবহার করা হ'ত। ওষুধপত্রের মধ্যে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস থাকত যা শুনলে আর খেতে ইচ্ছে হবে না। যেমন,—নানা রকম জীবজন্তু, মায় মরা মানুষের নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাংস সিদ্ধ করে তার ক্বাথ। অবশ্য গাছগাছড়ার ওষুধও যথেষ্ট ব্যবহার করা হ'ত। এর মধ্যে মা-হুয়াঙ হচ্ছে আধুনিক এফেড্রা,—যা আজও সমস্ত পৃথিবী যুড়ে ব্যবহার করা হয়। ওটি কিন্তু চীন দেশ থেকেই আমদানী।

পিএন্-চিয়াও

জাপান দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান

চীন দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানই জাপানে আসে আন্দাজ খৃষ্টপূর্ব ২১৮ অব্দে এবং তখন থেকে ওখানে একই প্রণালীতে ওর পঠন-পাঠন ও প্রয়োগ চলতে থাকে মধ্য যুগের শেষ পর্যন্ত। মৌলিক পরিবর্তন আসে একেবারে আধুনিক যুগে—জাপানে বিজ্ঞানের আলো প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বলা যেতে পারে। তখন থেকেই জাপানে পূরোপূরি পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চলন হয় এবং তরুণ জাপান এর নানা শাখাতেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা সুরু করে ইয়োরোপের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে যেতে সুরু করে।

চীনের বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ছিলেন হুয়া-টো। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি রাজা জুয়ান কুং-এর দেহে অস্ত্রোপচার করছেন। রাজাকে অন্যমনস্ক রাখার জন্য দাবা খেলায় মাতিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রাচীন আমেরিকায় কি রকম ছিল

কলম্বাসের আমেরিকা আগমনের আগে সে দেশের চিকিৎসা-পদ্ধতি ছিল অতি প্রাথমিক স্তরের—বিশেষতঃ উত্তর আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে। এরই মধ্যে মেক্সিকো-বাসী অ্যাজটেক এবং পেরু-বাসী ইঙ্কাস্‌দের মধ্যে চিকিৎসা-পদ্ধতিটা কিছুটা যুক্তি ও সাধারণ জ্ঞানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে স্প্যানিশরা যখন সে দেশ দখল করল তখন আর তারা সে সবের কোন পুথিপত্র বা সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখে নি—সব ছারখার করে দিয়েছে।

কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, প্রাচীন মেক্সিকোতে হাসপাতাল ছিল, সৈন্যেরা যুদ্ধে আহত হলে তাদের শরীরে অস্ত্রোপচার করার জন্য সার্জেনরা ছিলেন। ওষুধপত্র তৈরী হ'ত গাছ-গাছড়া—এমন কি ধাতব পদার্থ থেকেও। ছোট ছোট অপারেশন, শিরা থেকে রক্ত বার করে দেওয়া ইত্যাদি চিকিৎসারও নাকি চলন ছিল।

স্প্যানিশরা মেক্সিকো জয় করার পর ইয়োরোপের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সে দেশে প্রচলিত হয় এবং ক্রমে গোটা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিহাসের কথা

আসিরিয়া ও ব্যাবিলন

এই বইএর প্রথম খণ্ডে ইতিহাসে আদিপর্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এবারে স্বরু করব তার পরের কাহিনী।

তাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেতিস্ নদী দু'টির উত্তর-পূর্বে আস্থর বলে একটি জনপদে বহু কাল থেকেই সেমিটিক্ গোষ্ঠীর একটি জাতি রাজত্ব করত। তারা হিটাহিট্দের শিল্পকলা, ব্যাবিলনের লিপিমালা ও অন্যান্য বহু জাতির কাছ থেকে জীবনযাত্রার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিল। আস্থর নামে সূর্যদেব ও ইশ্তার নামে এক দেবীর আরাধনা করত তারা। খৃষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে আস্থরের রাজা প্রথম সালামানসিয়র ব্যাবিলন অধিকার করেন এবং হিটাহিট্দেরও বিতাড়িত করে দেন। এর প্রায় দেড়শ' বছর পরে রাজা টিগ্লাথ্ পিলেসের হিটাহিট্ রাজ্যের আরও কিছু অংশ জয় করেন ও সিদন ও বিব্লস্ শহর দু'টিই দখল করেন। আসিরিয় এই রাজার শখ ছিল বন্য বৃষ, হাতী আর সিংহ শিকার। তা ছাড়া নানা দেশের জীবজন্তু সংগ্রহের বাতিক ছিল তাঁর।

এরপর যাঁর নাম করতে হয় তিনি হচ্ছেন রাজা অস্থরনাসির পাল। সুশাসনের জন্যই তাঁর খ্যাতি। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রাজা সম্রাট্ অস্থরবাণীপাল। এঁর রাজত্বকালে আসিরীয় সভ্যতা উন্নতির চরম পর্যায়ে উপস্থিত হয়েছিল। এঁর ছিল বই পড়ার শখ। ইনি একটি বিরাট গ্রন্থাগার গড়ে তুলেছিলেন, তাতে বই ছিল বাইশ হাজার। বই বলতে কাগজের বই মনে কর না যেন, সে বই ছিল

সিংহ শিকার : আসিরিয়া
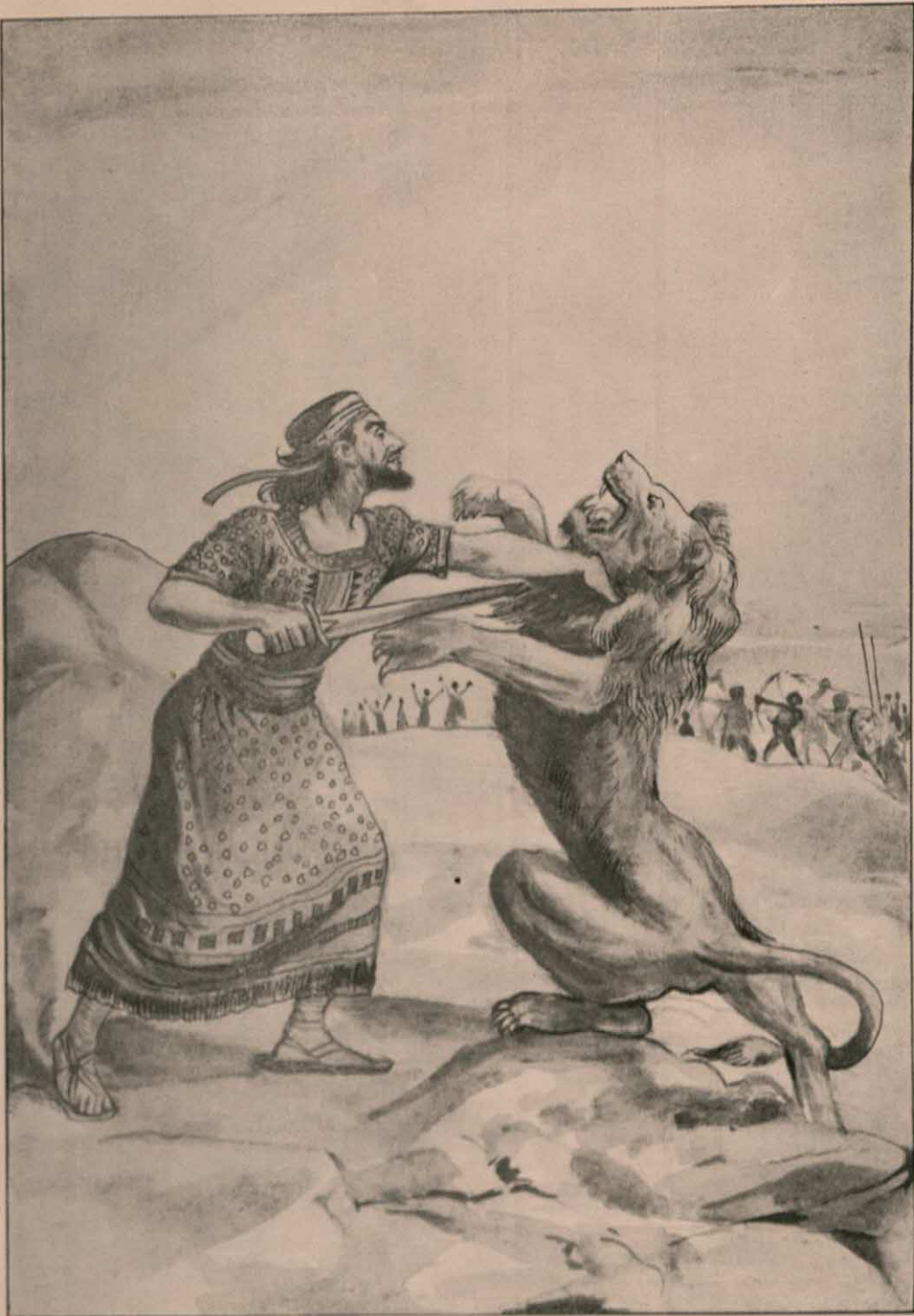
আসিরিয় রাজা টিগ্‌লাথের সিংহ শিকার

—ইতিহাসের কথা : পৃঃ ৫৬০

অসুরনাসিরপাল

আসুর নগর
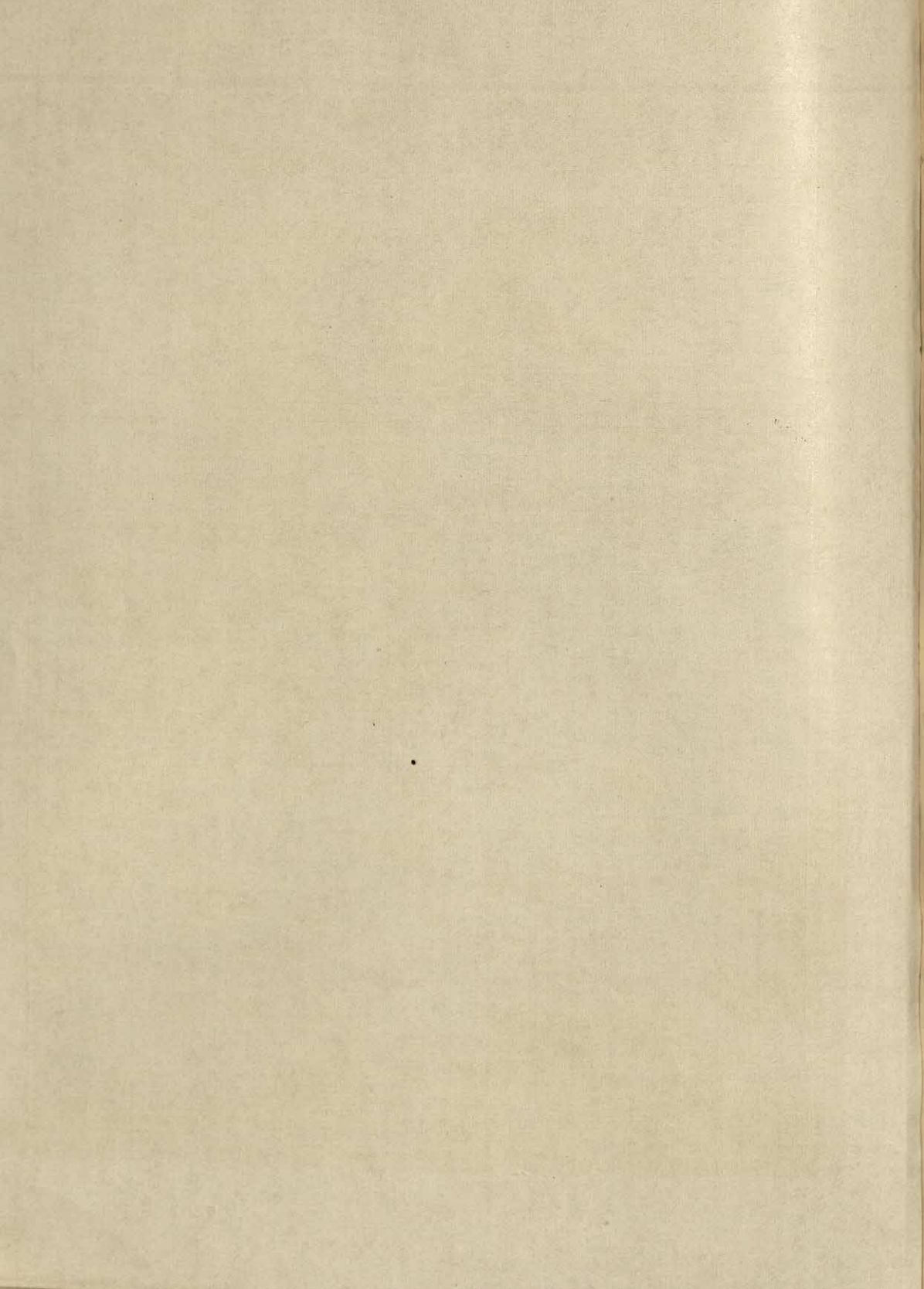
কাদামাটির টালি দিয়ে তৈরী। অসুরবাণীপালের মৃত্যুর পরে কল্‌দীয় ব্যাবিলনীয় আক্রমণে তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে কল্‌দীয় বা নব-ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। আসিরীয়রা ছিলেন যোদ্ধার জাতি। কঠোর আইনকানুনই ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য। তবে বর্তমানের পৃথিবী একদিক্ দিয়ে আসিরীয়দের কাছে গভীর ঋণী বলা যায়। তাঁরা যে সব লিখিত বিবরণ রেখে গেছেন তা থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও প্রাচীন ইতিহাসের বহু খবরাখবর পাওয়া গেছে। গ্রীক্‌রাও জ্যোতি-র্বিদ্যার জন্যে এঁদেরই বিবরণের সাহায্য নিয়েছিলেন।

কিন্তু শুধুমাত্র যুদ্ধের উপর ভিত্তি করে যে কোন সাম্রাজ্য বড় হতে পারে না তাও আমরা এঁদেরই কাছে শিখতে পারি। এখানকার রাজারা ক্রমে এমন অত্যাচারী হয়ে ওঠেন যে তাঁদের সহানুভূতি দেখাবার কেউই ছিল না। ফলে রাজা নবপ্লাসার সপ্তম খৃষ্টপূর্বাব্দে আসিরীয়দের ধ্বংস করে দেন।
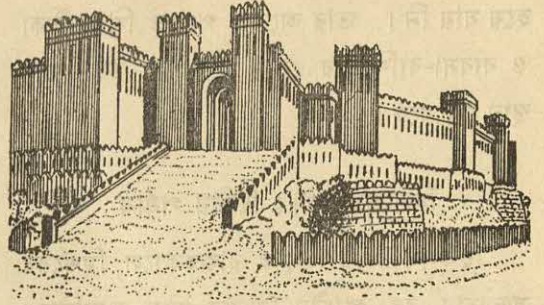
এঁরই ছেলে হচ্ছেন নেবুকাদ্‌নাজার। তাঁর নাম হয়তো তোমাদের অজানা নয়। ইনি মিদীয়দের সাহায্য নিয়ে মিশরীয় বাহিনীকে পরাস্ত করেন ও জেরুসালেম লুণ্ঠন করে বহু ইহুদীকে ব্যাবিলনে নিয়ে যান বন্দী করে। ব্যাবিলনের বিশ্ববিখ্যাত অপূর্ব কারুকাজ-করা ইশ্‌তার্ তোরণ, মারদুক দেবের মন্দিরের রাজপথ ও ধাপে-ধাপে-উঠে-যাওয়া বাগান (শূন্যোদ্যান) দিয়ে সাজানো বিখ্যাত প্রাসাদ এঁরই কীর্তি। এঁর রাজত্ব অবসানের পর শক্তিমান্ পুরোহিতগোষ্ঠী নাবোনিদাস নামে একজন শান্তিপ্রিয় পণ্ডিতমনা লোককে ব্যাবিলনের রাজ্যভার দেন কিন্তু রাজ্য শাসনে অবহেলার ফলে ও নানা জাতির আক্রমণে ব্যাবিলন ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যরাজ কুরুষের আক্রমণে এরা পরাজয় স্বীকার করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্যাবিলন আসুরের মত একেবারে নিশ্চিহ্ন

হয়ে যায় নি। তার অনেক পরেও শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

মিশরের কথা ঃ দ্বিতীয় পর্যায়

হিক্‌সস্ উপজাতিদের রাজত্বকালে মিশরের সভ্যতার বহু প্রাচীন নিদর্শন ধ্বংস হয়েছিল। অবশেষে থিবিস ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজারা বিদ্রোহ করে তাদের সীরিয়ায় তাড়িয়ে দেন।

অষ্টাদশ রাজবংশের যুগে মিশর গৌরবের চরম শিখরে ওঠে। মিশরীয় বীর, দেশপ্রেমিক যোদ্ধা 'অপনার পুত্র আহমেস্'-এর বিবরণ থেকে এ সময়কার অনেক কথা জানতে পারা যায়। সামান্য অবস্থা থেকে এই লোকটি মিশর দেশের মহানাবিকের পদ লাভ করেন ফারাও প্রথম আমেন্‌হোটেপের শাসনকালে। এই বংশের রাজা থথ্‌মেসের কন্যা হাত্‌শেপ্‌সুত দ্বিতীয় ও তৃতীয় থথ্‌মেসের সময় পর্যন্ত প্রভূত ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। মিশরের ফারাওরা এই সময়ে সীরিয়া ও পালেস্তিন (প্যালেস্টাইন) দখল করেছিলেন। দ্বিতীয় আমেন্‌হোটেপ, চতুর্থ থথ্‌মেস্ ও তৃতীয় আমেন্‌হোটেপ্ এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা। এঁদের মধ্যে শেষ জনের রাজত্বকালটি খুবই মূল্যবান্, কারণ 'টেল্-অল্-আমারণা' ফলকাবলী নামে পরিচিত তৃতীয় আমেন্‌হোটেপ্‌কে লেখা যে সব চিঠি পাওয়া গেছে তা থেকে মিশরের এই সময়কার জীবনযাত্রা বুঝতে পারা যায়। এই তৃতীয় আমেন্‌হোটেপ্‌ই লাক্সরে মন্দির এবং থিবিসের প্রান্তরে নিজের বিরাট প্রতিমূর্তি তৈরী করিয়েছিলেন।

এর পর চতুর্থ আমেন্‌হোটেপ। ইনি রাজত্ব লাভের চার বছর পরে প্রত্যক্ষ সূর্যের দেবতা 'আতন'-এর উপাসক হয়ে ওঠেন। অনেক

দ্বিতীয় রামেসেস্

ঐতিহাসিক মনে করেন যে ইনিই পৃথিবীর প্রথম একেশ্বরবাদী। ইনি নিজের নাম পরিবর্তন করে আখেন্-আতন্ নামে পরিচিত হন। থিবিসের আমন দেবের পুরোহিতরা কিন্তু তাঁদের পুরোনো ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করার জন্য এই বিদ্রোহী ফারাওকে দেখতে পারতেন না। ফলে এঁর স্বল্পকালস্থায়ী রাজত্বের শেষে, বিশেষ করে তুথ-আন্‌খ-আমনের রাজত্বকালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আখেতাতন শহর ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তুথ্-আন্‌খ-আমন মারা গেলে প্রথমে আতন, পরে আমনের কুচক্রী পুরোহিত আয়ী এবং তার পরে তুত-আনখ্-আমনের সৈন্যাধ্যক্ষ হোরেম্‌হেবের শাসনে মিশরে সমৃদ্ধি ফিরে আসে।

এর পরে মিশরে ঊনবিংশ রাজবংশের সেতেখি, দ্বিতীয় রামেসেস্ ও মেরেনেপ্টাহ্ এই তিন জন উল্লেখযোগ্য রাজা হিটাহিট্‌দের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্থায়ী শান্তির সৃষ্টি করেন ও লিবিয়ার বিদ্রোহকেও দমন করেন। সেতেখির থিবিস্ শহরের নিকটস্থ প্রায় তিনশ' ফুট উঁচু পাহাড়ে খোদিত কবর, দ্বিতীয় রামেসেসের আবু সিম্বেলের মন্দির ও বিদেশী আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য নীলনদের ব-দ্বীপ অঞ্চলে তানিস্ শহর স্থাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যায়।

বিংশ রাজবংশের একমাত্র ফারাও তৃতীয় রামেসেস সীরিয়ার যুদ্ধে ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বাণিজ্য করে কিছুটা নাম করেছিলেন কিন্তু রামেসেস নামধারী এই বংশের বাকী রাজারা ছিলেন অকর্মণ্য। একবিংশ রাজবংশের আমলে মিশর শক্তিহীন হয়। দ্বাবিংশ রাজবংশে একমাত্র প্রথম শেশান্‌কের নাম করা যেতে

ফারাও নেথ্‌ত্ নিবেফ্

পারে। ইনি জেরুসালেম ও অন্যান্য কয়েকটি শহর জয় করে প্রভূত ধনরত্ন লাভ করেন।

এর পর একে একে আরও কয়েকটি রাজবংশের রাজত্বের পর গ্রীক্‌রা ধীরে ধীরে মিশরে ঢুকে পড়ে। ফারাও কৌশলে তাদের আলাদা করে দেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদেশীদের দূরে সরিয়ে রাখা যায় নি। নতুন-সৃষ্টি-হওয়া পারস্য দেশের বিপুল সাম্রাজ্যের সম্রাট্ কম্বুজীয় বা ক্যামবাইসেস্ চতুর্থ প্‌সাম্‌টেক্‌কে পরাজিত করে মেম্‌ফিস্ শহর দখল করেন এবং মিশরের অধীশ্বর হন। চতুর্থ প্‌সাম্‌টেক্ পারস্য রাজ-দরবারে থেকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। কম্বুজীয়র পরে দরয়বহুষের শাসনে মিশরের আরও অনেক উন্নতি হয়।

দরয়বহুষের পরে মিশরে দলাদলি সুরু হয়। মাঝে দিন কয়েক শান্তিতে কাটলেও শেষ রাজা ফারাও দ্বিতীয় নেখ্‌তানোয়া বা নেখ্‌ত্-নেবেফ্ পারসীকদের কাছে পরাজিত হয়ে ইথিওপিয়ায় পালিয়ে যান। তারপর আলেকজান্দারের আক্রমণের পরে টোলেমীয়দের বংশ থেকে রোমান্‌দের আমল পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসের এই সুপ্রাচীন ও সুসভ্য দেশের উপর যে শোষণ চলে তা শুনলে মন বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষ ঃ সিন্ধু সভ্যতার কথা

মিশর থেকে আমরা এবার চলে আসছি আমাদের নিজেদের দেশ ভারতবর্ষে।

এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে পারস্যের মালভূমির গায়ে-লাগা বালুচিস্থানের পাহাড়ী অঞ্চলের গ্রামগুলিতে মানুষের

বসবাসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এরা চাষবাস করতে ও মাটির পাত্র তৈরী করতে পারত। তামার তৈরী হাতিয়ারও ব্যবহার করত। আরও পূর্বে সমতলভূমিতে বয়ে চলেছে সিন্ধুনদ। এখানেই আবির্ভাব হয় পৃথিবীর এক বিরাট সভ্যতার। বালুচিস্থান, সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজস্থান ও গুজরাটের বিশাল অঞ্চলে এর নানা নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খুঁজে পেয়েছেন। সিন্ধুর মহেন্‌জোদাড়ো ও চানহুদাড়ো, পশ্চিম পাঞ্জাবের রাভীর তীরবর্তী হরপ্পা ও গুজরাটের লোথাল নামক জায়গায় যে বড় বড় নগর ও বন্দর খুঁড়ে বার করা হয়েছে তা দেখলে অবাক্ হতে হয়।

মহেন্‌জোদাড়ো ও হরপ্পা এই দু'টি শহরের চৌহদ্দী ছিল তিন মাইলেরও বেশী। শহরের রাস্তা সব পূব-পশ্চিম আর উত্তর-দক্ষিণে পরস্পরকে অতিক্রম করে গেছে। রাস্তার তলায় নোংরা জল যাবার নালা টালি দিয়ে ঢাকা। কাদা, বালিমাটি ও খড়িমাটি বা জিপসামের মশলা দিয়ে শক্ত করে গাঁথা একতলা, দোতলা ইটের বাড়ী—উঠোন, স্নানঘর ও রান্নাঘর ভিতর দিকে, বাইরে দোকান-পশারের ঘর। পাড়ায় পাড়ায় প্রহরীদের জন্য শাস্ত্রীঘর, পাতকূয়া আর স্নান করবার জন্য ইট-বাঁধানো পুকুরের ব্যবস্থা। সত্যি, অবাক্ হবার মতই।

মহেন্‌জোদাড়োর শস্যাগার (ধ্বংসাবশেষ দেখে কাল্পনিক চিত্র)

এই সভ্যতার লোকেরা তামা, ব্রোঞ্জ, সোনা-রূপা প্রভৃতির ব্যবহার জানলেও লোহার ব্যবহার জানতেন না। ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজনের জন্য বাটখারা ব্যবহার করতেন। সুন্দর কার্পাস কাপড় বুনতে পারতেন। দক্ষিণ সুমেরের লার্‌সা নগরীতে পাওয়া উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে যে পারস্য
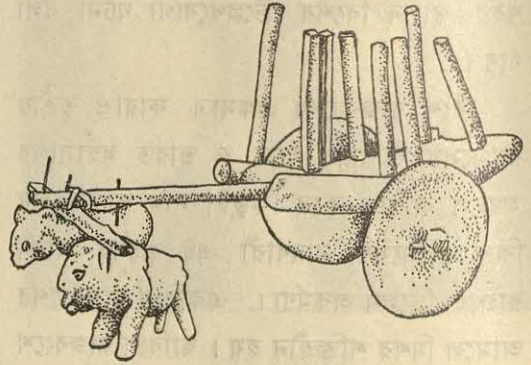
মহেন্‌জোদাড়োয়-পাওয়া খেলনা-গাড়ী

উপসাগরের বাহরিণ দ্বীপাঞ্চল থেকে ও মাকান বা মেল্‌লূহা থেকে তাদের দেশে অনেক জিনিস-পত্র আমদানী হ'ত। মনে হয় যে ঐ বিবরণে এই সিন্ধু সভ্যতার কথাই বলা হয়েছে। সিন্ধুনদ ও তার আশে-পাশের এই সভ্যতার অন্যতম বিস্ময় ছিল এর বিভিন্ন শস্যাগার। এই শস্যাগারগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে শস্য বহুদিন ধরে অবিকৃত রাখার জন্য হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থাও ছিল। মহেন্‌জোদাড়ো ও হরপ্পার দুর্গ, বিরাট নগর-প্রাচীর ও লোথালের মস্ত বড়
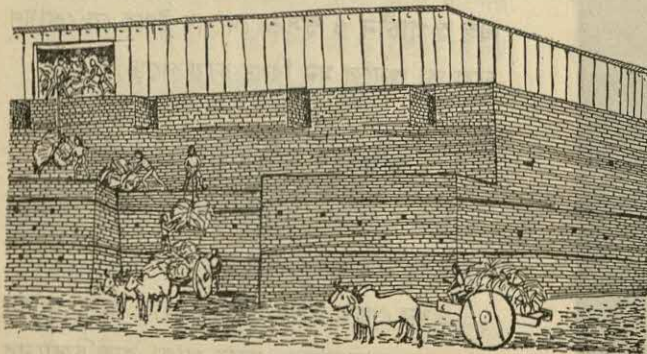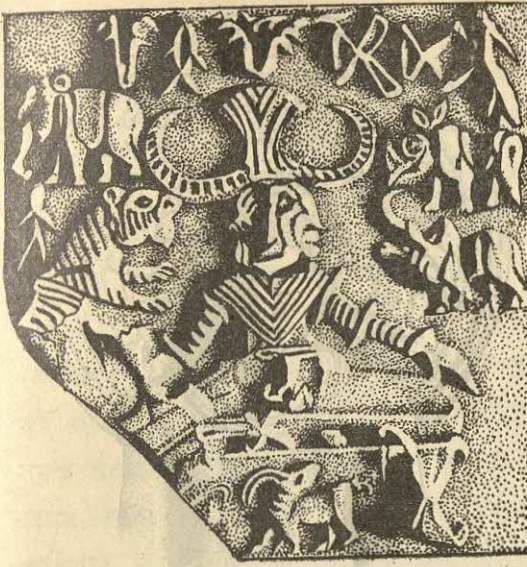
দেবমূর্তি—মহেন্‌জোদাড়ো

পোতাশ্রয় আজও আমাদের আশ্চর্য করে দেয়।

এখানে জাঁকজমক হয়তো তেমন ছিল না কিন্তু শিল্পসৃষ্টি ছিল অতি সুন্দর। পোড়া মাটির মূর্তি, ষ্টিয়াটাইট্ বা নরম চূণাপাথরের
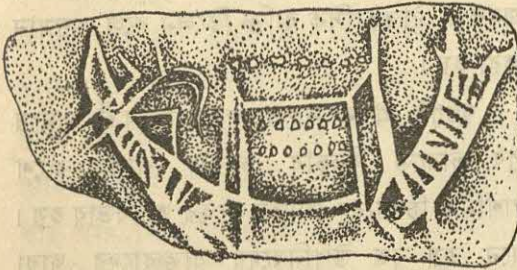
বাণিজ্যপোত, মহেন্‌জোদাড়ো

খোদাই সীলমোহর, ব্রোঞ্জের তৈরী মানুষ, ষাঁড় ইত্যাদির মূর্তি, এমন কি ছোটদের জন্য খেলনা-গাড়ী, পিছনে-গর্ত-করা পাখীর আকারের বাঁশী, দড়ির টানা-পোড়েনে নামা-ওঠা বাঁদর—এই সব জিনিস পাওয়া গেছে। কোন কোন সীলমোহরে রয়েছে চারদিকে জন্তু-জানোয়ার, মাঝখানে দেবমূর্তি, হাতী, ষাঁড়, গণ্ডার প্রভৃতি জন্তুর ছবি। খুব সুন্দর ভাবে খোদাই করা এক ধরণের চিত্রলিপি এই সীলমোহরে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তার অর্থ আজও আবিষ্কৃত হয় নি। অশ্বত্থ পাতা, শামুক, গাছগাছালির নক্সা-দেওয়া কাল্‌চে-লাল রংয়ের ওপর কালো রং-এ আঁকা পোড়ানো মাটির পাত্রও এই সভ্যতার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি থেকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যকালের এই সভ্যতা কি করে ধ্বংস হয়ে গেল তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। বার বার বন্যা ও বাইরে-থেকে-আসা শত্রুর আক্রমণ—এই দু'টি কারণেই বোধ হয় এই সভ্যতার সমাপ্তি ঘটেছিল। কেউ কেউ এই বাইরের শত্রু বলতে প্রাচীন ভারতের যাযাবর আর্য জাতির দল মনে করেন।

বৈদিক ও মহাকাব্যের যুগ

মহেন্‌জোদাড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি সিন্ধু সভ্যতার বা হরপ্পীয় সভ্যতার বিরাট নগরগুলি ধ্বংস হয়ে যাবার পর কি হ'ল জানতে তোমাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছা হচ্ছে। পণ্ডিতেরা অনেক সময়েই ভাষার মিল ও অন্যান্য প্রমাণ দেখেই একটি প্রাচীন জাতির পরিভ্রমণের পথটি নির্ধারণ করে থাকেন। ঠিক এই ভাবেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে অতি প্রাচীনকালে আর্যভাষাভাষী একটি জাতিগোষ্ঠী খৃষ্টপূর্ব দু'হাজার থেকে দেড় হাজার বছরের মধ্যে

উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে ও ধীরে ধীরে পাঞ্জাব ও রাজস্থানের কতকটা এবং উত্তরপ্রদেশ ও বিহার প্রভৃতি হয়ে সমস্ত উত্তর ভারতে ও পরে প্রায় সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন পারস্যের আর্যভাষাভাষী গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের জীবনযাত্রার অনেক সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেছে।

বিদেশ-থেকে-আসা এই আর্যরা সভ্যতায় সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের মত অতটা উন্নত ছিলেন না। তাঁরা শহরে বাস করতে বা লিপির ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন যাযাবর। পশুপালনই ছিল তাঁদের প্রধান উপজীবিকা। ঘোড়ায় চড়ে গরু-ভেড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তবে ঘোড়ায় টানা রথও ব্যবহার করতে শিখেছিলেন।

বেদের কথা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের কথা তোমরা আগেই পড়েছ। বেদের যুগে আর্যভাষী উপজাতিরা ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের আরাধনা করতেন। তখন তাঁরা যাযাবর জীবন থেকে নির্দিষ্ট স্থানে বসতি গড়তে শিখেছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে এঁদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। নিজেদের মধ্যেও যে হ'ত না তা নয়। সভা ও সমিতির সাহায্যে বৈদিক জনগোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন রাজাদের দ্বারা শাসিত হ'ত। তবে তখনও কৃষিকাজ ও পশুচারণই ছিল সব চাইতে ব্যাপক উপজীবিকা।

বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে কুরু ও পাঞ্চাল-দের কথা জানতে পারা যায়। মহাভারতের যুদ্ধের কথা এর পরবর্তী সময়ের বলেই অনুমিত হয়ে থাকে। মহাভারতের মত আর একটি মহাকাব্য রামায়ণে আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণে

বুদ্ধদেব

আর্য সভ্যতার বিস্তারের একটি চিত্র দেখতে পাই। এর পরে মধ্যদেশে রাজা পরীক্ষিৎ ও তাঁর বংশধর জনমেজয়ের কথাও জানতে পারি। বিদেহ বা বিহার সীমান্তের দার্শনিক রাজা জনকও ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ব ভারতে লিচ্ছবি গোষ্ঠীর শাক্য বংশে দার্শনিক চিন্তাবিদ্ গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। মনে হয় বুদ্ধ উপনিষদের যুক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তারই ফলে তিনি সমস্ত রকমের সামাজিক বিভেদ, বর্ণাশ্রম ও নিষ্ঠুরতাকে পরিহার করে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় আপন মতামত প্রচার করতে থাকেন। জৈন ধর্মের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরও এই সময়ে পূর্ব ভারতে আবির্ভূত হয়ে তাঁর

ধর্মমত প্রচার করেন। বুদ্ধ ও মহাবীরের আগের যুগটিতে বর্ণাশ্রম অর্থাৎ ভারতীয় সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই ভাবে ভাগ করে যে বিভেদ স্বুরু হয়েছিল বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সম্ভবতঃ তারই প্রতিবাদ।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গন্ধার অঞ্চল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট্ কুরুষ জয় করে নেন এবং সিন্ধু নদের পশ্চিম পারের সমস্ত অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথম দরয়বহুষের সময়ে পারস্য-বাহিনী পাঞ্জাব অধিকার করে এবং পারসীকেরা এই সমৃদ্ধ অঞ্চল হতে বিরাট কর আদায় করতে থাকে। কিন্তু ক্ষয়ার্সের পর থেকে পারসীক-অধিকৃত অঞ্চল ক্রমশঃ ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

মৌর্য যুগের কথা

মাসিদনের দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ একটি বড় ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও এদেশের ইতিহাসে তার ফল সামান্যই দেখা গেছে। শুধু মাত্র পশ্চিম প্রান্তের অধিবাসীরাই যে বিদেশী অভিযানকারীর বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করেছিল তাই নয়, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যেই কূটবুদ্ধি ও স্বদেশপ্রেমিক চাণক্য বা কৌটিল্যের সহযোগিতায় পূর্বদেশের অসমসাহসী যুবক চন্দ্রগুপ্ত মগধের নন্দ রাজ-বংশকে যুদ্ধে হারিয়ে ক্রমে ক্রমে সমস্ত উত্তর ভারত জয় করে ভারতীয় সভ্যতাকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্দারের সেনাপতি সেলুকস্‌কে যুদ্ধে প্রতিহত করে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করেন। ঐ সময়ে সেলুকসের রাজদূত মেগাস্থিনিস মৌর্য রাজ-দরবারে থেকে সেই সময়কার ভারতীয় সভ্যতা যে কত উন্নত ও ভারতীয়দের সংস্কৃতির মান কি রকম উঁচু ছিল তার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। কিন্তু মৌর্য বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও গোটা এশিয়ায় বিখ্যাত ছিলেন তাঁর পুত্র রাজা অশোক। তোমরা নিশ্চয়ই কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে অনুতপ্ত অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের গল্প শুনেছ। সুদূর গন্ধার দেশ, মানে এখনকার পূর্ব আফগানিস্থান থেকে মহীশূর ও পশ্চিমে গুজরাট থেকে উত্তর বঙ্গ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে অশোকের স্থাপিত স্তম্ভ, শিলালিপি ও শিল্প-নিদর্শন তাঁর বিরাট প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে।

মৌর্য রাজাদের আমলে গঙ্গাতীরবর্তী পাটলিপুত্র ছিল রাজধানী। পাটনার নিকটবর্তী বুলন্দীবাগ ও কুমরাহার নামক দু'টি জায়গায় এ সময়ের বহু আশ্চর্যজনক ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে বহু মসৃণ পাথরের স্তম্ভ দিয়ে তৈরি মৌর্য রাজসভার নিদর্শনটি আকর্ষণীয়। পাটলিপুত্রের চারদিকে কাঠের তৈরি সুদৃঢ় প্রাচীর ছিল। মৌর্যযুগে ভারতীয় মূর্তিশিল্প ও স্থাপত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। অশোক-স্তম্ভগুলির কোনটার উপরে ছিল এক বা একাধিক সিংহ, হাতী, ষাঁড় ও অন্যান্য ছোট আকারের জন্তু-জানোয়ারের ছবি, আর ছিল অপূর্ব মসৃণ পালিশ যা এখনও পর্যন্ত একটুও নষ্ট হয় নি।

মৌর্য আমলে বহির্ভারতের সঙ্গে এ দেশের যথেষ্ট সম্পর্ক ছিল। অশোক পশ্চিম এশিয়ার রাজ-দরবারগুলিতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দূত পাঠিয়েছিলেন। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারও অশোকেরই উৎসাহের ফল।

শুঙ্গ-কান্ব-সাতবাহন

অশোকের পরের মৌর্য রাজারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়েন। তারই সুযোগ নিয়ে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্যমন্ত্রী পুষ্যমিত্র শুঙ্গ-স্থাপিত শুঙ্গ বংশ ও তারপরে কান্ব বংশ উত্তর ভারতের অনেকটা জায়গায় রাজত্ব সুরু করে। দক্ষিণে রাজত্ব করতে থাকে পরাক্রান্ত সাতবাহন রাজ-বংশ। এ সময়ের রাজারা ধর্মে হিন্দু হলেও তাঁরা বৌদ্ধধর্মের সৌধ ও মঠাদি স্থাপনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নি নিষ্ঠুর ভাবে। এই সময়ের ভারতীয় শিল্পকলা মধ্যভারতের ভারহুত, সাঁচী প্রভৃতির স্তূপ ও তার সুন্দর অলঙ্করণের জন্য বিখ্যাত। ভারহুত, বোধগয়া ও সাঁচী স্তূপের চারিদিকে বুদ্ধের জীবনের বহু কাহিনীকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই চিত্রগুলি
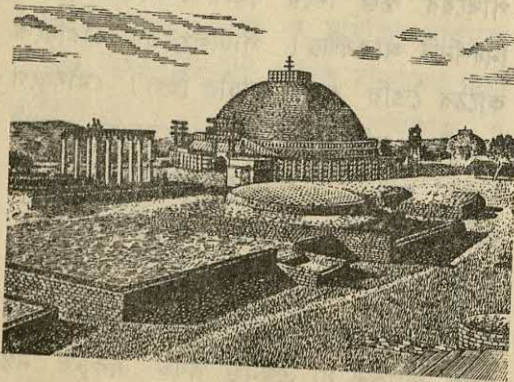
সাঁচী স্তূপ

দেখলে আমরা তখনকার ভারতের জনাকীর্ণ শহর, কাঠের বাড়ী, লোকজনের বেশভূষা ও জীবনযাত্রার একটা ধারাবাহিক ছবি পাই। উত্তরের মতই অন্ধ্রদেশের কৃষ্ণা-গোদাবরী নদীর মোহনার কাছাকাছি জায়গায় প্রথম দিকের ও পরবর্তীকালের সাতবাহন রাজারা জগ্‌গয়পেটা,
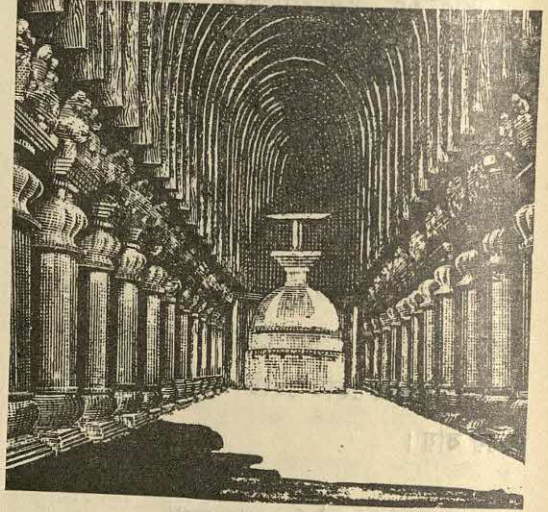
কার্‌লা চৈত্য

নাগার্জুনকোণ্ডা, অমরাবতী প্রভৃতি স্থানে আরও স্তূপ, মঠ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম ভারতের পাহাড়-কেটে-তৈরী গুহা ভাজা ও বোম্বাই শহরের নিকটস্থ কার্‌লারও নাম করা যেতে পারে।

খারবেল

এর কিছু পরেই কলিঙ্গ দেশে খারবেল নামক একজন অতি পরাক্রান্ত জৈনধর্মাবলম্বী রাজার উত্থান হয়। ইনি পুরোনো মৌর্য রাজ্যের অনেক অংশ জয় করেছিলেন। ওড়িষার ভুবনেশ্বরের কাছে হাতীগুম্ফায় এঁর একটি

বিখ্যাত শিলালিপি আছে। খারবেলের রাজ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময়ে জৈন সাধুদের জন্য পাহাড় কেটে কয়েকটি গুহা তৈরী করা হয়। এর মধ্যে রাণীগুম্ফা, হাতীগুম্ফা প্রভৃতি বিখ্যাত এবং এর কয়েকটি স্থানে সুন্দর ভাস্কর্যকলার নিদর্শন আছে।

ভারতীয়-গ্রীক রাজ্য

উত্তর-পশ্চিম ভারতে মৌর্যদের পরবর্তীকালে এই রাজ্য গড়ে ওঠে। এই রাজাদের কথা আমরা প্রধানতঃ তাঁদেরই ছবি-আঁকা মুদ্রা থেকে জানতে পারি। এঁদের মধ্যে ব্যাক্ট্রিয়ার রাজা ইউথিদেমস্‌এর পুত্র দিমিত্রিওস পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন। তক্ষশিলার অন্তিয়লকিদস, সকল বা বর্তমান শিয়ালকোটের মিনান্দার বিখ্যাত ছিলেন। এই গ্রীক্ রাজাদের অনেকে বৌদ্ধধর্মে ও ভারতীয় জীবনযাত্রার দিকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের ও এঁদের পরবর্তী রাজাদের রাজত্বকালে পশ্চিমী ভাবধারা অনুসরণ করে এক মূর্তিশিল্প গড়ে ওঠে। নীলচে পাথর দিয়ে তৈরী এই ভাস্কর্য গন্ধার শিল্পকলা নামে পরিচিত। প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্মের ও বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা এই শিল্পে স্থান পেয়েছে।

কুষাণদের কথা

মৌর্য, শুঙ্গ প্রভৃতি রাজবংশের পর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া থেকে এক যাযাবর জাতি ভারতে রাজত্ব বিস্তার করে ও ক্রমে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে মিশে যায়। কুজুল, কদ্‌ফিসিস, কণিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি কুষাণ রাজারা ভারতে ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সম্রাট্ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কুষাণরা প্রায় মধ্য এশিয়া থেকে সুরু করে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার অধিকাংশ স্থানেই তাঁদের অধিকার বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারতের পুরুষপুর বা বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত পেশোয়ার ও যমুনা-তীরবর্তী মথুরা নগরী শিল্পসমৃদ্ধিতে উন্নত হয়ে উঠেছিল। 'বুদ্ধচরিতে'র লেখক অশ্বঘোষ কণিষ্কের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন।

গুপ্তযুগের কথা

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত সময়টা ভারতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি স্বর্ণ-যুগ। মহাকবি কালিদাসের কাব্য, বরাহমিহির ও আর্যভট্টের বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পশাস্ত্রের গ্রন্থ বিষ্ণু-ধর্মোত্তরম্, বাৎসায়নের রচনাবলী সবই এই

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা

কালের বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, স্কন্দগুপ্ত —এই সব অসামান্য ও পরাক্রান্ত গুপ্ত রাজারা

অজন্তাগুহার প্রবেশদ্বার

শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশ-থেকে-আসা উপজাতিদের লোলুপ আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করেছিলেন। উত্তর ভারতে যখন গুপ্ত রাজারা রাজত্ব করতেন তখন দক্ষিণ দেশে বাকাটক নামে এক পরাক্রান্ত রাজবংশের উদ্ভব হয়। উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ শহরের একটি স্তম্ভলিপিতে আমরা গুপ্ত রাজাদের প্রবল পরাক্রমের কথা জানতে পারি। ঝাঁসি জেলার দেওগড় মন্দির এবং কানপুরের ভিতরগাঁও মন্দিরে পোড়ামাটির কারুকার্য ও মূর্তিশিল্প, বারাণসী শহরের রাজঘাট, এলাহাবাদের নিকটস্থ কৌশাম্বী, বারাণসীর অদূরে অবস্থিত বৌদ্ধধর্মক্ষেত্র সারনাথ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এবং মথুরা নগর থেকে এই সময়কার অনেক সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধ ও হিন্দুমূর্তি পাওয়া গেছে। পৃথিবী-বিখ্যাত অজন্তার গুহাচিত্র এই সময়ের। প্রায় সমসাময়িক কালেই বাঘগুহার চিত্র ও দক্ষিণ ভারতে সিত্তনভাসাল গুহাচিত্র অঙ্কিত হয়। এই সময়কার উত্তর বঙ্গের মহাস্থানগড় ও বাণগড় থেকেও বেশ কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন পাওয়া গেছে। ভাগলপুর জেলার সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত অপূর্ব ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তিও এই সময়কারই।

গুপ্ত রাজারা প্রথমে পাটলিপুত্র ও পরে উজ্জয়িনী নগরীকে তাঁদের রাজধানী নির্বাচিত করেছিলেন। এঁরা যে সমস্ত স্বর্ণ এবং রৌপ্যমুদ্রা তৈরী করিয়েছিলেন সেগুলি কারুকাজ ও সৌন্দর্যের দিক্ দিয়ে অতুলনীয়। এর কোনটাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ধ্বজার সামনে যূপাশ্ব দাঁড়িয়ে আছে, কোনটাতে সমুদ্রগুপ্তের মত কোনও রসিক সম্রাট্ বীণা বাজাচ্ছেন, কোথাও বা ভীষণাকৃতি সিংহ শিকার করতে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। এই রকম কত কি।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরে মান্দাসোরের যশোধর্মন নামক রাজা উত্তর ভারতে বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করে হূণ রাজা মিহিরকুলকে পরাজিত করেন। এর পরে উত্তরের মৌখরি, কলচুরি ও দাক্ষিণাত্যের পল্লব, চালুক্য প্রভৃতি রাজবংশ পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

বিশ্বমুখীন্ ভারত

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি আক্কাদের সারগনের সময়ে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার যে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল সেটি ইহুদী দেশের রাজা সলোমন ও টায়ারের রাজা হিরামের সময়েও অক্ষুণ্ণ থাকে। মৌর্যযুগ থেকে কুষাণ রাজত্বের

অবসান-কালের মধ্যে ভারতের সঙ্গে বহু দেশের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। টোলেমীর ভৌগোলিক বিবরণে ও গ্রীক্ নাবিকদের বৃত্তান্তে ভারতের সঙ্গে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা জানতে পারা যায়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক প্রভাবও এই সময়েই প্রথম দেখা দিয়েছিল। ব্রহ্মদেশ, জাভা, ইন্দোচীন উপ-দ্বীপের কম্বোডিয়া, চম্পা ও অন্যান্য স্থানে এই সময়ে ভারতীয়রা—প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারত, বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গ থেকে গিয়ে ব্যবসায় ও বসতি স্থাপন করেছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের সমুদ্রগামী বন্দর তাম্রলিপ্তির কথাও এই সময়ের বিবরণ থেকেই জানা গেছে। অন্য দিকে আফগানিস্থানের বৃহত্তর অংশে, পূর্ব ইরাণের শীস্তান বা শকস্থানে, উত্তর-পূর্ব দিকের খরতানে ও চীনের সিকিয়াং প্রদেশেও এই সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন স্থান এই সময়ে ভারতীয় নামে সুপরিচিত ছিল।

চীনের কথা

চীনের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সিয়া রাজবংশের কথা জানতে পারি খৃষ্টজন্মেরও দেড় হাজার বছর আগে। এর পরেই উৎপত্তি হয় শাং রাজবংশের। চীন তখন থেকেই সুসভ্য। তারা তামা ও টিন মিশিয়ে বাসনপত্র এবং পূর্বপুরুষদের জন্য সূক্ষ্ম কারুকাজ-করা অর্ঘ্যপাত্র ব্যবহার করত, ঘোড়ায়-টানা রথের ব্যবহার জানত, লিপি বা চীনাক্ষরেরও ব্যবহার ছিল। চীনের নদীগুলি বার বার গতি পরিবর্তন করত। কিন্তু বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করে চাষ-আবাদের উন্নতিও হয়েছিল এই সময়েই।

পাঁচশ' বছর শাং রাজত্বের পর চৌ নামে পরিচিত এক জাতি তাদের নেতা ওয়েন ওয়্'র প্রচেষ্টায় এক বংশ স্থাপিত করে উত্তর-পশ্চিম চীনে। এরা ছ'শ' বছর ধরে রাজত্ব করে। ইতিমধ্যে চীনে ক্রমে ক্রমে লোহার প্রচলন আরম্ভ হয় ও চাষ-আবাদের কাজও খুব বেড়ে যায়। কিন্তু চু, চি, ৎসিন ও চিন এই চারটি রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে নানা যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকে।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে চীনে লাওৎজে নামে এক দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। এরপর আধুনিক চীনের শানটুং প্রদেশের লু নামক এক ক্ষুদ্র রাজ্যের পণ্ডিত কনফুসিয়াস বহু রাজ্য ও দেশ ঘুরে বেড়িয়ে এসে ইতিহাস, লোকাচার, কাব্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করেন। কনফুসিয়াস তাঁর ছাত্রদের লিখন-বিধি, ভাষা ও সাহিত্য, যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি ও দর্শন শিক্ষা দিতেন ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার ওপর জোর দিতেন। সহজ, সাধারণ বুদ্ধি ও যুক্তি-বাদের জন্য ইনি আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন।

কনফুসিয়াসের পরের দু'শ' বছর বহু রাজ্যের ভাঙা-গড়া চলতে থাকে বলে চীনের ইতিহাসে এই সময়টিকে 'যুদ্ধরত রাজ্যের যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। এ সময় অনেক লোহার খনির আবিষ্কার হয়, লোহার হাতিয়ার দিয়ে খাল কেটে জল সেচের ব্যবস্থা হয় এবং চিন্ রাজ্যের মন্ত্রী শাং ইয়াং-এর কৃষিসংস্কারের ফলে সম্রাট চিন্ সম্রাট্ চি হো য়ুয়াংটি তি চীনের প্রথম সম্রাট্ নামে পরিচিত হন খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে।

'যুদ্ধরত রাজ্যের যুগে' মো-ৎসে বা মো-তি

নামে এক মানবপ্রেমিক ও শান্তিপ্রিয় দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। এঁর ছাত্র সুন-ৎসে উল্কাপাত ও গ্রহণ সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন। রাজ্য শাসন হওয়া উচিত রাজ্যের লিখিত আইনের সাহায্যে—এই মত ঘোষণা করায় ইনি স্বেচ্ছাচারী রাজার হাতে নিহত হন। চূ-য়ুয়ান নামে এক কবির কাব্য ও ভেষজবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব নিয়ে কয়েকটি গ্রন্থও এই সময়ে রচিত হয়েছিল। চিন্ রাজ্যের মন্ত্রী লি-সূ চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত লিপিকে নিয়ে সিয়াও-চুয়ান নামে এক সাধারণ লিপিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এই সময়েই মাঝখানে চৌকো গর্ত-করা গোল টাকার প্রচলন হয়েছিল এবং চীনের বিখ্যাত প্রাচীরও নির্মিত হয়েছিল সিউঙ্গ-নূ বা হুণদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। কিন্তু করভারে নিপীড়িত প্রজাদের বিদ্রোহের ফলে চিন্ রাজধানী সিয়েন ইয়াং ধ্বংস হয়ে চিন্‌রাজ্য অবলুপ্ত হয়।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রারম্ভেই লিউ পাং চীনা ইতিহাসে বিখ্যাত হান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ক'রে, ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে, সৈন্যদের দেশের সেবার সুযোগ দিয়ে ও পলাতকদের

ভূমিকম্প-নির্দেশক যন্ত্র : চীন

ক্ষমা প্রদর্শন করে জনপ্রিয় হবার চেষ্টা করেন। এই বংশের ৎসু ও য়ুতি জনকল্যাণকর কাজের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। এই সময়ে চীনের সঙ্গে মধ্যএশিয়ার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক সুসুমা চিয়েন, পিয়াও, পান-কু ও

চুং চিন

পানচাও এই সময়কার নামকরা পণ্ডিত ছিলেন। তোমরা হয়তো শুনেছ যে পৃথিবীতে কাগজ আবিষ্কার হয় প্রথম চীনদেশে। যিনি এই আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর নাম ৎসাই লূন। অনুমান ১০৫ খৃষ্টাব্দে এই আবিষ্কার হয়েছিল। চাংহেং-এর ভূকম্পন-নির্ণয়-যন্ত্র ও চুং চিনের রোগবিদ্যার গ্রন্থ এ যুগেরই সম্পদ্।

ৎসু-চুং-চিহ্

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের গোড়ায় ওয়াং মাং নামক এক যোদ্ধা কিছু দিনের জন্য হান সাম্রাজ্য অধিকার করে রাখেন। কিন্তু অত্যাচার-অবিচারের জন্য এঁর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য স্থায়ী হয়নি এবং পূর্বতন হান বংশের এক উত্তরাধিকারী লিউ সিউ লোয়াং নগরকে রাজধানী করে পরবর্তী হান বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে পান-চাও নামক এক চৈনিক রাজদূত পশ্চিমের দিকে হান প্রভাব ও রাজ্যবিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

হান রাজত্বের অবসানের পর চীন আবার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তৃতীয় শতকে রাজত্ব করে ওয়েই, শূ এবং য়ূ বংশ। ৎসিন বংশ রাজত্ব করে চলে খৃষ্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতকের গোড়ার দিক্ পর্যন্ত। আর উত্তর ও দক্ষিণ চীনে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত চার-পাঁচটি করে ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়।

হান বংশের সময়েই চীন দেশ তার যথার্থ সভ্যতার ভিত্তিটি তৈরী করে নেয়। পরবর্তী হানদের আমলেই বৌদ্ধধর্ম ভারত থেকে চীনে প্রচারিত হয়। তবে খৃষ্টজন্মের তিন-চারশ' বছর পর থেকেই বৌদ্ধপ্রভাব সব চাইতে বেশী দেখা যায় এবং ভারতের সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও সঙ্গীত এই সময়ে চীনে প্রচলিত হয়। পণ্ডিত কুমারজীবের চীনে গমন ও ফা-হিয়েনএর ভারতে আগমন এই সময়কারই ঘটনা। বহু ভারতীয় গ্রন্থ এই সময়ে চীনা ভাষায় অনূদিত হতে থাকে।

কোরিয়া ও জাপান

কোরিয়া ও জাপানে সভ্যতার বিকাশ চীনের সঙ্গে সংযোগের ফলেই হয়েছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে জাপানে নব্য ও মধ্যপ্রস্তর যুগের জোমোন মৃৎপাত্র প্রচলিত ছিল। এগুলি হ'ত দড়ির মত অলঙ্কারে সাজানো। জাপানের আদিম অধিবাসী আইনুরা ছাড়াও চীন উপকূল ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে বহু আদিম জাতি এসেছিল জাপানে। উত্তর-পূর্ব জাপান ছাড়া কিউসিউ দ্বীপে ইয়ামোয়ী নামে এক সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়। এই সময়ের সমাধিতে দেখতে পাওয়া যায় চীনদেশীয় ব্রোঞ্জের বাসনপত্র। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জাপান বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। পরে ইয়ামাতোর রাজ্যের অধীনে অন্যান্য রাজ্যগুলি তথা জাপান ঐক্যবদ্ধ হয়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে এই ঐক্য সুদৃঢ় হয়ে ওঠে জিম্মি তেন্নো নামক এক রাজপুত্রের নেতৃত্বে। এর শ'খানেক বছর পরেই জাপান কোরিয়ার একাংশ অধিকার করে।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে উত্তর কোরিয়ার খানিকটা অংশ চীন দখল করে নেয়। কোরিয়ার পানকাং নামক স্থান থেকে চীনের হান আমলের বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় খৃষ্টীয় প্রথম শতকে পরাক্রান্ত সিল্ল ও কোগুরিয়ো রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এই দু'টি রাজত্বই বহুদিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কোগুরিয়োর নেতৃত্বে কোরিয়া চীনের অধিকার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ হয়। কোরিয়া হয়েই এশিয়া মহাদেশের সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রসারিত হয়।

পারস্যের কথা

পারস্য দেশ খৃষ্টের জন্মের প্রায় হাজার বছর আগেই সুসভ্যতার পরিচয় বহন করত জরথুস্ত্র-স্থাপিত ধর্মমতের দ্বারা। এই ধর্মে অশুভ ও

শুভশক্তির চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সাধুতার জয়গান করা হয়েছিল। পারস্যের অতি প্রাচীন জাতিদের বিতাড়িত করে আর্য জাতির মানুষেরা সেখানে বসতি করেন। এদের মধ্যে মিদীয়রা উত্তর-পশ্চিম পারস্যে ও পারসীকরা পারস্য উপসাগর-সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাস করতেন।

আসিরীয় রাজাদের অধীনস্থ মিদীয়রা খৃষ্ট-পূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে দয়কুকুর নেতৃত্বে আসিরীয় রাজধানী নিনেভেকে ধ্বংস করে স্বাধীন মিদীয় রাজ্য স্থাপন করেন। মিদীয়রাই পারস্যের প্রথম স্বাধীন রাজবংশ। আসিরীয়দের দ্বারা প্রভাবিত এই রাজবংশ প্রায় একশ' বছর রাজত্ব করে গেছে।

আকামেনীয় সাম্রাজ্য

যথার্থ পারসীক রাজবংশ এর পরেই স্থাপিত হয়। সম্রাট্ প্রথম কুরুষ একবাটানা নগরী ও

সম্রাট্ দরয়বহুষ

মিদীয় রাজ্য জয় করে ক্রমে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া অধিকার করেন। ব্যাবিলন, লিদিয়া এবং সিরিয়ার গ্রীক্ উপনিবেশ রাজ্য সমস্তই তাঁর কুক্ষিগত হয়। অন্যদিকে ভারতের সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত তাঁর শাসন ছিল। কুরুষের পরে কম্বুজীয় মিশর অধিকার করেন। তারপর সাম্রাজ্যের নানান্ রকম আভ্যন্তরীণ দলাদলির মধ্যে দরয়বহুষ নামক এক সাহসী অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ কুরুষের সাম্রাজ্য অধিকার করে আকামেনীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মে জরথুস্ত্রবাদী হলেও এই বংশের রাজারা অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করতেন। ইহুদী ও গ্রীক্‌দের সত্তা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে তাঁরা কোন রকম বাধা দেন নি। পারসীক সম্রাট্‌দের আমলেই পশ্চিম এশিয়ায় সাধারণ শান্তি অব্যাহত থাকে ও সমৃদ্ধ নগর ও সুন্দর যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। পার্সিপোলিসের সুবিখ্যাত ও বিশাল রাজ-প্রাসাদ, কুরুষের সমাধি এবং দরয়বহুষের উৎকীর্ণ বেহিস্তন লিপিতে আজও আমরা সুবিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের গৌরবের কথা জানতে পারি।

আকামেনীয় রাজবংশের শেষ দিকে সামন্তদের বিদ্রোহে জর্জরিত রাজারা কঠোরতার নীতি গ্রহণ করেন। সম্রাট্ ক্ষয়ার্স (যাঁকে সাধারণ লোকে ভুল করে জ্যারাক্‌সেস বলে) থার্মোপিলির যুদ্ধে গ্রীক্‌দের পরাজিত করলেও ফিনীসিয় নাবিকদের সাহায্যে গঠিত তাঁর নৌ-বাহিনী সালামিসের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়।

গ্রীক্‌রা পারস্যের আধিপত্য পছন্দ না করলেও পারস্যের শাসনকে অনেক সময়েই কম ক্ষতিকারক বলে মনে করত। পারস্যের সম্রাটেরা উৎকোচ গ্রহণ করে পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করতেন এবং গ্রীক্ বিজয়ীরা

পারস্যের অনুকরণ করতে চাইতেন। পরবর্তী রাজারা বিলাস-ব্যসনে নিমজ্জিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন বলেই সম্রাট্ তৃতীয় দরয়বহুষ গ্রীক্-প্রভাবিত মাসিদনিয়ার রাজা ফিলিপের পুত্র আলেক-জান্দারের কাছে গ্রাণিকাসের ও ইসাসের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাকত্রিয়ায় আশ্রয় নেন ও আপন ছত্রপের হাতে নিহত হন। তৃতীয় দরয়-বহুষের সেনাবাহিনীতে বহু বেতনভুক্ গ্রীক্ সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষ আলেকজান্দারের বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিল। গ্রীক্ উপনিবেশ শহর হালিকার্নেসাসও শেষ পর্যন্ত পারস্যের পক্ষে অর্থাৎ আলেকজান্দারের সৈন্যবাহিনীর বিপক্ষে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করেছিল। এমন কি আথেন্সের নেতা দেমোস্থিনিস্ আলেকজান্দারের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের জন্য পারস্যে দূত পাঠিয়েছিলেন।

পার্থবদের রাজ্যকাল

মধ্য এশিয়ার সীদিয় গোষ্ঠীর দুর্ধর্ষ ও অসমসাহসী বর্ম-পরিহিত ঘোড়সওয়ার 'পার্থব' বা যোদ্ধা এই কথাটি থেকেই হয়ত পার্থব রাজাদের নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অর্সকেস্ ও তিরিদেতিস্ নামে দুই ভাই আর্সক শহরকে রাজধানী করে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। প্রথম রাজা হন তিরিদেতিস্। রোমান্ আক্রমণে দুর্বল সেলুকীয় রাজ্যকে ক্রমে ক্রমে অধিকার করে নিয়ে অর্সকীয় পার্থবেরা সমস্ত পারস্য ও ব্যাবিলন দখল করে নেন এবং আর্সক, একবাটানা, টেসিফোন প্রভৃতি স্থানে সমৃদ্ধ নগর স্থাপন করেন। অনেকের মতে এরই কাছাকাছি সময়ে আর্সকীয় পহ্লবী ভাষার জন্ম। ধর্মগ্রন্থ 'অবেস্তা'ও সম্ভবতঃ এই সময়ের।

রোম-সম্রাট্ অগাষ্টাস পার্থীয়দের সঙ্গে শান্তি চাইতেন, কিন্তু সম্রাট্ ট্রাজানের আমলে রোমান্ সৈন্যাধ্যক্ষ পম্পি, আন্তনি ও ট্রাজান পার্থীয় সীমান্ত আক্রমণ করেন। এর পর রোমান্ সৈন্য একাধিকবার টেসিফোন অধিকার করলেও রোম-সম্রাট্ মাক্রিনাস্ পার্থবদের হাতে পরাজিত হয়ে বিরাট কর দান করতে বাধ্য হন।

সাসানীয়দের কথা

প্রাচীন পারসীকদের বসতিস্থান দক্ষিণ পারস্যের পার্স বা ফার্সের সাস্‌সন নামক স্থানের পুরোহিত-পুত্র অর্দেশীর পাপকান পার্থীয় রাজা পঞ্চম অর্তবেনকে পরাজিত করে সাসানীয় বংশ স্থাপন করেন। সম্রাট্ প্রথম অর্দেশীর পূর্ব দিকে কুষাণ ও পশ্চিমে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলেন। অর্দেশীরের পুত্র শাপুরের কাছে রোম-সম্রাট্ ভ্যালেরিয়ন্ পরাজিত হন ও তিনি আশী হাজার রোমান্ সৈন্যকে পারস্যে বসতি স্থাপনের অনুমতি দান করেন। পারস্যের বিশাপুর প্রভৃতি একাধিক স্থানে পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ শাপুর ও তাঁর নিকট পরাজিত ভ্যালেরিয়নের ছবি আছে। শাপুরের রাজত্বকালেই মনি নামে এক প্রচারক জরথুস্ত্রীয়, ক্রীশ্চান ও বৌদ্ধধর্ম এক করে এক নিখিল ধর্মমত প্রচার করেন। রোম-সম্রাট্ কন্‌স্তান্তাইন ও আর্মেনিয়ার রাজা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে পারসীকরা এই মতবাদকে

প্রথমে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, কিন্তু পরে তারা ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাতে আপত্তি করে না। এই বংশের পঞ্চম বহরম শ্বেত হুণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে খ্যাতি লাভ করেন। তা ছাড়া সাহসী, সঙ্গীতরসিক ও শিকারী হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

এরপর পারস্যে মাজদকীয় নামে এক বিপ্লবী ধর্মমতের উত্থান হয়। সাধারণ চাষী, সৈন্য, ক্রীতদাস—এরাই ছিল এই ধর্মের সমর্থক। সমস্ত সম্পত্তির সমবন্টন, কোন মানুষকেই ঘৃণা করব না—এই সব মতই ছিল এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। পারস্যরাজ কোবাদ প্রথমে এই ধর্মের সমর্থক ছিলেন। তিনি এর অনুকূলে আইন-কানুনও করেছিলেন। অভিজাতদের বিপক্ষে জন-সাধারণের দিকে যোগ দিলেও পরে কিন্তু তিনি শ্বেত হুণদের সাহায্যে রাজ্য অধিকার করে নেন এবং শেষে তাঁর পুত্রের স্বার্থে জরথুস্ত্রীয় ও ক্রীশ্চান পুরোহিতদের সাহায্য নিয়ে মাজদাকীয় ধর্ম পারস্য থেকে নির্মূল করে দেন। তবে মধ্য এশিয়ার বহু দুর্গম অঞ্চলে এই মানবতাবাদী মতবাদ এর বহুদিন পরেও সজীব ছিল।

অর্দেশীরের স্থাপিত ফিরুজাবাদ, প্রথম শাপুরের পুনর্গঠিত বিশাপুর, গুন্দেশাপুর প্রভৃতি সাসানীয়দের গৌরবময় স্থাপত্যকীর্তির পরিচয় দেয়। বিরাট রাজপ্রাসাদে টালির রঙীন অলঙ্কার, সোনা-রূপা ও স্ফটিকের নিখুঁত কারুশিল্পে এদের কৃতিত্ব অসাধারণ।

সাসানীয়দের আমলেই সর্বপ্রথম ভারতের উপকথাগুলি সমেত সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি সাহিত্য পারসীক ভাষায় অনূদিত হতে থাকে। তোমাদের হয়ত আশ্চর্য লাগতে পারে, যে, 'গোলাপ' ও 'কমলালেবু' প্রভৃতি জিনিস ছাড়াও এই সময়কার 'চেক্' কথাটিও প্রাচীন পারস্য দেশের পহ্লবী ভাষা থেকেই এসেছে। ইহুদী ও ইরাণীয় বণিক্‌দের বিনিময়পত্রের নাম ছিল চেক্—যা এখন ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ে সারা পৃথিবীতে চালু হয়েছে।

গ্রীসের কথা

নসস্ শহরের বা ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতির কথা তোমরা এই বইএর প্রথম খণ্ডে পড়েছ। নসস্ ধ্বংস হয়ে যাবার পর হেলেনিস্ বা আচিয়ান জাতির ওপর প্রভাব এসে পড়ল মূল গ্রীস দেশের পেলিপনেসস্-এর উত্তর-পূর্ব কোণের মাইকেনী সংস্কৃতির। মাইকেনীর আত্রিয়ুস বংশীয়দের মধ্যে আগামেম্‌নন্ ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত। অনুমান খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে ট্রয় নামে একটি রাজ্য স্থাপিত হয়

প্রাচীন গ্রীক্ যোদ্ধা

দার্দানেল্‌স প্রণালীর কাছাকাছি। জোর করে কর বসানো, ঘুষ আদায় আর দস্যুবৃত্তি ইত্যাদির জন্যে মাইকেনী ও ট্রয়ের মধ্যে ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হয়। দশ বছর অবরোধের পর স্পার্টার রাজা মেনেলাউস্‌-পত্নী হেলেনকে অপহরণের অপরাধে মাইকেনীর আগামেম্‌নন্‌ ও ট্রয়ের প্যারিসের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে প্যারিস নিহত হন। এ ঘটনার প্রায় তিন শ' বছর পরে হোমার নামে এক অন্ধ কবি এই ট্রয় যুদ্ধের বিবরণ নিয়ে ইলিয়াদ মহাকাব্য রচনা করেন।

আচিয়ান বা প্রাচীন গ্রীক্‌ জাতি সিংহ ও বুনো শূয়োর শিকার করতে এবং ভোজসভায় ও চারণ গানে যোগ দিতে ভালবাসত। বৃষচর্মের ঢাল, দীর্ঘ বল্লম, ঘোড়ার কেশরের চূড়া-বসানো ব্রোঞ্জের শিরস্ত্রাণ পরে এরা যুদ্ধ করত। এরা বজ্রধারী দেবরাজ জিউস, সমুদ্রদেব পসেইদন, সঙ্গীত ও আরোগ্যের দেবতা আপোলো, যুদ্ধদেব আরেস, কারিগরী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আথেনী, বিদ্যার দেবী মির্নাভা প্রভৃতির উপাসনা করত। গ্রীক্‌দের বিশ্বাস ছিল এই দেব-দেবীরা সব অমর ও ন্যায়ের পক্ষপাতী। তাঁরা অলিম্পাস্‌ পাহাড়ে থাকেন। এঁদের পূজায় বৃষ ও মেষ বলি দেওয়া হ'ত।

এরপর খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের কাছাকাছি সময়ে উত্তর দিক্‌ থেকে আগত দোরিয়ান উপ-জাতিদের দ্বারা প্রাচীন গ্রীসের মাইকেনীয় সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যায়, কেবল মাত্র মধ্য গ্রীসের আটিকায় এর ধারাটি কোন রকমে বেঁচে থাকে। আটিকাই এর পরে গ্রীক্‌ সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকে গ্রীক্‌রা এশিয়ার উপকূলে অনেক বসতি স্থাপন করে ও আইয়োনীয় নামে পরিচিত হয়। কৃষ্ণ সাগরের তীরভূমিতে বসতিকারী গ্রীক্‌রা চলে যায়, এমন কি ক্রীট দ্বীপেও দোরিয়ান আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে গ্রীক্‌রা স্পেনে, আফ্রিকার উপকূলে, ইতালীর দক্ষিণে সিসিলী দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। এর ফলে ক্রমশঃ সমস্ত ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে গ্রীক্‌ সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে।
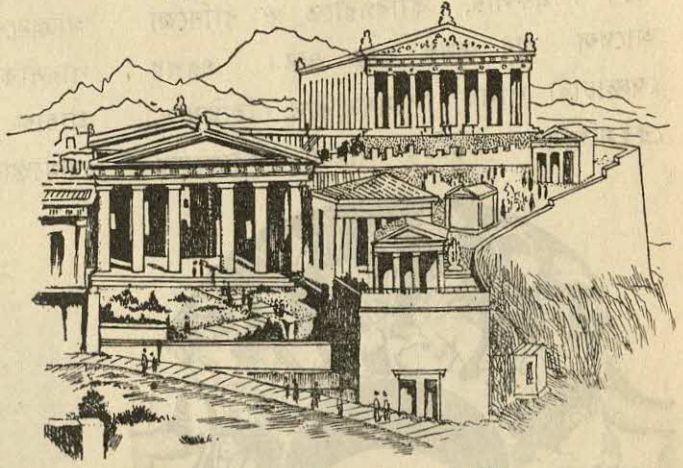
মন্দিরশোভিত নগরশীর্ষ—আথেন্স

স্পার্টা ও আথেন্স

গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের লাসিদেমন উপত্যকার স্পার্টা ছিল দোরিয়ান রাজ্যদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। বহু ক্রীতদাসদের উপর অত্যাচার করে স্পার্টার নাগরিকরা এক দেহসর্বস্ব যোদ্ধার জাতিতে পরিণত হয় এবং সব সময়ে বিদ্রোহের আশঙ্কায় দিন গুণতে থাকে। ওদিকে আটিকার শহর আথেন্স বা এথেন্স নগরী সব

দেবী আথেনী ও তাঁর বাহন প্যাচার ছবি বসানো আথেন্সের মুদ্রা

দিক্ দিয়ে স্পার্টার প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। জ্ঞানে, বিদ্যায় ও সভ্যতায় এই শহরটি বিখ্যাত হয়ে ওঠে। এখানে আথেনী দেবীর মন্দির থাকায় শহরটির ঐ নামকরণ হয়। ষষ্ঠ শতকে সোলন নামক এক বিজ্ঞ শাসকের সংস্কারের ফলে শিল্পকলায়, কারিগরীতে ও বাণিজ্যে আথেন্স খুব সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এরপর স্বেচ্ছাচারী শাসক পিসিসত্রাতাস, হিপ্পিয়াস, ক্লেইসস্থিনিস প্রভৃতির আমলে আথেন্সের

একটি গ্রীক্ বিদ্যালয়ের দৃশ্য (মাটির পাত্রের উপর আঁকা ছবি)

প্রভাব থেসালি, মাসিদন, এরিত্রিয়া, আর্গস ও থিবিসে ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষে স্থাপিত হয় পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আথেন্সের মত স্পার্টাও উন্নতি করে ও প্রায় সমস্ত পেলিপনেসস্ ভূখণ্ডে তাদের আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ে। স্পার্টার রাজা ক্লিওমেনেস্ কার্থেজীয়দের বিরুদ্ধে অভিযানে উৎসাহ দেন ও আথেন্সের বিরোধিতা করতে থাকেন। এরপর আইয়োনীয় গ্রীক্‌রা খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে নানা দিকে এগিয়ে চলে। এশিয়ার গ্রীক্ উপনিবেশগুলিতে এই সময়েই থালেস, হেরাক্লিতাস্, পাইথাগোরাস্ প্রভৃতি মনীষীরা আবির্ভূত হন। তা ছাড়া এ সময়কার সাফোর কবিতা, এফিসাস-এর মন্দির, মিলেটস নগরীর পশমবস্ত্র, ধাতুদ্রব্য ও মৃৎপাত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ক্রমে এই রাজ্যগুলি পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় সম্রাট্ কুরুষের আক্রমণে। এর পর মিলতিয়াদিস মারাথনের যুদ্ধে পারসীক বাহিনীকে পরাভূত করলেও পারস্যের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে। অবশ্য আথেনীয় নেতা থেমিস্তোক্লেস-এর পরামর্শে গড়া নৌবহর ও

পাণ্ডুলিপি সহ সফোক্লেস্

আটিকার রৌপ্যখনির সাহায্যে সমৃদ্ধ আথেন্সও স্পার্টার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং তারপর রাজা লিওনিদাসের অসমসাহসিক নেতৃত্বে থার্মোপিলির গিরিবর্ত্মে দরয়বহুষের পুত্র ক্ষয়ার্সের সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করে। পরে সালামিসের নৌ-যুদ্ধে ও প্লাতাইয়ার যুদ্ধে পারস্য সাম্রাজ্যের বাহিনী পরাস্ত হয়ে যায়। ফলে গ্রীক্‌দের স্বাধীনতা বজায় থাকে।

সংঘবদ্ধ গ্রীক্‌দের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আথেন্স। ক্রমে তারা এক বাণিজ্যভিত্তিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে এবং খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের মাঝামাঝি সময়ে থ্রেস ও লিদিয়ায় পারস্যের ক্ষমতা নির্মূল হয়ে যায়। এই সময় পেরিক্লেসের নেতৃত্বে আথেন্স স্পার্টার বিরুদ্ধে দশ বছর যুদ্ধ চালিয়েছিল। এর ইতিহাস লিখেছিলেন বিখ্যাত গ্রীক্ ঐতিহাসিক থুকিদাইদিস।
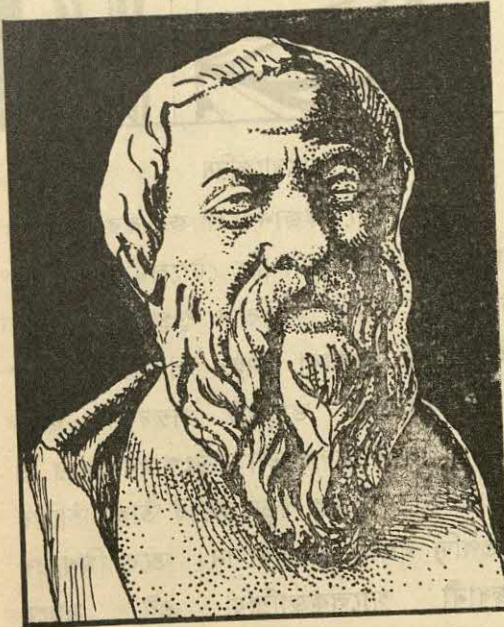
সক্রেতিস্

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীসে এসকাইলাস, সফোক্লেস্, ইউরিপিদিস্ ও এরিস্তোফিনিস্ নামে চারজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার মানুষের আদর্শ ও জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে বিখ্যাত কয়েকটি নাটক রচনা করেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিক হেরোদেতাস্ ছিলেন এশিয়া ভূখণ্ডে অবস্থিত হালিকার-এর অধিবাসী। প্রোতাগোরাস্ প্রমুখ দার্শনিকরা সব কিছু পরীক্ষা করে দেখতে চাইতেন এবং আথেন্সের ন্যায় ও সত্যের অনুরাগী দার্শনিক সক্রেতিস্‌ও এই সময়কারই লোক। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে আথেনীয় নাগরিকদের কুসংস্কারের সমালোচনা করার জন্য এঁকে বিষপানে আত্মহত্যার শাস্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। আরও একটি ভাববার কথা এই যে বহু প্রচারিত গ্রীক্ গণতন্ত্রেও ক্রীতদাসদের কোন রকম স্বাধীনতা স্বীকৃতি পায় নি, উপরন্তু অনেক গ্রীক্ চিন্তাবিদ্ এ প্রথার সমর্থনই করেছেন।

আরও নানা রাজ্য

গ্রীসের উত্তর-পশ্চিমের মাসিদন রাজ্যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফিলিপ্ নামক এক রাজা সুশিক্ষিত ও স্থায়ী পেশাদার সৈন্যদল নিয়ে দানিয়ুব নদীর তীর পর্যন্ত উপজাতীয়দের পদানত করেন। পরে চেরোনিয়ার যুদ্ধে আথেন্স ও থিবিসের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হলে ফিলিপের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলেকজান্দার প্রথমে দক্ষিণ গ্রীস্ অধিকার করে পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করেন ও ইসাস-এর যুদ্ধে তৃতীয় দরয়বহুষের

বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। গৌগামেলার যুদ্ধে পারসীক বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করার পর মধ্য এশিয়ায় ও সিন্ধুনদের তীর পর্যন্ত বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেন তিনি। আলেকজান্দারের মৃত্যু হয় ব্যাবিলনে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। সেলুকাস্ ও তাঁর বংশধরেরা সাম্রাজ্যের পূর্বদিকে রাজত্ব করতে থাকেন। আর নীল নদের দেশ মিশরে রাজত্ব করতে থাকেন টোলেমী উপাধিধারী রাজারা।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে গ্রীসে নগর-রাজ্য করিন্থ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং উত্তরে আটোলিয় ও দক্ষিণের আচিয় সংঘ পরস্পরের বিরোধিতা করতে থাকে। এর পরে এরা আপনাদের দেশের বিরোধে রোমকে আমন্ত্রণ করে—যার ফলে ধীরে ধীরে সমস্ত গ্রীস্ রোমের কুক্ষিগত হয়। কিন্তু আথেন্স রোমান্ অধিকারের সময়েও প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি পায়।

মাছ-ধরা জেলে (গ্রীক্ ভাস্কর্যের একটি নমুনা)

এই সময়ে বর্তমান আনাতোলিয়া বা তুর্কী দেশের তাউরাস পর্বতমালার উত্তরে পার্‌গামাম্ নামে এক পরাক্রান্ত রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল।
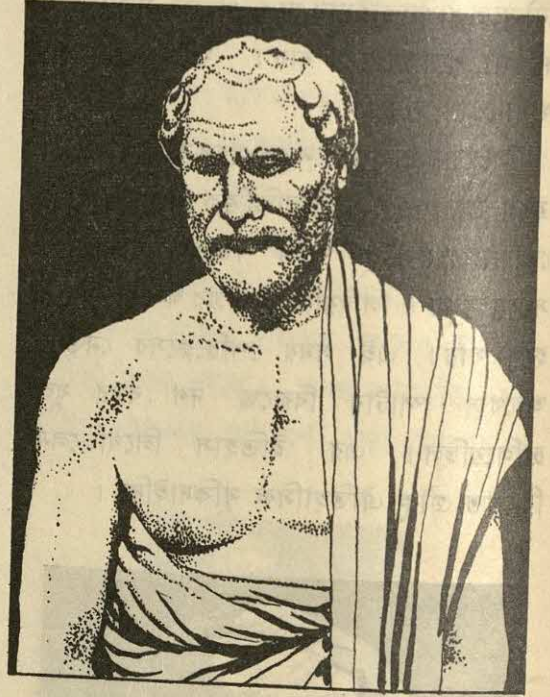
দেমোস্থেনিস্

মিশরে আলেকজান্দারের জয়-করা ভূমিতে তাঁর মৃত্যুর পরে সেনাপতি টোলেমীর স্থাপিত টোলেমীয় বংশের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের রাজারা নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে রাজ্য শাসন করতেন। ভাড়াটে সৈন্যদলের দ্বারা সাধারণ মিশরীয়দের ভীতি উৎপাদন করে ও অসংখ্য ক্রীতদাসদের পীড়ন করেই তাঁরা তাঁদের প্রতিপত্তি বজায় রেখেছিলেন। তবে মিশরের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়া এই সময়ে টোলেমীয়দের রাজপ্রাসাদ, ‘মিউজিয়াম’ বা

সংগ্রহশালা এবং গ্রন্থাগারের জন্য বিখ্যাত ছিল। টোলেমীয়রা মিশরে নিজেদেরকে দেবতা রূপে প্রচারিত করেছিলেন কিন্তু মিশরের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতিকে বিনাশ করতে পারেন নি।

মূল গ্রীস্ ও গ্রীক্-রাজ্যের উপনিবেশগুলি সোজা সোজা চওড়া পাথরে মোড়া রাস্তা, প্রাসাদ, গ্রন্থাগার, রঙ্গালয় প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ ছিল। গ্রীসের এই সময়ের মূর্তিকলা আগেকার মত সারল্যমণ্ডিত, স্নিগ্ধ ও মানবিক না হলেও মেলসের আফ্রোদিতি, সামোথ্রেসের বিজয়িনী দেবী নিকে, পারগামাম-এর জিউস মন্দিরের বেদী বিখ্যাত ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার মত পারগামাম্ ও আন্তিকয়োকে গ্রন্থাগারের কথা শোনা যায়।

গ্রীক্ সাহিত্যে আগের মত প্রতিভাধর দিক্‌পালদের আর আবির্ভাব ঘটে নি। তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ সময়ে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। আরিস্তোফিনিসের ভূগোল ও মানচিত্রের কথা, আথেন্সের পণ্ডিত প্লাতোর বিদ্যালয় ও আলেকজান্দ্রিয়ার ইউক্লিডের জ্যামিতির কথা আজও আমরা ভুলতে পারি নি। ফিনীসিয় পণ্ডিত জেনোর যুক্তিবাদ, সাইরাকিউসের বিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিদিসের আবিষ্কার এবং আরিস্ততলের বৈজ্ঞানিক রচনাবলী এ যুগের অন্যতম সম্পদ্।

রোমের কথা

এবার প্রাচীন গ্রীসের উপকূল ছেড়ে আমরা যে দেশে যাব তার নাম ইতালী। ইতালীর দক্ষিণে গ্রীসের অধিবাসীরা বহুকাল থেকেই অনেক শহর স্থাপন করেছিল। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে মধ্য ইতালীর টাইবার নদীর ধারে রোম শহরের পত্তন হয়। রোমান্‌রা প্রাচীন কালে কিছুদিনের জন্য এত্রুস্কানদের তারকুইন নামে রাজাদের অধীনে থাকার পর

হানিবল্

স্বাধীন হয়েই নতুন ধরণের শাসন-প্রথা প্রবর্তন করে। এতে সাধারণ লোকেই দেশ শাসনের ভার নিয়েছিল। জনসাধারণের সভা ও পরামর্শদাতা-সভা ছিল সিনেট। এদের নিয়োজিত কন্‌সাল ও ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দের ওপর ছিল শাসনের ভার। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে রোমান্‌রা প্রথমে এত্রুস্কানদের, উত্তরে গল্ উপজাতিদের এবং দক্ষিণের তারেণতুম প্রভৃতি গ্রীক্ রাজ্যগুলিকে পরাজিত করে। এর পর সার্দিনিয়া, কর্সিকা ও স্পেনের কাদিজ ও নব কার্থেজ স্থাপয়িতা উত্তর আফ্রিকার ফিনীসিয় গোষ্ঠীর ব্যবসায়ী রাজ্য কার্থেজের সঙ্গে রোমান্‌দের যুদ্ধ বাধে। কার্থেজ-সেনাপতি হামিলকার ও তাঁর পুত্র হানিবল্ এবং হানিবলের ভাই হাস্‌দ্রুবল্ গল্ ও স্পেনীয় উপজাতিদের দিয়ে তৈরী বাহিনী নিয়ে ইতালী ও রোমকে সম্পূর্ণভাবে

রোমান্ সিনেটর

পর্যুদস্ত করেন। তারপর বহুদিন ধরে যুদ্ধ চলবার পর ক্লডিয়াস্, নিরো, স্কিপিও প্রভৃতি রোমের সেনাপতিদের দ্বারা কার্থেজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়। রোম সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে মাসিদনে, গ্রীসে, মিশরে, এশিয়া মাইনরে ও পার্গামাম্ রাজ্যে।

এইভাবে বহু দেশ লুণ্ঠন করে রোমবাসীরা ধনী ও বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। শ্রমসাধ্য কাজকর্ম সবই ক্রীতদাসেরাই করত। রোমান্ শাসক টাইবেরিয়াস্ এবং গেইয়ুথ-গ্রাক্কাস জমির পুনর্বণ্টন করে ও কর্মহীন রোমান্দের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করায় রোমান্ সিনেটের বিরাগভাজন ও সিনেটের চক্রান্তে নিহত হন। এই সময়ে উত্তর আফ্রিকায় বিদ্রোহী রাজা জুরগুথা ও কেল্ট উপজাতিদের দমন করে সেনাপতি মারিয়াস, এশিয়া মাইনরের মিথ্রিদাতিস্কে পরাজিত করে বিখ্যাত সেনানায়ক সুল্লা, স্পেনের বিদ্রোহ দমন করে সেনাপতি পম্পী ও অসাধু অভিজাত ক্রাসাস্ রোমের ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। এঁদের মধ্যে নিষ্ঠুরতায় পম্পী সকলকে হার মানিয়েছেন। রোমের অত্যাচারিত ক্রীতদাসেরা স্পার্টাকাস্ নামে এক নেতার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করায় পম্পী ছ'হাজার ক্রীতদাসকে জীবন্ত ক্রুশবিদ্ধ
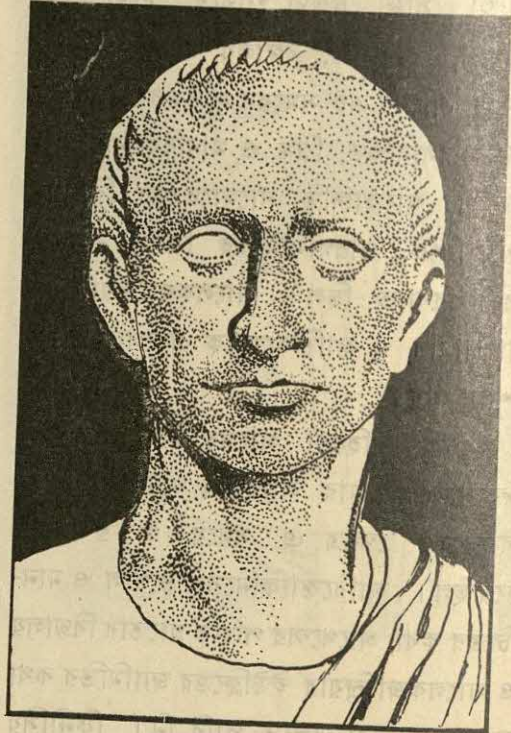
জুলিয়াস্ সীজার

করে হত্যা করেন। এ সময়েই বিখ্যাত জুলিয়াস সীজারের অভ্যুত্থান হয়। শৌর্যে, বীর্যে ও কূট-বুদ্ধিতে সীজারের মত লোক সে সময়ে বড় ছিল না। তিনি গল দেশ বা বর্তমানের ফ্রান্স দেশ জয় করেছিলেন। এবার সীজার ও পম্পীর মধ্যে ক্ষমতার জন্য অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়। শেষ পর্যন্ত সীজার জয়ী হয়ে সমস্ত রোমান্ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক হয়ে ওঠেন। কিন্তু

তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধি ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য শঙ্কিত সিনেট-সমর্থকদের চক্রান্তে সীজারও নিহত হন। এর ফলে রোমে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তখন সীজারের ভাগিনেয় অক্টেভিয়াস্ একটিয়ামের নৌ-যুদ্ধে আন্তনি ও মিশরের রাণী ক্লিওপেত্রার বাহিনীকে পরাজিত করে অগাষ্টাস উপাধি নিয়ে রোমের সম্রাট্ হন।

রোমের লাতিন সাহিত্য এ সময়ে ভার্জিল, হোরেস, কাটাল্লাস্ প্রভৃতি কবি ও লিভির মত ঐতিহাসিকদের রচনার মাধ্যমে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ভার্‌রোর মত পণ্ডিতের রচনাবলী, সিসারোর বক্তৃতা এবং খুব সহজ ভাষায় লেখা জুলিয়াস সীজারের গল্ বিজয়ের সম্পর্কে রচনাটিও উল্লেখযোগ্য।

সম্রাট্ কন্‌স্তান্তাইন্

সম্রাট্ অগাষ্টাসের মৃত্যুর পর টাইবেরিয়াস্ নিরো, ভেস্‌পাসিয়ান্ প্রভৃতি সম্রাটেরা রাজত্ব করেছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকায় মরেটানিয়া, গ্রীসে থ্রেসিয়া এবং ইহুদীদের জুডিয়া রাজ্যে ও বৃটেনে রোমান্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই রোমের ভয়ঙ্কর কলিসিয়াম্ প্রতিষ্ঠিত হয়—যেখানে যোদ্ধাদের আমরণ রক্তাক্ত সংগ্রাম অথবা বন্য পশুদের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ দেখে রোমবাসীরা আনন্দে উন্মত্ত হ'ত। দমিতিয়ান, নার্ভা ও ট্রাজানের সময়ে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করলেও সম্রাট্ হাদ্রিয়ানের আমলে রোমান্ বাহিনী আসিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চল পরিত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়। এই সময়েই রোমান্

রোমান্ যোদ্ধা (সম্রাট্ ট্রাজানের স্তম্ভে উৎকীর্ণ চিত্র)

সীমান্ত রক্ষার জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে একটি প্রাচীর তৈরী করা হয়।

এর পর সম্রাট্ কন্‌স্তান্তাইন্‌এর রাজত্ব কাল। তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার ফলে এই ধর্ম প্রচারের খুবই সুবিধা হয় এবং পূর্ব রোমান্ সাম্রাজ্যের রাজধানী এঁর নামানুসারে কন্‌স্তান্তিনোপল নামে পরিচিত হয়।

পঞ্চম শতাব্দীই ধরতে গেলে রোমের গৌরবের শেষ শতাব্দী। হুণ-নেতা আলরিকের আক্রমণে, বৃটেন থেকে রোমান্‌দের পশ্চাদপসরণে, গলে ভিসিগথ ও আফ্রিকায় ভান্দাল উপজাতিদের রাজ্যস্থাপনে রোম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। হুণ-নেতা আট্টিলা পরবর্তীকালে পরাজিত হলেও শেষ পর্যন্ত ওডোয়েসর নামে বর্বর জাতির নেতা পশ্চিম রোমান্ সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট্ রোমূলাস অগাষ্টাসকে পদচ্যুত করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে গ্রীক্-প্রভাবিত পূর্ব রোমান্ সাম্রাজ্যের বিখ্যাত আইন-প্রণয়নকারী রাজা জাষ্টিনিয়ান সুপ্রতিষ্ঠিত হন। এইভাবে প্রায় হাজার বছর ইয়োরোপ শাসন করার পর রোমের পতন হয়।

হিব্রু বা ইহুদীদের কথা

ইহুদী বা হিব্রুজাতির একটি শাখা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সূচনায় আব্রাহাম নামে এক নেতার দ্বারা চালিত হয়ে সুমেরের উর্ নগর পরিত্যাগ করে বর্তমান পালেস্তিন (প্যালেস্টাইন) অঞ্চলের কানানের চারণভূমিতে চলে আসে। যাযাবর হিব্রুজাতি এর পর মিশরে যায় ও পরে নেতা মোজেসের নেতৃত্বে প্রায় হাজার বছর বাদে স্বদেশে ফিরে আসে। ক্রমে সল ও ডেভিড্ এবং তাঁর পুত্র সলোমনের রাজত্বে হিব্রুরা বাস করতে থাকে। ইস্রায়েলের রাজধানী ছিল সামারিয়া আর জুডাহ্‌র রাজধানী ছিল জেরুসালেম। কিন্তু ইস্রায়েল ও জুডাহ্ এই ইহুদী রাজ্য দু'টি আসিরিয়ার পদানত হয় এবং ইহুদীরা নির্বাসিত হয় ব্যাবিলনে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাধে পারস্য সম্রাট্ কুরুষ ইহুদীদের দেশে ফেরার অনুমতি দেন। পারস্যের কর্মরত নেহেমিয়া ও এজ্‌রা—এ দু'জনে এই সময়ে ইহুদীদের নেতৃত্ব করতেন।

আলেকজান্দার-পরবর্তী গ্রীক্ রাজাদের আমলে মাত্তাথিয়াস, জুডাস ম্যাকাবি, জোনাথান,
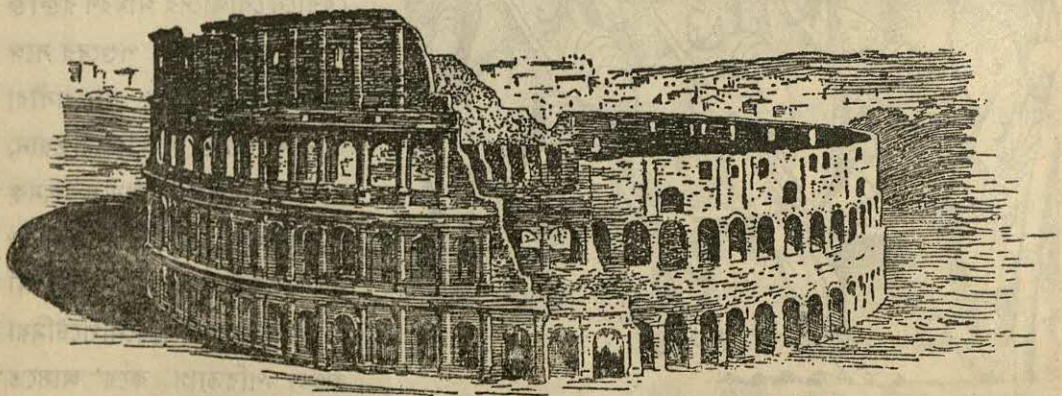
রোমের কলিসিয়ামের ধ্বংসাবশেষ

সাইমন প্রভৃতি ইহুদী বীরেরা তাঁদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। কিন্তু এর পরে কিছুদিন সিরীয় গ্রীক্‌দের অধিকারে থেকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে হিব্রুরাজ্য চলে যায় রোমান্ অধিকারে। হেরদ্ এই সময়ে ইহুদীদের রাজা ছিলেন। গ্রীক্-রোমান্-ভাবাপন্ন ইহুদীরা ক্রমশঃ আলেক-জান্দ্রিয়ায় ও রোমান্ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট্ অগাষ্টাসের আমলে ইহুদীরা শান্তিতে ছিল, কিন্তু পরে রোমান্‌দের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলে খৃষ্টীয় প্রথম শতকের সপ্তম দশকে ভেস্‌পাসিয়ান্ ইহুদীদের পরাজিত করেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সম্রাট্ হাদ্রিয়ান জুপিটারের মন্দিরের জন্য ইহুদীদের জেরুসালেমের মন্দির ধ্বংস করতে উদ্যত হলে বার্-কোচ্‌বা নামক নেতার নেতৃত্বে ইহুদীরা বিদ্রোহ করে কিন্তু জয়ী হতে পারে না। বিজয়ী রোমান্ সেনারা ইহুদীদের প্রাচীন শহর জেরুসালেম ও তার মন্দির বিধ্বস্ত করে দেয়। জুডাহ্ ও জেরুসালেম বিধ্বস্ত হবার পর ইহুদীরা বিশ্বের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

সুতীব্র দেশপ্রেম ও নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্য-ধারাবাহী সভ্যতার জন্য হিব্রুজাতি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

খৃষ্ট ও ক্রীশ্চান ধর্মের কথা

রোমান্ সম্রাট্ টাইবেরিয়াসের রাজত্বকালের শেষ দিকে ইহুদী-দেশের রাজা হেরদ্-শাসিত গ্যালিলির নাজারেথ্ নামক জনপদে এক সূত্র-ধরের পরিবারে যীশুখৃষ্টের জন্ম হয়। খৃষ্ট সমস্ত রকম কুসংস্কার ও অত্যাচার প্রভৃতির

যীশুখ্রীষ্ট

বিরুদ্ধে নির্ভীক্ প্রচার সুরু করায় গোঁড়া ধর্মধ্বজী ও তাদের সমর্থক বিদেশী রোমান্ শাসন-কর্তা তাঁর ওপর চটে যান। শেষে জেরুসালেমের প্রধান পাণ্ডার কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ইহুদী-ধর্মবিরোধী কাজ করার জন্য এবং জনসাধারণকে রোমের শাসনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার অপবাদ দিয়ে। অবশেষে নির্ভীক্ মানবপ্রেমী শান্তপ্রকৃতির এই মহাপুরুষ রোমান্ শাসনকর্তা পন্‌টিয়াস্ পিলেট্ ও তার সহযোগীদের চক্রান্তে জেরুসালেমের নিকটস্থ ক্যাল্‌ভারী পাহাড়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে এক নিষ্ঠুর ও যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে বরণ করেন।

যীশুর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা ক্রীশ্চান ধর্মকে রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেন, কিন্তু যোহন, পিটার ও তারসাসের সল বা পলকে রোমান্ সম্রাট্ ও শাসনকর্তাদের হাতে প্রচুর উৎপীড়ন-অত্যাচার সহ্য করতে হয়।

সঙ্গীতের কথা

সঙ্গীতের সুরু

মানুষের মনে প্রথম কবে যে সুরের প্রেরণা এসেছিল তা ঠিক করে বলা খুব সহজসাধ্য নয়। মনের আবেগ প্রকাশ করার ইচ্ছা—গুন্ গুন্ করে দুর্বোধ্য ভাষায় সুরহীন শব্দ কবে যে আস্তে আস্তে স্বর্গীয় সুরধারায় মিশে গেছে তার পূরো ইতিহাস এখনও প্রায় অজ্ঞাত। তবুও সঙ্গীত-গবেষকগণ যুগ যুগ ধরে বহু সাধনার ফলে যে তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা কম রোমাঞ্চকর নয়। পূর্ণ পরিচয় এত অল্প জায়গায় দেওয়া সম্ভব নয়। যেটুকু জানাচ্ছি সেটাকে বলা যেতে পারে তার সামান্য একটু বাইরের পরিচয়—ইংরেজীতে যাকে আমরা বলি 'আউট লাইন'—যাতে, তোমাদের মধ্যে যারা সঙ্গীত-পিপাসু, তারা এ থেকে কিছু প্রেরণা পেয়ে এ বিষয়ে আরও অনুশীলন করতে পার।

পৃথিবীর কোথায় কোন্ দেশে সঙ্গীত একটি চারুকলা হিসেবে সব-প্রথম স্বীকৃতি পায় সে বিষয়ে সঠিক বলতে না পারলেও এটুকু বলা চলে যে আদিম মানুষ যখন প্রথম ভাষা আয়ত্ত করল তার কিছু পর থেকেই হয়তো অবকাশ ও আনন্দযাপনের একটি উপায় হিসাবে সে এটিকে বেছে নেয়—কতকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবেই হয়তো, এবং এর আনুষঙ্গিক হিসেবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারও হয়তো অল্প পরেই দেখা দেয়। এ সব গান-বাজনা সাধারণতঃ সমবেত ভাবেই চলত। আজও আমরা নানা দেশের আদিবাসীদের মধ্যে এই রকম দলবদ্ধ ভাবে গান-বাজনার আসর দেখতে পাই। নাচটা সম্ভবতঃ তারও আগের—কারণ আদ্যিকালের গুহামানবেরা পাহাড়ের গুহায় যে সব ছবি এঁকে রেখে গেছে তাতেও এ ধরণের সমবেত নৃত্যের অনেক নমুনা পাওয়া গেছে। যাই হোক, নাচের কথা বাদ দিয়ে গানের কথাই আমরা এখানে আলোচনা করব—যদিও এ দু'টি কলাই যে পাশাপাশি চলত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সময় বা যুগের দিকে নজর না দিয়ে দেশ ধরেই সুরু করা যাক। প্রথমে বলি এশিয়ার কয়েকটি দেশের কথা।

ভারতবর্ষের সঙ্গীতশাস্ত্র

আমাদের ভারতবর্ষের সুমহান্ ঐতিহ্যে সঙ্গীতের স্থান অতি সুস্পষ্ট। সামবেদেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। বেদের যে অংশ গান

সামবেদ গান

খৃষ্টজন্মের আড়াই হাজার বছর আগেও ওদেশে জন্ম নিয়েছিলেন এক অদ্ভুত সঙ্গীতকার। তাঁর নাম লিং লাং। সুরের স্পর্শে সূক্ষ্ম ঝঙ্কারের তারতম্য অনুসরণ করে লিং লাংই বোধ হয় প্রথম পঞ্চরাগের—যাকে বলা যায় 'টোন'—আবিষ্কার করেন। আরও আগে যদি যাওয়া যায়, খৃষ্টপূর্ব ২৭০০ বছর আগে মহাচীনের অর্ধ-কাল্পনিক, অর্ধ-পৌরাণিক মহান্ "পীত সম্রাট্" নাকি প্রথম ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তাঁর সেই গান মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। তবে যতদূর জানা যায় সেই গানে রাগ-রাগিনীর মারপ্যাঁচ বিশেষ ছিল না। মহাজ্ঞানী কন্‌ফুসিয়াস্, যাঁর প্রতিভার দীপ্ত আলো তখনকার সমাজের নানান্ দিক্ আলোকিত করেছিল,—তিনিও সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা মতামত ব্যক্ত করে গেছেন। তবে তাঁর গবেষণায় সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর যতটা জোর দেওয়া হয়েছিল রাগ-রাগিনীর বিকাশ সম্বন্ধে ঠিক ততটা জোর দেওয়া হয় নি।

দিয়ে তৈরী তাই হচ্ছে সামবেদ, আর বেদকে যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলা হয় তা তো জানই। পুরাণের মতে দেব-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর অনুরাগী ভক্তদের অপরূপ এক বাদন-যন্ত্র দান করেছিলেন আশীর্বাদ হিসেবে। সেই যন্ত্রই বীণারূপে ধীরে ধীরে বৈদিক যুগে সঙ্গীত-তপস্বীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বৈদিক ঋষিরা সঙ্গীতকে যে ধর্মচর্চার একটা অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সে কথা বললে ভুল বলা হবে না। প্রাচীন ভারতীয়দের কাছে ধর্ম এবং সঙ্গীত নিষ্ঠার একই পর্যায়ে পড়ত। পরবর্তী যুগে সুর, রাগ, রাগিনী ইত্যাদির সাহায্যে ভারতীয় সঙ্গীত এক অপূর্ব শিল্পের সৃষ্টি করে। এই ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আমরা পরে আরো বিশদ ভাবে আলোচনা করব।

মহাচীনের দান

পৃথিবীর বহুমুখী সভ্যতায় মহাচীনের দানও অসামান্য। সঙ্গীত শাস্ত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। যীশুখৃষ্টের জন্মের বহু বছর আগেও চীন সভ্যতায় বহুদূর এগিয়ে এসেছিল। এমন কি

সিংহলের সঙ্গীতশাস্ত্র

ভৌগোলিক, পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে সিংহল ভারতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই পৌরাণিক সঙ্গীত শাস্ত্রের কোন শাখার উন্মেষ এক দেশে হলে অন্য দেশে ছড়িয়ে যেতে বেশী দেরী হয় না। ওদেশে প্রবাদ, প্রায় সাত হাজার বছর আগে মহাবীর রাবণ কৌতুক-ছলে এক তারের বাদ্য আবিষ্কার

করেন এবং তার নাম দেন "রাবণাঅস্ত্রন্"। সেটি দেখতে অনেকটা আধুনিক 'এস্‌রাজে'র মতো। কালক্রমে এই যন্ত্রের নানারকম হেরফের হয়ে তা প্রাচীন সিংহলী সঙ্গীতরসিকদের স্বরচর্চার প্রধান যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই বাজনাটি সম্বন্ধে একজন গবেষক লিখেছেন, যন্ত্রটি ছিল ধনুকের মত বাঁকা একটা তারের যন্ত্র ; এর তার ছিল দু'টি আর একটা গোলাকার তীরের মত জিনিস দিয়ে তা বাজানো হ'ত।

মিশর দেশের সঙ্গীত

এশিয়া ছেড়ে এবার আমরা আরও পশ্চিমে চলে আসছি। প্রাচীন সভ্য দেশ বলতে মিশরের কথা স্বতঃই মনে পড়ে আর কৌতূহল হয় ওদেশের সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু জানবার। প্রাচীন মিশরের বহুধারা সভ্যতার যে সব চিহ্ন পাওয়া গেছে তাতে সঙ্গীতও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে বহু পুরোনো সামগ্রীর আবিষ্কার হয়েছে মিশরের রুক্ষ মরুভূমিতে। গবেষকের কোদালের আঘাতে হাজার হাজার বছরের পুরোনো যে সব বাদ্যযন্ত্র উঠে এসেছে তার সঙ্গে বর্তমান কালের তবলা, ব্যাগ্ পাইপ্ এবং নানা রকম তারের বাজনার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।
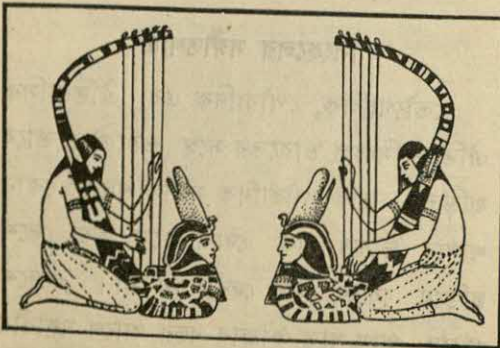
প্রাচীন মিশরের তারের যন্ত্র

একটি প্রাচীন মিশরীয় চিত্রে নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র

আরব

আরব দেশের সঙ্গীতচেতনা বোধ হয় অতটা প্রাচীন নয়,—অন্ততঃ ভারতবর্ষ, চীন এবং মিশরের তুলনায়। যতদূর জানা যায়, ধনুকের মতো বাঁকা এক রকম তার-যন্ত্রই আরব দেশের প্রথম বাদ্যযন্ত্র। তা ছাড়া ওখানে নারকেলের খোল দিয়ে তৈরী এক রকম তবলা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল খৃষ্টজন্মের বহু আগে থেকেই। আরও অনেক পরে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে আরব দেশে "রাবাব" নামে এক রকমের তারের বাজনা খুব জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। যতদূর জানা যায় প্রাচীন মূর জাতিরা আবার এই রাবাবের

ধনুকের মত বাঁকা তার-যন্ত্র

প্রচলন করে সুদূর স্পেন দেশে (৭০০-৭২০খৃঃ)। স্পেনের লোকেরা তার নতুন নাম দেয় "ভিয়েলা"। অনুমান করতে কষ্ট হয় না—"ভাইওলা" (পাশ্চাত্য ঐকতান বাদনে যার বিশেষ ভূমিকা আছে) এই ভিয়েলারই একটি সংস্কৃত রূপ।

হিব্রু সঙ্গীত

সঙ্গীত শাস্ত্রে সেকালকার হিব্রুদের অবদানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের সঙ্গীতকে প্রাচীন এবং নতুন যুগের সঙ্গীতের মাঝখানকার সেতু বলা যায়। নতুন যুগের সঙ্গীত বলতে যে সঙ্গীতে নবীন খৃষ্টীয় ধর্মের প্রভাব এসে পড়েছিল তারই কথা বলছি। একটা বিস্ময়ের বিষয় এই যে ভাস্কর্য অথবা অন্যান্য প্রাচীন চারুশিল্পে হিব্রুদের অবদান খুব উল্লেখযোগ্য নয়। খুব সম্ভব আধ্যাত্মিক কারণেই তাঁরা ও সব থেকে নিবৃত্ত ছিলেন, আর তারই জন্যে হয়তো তাঁদের অন্তরের শিল্পপ্রতিভা সাহিত্য এবং সঙ্গীতকে আশ্রয় করেছিল। এটা খুবই লক্ষ্য করবার মত যে প্রাচীন হিব্রুদের এই দু'টি শিল্পই ছিল অত্যন্ত ধর্মাশ্রয়ী। এই প্রসঙ্গে সম্রাট্ ডেভিড (খৃষ্টপূর্ব ১৯৬০) এবং তার পর সলোমনের উল্লেখ করা যায়।

ডেভিডের সঙ্গীতপ্রীতি সম্বন্ধে বাইবেলে একটি সুন্দর গল্প আছে। ডেভিডের বয়স যখন অল্প তখন থেকেই তিনি চমৎকার গান গাইতে পারতেন এবং গান বাঁধতেও পারতেন চমৎকার। একবার খবর এল রাজা সল্ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সর্বদাই মন-মরা হয়ে থাকেন, কেউ তাঁকে সুস্থ করতে পারছে না। তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল,—মনের ওপর সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া অসাধারণ। রাজাকে যদি তেমন কোন গান শোনানো যায় তা হলে হয়তো তিনি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু শোনাবে কে? সকলে বলল, 'মেষপালক বালক' ডেভিডকে পাঠিয়ে দেখ না! রাজা আপত্তি করবেন না।

রাজা সল্ তাঁর তাঁবুতে বিষণ্ণ মুখে বসে ছিলেন। ডেভিড গিয়ে তাঁর হার্প নিয়ে তাতে ঝংকার তুললেন, তারপর সুরু করলেন নিজের রচিত গান। অপূর্ব তার কথা, অপূর্ব তার সুর। রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন আর, আশ্চর্য, এর পরই তাঁর মানসিক বিষণ্ণতা একদম চলে গেল। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন তিনি।

সলোমনের সম্বন্ধেও গল্প আছে যে তাঁর সঙ্গীত এবং শিল্পপ্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা

ডেভিড হার্প নিয়ে ঝংকার তুললেন।

ওঁকে দর্শন করতে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাইবেল-বর্ণিত "শিবা"র মহারাণী। প্রাচীন ইহুদীদের ইতিহাসে বহু জায়গায়, বিশেষতঃ যুদ্ধের বর্ণনায় তখনকার দিনের বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। যেমন যীশুখৃষ্ট জন্মাবার ৭০ বছর আগে যখন পুণ্যভূমি জেরুসালেমের পতন হয়, তার বিবরণে ঢোলক জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা আছে। জেরুসালেম মন্দিরে 'ট্রাম্পেটের' শব্দের কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। জেরুসালেমের পতনের ফলে যখন ইহুদী জাতি সারা পৃথিবীতে, ছড়িয়ে পড়ে তখন সেদিনের বাস্তুহারা ইহুদীর দল যেখানে যেখানে গেছে সেখানেই নিয়ে গেছে তাদের শিল্প আর সঙ্গীত —যার মূল সুর ছিল সম্পূর্ণ প্রাচ্য।

এর পর গ্রীস্

সঙ্গীতের ক্রমবিকাশে প্রাচীন গ্রীসের অবদানও বিস্ময়কর। গ্রীক্ সভ্যতার স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নানান্ ধরণের চারু-শিল্পেরও উৎকর্ষ হতে থাকে। এই প্রসঙ্গে যাঁদের অবদান অবিস্মরণীয় তাঁদের মধ্যে পিথাগোরাস একটি অমর নাম। ওঁর নিজের লেখা 'থিওরি অব্ মিউজিক্' অর্থাৎ সঙ্গীত-তত্ত্বে প্রাচীন গ্রীসের সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পিথাগোরাস সম্ভবতঃ যীশুখৃষ্টের জন্মের পাঁচ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ওঁর প্রথম জীবনের শিক্ষা হয় মিশর দেশে এবং সেইজন্যই বোধ হয় প্রাচীন গ্রীসের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে প্রাচীন মিশরের প্রভাব অতি সুস্পষ্ট। পিথাগোরাস্ নিজে ছিলেন গণিতজ্ঞ, তাই সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর বর্ণিত সঙ্গীতের,—তা সে কণ্ঠসঙ্গীতই হোক বা যন্ত্রসঙ্গীতই হোক,—সুরঝংকারের সূক্ষ্ম তারতম্য, যাকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি অব্ ভাইব্রেশন্—তার ধ্বনির বিভিন্ন বিচার এবং বিভিন্ন লয় ও যতির উৎপত্তি ও বিশ্লেষণ আজও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

প্রাচীন গ্রীসের স্বরগ্রামে আটটি সুরের (স্কেল্স্) প্রচলন ছিল। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চ বা মেজর অথবা নিম্ন বা মাইনর-এর সঙ্গে

অন্ধ কবি হোমার লায়ার বাজিয়ে গান গাইছেন।
(গ্রীক্ ভাস্কর্য থেকে)

তাদের ধ্বনিগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই আটটি সুরের প্রত্যেকটি ছিল এক একটি বিশেষ ভাবের অভিব্যক্তি। নির্দিষ্ট এবং কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে সঠিক রূপটি ফুটিয়ে তোলার জন্য কোনো এক নির্দিষ্ট সুরেই গান গাওয়া বা বাজনা শোনানো হ'ত। এখানে উল্লেখযোগ্য, সেই সময়ে জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বলে যাকে সম্মান দেওয়া হয়েছিল তাকে বলা হ'ত "সিথারা" (বর্তমান সেতারের মতনই একটা তার-যন্ত্র)। সুরেলা আর গম্ভীর ঝঙ্কার ছিল বলেই সিথারাকে এই বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছিল। গ্রীক্ পুরাণে উল্লিখিত পৌরাণিক গায়ক অর্ফিয়ূসের হাতে সিথারার সুরব্যঞ্জনায় মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং হেড্স্‌এর রাজা তার মৃত পত্নী ইউরিডিসের জীবনদান করতে রাজী হয়েছিলেন। সিথারা ছাড়া প্রাচীন গ্রীসে ফ্লুট এবং হার্প নামে দু'টি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন হয়েছিল। সিথারার বাজনা যেমন ছিল ভাবগম্ভীর তেমনি লঘু রসের সঙ্গীতের সঙ্গে এই সময়ে বাজানো হ'ত 'অলোস্' নামে 'এক রকম বাঁশীর মত যন্ত্র। প্রাচীন গ্রীসের 'লায়ার' নামক তার-যন্ত্রের

অর্ফিয়ুস

কথাও এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হয়।

গ্রীসের পর রোম

রোমান্ সভ্যতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য কারণে গ্রীক্ সভ্যতা একটু নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। কিন্তু সভ্যতার অন্য ক্ষেত্রে যাই হোক্ না কেন, গ্রীক্ সঙ্গীত আর গ্রীক
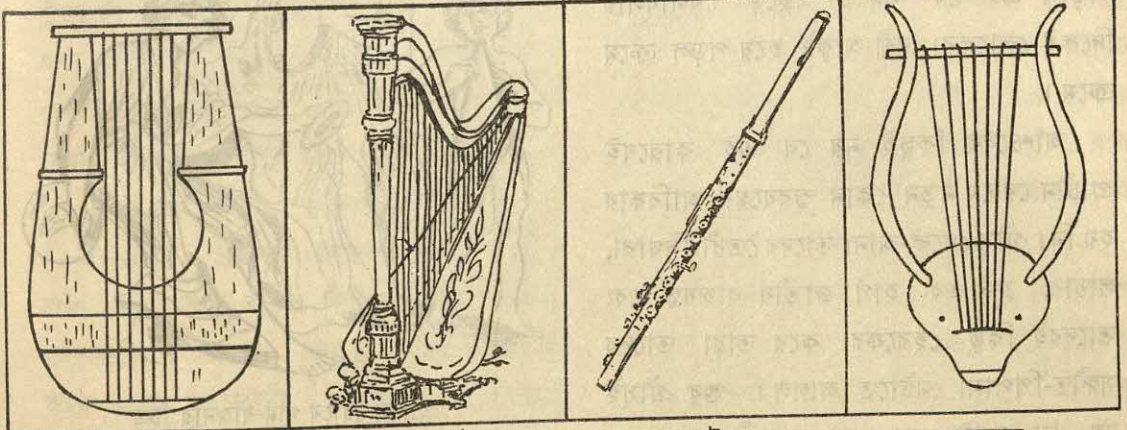
সিথারা হার্প ফ্লুট লায়ার

রঙ্গমঞ্চের প্রভাব রোমান্‌রা সহসা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। যে সঙ্গীতের উৎস সুরু হয়েছিল গ্রীসের সুর-অঙ্গনে সেই সঙ্গীতের ঝরণাধারা ধীরে ধীরে ইটালী এবং মধ্য-ইয়োরোপেও ছড়িয়ে পড়ল। তারপর কালের প্রভাবে রোমান্ এবং গ্রীক্ সভ্যতার মূল পার্থক্যের ফলে গ্রীস্ থেকে আগত সঙ্গীত শাস্ত্রেরও ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দিল। রোমান্ সভ্যতা ছিল তখন অনেক বাস্তববাদী, তাই তাদের গানের কথা ও সুর এবং নানাবিধ যন্ত্র-সঙ্গীতের নক্সা এবং যান্ত্রিক সুরেও যে সঙ্গীতের প্রচার সুরু হ'ল তাতে গ্রীক্ সঙ্গীতের ভাবগম্ভীর ব্যঞ্জনা ধীরে ধীরে চলে যেতে লাগল। ফলে রোমে যার প্রচলন হ'ল তাকে এক কথায় বলা চলে অত্যন্ত লঘু, হাল্কা-জাতীয় সঙ্গীত—কণ্ঠ এবং যন্ত্র দুই-ই। সূক্ষ্ম সুরমূর্ছনার বদলে রোমের ঘরে ঘরে আদর হ'ল স্থূল রসের শব্দবহুল সঙ্গীতের। সিথারার বদলে জনপ্রিয় হ'ল জয়ঢাক অথবা ড্রাম্ এবং শিঙ্গা বা হর্ন, কিংবা উঁচু পর্দার এক ধরণের বাঁশী—টিউবা, যার তালে তালে হুল্লোড় করে নাচত সঙ্গীতপিপাসু রোমের নরনারী। ফলে দাঁড়াল এই যে সঙ্গীত ছেড়ে খেলাধূলার দিকেই লোকেরা বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়ল ক্রমে ক্রমে।

আশ্চর্যের কিছুই নয় যে এই কারণেই প্রাচীন রোমে নতুন কোন সুরযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নি। গ্রীস্-থেকে-আনা তাদের তৈরী সিথারা, লায়ার, ফ্লুট এবং হার্প জাতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং তাদেরই কিছু হেরফের করে তারা তাদের সঙ্গীত-পিপাসা মেটাতে লাগল। শুধু গ্রীস্ই নয়, যে দেশই তখন পরাক্রমশালী রোমান্‌রা অধিকার করেছিল সেখান থেকেই অন্যান্য বহুমূল্য রত্নাদির সঙ্গে তারা নিয়ে এসেছিল সে দেশের গান-বাজনার সরঞ্জাম। গবেষকদের বিবরণ থেকে জানা যায়—প্রাচীন রোমান্‌দের মধ্যে বাঁশী-জাতীয় যন্ত্র বেশ জনপ্রিয় ছিল। সেই বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে সুরের কিছু অদল-বদল করে তারা গম্ভীর অথবা লঘু ক্রিয়া-কর্মে সুর-সৃষ্টি করত। যতদূর জানা গেছে খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩৩০ বছর আগে রোম রাজ্যে প্রথম রঙ্গনাট্য 'প্যাণ্টোমাইম্' প্রচলিত হয়। যদিও প্রথম দিক্‌টায় এটা ছিল গ্রীস্ দেশেরই অনুকরণ, কিন্তু কালক্রমে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য-মেশানো রঙ্গমঞ্চেরও প্রচলন হ'ল। অবশ্য এ সব রঙ্গমঞ্চে যে সব নাটক অভিনীত হ'ত তাদের ভাব বা ভাষায় খুব যে একটা শালীনতা ছিল এমন বলা যায় না।

এই সব কারণেই খৃষ্টধর্মের আবির্ভাবের গোড়ার দিকে সঙ্গীত শাস্ত্রের ওপর জনসাধারণের

প্রাচীন রোমে গান-বাজনার চিত্র
(একটি প্রাচীন রোমান্ চিত্র থেকে)

মনের যে ভাব ছিল তাকে একটু উপেক্ষার ভাবই বলা চলে। কিন্তু ধীরে ধীরে কালের গতিতে এই নতুন খৃষ্টধর্মাবলম্বীরাই সঙ্গীতের পরম ভক্ত হয়ে পড়ল এবং শেষে তারাই হ'ল এই অপূর্ব রসের ধারক। তারপর ধীরে ধীরে এই খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের চেষ্টায় রোম-সভ্যতা যখন এক নতুন রূপ নিল তখন তাদের শৌর্য ও বীর্যের সঙ্গে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটল। প্রধানতঃ শুধু এশিয়া থেকে যে সঙ্গীত ক্রমশঃ হাতবদল হয়ে তাদের কাছে এসেছিল কালক্রমে তা লোপ পেল এবং সেই জায়গায় দেখা দিল তাদের একান্ত নিজস্ব সুর, স্বরলিপি আর স্বরযন্ত্র। এই নতুন সঙ্গীত-ভাবের উৎপত্তি হ'ল খৃষ্টানদের ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে এবং সে সব গান প্রথমে ধর্মযাজকরাই গাইতেন,—বিশেষতঃ ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীরা। ধর্মীয় গুরু পোপ্ (গ্রেগরী দি গ্রেট্) ছিলেন এর একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই প্রসঙ্গে জনৈকা ধর্মপ্রাণা মহিলা সেন্ট সিসিলিয়ার নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি রোমে প্রথম 'অর্গ্যান' বাদ্যের প্রচলন করেন এবং নিজেও ধর্মসঙ্গীতের একজন প্রধান উৎসাহী ছিলেন। কথিত আছে তিনি ধর্মের জন্য শহীদ হন এবং আজও ইয়োরোপের বহু দেশে তাঁর মৃত্যুদিবস ২২শে নভেম্বর 'সঙ্গীত-দিবস' হিসাবে পালিত হয়।

ধর্মযাজক কবি নট্কার বালবোলাস্‌ও (৮৩০-৯১২) ছিলেন একজন বিখ্যাত সুর-স্রষ্টা এবং তাঁর রচিত মিডিয়া ভিটা এখনও ধর্ম-অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। লাবিও নামে আর এক মহাজ্ঞানী ক্যাথলিক পুরোহিত ল্যাটিন এবং গ্রীক্ রচনা জার্মান্ ভাষায় অনুবাদ করেন। বস্তুতঃ ইনিই প্রথম জার্মান্ ভাষায় সঙ্গীত শাস্ত্র রচনা করে গেছেন বলা চলে। এই প্রসঙ্গে আরও একজনের নাম তোমাদের জানা উচিত। এঁর নাম গুইডো। ইনি ছিলেন সঙ্গীতের যাদুকর এবং আজ পাশ্চাত্য দেশে যে সঙ্গীত-বর্ণমালার প্রচলন রয়েছে (Do-re-mi-fa-sol-la-si) তিনিই তার প্রবর্তক। সেই হিসেবে গুইডোর নাম অমর হয়ে থাকবে। ইনি ১০৫০ সনে মাত্র ৫৫ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। গুইডোর পর থেকে রোম হয়ে উঠল সঙ্গীত-শিল্পের পীঠস্থান এবং যে স্বর্গীয় সুরধারা আস্তে আস্তে সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়ল তার উৎস হ'ল ইটালী।

ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে

একাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই দক্ষিণ ফ্রান্সে গান আর বাজনার আদর সুরু হয়। অভিজাত-ঘর-থেকে-আসা 'একাদশ চারণ কবি'—যাঁদের বলা হ'ত 'ত্রুবেডুর্স'—গান গেয়ে গেয়ে সারা দেশে সঙ্গীতকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করতেন। প্রধানতঃ এঁদের প্রচারের ফলেই গানের ভাষারও রূপান্তর ঘটল। সাধারণের কাছে কিছুটা খটমট ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তে ধীরে ধীরে স্থানীয় কথ্য অথবা অর্ধ-সাধুভাষার প্রচলন হ'ল, যার ফলে কাব্য আর সঙ্গীত ফরাসী জনসাধারণের বড় আপনার জিনিস হয়ে পড়ল।

সে যুগের চারণ কবিদের গাওয়া গান আজও ফ্রান্সের বহু জায়গায় গাওয়া হয়। নতুন যুগের ছোঁয়ায় হয়তো তার ভাষার কিছু বদল হয়েছে কিন্তু মূল রূপটি এখনও অব্যাহত আছে।

সেদিনের সেই চারণ কবিদের সঙ্গে থাকত তাদের তৈরী নানা ধরণের তার-যন্ত্র। কোনটির একটি তার, কোনটির তু'টি, কোনটি আবার ততোধিক তার দিয়ে সাজানো। এদের বলা হ'ত গিগা অথবা ভিয়েল। অনেক সময়ে তারা হার্প জাতীয় এক রকম যন্ত্র ব্যবহার করত—যাতে একসঙ্গে একাধিক সুর তোলা যেত। এতে মনে হয় তখন থেকেই ফরাসী দেশে রাগ-রাগিনীর প্রচলন সুরু হয়েছিল।

দক্ষিণের মতো উত্তর ফ্রান্সেও সেই সময়ে এই রকম ভ্রাম্যমাণ গায়ক দলের আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের বলা হ'ত ক্রুভেরেস্'। এই গায়কের দল তাঁদের অভিযান ফ্রান্সের সীমানা ছাড়িয়ে স্পেন এবং পর্তুগালেও বিস্তৃত করেছিলেন। ফলে ঐ সব দেশে ফ্রান্স-থেকে-আসা সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা এত বেড়ে গিয়েছিল যে ওখানকার লোকেরা ক্রমশঃ তাদের নিজস্ব সুর ও স্বরগ্রামও ভুলতে বসেছিল। কথিত আছে রাজা প্রথম ডন জুয়ান বার্সিলোনায় সেই ঢং-এর সঙ্গীতের এক স্কুল স্থাপন করেন এবং সেই স্কুলে নিয়মিত গান-বাজনার মজলিশ্ বসত।

জার্মেনী ও ইংল্যাণ্ড

উত্তর ফ্রান্স থেকে সঙ্গীতের আর একটি ধারা ক্রমশঃ ইংল্যাণ্ড এবং জার্মেনীতে ছড়িয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য অতি অল্প সময়ে এই তুই দেশে সঙ্গীতের অসম্ভব কদর হয়। ফ্রান্সের মতো এই তুই দেশেও অত্যন্ত অভিজাত বংশের থেকে (এমন কি রাজবংশ থেকেও) সঙ্গীত-রসিকেরা এসে ভ্রাম্যমাণ চারণ কবির দল তৈরী করেন। ইংল্যাণ্ডে এই চারণ কবিদের বলা হত 'মিন্‌স্ট্রেল্‌স্'। রাজা 'সিংহহৃদয় রিচার্ড'-এর (কিং রিচার্ড দি লায়ন-হার্টেড) নাম তো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই অসমসাহসী তুর্ধর্ষ সৈনিক-সম্রাট্ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসেন ১১৮৯ সালে। তুর্ভাগ্যক্রমে ইয়োরোপে একবার যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাঁকে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্ লিওপোল্ডের হাতে বন্দী হয়ে 'দোয়রুস্তাইন' তুর্গে আটক থাকতে হয়। কুখ্যাত এই তুর্গটি ছিল ড্যানিউব নদীর তীরে। শোনা যায় তাঁদের প্রিয় সম্রাট্‌কে খুঁজে না পেয়ে রিচার্ডের অনুরক্ত সৈনিক-বন্ধুরা ছদ্মবেশে দলে দলে ইয়োরোপের বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা রিচার্ডের প্রিয় গানগুলি গেয়ে গেয়ে পথে-বিপথে, অরণ্যে, পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন। তারপর একদিন প্রিয় সখা ব্লন্‌ডেন যখন গান গেয়ে গেয়ে ড্যানিউব নদীর তীর দিয়ে হাঁটছিলেন, অন্ধকার নির্জন তুর্গে সেই গানের সুর রিচার্ডের কানে এসে পৌঁছাল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে রিচার্ড গলা ফাটিয়ে গান গেয়ে তার প্রতিধ্বনি করলেন। ব্লন্‌ডেনের উদ্দেশ্য সফল হ'ল এবং ইংল্যাণ্ডের রাজারও পুনরুদ্ধার ঘটল।

জার্মেনীতে এই চারণ কবিদের ও-দেশের ভাষায় বলত 'মিনেসিঙ্গার্স'। মিনে কথাটার জার্মান্ ভাষায় অর্থ ভালবাসা। তবে এদের গানের ভাব শুধু মানুষের প্রতি ভালবাসার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, মানুষকে ছাড়িয়ে জাতি এবং দেশপ্রেম ক্রমশঃ এই গানের প্রধান উপাদান হয় ওঠে।

কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুরই বুঝি

পরিবর্তন হয়! ধীরে ধীরে ইয়োরোপে এল এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক বিপ্লব। কত রাষ্ট্রের উত্থান হ'ল, কত রাষ্ট্রের পতন হ'ল, কত সভ্যতার বিনাশ ঘটল, আবার কত নতুন সভ্যতার স্ফূরণ হ'ল। আর সেই সঙ্গে চলল মানুষের প্রয়াস—নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা কিংবা পুরোনোকেও আঁকড়ে রাখার গোঁড়া মনোভাব। ১২৮৭ সালে মৃত্যু হ'ল আদাম্ দ্য লা হালের। তাঁকে বলা হ'ত ইয়োরোপের ক্রুবেদুর্স কবি। তাঁর লেখা গীতি-নাটক 'রবিঁ এৎ মারিওঁ' বোধ হয় আজকের 'অপেরা' জাতীয় অনুষ্ঠানের পথপ্রদর্শক।

১৩০৫ সালে মৃত্যু হয় বোহেমিয়ার দ্বিতীয় ভেন্‌সেলাস্-এর। ইনি ছিলেন জার্মেনীর শেষ মিনেসিঙ্গার। এঁর লেখা বহু অমূল্য গাথা এখনও জার্মেনীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

এই চারণ কবিদের প্রচেষ্টার ফলেই ইয়োরোপ ও ইংল্যাণ্ডে লোকগীতির জনপ্রিয়তা বাড়ে এবং তাদের কৌলীন্যও বৃদ্ধি পায়। আজ যে পাশ্চাত্য দেশে সঙ্গীতের স্থান এত উঁচুতে মূলতঃ সেটা এঁদেরই সাধনার ফল।

স্বর্ণযুগ

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার থেকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যে স্বর্ণযুগের সূচনা হয়েছিল তার পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় দেওয়া শুধু অসম্ভবই নয়, ওতে ওর প্রতি কিছুটা অবিচার করারও ভয় আছে। সঙ্গীত এবং নাট্যকলার বিবিধ শাখা—অর্থাৎ অর্কেষ্ট্রা, অপেরা, ব্যালে—সবেরই বলতে গেলে প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল এই সময় থেকে এবং প্রধানতঃ জার্মেনী এবং অষ্ট্রিয়া থেকে।

ইয়োহান্ সিবেষ্টিয়ান্ বাখ (১৬৮৫—১৭৫০) এবং জর্জ ফ্রেডরিক্ হাণ্ডেল্ (১৬৮৫—১৭৫৯) এই দু'জন অবিস্মরণীয় এবং অলৌকিক প্রতিভা-

ফ্রেডরিক্ হাণ্ডেল্

সম্পন্ন সুরকার এসেছিলেন জার্মেনী থেকে। বেট্‌হোফেন (১৭৭০—১৮২৭), যাঁর নাম তোমাদের কারোরই অজানা নয়,—তিনিও

বেট্‌হোফেন্

জন্মেছিলেন জার্মেনীর বন্ শহরে। ঐকতান-সুরকার (অর্কেষ্ট্রাল্ কম্পোজার) হিসেবে মোৎসার্ট-এর (১৭৫৬—১৭৯১) অবদানও ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি জন্মেছিলেন অষ্ট্রিয়ার সল্‌জ্‌বুর্গ-এ। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে অষ্ট্রিয়াতে আরও একজন প্রখ্যাত সুরকারের

মোৎসার্ট

আবির্ভাব হয়। তাঁর রচিত বিভিন্ন ওঅল্‌স আজ সারা বিশ্বের সঙ্গীত-রসিকদের মনোরঞ্জন করছে। আদর করে দেশবাসী তাঁর নাম দিয়েছিল 'ষ্ট্রাউস্—দি ওঅল্স কিং' অর্থাৎ ওঅল্সের রাজা—ষ্ট্রাউস্। স্যুবার্ট (১৭৯৭—১৮২৮) সঙ্গীত-লোকের আর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর জন্ম এবং কর্মস্থান ভিয়েনায়। তা ছাড়া ইটালীতে জন্মেছিলেন রোসিনি (১৭৯২—১৮৬৮) আর ফরাসী দেশে আবির্ভাব হয়েছিল জাঁক্ অফেন্‌বাখ্ (১৮১৯—১৮৮০) এবং হেক্টর বারলিওস্-এর(১৮০৩—১৮৬৯)।এঁদের অবদানও সঙ্গীত-জগতে অম্লান হয়ে থাকবে।

শোঁপা (১৮১০—১৮৪৯) ছিলেন পোল্যাণ্ডের লোক। তাঁর অতি উজ্জ্বল প্রতিভা সেই সময়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে এক অসাধারণ গৌরব দান করেছিল। চেকোস্লোভাকিয়াতে যে বিখ্যাত শিল্পীর দান সঙ্গীত-জগৎকে সমৃদ্ধ করেছিল তাঁর নাম বেড্রিশ্ স্মেটানা (১৮২৪—১৮৮৪)। এর কাছাকাছি সময়ে রাশিয়ায়ও কয়েকজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা হলেন আলেকজাণ্ডার বোরো-ডিন (১৮৩৪—১৮৮৭), মোডেস্ট পেত্রোভিচ্ মুসোরগ্স্কি (১৮৩৯—১৮৮১) এবং নিকোলাই রিম্স্কি করসাকভ্ (১৮৪৪-১৯০৪)। স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়াতে তখন এডভার্ড গ্রীগ্ (১৮৪৩—১৯০৭)-এর দারুণ নামডাক। আর সেই সময়েই স্লাভভূমিতে আরও একজন দিক্‌পাল সুরকারের জন্ম হয়। তাঁর নাম চাইকফ্স্কি (১৮৪০—১৮৯৩)। ওঁর সুর-সংযোজিত বিভিন্ন ব্যালে আজও ইয়োরোপের সব দেশে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ওঁর বিখ্যাত নৃত্য-নাট্য 'সোয়ান্ লেক্' এবং 'নাট্ ক্র্যাকার'-এর নাম হয়তো তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। সে যে কী অপূর্ব সৃষ্টি তা একবার যে দেখেছে সে-ই স্বীকার করবে। ও-জিনিস একবার দেখলে কখনও ভুলতে পারা যায় না।

এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে আবার আমরা তোমাদের জানাচ্ছি যে বিশ্বসঙ্গীতের পরিচয় এত অল্প কথায় দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা শুধু একটু পথের নিশানা দিলাম মাত্র। কিন্তু সেই অপূর্ব রসের রাজত্বে প্রবেশ করার ছাড়পত্র পেতে হলে চাই কঠোর সাধনা এবং গভীর মনোনিবেশ। আর সেই সঙ্গে কিছুটা প্রতিভাও যে থাকা দরকার সে কথা হয়তো না বললেও চলে।

তামিল ছড়া

দোলে দোলে হাতটি খোকার
তুলছে দোতুল দোল্,
মিষ্টি কেনার দোকান-ঘরের
দরজা তু'টি খোল্।
একটু করে খাজা-গজা
মুখের ভিতর তোল্,
খোকন সোনার নরম তু'হাত
তুলছে দোতুল দোল্।

* * *
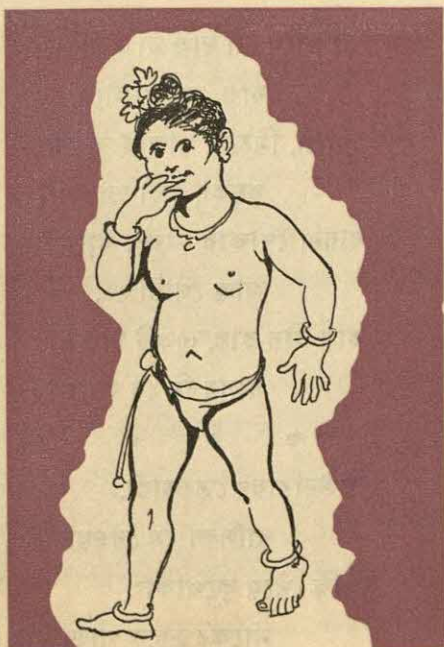
কুচকুচে কালো কাক
ডাকে খালি খালি,
খোকনের চোখে দেবে
কাজলের কালি।
ছোট পাখী, আনো দেখি
রং-মাখা ফুল,
তাই দিয়ে খোকনের
বেঁধে দেব চুল।
সারসের ঠোঁট-ভরা
মধু আনা চাই,
টিয়া পাখী বাটি ভরে
তুধ দিও ভাই!

* * *
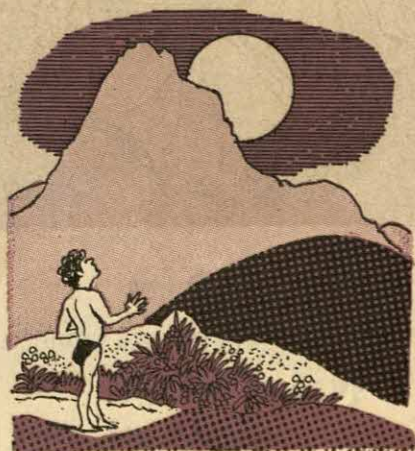
এস এস ছুটে এস—
চলবে না থামা,
পাহাড়ের চূড়ো থেকে
এস চাঁদা মামা!
চামেলির ফুল এনে
ভরে দাও বাড়ী,
মিঠে মিঠে বুলি মুখে
এস তাড়াতাড়ি।

হিন্দী ছড়া

ছুটল হাতী, ঘোড়ার পাল,
পাল্‌কী চড়ে কানাইলাল।

* * *

ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়ে
আকাশ ফেটে শেষটাতে,
থুথুড়ে এক মরল বুড়ী—
বুক ফাটা তার তেষ্টাতে।

* * *

লম্বা-ঠুঁটো মাছরাঙাটা
খুঁজছে জলে মাছ,
ঘাসের বুকে রং ধরেছে—
ফড়িং নাচে ঐ;
খোকন বাবু রাগ করেছে—
দুধ খাবে না আজ,
চোখের জলে বন্যা এল
জল থৈ-থৈ—থৈ!

কী খাবে সে দাও না এনে—
যাও না বাজারে,
মোণ্ডা, মিঠাই, মালাই আনো—
পুচ্‌কা, পুরী ভাজো;
বায়না খোকার—ভুট্টা খাবে
আস্ত গোটা রে,
হায় হায় হায়, একটি দাঁতও
গজায় নি যে আজো!

* * *

শিউনারায়ণ তেওয়ারী,
বাসিন্দা সে রেওয়ার-ই;
সিদ্ধি খেয়ে কুপোকাৎ,
নাকের ডাকে পাড়া মাৎ।
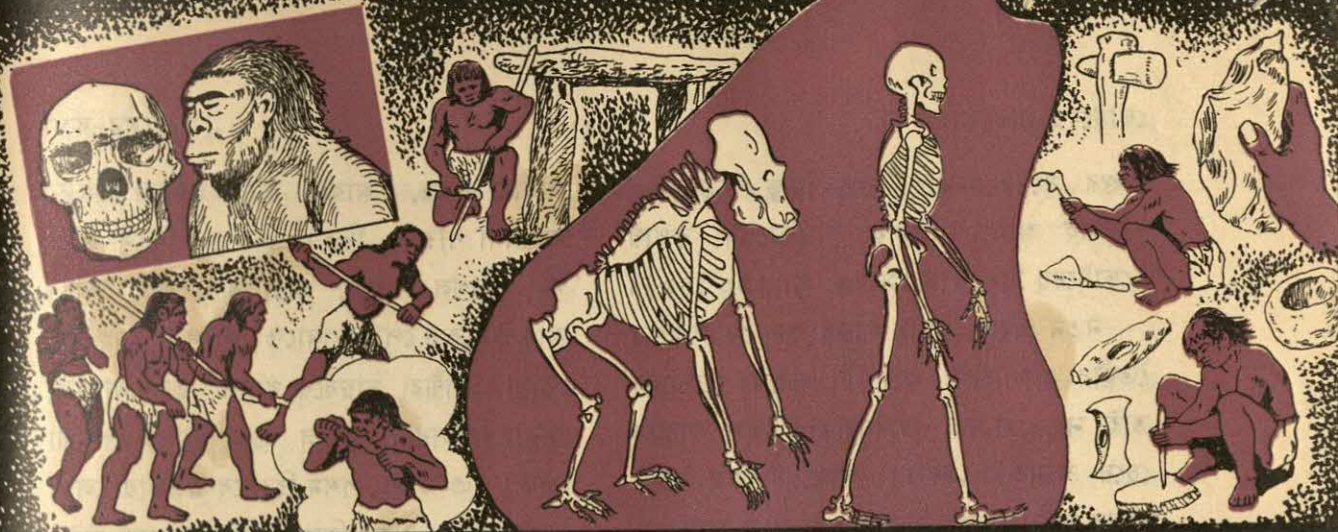
মানুষের কথা

প্রস্তর যুগের মানুষ

জীবজগতের ক্রমবিকাশের ফলে পৃথিবীতে উপ-মানুষ, প্রায়-মানুষ এবং অবশেষে সত্যিকার মানুষের আবির্ভাবের কাহিনী তোমরা আগেই শুনেছ (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮-১৩৯) কিন্তু সে নেহাৎই আদ্যিকালের মানুষ। সে মানুষ ঘরদুয়ার বানাতে শেখে নি, চাষবাস করতে শেখে নি, থাকত পাহাড়ের গুহায়। প্রধানতঃ পশুমাংস বা অভাবে শামুক, গেঁড়ি, বুনোগাছের ফলমূল, কচি পাতা, মাটির তলা থেকে খুঁড়ে-বার-করা কন্দ এই সব খেয়েই বেঁচে থাকত তারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশপাশের অন্যান্য জীব থেকে তারা যে অনেকখানি আলাদা এবং অনেকটা উন্নত তার হাজারো প্রমাণের চিহ্ন তারা রেখে গেছে। এর মধ্যে গুহাচিত্র, আগুনের ব্যবহার এবং পাথরের তৈরী অস্ত্রশস্ত্রের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথম যুগের মানুষেরা যে সব পাথরের হাতিয়ার বা অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে গেছে সেগুলো ছিল নেহাৎই এবড়োখেবড়ো—অপটু হাতের তৈরী। কিন্তু ঐ মানুষই বহুদিন পরে যে সব পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত তা অনেক উন্নত ধরণের—অনেক মসৃণ, অনেক ধারাল, আরও নিপুণ হাতের তৈরী। তফাৎটা এতই বেশী চোখে পড়ে যে এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে যে-সব মানুষ ঐ দু'রকম অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে গেছে তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল খুবই বেশী। বছর দিয়ে তার সঠিক হিসেব পাওয়া সম্ভব নয়, তবে সেটা যে বেশ কয়েক হাজার বছর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই দু'টি যুগকেই অবশ্য বলা হয় প্রস্তর যুগ বা স্টোন এজ্, তবে দু'টির পার্থক্য বোঝাবার জন্য প্রথম যুগটিকে বলা হয় পুরোনো প্রস্তর যুগ আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় নতুন প্রস্তর যুগ। ইংরেজী করে বললে প্রথমটিকে বলা হয় প্যালিওলিথিক এজ্ আর দ্বিতীয়টিকে নিওলিথিক এজ্।

নতুন প্রস্তর যুগ বা নিওলিথিক এজ্

প্যালিওলিথিক এজ্ বা পুরোনো প্রস্তর যুগের কথা তোমরা আগেই শুনেছ, নতুন

প্রস্তর যুগের কথাও কিছু কিছু পড়েছ এই বইএরই অন্য জায়গায়—ইতিহাসের কথায় (ছোটদের বিশ্বকোষ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩-১৪৯)।

নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ শুধু যে অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর ব্যাপারেই অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল তাই নয়, তাদের জীবনযাত্রাও ছিল আগের চেয়ে অনেকটা উন্নত। পাথরের অস্ত্র তৈরী করার সময় পাথর ঠোকাঠুকির ফলে তারা যে আগুনের সন্ধান পায় সেই আগুনই হয়তো তাদের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে থাকবে অনেকখানি। ক্রমে মানুষ তীরধনুকের ব্যবহার শিখল—যার ফলে শত্রুর সামনা সামনি না গিয়ে আড়াল থেকেও তাকে কাবু করা যেত। কিন্তু এর চেয়েও বড় বাহাদুরি হ'ল তাদের বনের পশুকে পোষ মানাবার কৌশল আয়ত্ত করা।

মানুষের পোষা প্রথম প্রাণী বোধ হয় কুকুর। শিকারের ব্যাপারে এই কুকুর মানুষকে সাহায্য করত, আবার রাত্রে হয়তো তাদের আস্তানা পাহারা দিত। এর পর ক্রমে তারা গরু, ছাগল, ভেড়া, গাধা এবং শেষে ঘোড়া আর উটকেও পোষ মানাতে শিখল। এই সব পোষা প্রাণীরা মানুষকে খাবার দুধ যোগাত, আবার শিকার না জুটলে ওদের মাংসও খাওয়া চলত। এ ছাড়া পশম হিসেবে ভেড়ার লোম কাজে লাগত, বাহন হিসেবে গাধা, ঘোড়া, উট। যাই হোক, এই পশুপালনের জন্যই মানুষের জীবনযাত্রায় দেখা দিল পরিবর্তন—সুরু হ'ল মানুষের যাযাবর জীবন, অর্থাৎ কোথাও স্থায়ী আস্তানা না গেড়ে এখানে ওখানে ক্রমাগত ঘুরে বেড়ানো। জীবজন্তু পুষতে হলে তাদের খাওয়াদাওয়ার কথাও তো ভাবতে হবে! এক জায়গায় হয়তো প্রচুর ঘাস, গাছপালা। সেখানে কিছুদিন তাঁবু গেড়ে কাটাবার পর যখন সে ঘাসপালা ফুরিয়ে এল তখন আবার পাততাড়ি গুটিয়ে চল অন্য আশ্রয়ের খোঁজে।
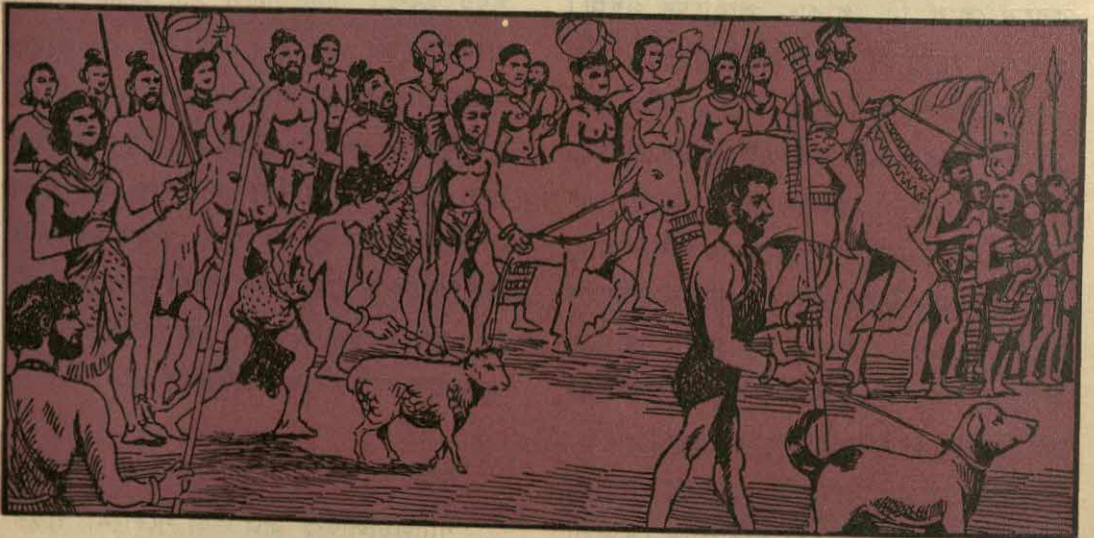
সুরু হ'ল মানুষের যাযাবর জীবন

এইভাবে বহুদিন ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে আবার এল মানুষের জীবনে নতুন অধ্যায়।

গাছ থেকে বীজ পাকলে মাটিতে ঝরে পড়ে, তাই থেকে হয় নতুন গাছ, তাতে ফলে নতুন ফসল। তা হলে ঐ ভাবে প্রকৃতির অনুকরণে নিজেরাও তো গাছ বুনে ফসল ফলানো যেতে পারে! এই থেকেই এল মানুষের মাথায় চাষ-আবাদের বুদ্ধি। বুনো ফল আর বুনো ফসল—জংলী গম আর যবের সঙ্গে মানুষের ইতিমধ্যেই পরিচয় হয়ে থাকবে। তাই নিয়েই সূত্রপাত হ'ল মানুষের প্রথম চাষবাস। আবার চাষবাস করতে হলে সেই ফসলের ক্ষেতের কাছেই থাকা দরকার—তখন আর ঘুরে বেড়ালে চলবে না। যাযাবর মানুষ এবার এক জায়গায় স্থায়ী ঘর বাঁধতে শিখল। ফসল ফলানোর জন্য সর্বদা হাতের কাছে জলের দরকার। সুতরাং কোন নদী বা হ্রদ বা ঝিলের ধারেই সুরু হ'ল এই বসতি। তার পর ঘরসংসারী মানুষ কি করে প্রয়োজনের খাতিরে একটার পর একটা গৃহস্থালীর নানা সরঞ্জাম তৈরী করতে শিখল ইতিহাসের কথায় তা তোমরা পড়েছ। প্রস্তর যুগেই কিন্তু এত সব কাণ্ড ঘটে গেছে। এর পর মানুষ যখন তামা প্রভৃতির ব্যবহার শিখল তখন দিকে দিকে সুরু হ'ল মানুষের জয়যাত্রা। মানুষ সমাজ গড়ল, গোষ্ঠী গড়ল, গ্রাম পত্তন করল, শহর গড়ে তুলল। সুরু হ'ল এক গোষ্ঠীর সঙ্গে আর এক গোষ্ঠীর জিনিসপত্র আদানপ্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, বন্ধুত্ব, ঝগড়াঝাঁটি, যুদ্ধ-বিগ্রহ—আরও কত কি! ইতিহাসের পাতায় তা লেখা হয়ে আছে। সেই সভ্যতার স্রোত আজও বয়ে চলেছে সমানে।

নদী, হ্রদ বা ঝিলের ধারেই সুরু হ'ল বসতি

মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর তফাৎ কোথায়

মানুষের কথা বলতে গেলে যেমন মানুষের সভ্যতার ইতিহাস আপনি এসে পড়ে তেমনি আরও কতকগুলি বিষয় নিয়েও আলোচনা করতে হয়। যেমন অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের শারীরিক গড়নের পার্থক্য, মানুষে মানুষে চেহারার পার্থক্য, বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের হালচাল, রীতিনীতি, মানুষের ওপর পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাব ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা এই সমস্ত নিয়েই গবেষণা করে চলেছেন আর মানুষের এই বিজ্ঞানের নাম দিয়েছেন অ্যান্‌থ্রপলজি। অ্যান্‌থ্রপস্ কথাটার মানে হচ্ছে মানুষ, তাই থেকেই অ্যান্‌থ্রপলজি। সংস্কৃতেও নৃ শব্দ থেকেই নর অর্থাৎ মানুষ কথাটির উৎপত্তি, তাই মানুষের এই বিজ্ঞানকে সাধুভাষায় বলা হয় নৃতত্ত্ব। নৃতত্ত্বেরও
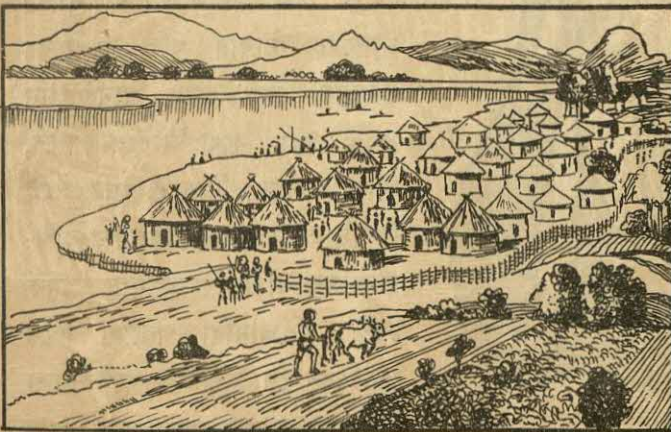
আবার নানান্ শাখা আছে। তার সবগুলো নিয়ে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়, বেছে বেছে গুটিকয়ের কথাই বলব।

অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের শরীরের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে প্রথমেই যা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে মানুষের খাড়া হয়ে দাঁড়ানো আর ছু' পায়ে হাঁটা। অন্য প্রাণীদের মধ্যে চারপায়ে-হাঁটা প্রাণীই আমাদের চোখে বেশী পড়ে। কেউ কেউ বুকে ভর দিয়ে বা লতার মত লতিয়ে লতিয়েও চলে। অবশ্য ছু'-পেয়ে জানোয়ার হয়তো আরও আছে (পাখীকেও তো ছু'-পেয়ে বলা যায়) কিন্তু তারা কেউই মানুষের মত অমন ভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারে না। বনমানুষ অর্থাৎ শিম্পাঞ্জী, ওরাং ওটাং বা গরিলা জাতের যে সব প্রাণীকে মানুষের নিকট জ্ঞাতি বলে ধরা হয় তারাও ঠিক মানুষের মত সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না। চলবার সময় লম্বা হাতের সাহায্য নিতে হয় তাদের, চলার ভঙ্গীও যেন কেমন টলমলে! এদের পায়ের গড়নও মানুষের মত নয়, সে পায়ের আঙ্গুলগুলো হাতের আঙ্গুলের মতই লম্বা আর তা দিয়ে হাতের মতই ডালপালা আঁকড়ে ধরা যায়। মানুষের কিন্তু সমস্ত শরীরের ভারটাই পড়েছে পায়ের ওপর, পায়ের গড়নও তাই হয়েছে সেই রকম। পায়ে স্প্রিংএর মত ব্যবস্থা থাকায় ছু' পায়ে চলতে তার কোন অসুবিধা হয় না, মেরু-দণ্ডও মাথার হাড়ের ঠিক মাঝখানে এসে লাগায় মাথা সোজা রাখতে তার কোন কষ্ট হয় না। চোখ ছু'টো পাশাপাশি থাকায় সব জিনিস সে একসঙ্গে ছু'চোখ দিয়ে দেখে—যা সব জানোয়ারের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের শরীরের কথায় (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০) এ সব তোমরা আগেই পড়েছ।

মানুষের নিকট জ্ঞাতি গরিলাও মানুষের মত সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না।

কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মগজ আর তার সঙ্গে যোড়া সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলী বা নার্ভ। মানুষের মাথার খুলি শরীরের তুলনায় বেশ বড়—অনেকখানি মগজ তার মধ্যে আঁটতে পারে, আর তোমরা নিশ্চয়ই জান এই বিরাট মগজের জন্যই মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি অন্য প্রাণীদের তুলনায় অনেক বেশী। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে আধুনিক যুগের সভ্য মানুষদের মাথায় গড় পড়তা প্রায় দেড় হাজার মিলিলিটার মগজ

থাকে বা থাকবার জায়গা আছে, কিন্তু মানুষেরই নিকটতম জ্ঞাতি বিরাটকায় গরিলার মাথায় বড় জোর চার শ' কি পাঁচ শ' মিলিলিটারের বেশী মগজ পাওয়া যায় নি। এদেশে নতুন মাপ চালু হবার পর লিটার কাকে বলে তোমরা নিশ্চয়ই জান। মিলিলিটার হচ্ছে এক লিটারের হাজার ভাগের এক ভাগ। এক ঘন সেন্টিমিটার (সি. সি.) আর এক মিলিলিটার আয়তনে প্রায় সমান।

শুধু তাই নয়, মানুষের শিশু যখন জন্মায় তখন তার মাথার হাড়, হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে, অনেকটা নরম থাকে। এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, হাড়ের ভিতরকার মগজ বা মস্তিষ্ক যাতে ঠিক মত বাড়তে পারে —কোন বাধা না পায় তারই জন্যই মনে হয় এই ব্যবস্থা। এর ফলে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের বাচ্চাদের 'মানুষ' হতে অনেক বেশী সময় লাগে। একটি দেড়বছরের-দু'বছরের মানুষের শিশু আমাদের কাছে কতই না বাচ্চা, নিজে সে প্রায় কিছুই করতে পারে না, বোঝেও না অনেক কিছু। কিন্তু ঐ বয়সেরই একটি গরু বা বেড়াল বা কুকুরকে দেখ, সে তখন দিব্যি জোয়ান—প্রায় পূর্ণবয়স্ক প্রাণীর মতই তার হালচাল। হয়তো ঐ বয়সেই তার নিজেরই বাচ্চা জন্মাতে সুরু করেছে।

অন্যান্য প্রাণীদের—বিশেষ করে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বেলায় বাচ্চারা শৈশবে মায়ের কাছে থেকে থেকে তাদের দেখে দেখে যা কিছু শিখবার শিখে নেয়। ঐ সময়ে তাদের খাওয়াবার ভারও থাকে প্রধানতঃ মায়ের ওপর। কিন্তু একটু বড় হলেই মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, বাপের সঙ্গে তো থাকেই না। পরে হয়তো সন্তান মাকে কিংবা মা সন্তানকে চিনতেই পারে না। কিন্তু মানুষের বেলা সম্পূর্ণ আলাদা নিয়ম। মা-বাবা বহুদিন পর্যন্ত সন্তানের দায়িত্ব বহন করে। শুধু মা-বাবাই নয়, সমাজের কাছ থেকেও সে অনেক কিছু শেখে। শুধু তাদের অনুকরণ করেই নয়, ভাষার সাহায্যেও। এই ভাষা মানুষের বেলা যেমন পূর্ণতা পেয়েছে অন্য কোন প্রাণীর বেলা তার ধারে-কাছেও আসতে পারে নি।

মানুষে মানুষে তফাৎ

অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের শারীরিক এবং মানসিক পার্থক্যের কথা ছেড়ে এবার মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তাইতেই আসা যাক।

পৃথিবীতে হরেক রকম মানুষ। যে কোন বড় শহরে গেলেই দেখবে কত রকম মানুষ—কত রকম তাদের চেহারা! কারো মুখের আদল আলাদা, কারো গায়ের রং আলাদা, কারো পোশাক আলাদা, কারো ভাষা আলাদা। কেউ ধবধবে ফরসা, কেউ কুচকুচে কালো, কারো বা গায়ের রং বাদামী, কেউ বা হলদে। চোখের গড়ন, নাকের গড়ন, মাথার গড়ন, চুলের গড়ন—কত কিছুতে তফাৎ চোখে পড়বে! কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা সবাই মানুষ। মানুষের যা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য তা এদের সকলের মধ্যেই আছে। যদি গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া যায় তা হলে একটি থেকে আর একটির কোন তফাৎ বোঝা যাবে না।

কিন্তু তবু এদের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে এবং সেই তফাৎ খুঁজে বার করেই বিজ্ঞানীরা

পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের মানুষকে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করে ফেলেছেন। এই আলাদা আলাদা ভাগের মানুষকেই বলা হয় মানুষের এক-একটা জাতি বা চলতি কথায় জাত। ইংরেজিতে একেই বলা হয় 'রেস্'।

জাত বলতে কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে যে জাতিভেদ প্রথা আছে তার সঙ্গে গোলমাল করে ফেলো না। বিজ্ঞানীরা যে ভাবে মানুষকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করেছেন তাতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা বৈদ্য—এরা সব এক জাতিতেই পড়ে। জাতি বলতে এখানে বৃহত্তর পার্থক্যের কথাই বুঝতে হবে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে জাতিভেদ

এই জাতিবিচার কয়েক ভাবে করা যেতে পারে। প্রায় শ' দুই বছর আগে এক জার্মান্ পণ্ডিত ফ্রেডরিক ব্লুমেন্‌বাক পৃথিবীর মানুষকে পাঁচটি জাতে ভাগ করেছিলেন। এদের বলা হ'ত ককেশিয়ান্ (সাদা জাত), মোঙ্গোলিয়ান্ (হলদে জাত), ইথিওপিয়ান্ (কালো জাত), আমেরিকান্ ইণ্ডিয়ান্ (লাল জাত) আর মালয়ান্ (তামাটে জাত)। বহুদিন ধরে এই পদ্ধতিতেই মানুষের জাত বিচার করা হ'ত। কিন্তু পরবর্তী যুগে ও-ভাবে জাত বিচার না করে প্রধানতঃ তিনটি জাতে মানুষকে ভাগ করার প্রথা চালু হ'ল। এ তিনটি হ'ল—ককেশিয়ান্ বা সাদা জাতের মানুষ, মোঙ্গোলয়েড্ বা হলদে জাতের মানুষ আর নিগ্রোয়েড্ বা কালো জাতের মানুষ। এখনও মোটামুটি এই পদ্ধতিটা অনেক বিজ্ঞানীই মেনে চলেন, তবে এ পদ্ধতিটাতেও ঠিক ঠিক মানুষের জাত বিচার হয় বলে সবাই মনে করেন না। তাই আরও নতুন নতুন পদ্ধতি খুঁজে বার করা হচ্ছে। আসল কথা, আজ পৃথিবীর এক অঞ্চলের লোকের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের লোকের মেলামেশা এত বেড়ে গেছে যে তার ফলে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বিবাহাদি হয়ে কোন একটি খাঁটি জাতের মানুষ খুঁজে বার করা কষ্টকর। সন্তানের মধ্যে বাবা-মা দু'জনেরই কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য এসে পড়ে। সুতরাং জাতে জাতে মিশে সঙ্কর জাতের সংখ্যাই দাঁড়াচ্ছে বেশী। তা ছাড়া এক জাতের মানুষ তার নিজের দেশ ছেড়ে গিয়ে অন্য দেশে নতুন পরিবেশে বাস করার ফলেও তার নিজের জাতের বৈশিষ্ট্য অনেকটা হারিয়ে ফেলছে। যেমন ধর, জাপানীরা সাধারণতঃ একটু বেঁটে জাত। কিন্তু ওরাই দু'-এক পুরুষ আমেরিকায় কাটিয়ে দিব্যি লম্বা হয়ে যাচ্ছে।

তিন জাতের মানুষ

ওপরে যে তিনটি জাতের কথা বললাম তাদের শুধু গায়ের রং-ই নয়, চুলের গড়ন অনুসারেও ঐ ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমেই ধরা যাক ককেশিয়ান্‌দের

কথা। এরা সাধারণতঃ ছড়িয়ে আছে ইয়োরোপ, ভূমধ্যসাগর অঞ্চল, নিকট প্রাচ্য আর ভারতবর্ষে। এদের প্রায় সকলেরই চুল ঢেউ-খেলানো, তবে সে চুলের রং কখনও কালো কখনও কটা। এদের নাক টিকোলো, মাথার খুলি চওড়া অথবা লম্বা; গায়ের রং অবশ্য সকলের ঠিক এক রকম নয়। যারা ইয়োরোপে থাকে তাদের গায়ের রং ফরসা বা সাদা, কিন্তু যারা ভারতবর্ষে থাকে তাদের রং ঈষৎ তামাটে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা নিজেদেরকে আর্যসন্তান বলি তারা সকলেই এই জাতের লোক।

মোঙ্গোলীয়ান্‌দের চুল কিন্তু পাৎলা আর সোজা সোজা। এদের নাক খ্যাঁদা, চোখ ছোট ছোট এবং বোঁজা বোঁজা, গালের হাড় উঁচু। দাড়ি-গোঁফও এদের বেশী হয় না। গায়ের রং হলদে, তাই এদের বলা হয় পীত জাতি। এরা থাকে চীন, জাপান, মোঙ্গোলিয়া, ভিয়েৎনাম, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ এবং তিব্বতে। এমন কি আসাম-ত্রিপুরা অঞ্চলেও এদের যথেষ্ট দেখা যায়। এশিয়ার বাইরে আমেরিকার এস্কিমোরাও এই জাতের।

নিগ্রোদের চুল খুব ঘন পশমের মত আর কোঁকড়ানো। গায়ের রং খুব কালো, নাকও থ্যাবড়া—কিন্তু মোঙ্গোলিয়ান্‌দের মত নয়। আফ্রিকার নানা অঞ্চলে এরা বাস করে। তা ছাড়া মালয়েশিয়া, আন্দামান, নিকোবর প্রভৃতি দ্বীপেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। আজকাল এরা ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ছে। আমেরিকায় এদের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গেছে, যার ফলে সেখানে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমেরিকার নিগ্রোরা কিন্তু এখন আর সবাই আফ্রিকার নিগ্রোদের মত অত কালো নয়।

জাত বিচারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

অবশ্য এই চুলের বা মুখের গড়ন আর গায়ের রং সাদা-কালো হবার কারণটা সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বলা যেতে পারে। যে সব গরম দেশে সূর্যের কিরণ খুব জোরাল সেখানে গায়ের চামড়াকে সূর্যের তেজ থেকে বাঁচাবার জন্যই প্রকৃতির এই ব্যবস্থা। চামড়ার নীচে মেলানিন বলে এক রকম কালো রং-এর দানা থাকলে সে চামড়া সূর্যের তেজ অনেকটা সহ্য করতে পারে। নিগ্রোদের দেশ আফ্রিকায় সূর্যের তেজ ভারী কড়া। সেই তেজকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যই তাদের চামড়ায় এই কালো দানা প্রচুর থাকা দরকার। নইলে চামড়া পুড়ে ঝলসে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। চামড়ার নীচে রক্ত-চলাচল বেশী হলেও চামড়ার রং কিছুটা কালো দেখায়। গরম দেশে সাধারণতঃই এই রক্ত-চলাচল একটু বেশী হয়। আমাদের দেশেও সূর্যের তাপ বড় কম নয়। তাই আমাদের চামড়ার নীচেও এই কালো দানা মেলানিন খানিকটা থাকা প্রয়োজন, এবং আছেও। তবে নিগ্রোদের মত অত বেশী নয়। সেই জন্যই আমাদের দেশের লোকেরাও কিছুটা কালোই বলা যেতে পারে—কিংবা বড় জোর বলতে পার "উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ"। বিয়ের সময় বাড়ীর বৌটি মেমের মত ফরসা আসুক এ অনেক শ্বশুর-শাশুড়ীই চান। কিন্তু গরম দেশের প্রকৃতিই যে তাতে বাদ সাধছেন এ কথা তাঁদের মনে থাকে না।

শীতপ্রধান দেশে সূর্যের তেজ অনেক কম,
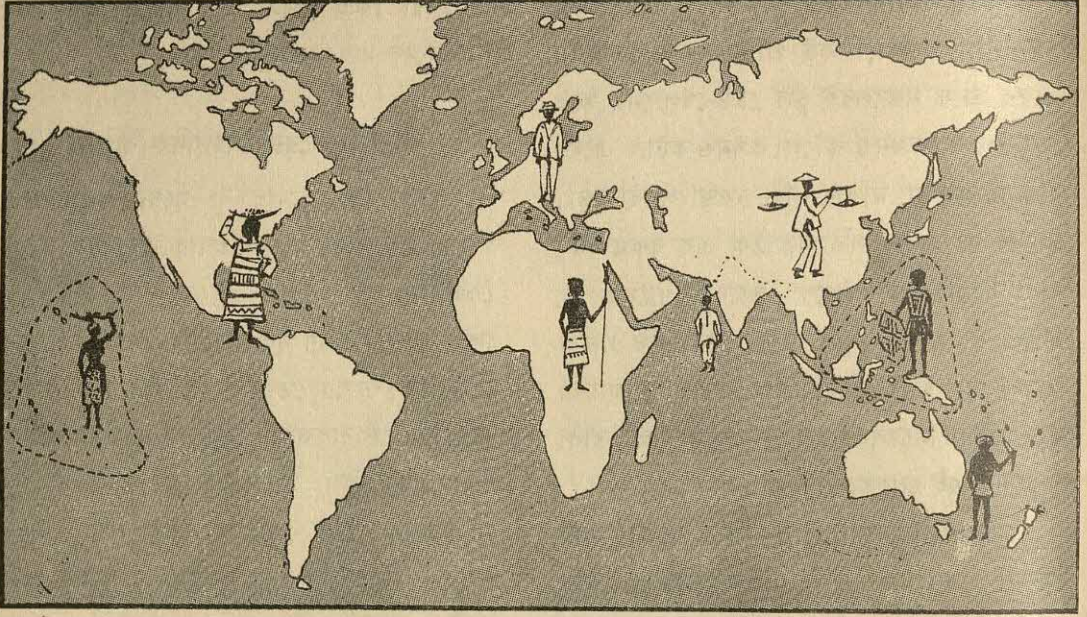
পৃথিবীর নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে নানা জাতি, তাই থেকে করা হয়েছে ভৌগোলিক জাতিভেদ

সেখানকার মানুষদের তাই ঐ রকম চামড়া-বাঁচানো কালো দানার দরকার করে না। তাই তাদের রং সাদা। এমনও দেখা গেছে যে সাদা চামড়ার মানুষ দীর্ঘ দিন গরম দেশে কাটানোর ফলে তার গায়ের রং আর সাদা থাকছে না—তামাটে হয়ে যাচ্ছে। ওদের ভাষায় যাকে বলে 'ট্যান্‌ড্‌' চামড়া।

ঠিক এই রকম বৈজ্ঞানিক কারণেই গরম দেশের লোকের চুল এবং চোখের তারাও কালো। ইয়োরোপের মত কটা চোখ বা লালচে চুল ভারতে বা কোন গরম দেশে কখনই দেখতে পাবে না।

নিগ্রোদের শুধু রং-ই কালো নয়—নাকও চ্যাপ্টা এবং চওড়া। এই নাকের গড়ন ঐ রকম হওয়ার কারণও ও-দেশের গরম আবহাওয়া। পক্ষান্তরে শীতের দেশ ইয়োরোপের লোকদের নাক উঁচু ও খাড়া হওয়ার কারণ—নিঃশ্বাসের বাতাস যাতে নাকে গিয়ে আগেভাগেই একটু গরম হয়ে তার পর ফুসফুসে যেতে পারে।

ঐ ভাবে নিগ্রোদের কোঁকড়ানো চুলেরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তেমনি আবার মোঙ্গোলিয়ান্‌দের গালের হাড় উঁচু হওয়া বা চোখ বোঁজা বোঁজা হওয়ার কারণ দেখিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কারণ আর কিছু না, ওখানকার জল-হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যই ওগুলো ও-রকম। ও-সব অঞ্চলে তুষার-আক্রমণ একটা স্বাভাবিক ঘটনা। গালের হাড় উঁচু হয়ে মুখ চ্যাপ্টা হলে এই আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। তেমনি চোখের পাতায় যদি চর্বি বেশী থাকে তবে তার ভারে চোখটা বোঁজা বোঁজা হবে, তাতেও তুষার-আক্রমণ ঠেকানো যাবে খানিকটা।

দাড়ি-গোঁফ কম হবারও ঐ রকম বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ভৌগোলিক জাতিভেদ

জাতিভেদের আরও নতুন নতুন পদ্ধতির কথা আগেই বলেছি। এর একটা হচ্ছে ভৌগোলিক জাতিভেদ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হচ্ছে—(১) ইয়োরোপীয়ান্। অবশ্য এদের মধ্যে খাঁটি ইয়োরোপীয় ছাড়াও উত্তর-আফ্রিকা, পশ্চিম-এশিয়া, আমেরিকান্ (আদিম আমেরিকান্ নয়—যারা পরে গিয়ে ওদেশে বাস করছে তারা), ইয়োরোপ-আগত অষ্ট্রেলিয়ান্ ইত্যাদি লোকেরাও পড়ে। এরা সাধারণতঃ ফরসা (কেউ কেউ তামাটে), গোঁফ-দাড়িওয়ালা এবং মোটামুটি লম্বা জাত। (২) আফ্রিকান্। আফ্রিকার নিগ্রোরা তো বটেই, আরো কোন কোন দেশের কালো জাত এদের মধ্যে পড়ে। এরা সকলেই কালো। কোঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট, ঠেলে-আসা চোয়াল এদের বৈশিষ্ট্য। (৩) এশিয়াটিক্। উত্তর-এশিয়ার পীত জাতি, তা ছাড়া ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশের লোকদের এই দলে ফেলা হয়েছে। চোখের পাতায় ভাঁজ, উচু গালের হাড়, সাধারণতঃ হলদে গায়ের রং, কালো চুল ইত্যাদি এদের বিশেষত্ব। (৪) ইণ্ডিয়ান্। ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের লোক। এদের গায়ের রং শ্যাম—কালোর দিকেই বলা চলে, কিন্তু চুল ঢেউ-খেলানো এবং কালো। নাক, ঠোঁট প্রভৃতির গড়নেও অনেকটা ইয়োরোপীয়দের সঙ্গে মিল আছে। (৫) অষ্ট্রেলিয়ান্। এদের ভ্রূ কোঁচকানো, দাঁত বড় বড়, চুল খুব বেশী। কেউ কেউ এদের নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বংশধর বলে সন্দেহ করেন। এরা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতি, সংখ্যায় খুব বেশী নয়। (৬) মেলানেসিয়ান্। নিউগিনী, মেলানেসিয়া প্রভৃতি দ্বীপে এদের বাস। এদের চেহারায় একটু নিগ্রো ছাপ আছে, রংও কালো। তবে তফাৎও আছে অনেক বিষয়ে। (৭) পলিনেসিয়ান্। নিউজিল্যাণ্ড এবং তার আশপাশ ঘিরে এদের বাস। এদের দাঁতের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। চেহারায় একটু মোঙ্গোলীয় ভাবও আছে। হয়তো তাদের সঙ্গে এদের জ্ঞাতিত্বও থাকতে পারে। (৮) আমেরিণ্ডিয়ান্। এরা থাকে দক্ষিণ-আলাস্কা থেকে সুরু করে দক্ষিণ-আমেরিকার ওপর

ইয়োরোপীয় | আফ্রিকান | এসিয়াটিক | ইণ্ডিয়ান
অষ্ট্রেলিয়ান | মেলানেসিয়ান | পলিনেসিয়ান | আমেরিণ্ডিয়ান

ভৌগোলিক জাতিভেদের আটটি ভাগ

মেয়ে বুশ্‌ম্যান্

দিক্‌টায়। চেহারায় এদেরও মোঙ্গোলীয়দের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। এরাই ঐ অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। রেড-ইণ্ডিয়ান্‌রা এদেরই সগোত্র।

এ ছাড়া আফ্রিকার বুশ্‌ম্যান্, হটেন্‌টট্, জাপানের আইনু প্রভৃতি আরও কয়েকটি জাতকে পৃথক্ ভৌগোলিক জাত বলে অনেকে মনে করেন। তা ছাড়াও আছে নানা দেশের আদিবাসী বা খণ্ডজাতি। আমাদের দেশেও

জাপানের আইনু

আছে—সাঁওতাল, কোল, ভীল, টোডা, নাগা ইত্যাদি কত জাত! নৃতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে এদের মূল্য খুব বেশী। কেন, সে কথা পরে বলব।

কি করে জাত চেনা যায়

কোন মানুষের জাত ঠিক করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা নানা রকম প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির সাহায্য নেন। একটি মজার পদ্ধতি হচ্ছে মাথার খুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে সবচেয়ে বেশী

নাগা

যে দৈর্ঘ্য পাওয়া যাবে তাকে সবচেয়ে বেশী প্রস্থ দিয়ে ভাগ করা। তার পর সেই ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যাবে সেইটেই হচ্ছে ঐ মানুষের জাত চিনবার বিভিন্ন উপায়ের একটি। সংখ্যাটি যদি ৮২-র বেশী হয় তা হলে বুঝতে হবে লোকটি ছোট মাথাওয়ালা জাতের লোক। আর যদি ৭৭-এর নীচে হয় তবে বুঝতে হবে লোকটি বড় মাথাওয়ালা কোন জাতের হবে। এই রকম আরও নানা উপায় মিলিয়ে বিজ্ঞানীরা তাঁদের মতামত খাড়া করেন।
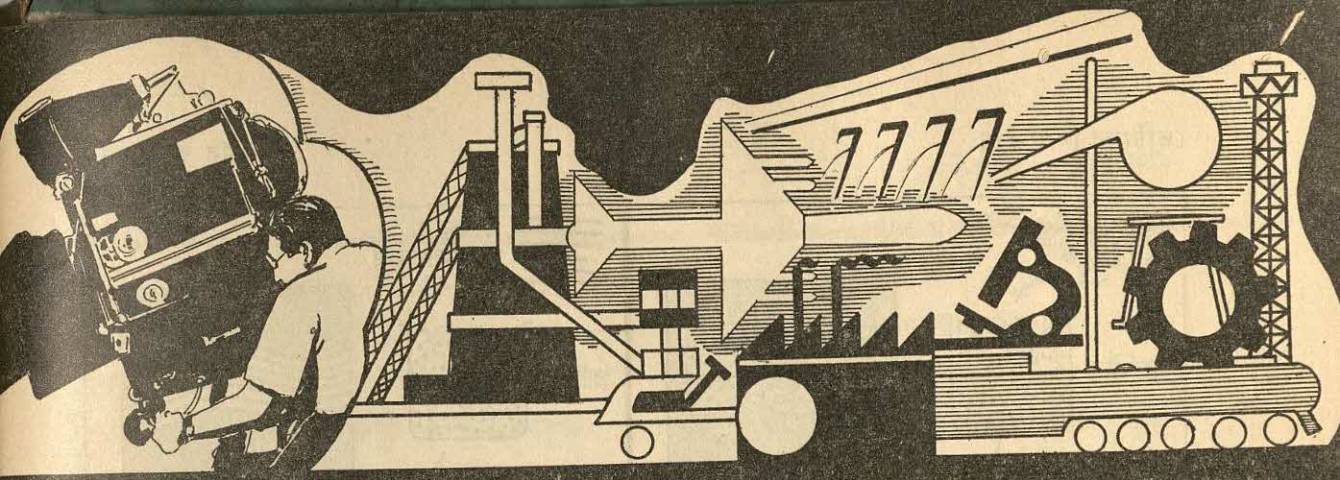
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

আবার নতুন যুগের পদক্ষেপ

প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ, লৌহযুগ। তারপর?

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এই লৌহযুগের সূচনা হয়েছে আজ অনেক দিন। আর আমাদের জন্ম থেকেই আমরা সে যুগে বাস করছি। সাম্প্রতিক কালে লোহার সঙ্গে অন্যান্য ধাতু মিশিয়ে নানা রকম অ্যালয় স্টীল আবিষ্কার হবার পর থেকে লোহা যেন আমাদের জীবনে অনেক জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু, তা সত্বেও, লোহার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। তার নাম প্ল্যাস্টিক। বিজ্ঞানীরা বলছেন, লৌহযুগ বুঝি এবার শেষ হয়ে এল, এবার সুরু হবে প্ল্যাস্টিক যুগ। অন্তরীক্ষে তার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন তাঁরা।

কল্পনায় যেন দেখতে পাচ্ছি সে যুগের চেহারা।

সারি সারি বিরাট আকাশ-ছোঁয়া বাড়ী। ঝক্ ঝক্ করছে তার দেয়াল। দেয়ালের ভিতর দিয়ে দিনে ভেসে আসছে সূর্যের আলো, রাত্রে উপছে পড়ছে জ্যোৎস্নার বান। এখানে সেখানে রঙের খেলা—ইচ্ছেমত যেন রঙের তূলি টেনে গিয়েছেন শিল্পী। হবে না কেন, সে বাড়ীর প্রত্যেকটি ইটই যে প্ল্যাস্টিক দিয়ে তৈরী!

ঘরের ভিতরকার দেয়ালে হাল্কা রঙের প্ল্যাস্টিকের পলেস্তরা। দেয়ালে ঝুলছে প্ল্যাস্টিকের ফ্রেমে প্ল্যাস্টিকের পাতের ওপর প্ল্যাস্টিকের রঙে আঁকা কয়েকখানা সুদৃশ্য ছবি। একধারে একটা আলমারি,—আগাগোড়া প্ল্যাস্টিকের তৈরী সেটা। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো আসবাবপত্র—চেয়ার, টেবিল, সোফা—সেগুলোও সব প্ল্যাস্টিকের তৈরী, এমন কি গদীগুলো পর্যন্ত। জানালায় পাৎলা প্ল্যাস্টিকের পর্দা ঝুলছে, মাথার ওপর ঘুরছে প্ল্যাস্টিকের পাখা। টেবিলে রয়েছে প্ল্যাস্টিকের চিরুণী, ব্রাশ, ছাইদানী, পাউডার-কেস, ফুলদানী। ফুলদানীতে নকল প্ল্যাস্টিকের ফুল, কিন্তু দেখাচ্ছে টাটকা ফুলের মত। ঘরের এক কোণে একটা টেলিভিশন সেট্, সেটাও প্ল্যাস্টিকের তৈরী।

হঠাৎ পাশের ঘরে কচি ছেলের কান্নার শব্দ শোনা গেল। প্ল্যাস্টিকের খাটে, প্ল্যাস্টিকের বিছানায় জন্মগ্রহণ করল একটি ছোট্ট খোকা। ডাক্তার-নার্সেরা প্ল্যাস্টিকের যন্ত্রপাতি নিয়ে
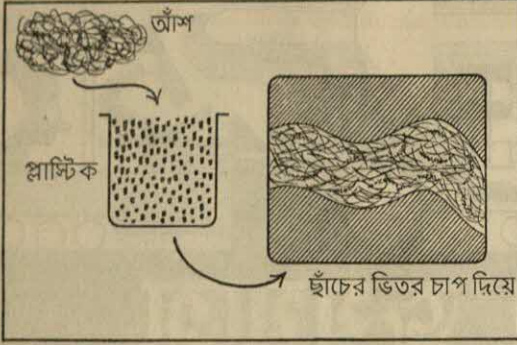
প্লাস্টিকের ভেতর শক্ত জিনিসের আঁশ ভরে দিয়ে তাকে আরও মজবুত করা যায়।
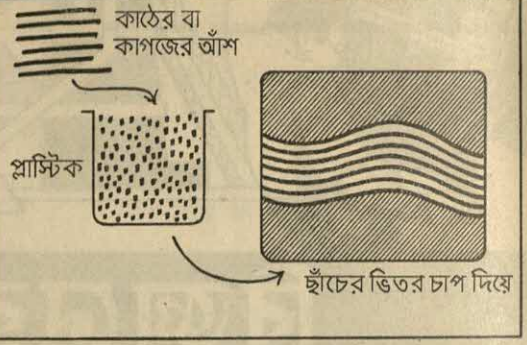
কাঠ বা কাগজের আঁশ দিয়ে তৈরী পাতের সঙ্গে তরল প্লাস্টিক মিশিয়ে তাদের বেমালুম যুড়ে দেওয়া যায়।

আগেই তৈরী ছিলেন। খোকাকে তাই দিয়ে পরীক্ষা করা হ'ল, প্লাস্টিকের ওজনযন্ত্রে ওজন নেওয়া হ'ল তার। তারপর প্লাস্টিকের একটা টবে বাচ্চাটিকে নিয়ে স্নান করিয়ে, প্লাস্টিকের তোয়ালে দিয়ে ভাল করে মুছিয়ে, শুইয়ে দেওয়া হ'ল প্লাস্টিকের কটে। ওষুধপত্র যা কিছু সবই বার করে নেওয়া হ'ল প্লাস্টিকের শিশি-বোতল থেকে। স্নানের জল এল প্লাস্টিকের নলের ভিতর দিয়ে প্লাস্টিকের কল খুলে। ঈষদুষ্ণ সে জল গরম করে নেওয়া হ'ল প্লাস্টিকের তৈরী বৈদ্যুতিক স্টোভে।

খোকা একটু একটু করে বাড়তে লাগল। চোখ খুলে সে যা কিছু দেখছে সবের মধ্যেই প্লাস্টিক। তার চুষিকাঠি থেকে সুরু করে খেলনা, পুতুল, দুধের বোতল, এমন কি বেড়াবার ঠেলাগাড়ীটিও প্লাস্টিকের তৈরী। তার যাবতীয় প্রসাধন-সামগ্রী—চিরুণী-বুরুশ, সাবানের কেস, পাউডারের কৌটা,—তার পোশাক-পরিচ্ছদ—জামা-কাপড়—মোজা-জুতো, গায়ে দেবার কম্বল—সবই প্লাস্টিকের তৈরী।

আরও বড় হ'ল খোকা। স্কুলে যেতে সুরু করেছে এবার। স্কুলের মোটর-বাসে চড়ে রোজ স্কুলে যায়। সেই গাড়ীর বডি, কলকব্জা, বসবার আসন—সবই প্লাস্টিকের তৈরী। স্কুলে গিয়েও সে সর্বত্র দেখছে প্লাস্টিক। বসবার বেঞ্চ, ডেস্ক, ব্ল্যাকবোর্ড প্লাস্টিকের তৈরী; লিখবার খাতা, বই, কলম—সবের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে
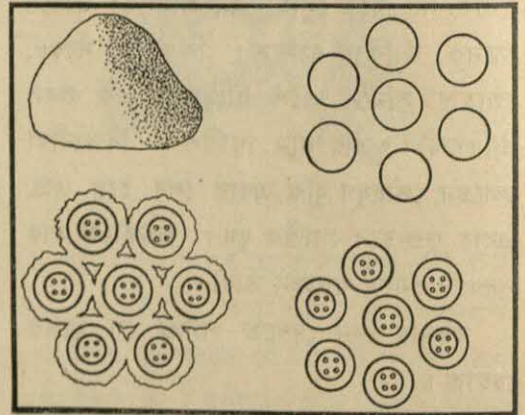
প্লাস্টিকের তাল থেকে তৈরী বোতাম

প্লাস্টিক। পাঠ্য বয়ের মধ্যেও প্লাস্টিকের কথা নিশ্চয়ই পড়তে হচ্ছে তাকে—নইলে এক পাও এগোনো যাবে না কর্মক্ষেত্রে।

খেলার মাঠেও তাই। প্লাস্টিকের বল,

প্লাস্টিকের ব্যাট, প্লাস্টিকের হকি-স্টিক প্রভৃতি অধিকাংশ খেলার সরঞ্জামই প্লাস্টিকে তৈরী। ঘরে বসে খেলবার লুডো, ক্যারম, দাবা—কোথাও প্লাস্টিক আসতে বাকি নেই।

তারপর গোটা জীবনটাই তো পড়ে রয়েছে। কত আর বর্ণনা দেব? জীবনযাত্রার প্রতি পদে পদে প্লাস্টিক আর প্লাস্টিক আর প্লাস্টিক! কল্পনা নয়, প্লাস্টিকের চশমা চোখে এঁটে দেখছি প্লাস্টিকের পর্দায় সত্যি সত্যি ভেসে উঠছে সমস্ত ছবি। সব বাস্তব ছবি। প্লাস্টিক যুগ সত্যি এসে গেছে।

প্লাস্টিক কাকে বলে

প্লাস্টিক কথাটা এসেছে গ্রীক্ শব্দ প্লাস্টিকোস্ থেকে। কথাটার মানে যা ছাঁচে ঢালাই করা যায়। তা হলে তো প্রায় যে কোন কাদা কাদা জিনিসকেই প্লাস্টিক বলতে হয়! কিন্তু যে সব প্লাস্টিকের জিনিস আমরা দেখি তা তো, কই, অমন কাদা কাদা নয়!

সত্যি, ঠিক ঐ অর্থে প্লাস্টিক কথাটা আর এখন বলা চলে না। তবে তৈরী করার সময় সব প্লাস্টিকই একটা অবস্থায় ঐ রকম কাদা কাদা চেহারায় থাকে বলে নামটা এখনও বহাল আছে। তা ছাড়া কোন নাম একবার চালু হলে তা সহজে বদলানো কঠিন। তাই বিজ্ঞানীরাও ও নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করেন নি। নানা জাতের প্লাস্টিক বেরিয়েছে, একটার সঙ্গে আর একটার হয়তো কোনই সাদৃশ্য নেই, কিন্তু নাম এখনও ঐ এক।

সাদৃশ্য নেই বললাম বটে এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক বিভিন্ন জাতের হলেও একটা বিষয়ে কিন্তু সব প্লাস্টিকের মধ্যেই কতকটা মিল আছে। সেটা হচ্ছে ওর অণুর গঠন। তোমাদের মধ্যে যারা অণু-পরমাণু অর্থাৎ অ্যাটম্ আর মলিক্যুল সম্বন্ধে একটু-আধটু খবর রাখ তারা জান যে অণু তৈরী হয় পরমাণু দিয়ে। একই ধরণের পরমাণু দিয়ে একটা অণু তৈরী
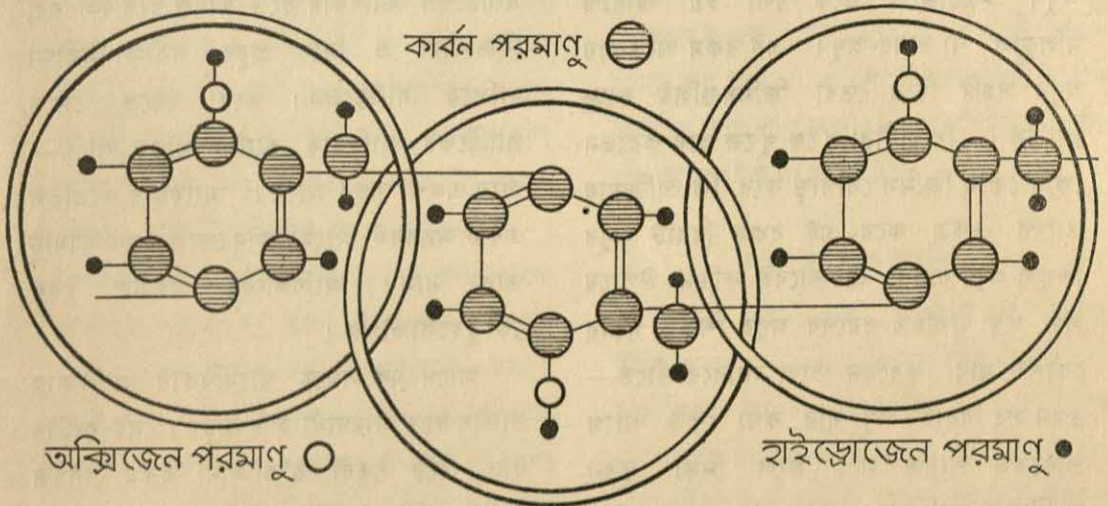
প্লাস্টিকের গঠন: অতিকায় অণুর শিকল দিয়ে তৈরী হয় প্লাস্টিক

হতে পারে, আবার বিভিন্ন ধরণের পরমাণু দিয়েও একটা অণু গড়ে উঠতে পারে। এখন, সব প্ল্যাস্টিকের মধ্যেই আছে কার্বন বা অঙ্গার—অর্থাৎ কার্বনের পরমাণু। আর ঐ কার্বনের পরমাণুর একটা গুণ হচ্ছে এই যে ওরা নিজেদের মধ্যে একটার সঙ্গে একটা ক্রমাগত যুড়ে যুড়ে লম্বা অণুর শিকল গড়তে পারে—যে ক্ষমতা অন্য কোন পরমাণুর নেই। ঐ অণুগুলোর মধ্যে কার্বন ছাড়া অন্য পরমাণুও ওরা ঢুকিয়ে নেয়—যেমন অক্সিজেনের পরমাণু, হাইড্রোজেনের পরমাণু, নাইট্রোজেনের পরমাণু বা ঐ রকম অন্য কোন পরমাণু। এইভাবে সেই অণুর শিকল বেড়ে বেড়ে এত বড় একটা অণু তৈরী হতে পারে যাকে বলা যায় অতিকায় অণু। ইংরেজিতে ওকে বলা হয় 'জায়ান্ট মলিক্যুল' বা দানব-অণু। এই রকম অতিকায় অণুর সমষ্টি দিয়ে তৈরী জিনিসগুলিই হচ্ছে প্ল্যাস্টিক। বিজ্ঞানীরা খুঁজে খুঁজে বার করছেন কোন্ কোন্ জিনিস যোগাড় করে, কি প্রক্রিয়ায় তাদের একত্র করে এই রকম বিরাট অণুর শিকল গড়া যায়। এইভাবেই কৃত্রিম উপায়ে লম্বা লম্বা বিচিত্র ধরণের অণুর শিকল গড়ার কৌশল বার করছেন তাঁরা ল্যাবরেটরীতে—এমন সব বিরাট অণু যার কথা কেউ আগে ভাবতেও পারত না। ফলে নিত্য নূতন প্ল্যাস্টিকের আবিষ্কার হচ্ছে—যার এক-একটার গুণ এক-এক রকম। সেই যে একটা কথা আছে না, 'খোদার ওপর খোদকারী',—এও যেন তাই। ছোট ছোট এক রকমের অণুগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'মেনোমার' (মোনো = এক), আর অতিকায় অণুগুলো, যা নাকি একই রকম কতকগুলি মোনোমার নিয়ে তৈরী হয়েছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'পলিমার'। আবার বিভিন্ন রকমের মোনোমার মিশিয়েও অতিকায় অণু তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'কো-পলিমার'। আর এইভাবে পলিমার তৈরীর পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে 'পলিমারিজেশন্'।

প্রথম প্ল্যাস্টিক

আমাদের দেশে প্ল্যাস্টিক জিনিসটার আমদানী অনেকটা হাল আমলের বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই ওটা এদেশে বিশেষ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে পাশ্চাত্য দেশে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেই নানা রকম প্ল্যাস্টিকের আবিষ্কার হতে আরম্ভ হয়েছিল এবং বিজ্ঞানীরা ও নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তবে ধরতে গেলে প্ল্যাস্টিকের আবিষ্কার হয়েছে আরও আগে—প্রায় একশ' বছর আগে। আবিষ্কার করেছিল একটি অল্পবয়সী আমেরিকান্ ছেলে—জন্ হায়াট্ তার নাম। আবিষ্কারের গল্পটিও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

আগে এক সময়ে আমেরিকায় আফ্রিকার হাতীর দাঁত আমদানী হ'ত প্রচুর। সেই হাতীর দাঁত দিয়ে তৈরী হ'ত নানা রকম সৌখীন জিনিস—বিশেষ করে মেয়েদের। যেমন ধর চিরুনী। আর তৈরী হ'ত বিলিয়ার্ড খেলার বল। ঐ সব হাতীর দাঁত বয়ে আনত নিগ্রো ক্রীতদাসরা। কিন্তু দাসপ্রথা উঠে গেলে হাতীর দাঁতের আমদানীও গেল কমে। ফলে যেটুকু আসত তার দাম চড় চড় করে বাড়তে লাগল।

যাঁরা বিলিয়ার্ড বল্ তৈরী করে ব্যবসা করতেন তাঁরা পড়লেন মুশকিলে। শেষে এক কোম্পানী ঘোষণা করলেন—কেউ যদি হাতীর দাঁতের অনুরূপ কোন রাসায়নিক পদার্থ বার করতে পারেন--যা দেখতে এবং গুণে হাতীর দাঁতের মত হবে, তা হলে তাঁকে দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

হায়াট্ কাজ করত একটা ছাপাখানায়, কিন্তু বিজ্ঞানের দিকে তার ছিল বরাবরই ঝোঁক। পুরস্কারটার কথা শুনে সে ভাবল, একবার চেষ্টা করে দেখা যাক না কেন! হায়াট্ পরীক্ষা করে চলেছে এমন সময় একটা দৈব ঘটনা এসে তাকে খুব সাহায্য করল। একদিন ছাপাখানায় কাজ করতে করতে তার হাত গেল কেটে। কাটা জায়গা যুড়বার জন্য সে সময়ে কলোডিয়ন জিনিসটা খুব ব্যবহার করা হ'ত। হায়াটের কাটা হাতে কলোডিয়ন ঢেলে দিতেই একটু পরে তা গেল জমে আর একটা স্বচ্ছ কাচের মত আবরণে জায়গাটা ঢেকে গেল। হায়াটের মাথায় টক্ করে বুদ্ধি এল—তা হলে এই কলোডিয়নটা কোন রকমে কাজে লাগানো যায় না? কলোডিয়ন তৈরী করতে ব্যবহার করা হয় নাইট্রোসেলুলোজ। হায়াট্ তাই তখন পরীক্ষা শুরু করল নাইট্রোসেলুলোজ নিয়ে। এই সময় একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী কর্পূর নিয়ে কাজ করছিলেন। কর্পূর যে কোন কোন জিনিসকে জমাট বাঁধিয়ে দিতে পারে এ তথ্যটি তিনি প্রকাশ করলেন। হায়াটের মাথায় আবার বুদ্ধি এল, সে এবার নাইট্রো-সেলুলোজের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে পরীক্ষা সুরু করল। আর আশ্চর্য, তাইতেই নকল হাতীর দাঁতের মত একটা জিনিস তৈরী হয়ে গেল! হাতীর দাঁতের মতই শক্ত, ঐ রকম দেখতে, ঐ রকম চক্চকে। উপরন্তু ছাঁচে ফেলে ইচ্ছেমত চেহারাও দেওয়া যায় ওকে, সেই সঙ্গে রং মিশিয়ে রঙিনও করে নেওয়া যায়। এই জিনিসটির নাম দেওয়া হ'ল সেলুলয়েড। এই সেলুলয়েডকেই বলা যায় প্ল্যাস্টিকের পূর্বপুরুষ বা প্রথম প্ল্যাস্টিক।

হায়াট্ কিন্তু ঐ দশ হাজার ডলারের পুরস্কারটা পেল না,—কারণ সেলুলয়েডের যত গুণই থাকুক না কেন, বিলিয়ার্ড বল্ তৈরীর পক্ষে ওটা তেমন সুবিধাজনক মনে হয় নি। তা ছাড়া ওর একটা প্রধান দোষ হচ্ছে ওটি অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ—একটুতেই আগুন ধরে যেতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রসায়ন বিজ্ঞানে সেলুলয়েড এক নতুন জীবন আমদানী করল বললে ভুল হবে না। সেলুলয়েডে তৈরী নানান্ জিনিসে ছেয়ে গেল বাজার। পুরস্কার না-পাওয়ার দুঃখ আর রইল না হায়াটের।

নানা জাতের প্ল্যাস্টিক

এবার চেষ্টা চলল সেলুলয়েডের চাইতে উন্নত ধরণের ঐ রকম জিনিস কিছু তৈরী করা যায় কিনা—যাতে সেলুলয়েডের গুণগুলো রেখে দোষগুলো বাতিল করে দেওয়া যায়।

এইভাবেই আবিষ্কার হ'ল বেকেলাইটের—সেলুলয়েড আবিষ্কারের প্রায় ত্রিশ বছর পরে। আবিষ্কারকের নাম বেকল্যাণ্ড, তাই থেকে বেকেলাইট। এখানে কিন্তু ব্যবহার করা হ'ল একেবারে অন্য কাঁচা মাল—ফর্মালডিহাইড আর ফিনোল (যার অন্য নাম কার্বলিক অ্যাসিড)।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ঐ থেকে পাওয়া গেল একটা চটচটে জিনিস। বেকল্যাণ্ড তার সঙ্গে কাঠের মিহি গুঁড়ো আর নানা রকম রং মিশিয়ে একেবারে হাতীর দাঁতের মত শক্ত একটা জিনিস বানিয়ে ফেললেন। শক্ত, হাল্কা, চকচকে; দেখতেও ভারী সুন্দর। তার ওপর আগুনেও পোড়ে না, জলেও নষ্ট হয় না। অল্প দিনের মধ্যেই বেকেলাইট বাজার জাঁকিয়ে বসল। বেকেলাইটকে তরল অবস্থায় কাগজ, কাপড়, কাঠ ইত্যাদির পাত বা চাদর একটার সঙ্গে একটা যুড়বার আঠা হিসেবেও কাজে লাগানো হ'ল। দেখা গেল এমন ভাবে ওগুলো যুড়ে যাচ্ছে যে চোখে দেখে সহজে সে যোড়া বুঝবার উপায় নেই।

আর একজন বিজ্ঞানী ঐ ফর্মালডিহাইডের সঙ্গে কেসিন অর্থাৎ দুধের ছানা-অংশ মিশিয়েও ঠিক ঐ রকম নকল হাতীর দাঁতের মত শক্ত একটা জিনিস বানিয়ে ফেললেন। ওর নাম দেওয়া হ'ল গ্যালালিথ অর্থাৎ দুধ-পাথর (গ্রীক্ ভাষায় গ্যালা হচ্ছে দুধ, আর লিথোস্ হচ্ছে পাথর)। দুধের ছানাকে প্রায় পাথরের মত শক্ত করে নেওয়া হ'ল বলেই ঐ নাম।

এরাই হ'ল সব-প্রথম যুগের প্লাস্টিক। তারপর আরও নানা রকম প্লাস্টিকের আবিষ্কার হয়েছে—যেগুলো শুধু জাতেই আলাদা নয়, গুণাগুণেও আলাদা। জাতে আলাদা বলছি এই জন্য যে যে-সব কাঁচা মাল থেকে আজ প্লাস্টিক তৈরী হচ্ছে তার একটার সঙ্গে অন্যটার অনেক সময় কোন সম্পর্কই খুঁজে পাওয়া যায় না। কয়লা থেকে প্লাস্টিক তৈরী হচ্ছে, হচ্ছে পেট্রোলিয়াম্ বা খনিজ তেল থেকে, কাঠ থেকে, তুলো থেকে, উদ্ভিজ্জ তেল থেকে, জীবজন্তুর চর্বি থেকে, চুন থেকে, বালি থেকে, সমুদ্রের জল থেকে, এমন কি নানা রকম অকেজো গ্যাসকেও কৌশলে পরিবর্তিত করে জমিয়ে বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিক তৈরী করে নিচ্ছেন। আরও গোড়া থেকে ধরলে বলা যায়—জল, বাতাস, মাটি—সব থেকেই প্লাস্টিক তৈরী করা হচ্ছে। উপাদান ভেদে এদের নামকরণও হচ্ছে নানা রকম। যেমন ধর—সেলুলোজ-প্লাস্টিক্স্, কেসিন-প্লাস্টিক্স্, বেকেলাইটস্-প্লাস্টিক্স্, ইউরিয়া-প্লাস্টিক্স্, ভিনাইল-প্লাস্টিক্স্, পলি-ভিনাইল-প্লাস্টিক্স্, স্টিরিন, পলিস্টিরিন, ইথিলিন, পলি-ইথিলিন, নাইলন, অ্যাক্রাইলিক, মেলামিন, পলি-প্রপিলিন, পলি-ইথার, এপক্সি, সেলুলোজ-প্রপিওনেট, অ্যাসিটাল রেজিন, ফ্লুওরো-কার্বন্স্, সিলিকোন্স্। সবই বিভিন্ন জাতের, তাই এদের সব মিলিয়ে বলা হয় প্লাস্টিক রাজ্য। এ রাজ্য হয়তো শীগ্গিরই সাম্রাজ্য হয়ে দাঁড়াবে, ঠেকাবার উপায় নেই,—তা পৃথিবী থেকে সাম্রাজ্যবাদ তাড়াবার জন্য যতই-না চীৎকার করি আমরা।

প্ল্যাস্টিক কি ভাবে তৈরী হয়

এই সব প্লাস্টিক কি ভাবে তৈরী করা হয় স্বভাবতঃই সে প্রশ্ন তোমাদের মনে আসছে। এত রকমের—এত জাতের প্লাস্টিক, এদের তৈরী করার পদ্ধতিও নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা হবে তা তো বুঝতেই পারছ। তাদের বিবরণ অল্প কথায় দেওয়াও সম্ভব নয়। কাজেই উদাহরণ হিসেবে তাদের একটা বেছে নিয়ে সংক্ষেপে একটু আভাস মাত্র দিচ্ছি এখানে।
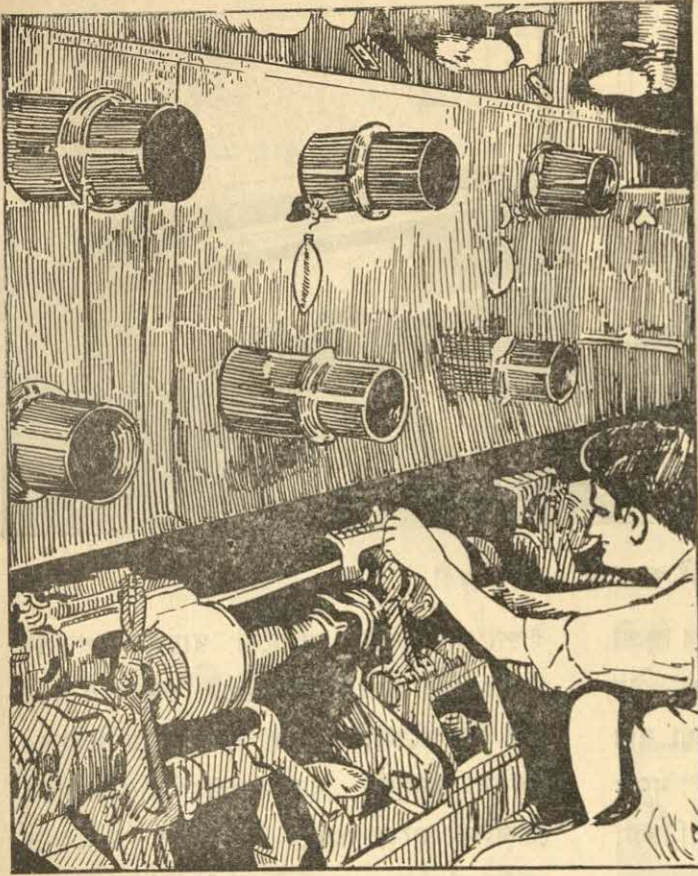
প্লাস্টিকের কারখানার একটি দৃশ্য

ধরা যাক মেলামিন প্ল্যাস্টিকের কথা—যার পূরো নাম মেলামিন-ফর্মালডিহাইড প্ল্যাস্টিক। মেলামিন আর ফর্মালডিহাইড দিয়ে জিনিসটা তৈরী হয় কিনা, তাই এই নাম। গোড়া থেকে ধরতে গেলে বলতে হয় এর কাঁচা মাল হচ্ছে কয়লা, চুনা-পাথর আর বাতাস।

কয়লাকে কোক্ ওভেনে পুড়িয়ে পাওয়া যায় কোক্। (কোক্ ছাড়া কিছু জ্বালানী কোল গ্যাস, কিছু আলকাতরা এবং কিছু অ্যামোনিয়া ইত্যাদিও পাওয়া যায়।) অমনিধারা চুনা-পাথর ভাঁটিতে পুড়িয়ে পাওয়া যায় চুন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস। এখানে আমাদের দরকার শুধু চুনটুকু। কোকের সঙ্গে চুন মিশিয়ে বৈদ্যুতিক চুল্লীতে খুব প্রচণ্ড উত্তাপে (২৫০০ থেকে ৩০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) গরম করলে পাওয়া যায় ক্যালসিয়াম কারবাইড। এই ক্যালসিয়াম কারবাইডের সঙ্গে বাতাসের নাইট্রোজেন মিশিয়ে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় গরম করলে পাওয়া যাবে ক্যালসিয়াম সায়নামাইড। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন কি করে বার করে নেবে ভাবছ? বাতাসকে খুব চাপ দিয়ে খুব ঠাণ্ডা করলে সে বাতাস তরল হয়ে যায়। সেই বাতাসকে ধাপে ধাপে ডিস্টিল্ করলে প্রথমে বেরিয়ে আসে নাইট্রোজেন (শূন্য ডিগ্রী থেকে ১৯৫.৫ ডিগ্রী নীচে), পরে অক্সিজেন (শূন্য ডিগ্রীর চাইতে ১৮২ ডিগ্রী নীচে)। কাজেই এই ভাবে বাতাসের অক্সিজেন থেকে নাইট্রোজেন পৃথক্ করে নেওয়া যায়।

এবারে ঐ ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড থেকে পর পর জল, অ্যাসিড এবং কস্টিক সোডার সাহায্যে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পর পাওয়া যাবে ডাইসায়ান-ডাইঅ্যামাইড। তার পর সেটিকে নিয়ে অ্যামোনিয়া আর মিথাইল অ্যালকহল মিশিয়ে গরম করলে পাওয়া যাবে মেলামিন।

এর পর ফর্মালডিহাইড তৈরী করার পালা। এখানেও আগের মত করে কোক্ তৈরী করে
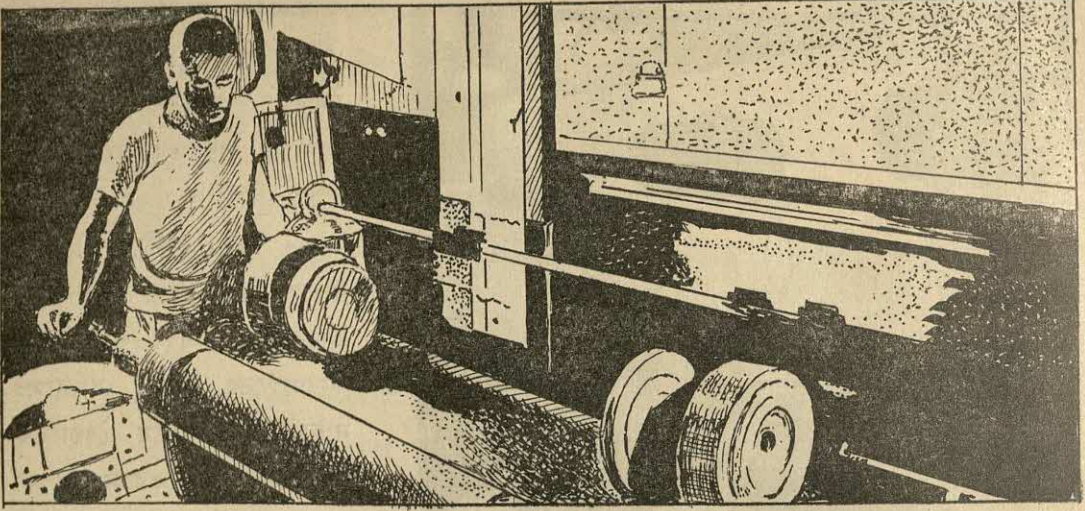
প্ল্যাস্টিকের পাত ও চাদর তৈরী

সেই কোক্ গনগনে আগুনে (এক হাজার ডিগ্রী সেঃ) লাল বা সাদা করে নিয়ে তার মধ্যে স্টীম অর্থাৎ জলীয় বাষ্প ঢুকিয়ে দিলে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন আর কার্বন মোনোঅক্সাইড নামে দু'টি গ্যাস। ঐ গ্যাস দু'টির সঙ্গে খানিকটা ক্রোমিক অক্সাইড মিশিয়ে তার ওপর খুব চাপ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যদি গরম করা যায় তা হলে পাওয়া যাবে মিথাইল অ্যালকহল। এই মিথাইল অ্যলকহল খুব অল্প তাপেই উবে যায় গ্যাস হয়ে। সেই গ্যাস অবস্থায় তা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশিয়ে সঙ্গে কিছু রাসায়নিক মশলা মিশিয়ে গরম করলেই তা থেকে তৈরী হবে ফর্মালডিহাইড।

এইবার আসল কাজ। এর জন্য দরকার স্টেনলেস স্টীলে তৈরী বিরাট একটি কেট্‌লি। এ কেট্‌লি কিন্তু সাধারণ কেট্‌লির মত নয়। কেট্‌লির ভিতর কোন কিছু রেখে যাতে সেগুলো গরম করা যায় সেজন্য ওর গায়ে একটা ইস্পাতের খোল লাগানো থাকে। খোলের ভিতর গরম বাষ্প ছেড়ে দিলেই ভিতরটাও গরম হয়ে ওঠে। কেট্‌লির সঙ্গে আরও আছে ভিতরের জিনিস ক্রমাগত ঘুঁটে দেবার একটি যন্ত্র। কেট্‌লির মধ্যে প্রথমে ফর্মালডিহাইড ভরে দেওয়া হ'ল, তার পর দেওয়া হ'ল মেলামিন এবং আরও কয়েকটি মশলা, যাতে কাজগুলো তাড়াতাড়ি হতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে খোলের ভিতর গরম বাষ্প চালিয়ে গরম করা হতে লাগল কেট্‌লি। ঘুঁটবার যন্ত্রটিও সুরু করল তার কাজ। খানিক পরে দেখা যাবে ভিতরে একটা তেলতেলে রজন জাতীয় জিনিস তৈরী হয়ে গেছে। কেট্‌লি থেকে বার করে এনে এবার সেটা ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল একটা বড় পিপের মত পাত্রে—এটাও স্টেনলেস স্টীলের তৈরী। সেই সঙ্গে আরও দেওয়া হ'ল কিছু সালফাইট পাল্‌প্—দেখতে আঁশের মত আর যা নাকি পাওয়া যায় কাঠ থেকে। এবার পিপেটা ক্রমাগত ঘোরানো

হতে লাগল। ফলে দু'টো জিনিস বেশ ভাল করে মিশে গেল। এবার পিপে থেকে বার করলে দেখা যাবে জিনিসটা শুকিয়ে শুকিয়ে বেশ শক্ত হয়ে এসেছে। ওটাকে শুকিয়ে আরও শক্ত করে, আরও নানা মশলা, রং ইত্যাদি মিশিয়ে গুঁড়ো করলেই পাওয়া যাবে প্ল্যাস্টিকের গুঁড়ো। ঐ গুঁড়ো কলে ছেঁকে নিলে মিহি গুঁড়ো পাওয়া যাবে, দানাও (গ্র্যানিউল) পাওয়া যাবে। এবার ওগুলো বস্তাবন্দী করলেই হ'ল।

ওপরের "সংক্ষিপ্ত" বর্ণনাটা পড়লেই বুঝবে সমস্ত কাজটা খুব সহজ নয়। অন্যান্য প্ল্যাস্টিকের বেলাও প্রায় এই রকম।

থার্মোসেটিং আর থার্মোপ্ল্যাস্টিক

কিন্তু শুধু গুঁড়ো বা দানা হলেই হ'ল না, তা দিয়ে জিনিস গড়তে হবে। কোন্ জিনিসের জন্য কোন্ প্ল্যাস্টিক দরকার তাও বেছে নিতে হবে। টুকিটাকি জিনিস—পাউডার-কেস, চিরুণী, বোতাম, পুতুল—এ সব তৈরী করতে যে প্ল্যাস্টিক লাগবে, বড় বড় আসবাবপত্র তৈরী করতে তা দিয়ে কাজ চলবে না। তেমনি যন্ত্রপাতি, কলকব্জার জন্যও আলাদা প্ল্যাস্টিক বেছে নিতে হবে। সুতো বা চাদরের জন্য চাই আর এক জাতের প্ল্যাস্টিক। পলেস্তরার জন্য দরকার এমন প্ল্যাস্টিকের যা সহজেই গালিয়ে তরল, আবার জমিয়ে শক্ত করা যায়।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন প্ল্যাস্টিক নানা জাতের হলেও প্রধানতঃ ওদেরকে দু'টি বড় বড় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক হচ্ছে থার্মোপ্ল্যাস্টিক—যা গরম করলে নরম হয়, এমন কি তরলও হয়ে যায়, আবার ঠাণ্ডা করলেই শক্ত হয়ে যায়। এ প্ল্যাস্টিকগুলোর তাই ইচ্ছেমত চেহারা বদলে দেওয়া যায়। দুই নম্বরেরটা হচ্ছে থার্মোসেটিং। এগুলো গালিয়ে একবার ছাঁচে ফেলে ঠাণ্ডা করলে সেই যে শক্ত হয়ে সিমেন্টের মত 'সেট্' করে যাবে আর তাদের চেহারা বদলানো যাবে না। থার্মো কথাটার মানে জান তো?—গরম বা তাপ।

প্ল্যাস্টিকের জিনিস কি করে গড়া হয়

প্ল্যাস্টিকের জিনিসপত্র সাধারণতঃ ছাঁচে ফেলেই বেশী তৈরী হয়। এই ছাঁচে ঢালার মধ্যেও আবার রকমফের আছে। যেমন ধর একটি পদ্ধতির নাম 'কম্প্রেশন্' মোল্ডিং (কম্প্রেশন্ মানে চাপ দেওয়া আর মোল্ডিং মানে ছাঁচে ঢালাই)। সাধারণতঃ থার্মোসেটিং জাতের প্ল্যাস্টিকের বেলাই এই পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়। প্ল্যাস্টিকের গুঁড়ো প্রথমে ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হ'ল। তারপর ছাঁচটাই গরম করে প্ল্যাস্টিকটাকে নরম করে ফেলা হ'ল। তারপর ওপর থেকে প্রবল চাপ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছাঁচ ঠাণ্ডা করে নেওয়া হ'ল। ঐ চাপের ফলেই প্ল্যাস্টিকের মধ্যে ঘটবে কিছুটা রাসায়নিক পরিবর্তন। ছাঁচ থেকে বেরোলে ঐ ছাঁচের আকৃতি নিয়েই শক্ত জমাট প্ল্যাস্টিকের চাঁই বেরিয়ে আসবে।
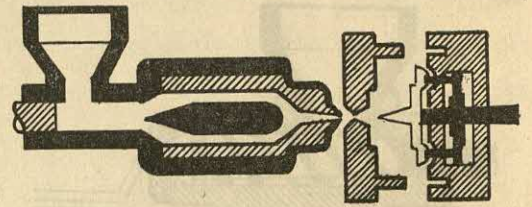
ইন্জেক্শন্ মোল্ডিং

ইন্‌জেক্‌শন্ মোল্ডিংএর বেলায় আবার অন্য ব্যবস্থা। প্লাস্টিকের গুঁড়ো ঢেলে দেওয়া হ'ল যন্ত্রের একটা চোঙার মধ্যে। যন্ত্রের ভিতরেই বসানো আছে গরম করার সরঞ্জাম। প্লাস্টিক গলে তরল হয়ে গেল। এবার সরু নল দিয়ে সেই তরল প্লাস্টিক তোড়ে বার করে দেওয়া হ'ল, সেটা পড়ল গিয়ে ছাঁচে। ছাঁচেই ঠাণ্ডা হ'ল সে প্লাস্টিক। তার পর ছাঁচ থেকে বার করলে দেখা যাবে দিব্যি পছন্দসই জিনিস তৈরী হয়ে গেছে। সাধারণতঃ থার্মোপ্লাস্টিক-গুলোই এ-ভাবে ছাঁচে ঢালাই করা হয়।

আর এক রকম পদ্ধতিকে বলা হয় এক্সট্রুশন্ মোল্ডিং। সাধারণতঃ প্লাস্টিকের পাত, প্লাস্টিকের চাদর, প্লাস্টিকের নল, প্লাস্টিকের

এক্সট্রুশন্ মোল্ডিং

সুতো—এই সবই তৈরী হয় এই পদ্ধতিতে। এখানে কোন ছাঁচের দরকার হয় না। প্লাস্টিকের গুঁড়ো বা দানা প্রথমে গরম করে একটা ঘুরন্ত স্ক্রুর সাহায্যে ঠেলে দেওয়া হয় একটা সিলিণ্ডার জাতীয় বড় পাত্রে। ঐ পাত্রের মধ্যে থাকে খাঁজ বা ফুটো। তরল প্লাস্টিক চাপের চোটে এসে পড়ে ঐ পাত্রে, তার পর ধাক্কা খেয়ে বেরিয়ে আসে ঐ খাঁজ বা ফুটোর ভিতর দিয়ে। খাঁজ দিয়ে যখন বেরিয়ে আসে তখন
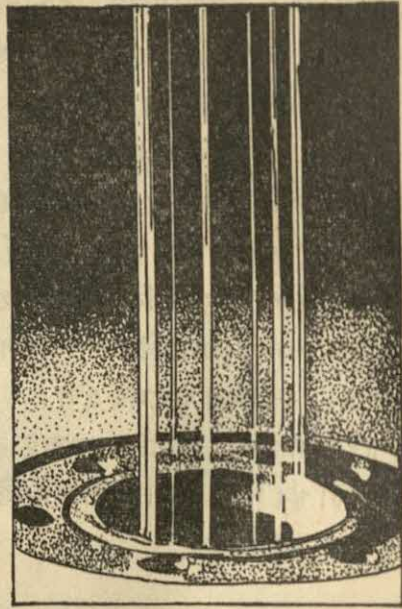
প্লাস্টিকের সুতো তৈরী

তার চেহারা হয় পাত বা চাদরের মত, যখন ফুটো দিয়ে বার হয় তখন হয় নলের মত। সুতোর বেলা ফুটোর বদলে পাশাপাশি প্রচুর সূক্ষ্ম নল বসানো থাকে, জলের ফিন্‌কির মত করে তাই দিয়ে বেরিয়ে আসে তরল প্লাস্টিক। বেরিয়ে আসামাত্র ঠাণ্ডা বাতাস বা জল ছিটিয়ে ওদের জমিয়ে দেওয়া হয়।

প্লাস্টিকের নানা গুণ

প্লাস্টিকের নানা গুণের কথা আগেই কিছুটা বলেছি। কোন কোন প্লাস্টিক প্রচুর ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। খুব শীতের দেশে বা খুব উঁচু আকাশে এই প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী যন্ত্রপাতি খুব কাজে এসেছে। পলিস্টিরিন এই জাতীয় প্লাস্টিক। আবার উল্টোটাও আছে। কোন কোন প্লাস্টিক প্রচুর তাপ সহ্য করতে পারে। প্রচণ্ড উত্তাপেও এদের গালানো যায় না—
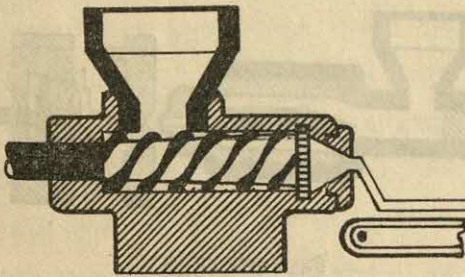
ফাটানো যায় না, এমন কি উগ্র রাসায়নিক পদার্থ দিয়েও গলানো যায় না এদের। যেমন ধর সিলিকোন্‌স্‌, ফ্লুয়োরো-কার্বন্‌স্‌ জাতীয় প্ল্যাস্টিক। কোন কোন প্ল্যাস্টিকে আবার ঠাণ্ডা-গরম ছু'টোই সহ্য করার আশ্চর্য গুণ দেখা গেছে। কোন কোন প্ল্যাস্টিক খুব বেশী রকম ভোল্টের বিদ্যুৎ-প্রবাহ সহ্য করতে পারে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির জন্য এদের চাহিদা। কোন কোন প্ল্যাস্টিক অতি অল্প তাপেই গলে যায়। নরম জিনিস তৈরী করতে হলে দরকার এই রকম প্ল্যাস্টিকের। এ ছাড়াও আগুনে পোড়ে না, জলে ভেজে না, ঠাণ্ডায় বেঁকে না বা কোঁচকায় না, ঘা মারলে ভাঙ্গে না, মোচড়ালে চিড় খায় না—কত রকম গুণের প্ল্যাস্টিকই না বেরিয়েছে! কোন কোনটা ইস্পাতের চাইতেও শক্ত এবং মজবুত, যন্ত্রপাতি—নাট্‌, বোল্ট্‌, স্ক্রু, বুশ, গিয়ার ইত্যাদি তৈরী করা যায় এগুলো দিয়ে। মরচে পড়ার কোন ভয় নেই। অনেক সময়ে লোহার যন্ত্রপাতিতেও এই জাতীয় প্ল্যাস্টিকের আস্তর লাগিয়ে নেওয়া হয়। গলানো প্ল্যাস্টিকের মধ্যে যন্ত্রপাতি চুবিয়ে শুকিয়ে নিলেই হ'ল এই আস্তর। প্ল্যাস্টিকের সুতোর কথা তো আগেই বলেছি। এ রকম
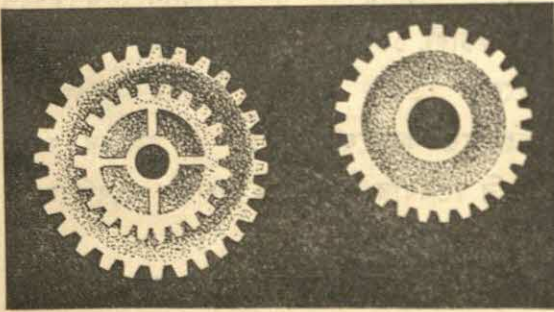
প্ল্যাস্টিকের তৈরী যন্ত্রপাতির অংশ
ইস্পাতের চেয়েও মজবুত

সুতোয় বোনা জামা ক্রমেই বাজার ছেয়ে ফেলছে। নাইলন, টেরিলিন—সবই এই জাতের। এগুলি সহজেই পরিষ্কার করা যায়—ভিজে ন্যাকড়া বা কচিৎ সাবান দিয়ে একটু ঘষে নিলেই হ'ল, ইস্ত্রী করারও দরকার নেই। প্ল্যাস্টিকের সুতো বা রেশমের মত প্ল্যাস্টিকের পশমও বেরিয়েছে—যা গরম জামাকাপড়ের মতই শীত রোধ করতে পারে অথচ পোকায় কাটে না পশমের মত। স্পঞ্জের মত ফোম্‌-প্ল্যাস্টিকের তৈরী গদীতেও তোমরা নিশ্চয়ই বসেছ।

থার্মোসেটিং জাতের প্ল্যাস্টিকগুলোর মধ্যে অনেক সময়ে অ্যাস্‌বেস্টস্‌, গ্ল্যাস্‌-উল, কাপড়, সুতো, কাগজ ইত্যাদির আঁশ ঢুকিয়ে দেওয়া যায়—ছাঁচের ভিতর চাপ দিয়ে। একে বলে 'রি-এন্‌ফোর্স্‌ড্‌ প্ল্যাস্টিক'। ভারী মজবুৎ করা করা যায় প্ল্যাস্টিককে এই ভাবে। তেমনি পাৎলা কাঠ, কাগজ, আঁশ ইত্যাদির পাত বা চাদরের ভাঁজে ভাঁজে তরল প্ল্যাস্টিক মিশিয়ে তাদের একত্র করে খুব মজবুত পাত বা চাদরও গড়া যায়—যাদেরকে বলা হয় 'ল্যামিনেটেড্‌ প্ল্যাস্টিক'। বলা বাহুল্য এখানেও ছাঁচে ফেলে প্রয়োগ করা হয় চাপ। (৬১০ পৃষ্ঠায় ছবিতে দেখ।)

প্রায় সব রকম প্ল্যাস্টিকই দেখতে মোটামুটি সুন্দর। আর নানা রকম রং মিশিয়ে তাকে আরও চোখ-ঝলসানো রূপ দেওয়া যায়।

মহাকাশ-জাহাজের আগায় যে 'ক্যাপসিউল' থাকে—যেটা নাকি মহাকাশযাত্রীর কেবিন,—তাতেও এই প্ল্যাস্টিক ব্যবহার করে আশ্চর্য ফল পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কারণ প্রচণ্ড উত্তাপ আর প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ছুই-ই সহ্য করতে পারে এমন জিনিস ও ছাড়া আর কি পাওয়া যাবে?
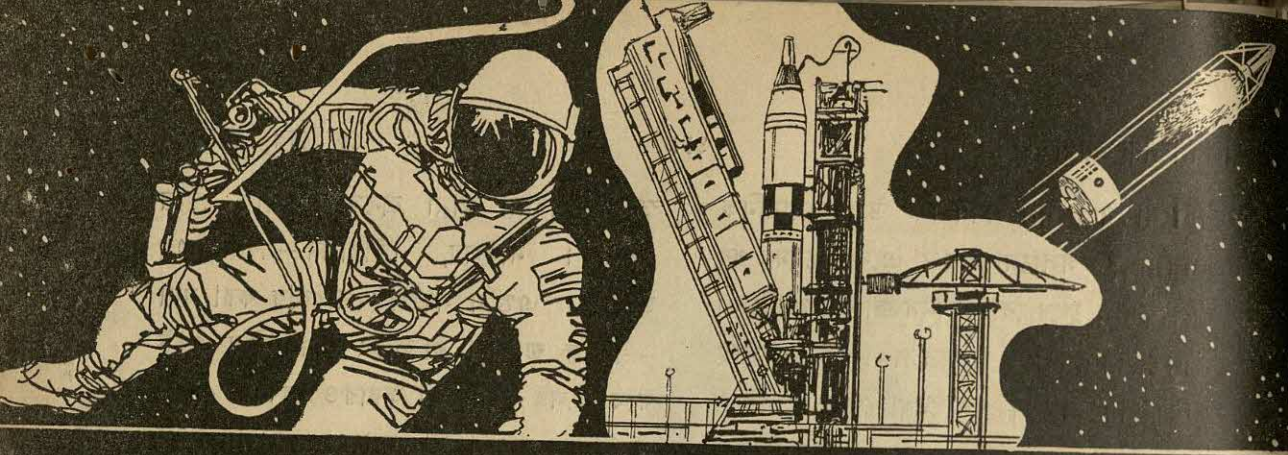
মহাশূন্যের পথে

মহাকাশ-যাত্রার প্রথম ধাপ

মানুষের মহাকাশ-যাত্রার কাহিনী আবার সুরু করছি।

মহাকাশের প্রথম অভিযাত্রী ছিল একটি রাশিয়ান্ কুকুর—লাইকা, তার ছবি তোমরা দেখেছ (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৩)। লাইকার পরে এই অভিযানে রওনা হয় দু'টি বানর। তারাও রাশিয়ার বাসিন্দা। মহাশূন্য থেকে বহাল তবিয়তে ঘুরে এসে তারাও অন্ততঃ একদিক্ দিয়ে মানুষের ওপর টেক্কা দিয়ে গেছে, যদিও তার বাহাদুরিটুকু মানুষেরই প্রাপ্য।

তারপর মহাকাশ-অভিযানের ইতিহাসে এল এক স্মরণীয় দিন। ১২ই এপ্রিল, ১৯৬১ সাল। একটি অসমসাহসিক রাশিয়ান্ অভি-যাত্রী, ইউরি গ্যাগারিন রকেটে চড়ে পাড়ি দিলেন মহাকাশে। পৃথিবীকে চক্কর দিতে দিতে ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট মহাশূন্যে কাটিয়ে অক্ষত শরীরে নেমে এলেন তিনি। প্রথম মহাকাশযাত্রী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় গ্যাগারিনের নামটি সোনার অক্ষরে খোদাই হয়ে গেল সে দিন। অত্যন্ত দুঃখের কথা— এই সে দিন, ২৭শে মার্চ ১৯৬৮, একটি বিমান-দুর্ঘটনায় অত্যন্ত অপরিণত বয়সে এঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

গ্যাগারিনের পর দ্বিতীয় মহাকাশযাত্রী হচ্ছেন টিটভ। ইনিও রুশ। ঐ বছরেরই আগষ্ট মাসে ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট মহাকাশে কাটিয়ে, ১৭ বার পৃথিবীকে চক্কর দিয়ে নেমে এলেন তিনি। মহাকাশ-বিজ্ঞানে রাশিয়ার জয় জয়-কার পড়ে গেল।

এদিকে আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও পিছিয়ে থাকবার ন'ন। টিটভের আগেই শেপার্ড ও গ্যারিসন অল্পক্ষণের জন্য (১৫ মিনিট ও ১৬ মিনিট) মহাকাশে উঠেছিলেন কিন্তু পৃথিবীকে চক্কর দিতে পারেন নি। সে কাজ হাসিল করে প্রথম আমেরিকার মুখ রাখলেন গ্লেন (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২)। টিটভের মত অতক্ষণ না হলেও তিনিও প্রায় ৫ ঘণ্টার কাছাকাছি মহাশূন্যে কাটিয়েছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি তিনবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন।

একে একে আরো অনেকে

এর পর যা সুরু হ'ল তাকে দুই দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বললে হয়তো বাড়িয়ে বলা
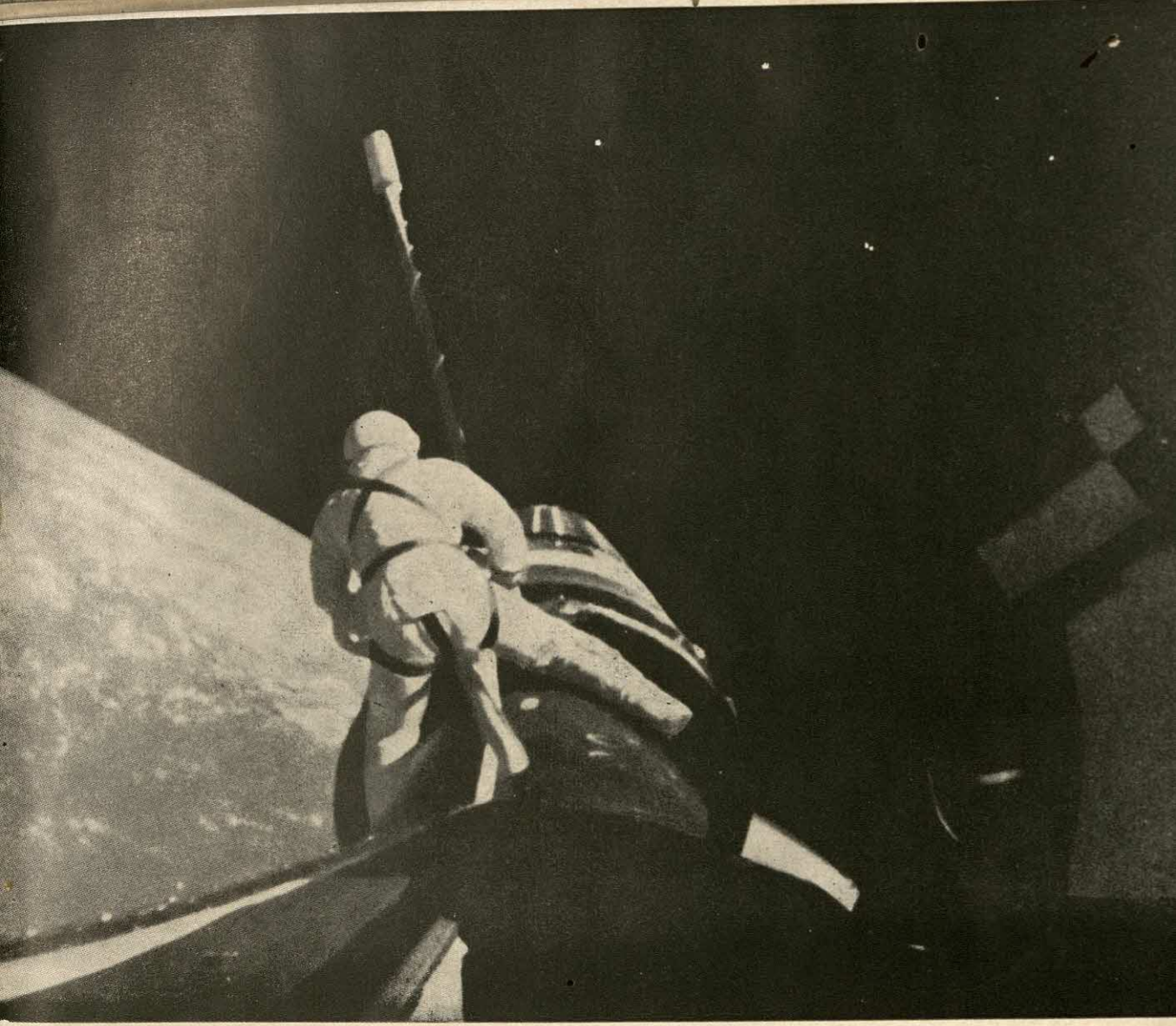
মহাশূন্যে জাহাজবদল

আমেরিকার মহাকাশযাত্রী রিচার্ড গর্ডন মহাকাশে পরস্পরসংলগ্ন দু'টি মহাকাশ-জাহাজের একটি (জেমিনি-১১) থেকে আর একটিতে হেঁটে চলেছেন। পায়ের নীচে মহাশূন্য, তারই ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে চলেছেন তিনি, কারণ ওখানে কোন ওজনই নেই তাঁর। বাঁ-দিকে যে সাদা গোল জিনিসটির খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে সেটি আমাদের পৃথিবী। ডাঙ্গা থেকে ৩০০ কিলোমিটার উঁচুতে এই ফটোটা তোলা হয়। —ইউ. এস. আই. এস.-এর সৌজন্যে।

মহাকাশযাত্রী বানর

হবে না। একে একে মহাকাশে ঘুরে এলেন আমেরিকার কার্পেন্টার (৪ ঘণ্টা, ৫৬ মিনিট—৩ পাক), শির্‌রা (৯ ঘ. ১৩ মি.—৬ পাক), কুপার (৩৪ ঘ. ২০ মি.—২২ পাক) ; রাশিয়ার নিকোলয়েভ (৯৪ ঘ. ২২ মি.—৬৪ পাক), পোপোভিচ (৭০ ঘ. ৫৭ মি.—৪৮ পাক), বিকোভ্‌স্কি (১১৯ ঘ. ৩৬ মি.—৮১ পাক), তেরেস্‌কোভা (৭০ ঘ. ৫০ মি.—৪৮ পাক)। তারপর আরও কত জন!

এরপর স্থরু হ'ল একই সঙ্গে একাধিক মহাকাশযাত্রীর অভিযান। রাশিয়ার কোমারোভ, ফিওক্‌তিস্তোভ, ইয়েগোরোভ একসঙ্গে ২৪ ঘণ্টার ওপর কাটিয়ে এলেন মহাকাশে ; বেলিয়ায়েভ ও লিওনোভ কাটিয়ে এলেন ২৬ ঘটার ওপর। তেমনি আমেরিকার ম্যাক্‌ডিভিট ও হোয়াইট কাটিয়ে এলেন ৯৭ ঘণ্টা ৪১ মিনিট, কুপার ও কনরাড ১৯০ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট (১২০ পাক) এবং বর্‌ম্যান ও লোভেল ৩৩০ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটে ২০৬ বার চক্কর দিলেন পৃথিবীকে। এক কথায় মহাকাশ-যাত্রা যেন একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এখন আর ও-কথা শুনলে কেউ অবাক্ হয় না।

গর্ডন কুপারের বাহাছুরি

এর মধ্যে গর্ডন কুপারের (আমেরিকান্) অভিযানটিকে একদিক্ দিয়ে উল্লেখযোগ্য বলতে হবে। মোট ৩৪ ঘণ্টা ২০ মিনিট ছিলেন তিনি মহাকাশে, কিন্তু তার পরেই তাঁর বাহন মহাকাশ-জাহাজের যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেল। কী ভীষণ অবস্থা ভাব দেখি! কবির ভাষায় বলতে গেলে "দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিশূন্য মহাশূন্য 'পরে" ছোট্ট একটি মানুষ রুদ্ধ একটি যন্ত্রগৃহে বসে ভীমবেগে পাক খাচ্ছে পৃথিবীর চারদিকে। নীচে বহুদূরে ছোট্ট একটা তারার মত ঐ যে আলোর স্ফুলিঙ্গটুকু দেখা যাচ্ছে ঐ হচ্ছে পৃথিবী। ঐখানে তাকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু সে ব্যবস্থা বুঝি বানচাল হয়ে গেল! কতখানি মনের জোর, স্নায়ুর জোর আর উপস্থিত-বুদ্ধি থাকলে তবেই না মাথা ঠিক রেখে ও অবস্থায় নিজের হাতে ঠিকমত যন্ত্র চালিয়ে নীচে নেমে আসা যায় তা কল্পনা করাও কঠিন। কুপার কিন্তু তাই করেছিলেন। অবলীলাক্রমে স্থিরমস্তিষ্কে তাঁর সেই বিকল যন্ত্রটিকে চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন পৃথিবীতে। অবশ্য মাটিতে নামা সম্ভব হয় নি, নেমেছিলেন জলে। সেখান থেকে তাঁকে তুলে নেওয়া হয়েছিল।

কুপারের অভিজ্ঞতার কাহিনীও বিচিত্র। আমাদের শরীরের যে ওজন বা ভার তা হচ্ছে পৃথিবীর টান অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তা নিশ্চয়ই জান। মহাশূন্যে উঠতে উঠতে একটা সময়ে এমন অবস্থা আসে যখন এই টান আর প্রায়

মহাকাশ-থেকে-ফিরে-আসা ছ'জন রুশ অভিযাত্রী
বাঁ দিক্ থেকে : গ্যাগারিন, টিটভ, নিকোলয়েভ, পোপোভিচ্, বিকোভ্স্কি ও তেরেস্কোভা

থাকেই না। হাল্কা মেঘের মত—পেঁজা তুলোর মত শূন্যে ভাসতে থাকে শরীর। কুপারের যখন সে অবস্থা এল তখন শুধু তাঁর নিজের নয়, যে ঘরটি নিয়ে তিনি মহাশূন্যে ঘুরছিলেন তার সব কিছুরই ওজন চলে গেল। এমন কি ঘরের ভিতরকার সমস্ত জলকণা—মায় তাঁর গা-থেকে-বেরিয়ে-আসা ঘামগুলি পর্যন্ত ভেসে বেড়াতে লাগল কামরার ভিতর। ওরই জন্যে সামনের যন্ত্রপাতিগুলোও খানিকক্ষণের জন্য তাঁর চোখে ঝাপসা হয়ে গেল। ভাগ্যিস তিনি বুদ্ধি করে রুমাল দিয়ে সেই ভাসমান জলকণাগুলি ধরে ফেলেছিলেন—যেমন করে লোকে জালের থলি দিয়ে প্রজাপতি বা ফড়িং ধরে! নইলে পরে যন্ত্রের ত্রুটি হয়তো তাঁর চোখেই পড়ত না। ফিরে এসে তাই কুপার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "মহাকাশে যাবার সময় সঙ্গে আর যাই নাও বা না নাও, কয়েকটা বাড়তি রুমাল নিতে ভুল না।"

বাজপাখী আর শঙ্খচিল

কুপারের পরবর্তী মহাকাশযাত্রীদের মধ্যে বিকোভ্স্কির যাত্রাও কম উল্লেখযোগ্য নয়। প্রায় পূরো পাঁচ দিন তিনি মহাশূন্যে কাটিয়ে এসেছিলেন যা তাঁর আগে আর কেউ পারেন নি। এই পাঁচ দিনে যে পথ তিনি পার হয়েছিলেন তার দূরত্ব পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের চেয়ে অনেক বেশী। পৃথিবী থেকে চাঁদের গড়পরতা দূরত্ব হচ্ছে ৩৮,৩৩৪২ কিলোমিটার, আর বিকোভ্স্কি পার হয়েছিলেন ৩৫,০০০০০ কিলোমিটার। অবশ্য পৃথিবী থেকে ২৩৫ কিলোমিটার ওপরে উঠে সমান্তরাল ভাবে ঘোরা আর খাড়া ওপর দিকে উঠে যাওয়া ঠিক এক কথা নয়। তবে পৃথিবীর দুরন্ত টান এড়িয়ে এতক্ষণ মহাকাশে ভাসা যখন সম্ভব হয়েছে তখন একদিন চাঁদে যাওয়াও যে অসম্ভব হবে না এ কথা সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বিকোভ্স্কি মহাকাশে থাকতে থাকতেই তেরেস্কোভা মহাকাশ-যাত্রা সুরু করেন। মেয়েদের মধ্যে এ পর্যন্ত একমাত্র ইনিই এই অসম সাহস দেখাতে পেরেছেন। মহাকাশে উঠে তিনি যখন টের পেলেন যে টেলিভিশনে পৃথিবীর অগণিত লোক তাঁকে লক্ষ্য করছে তখন মুচকি হেসে সেখান থেকেই সবাইকে অভিনন্দন

জানালেন। এক সময় যখন ভারতের ওপর দিয়ে তাঁর মহাকাশ-জাহাজ ছুটে যাচ্ছিল তখন তিনি বলে উঠলেন, "আমি শঙ্খচিল, মহাকাশ থেকে ভারতবাসীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।" শঙ্খচিল হচ্ছে তেরেস্কোভার সাংকেতিক ডাক-নাম, আর বিকোভ্স্কির নাম হচ্ছে বাজপাখী।

মাটিতে নামবার একটু আগে তিনি তাঁর 'ভোস্তক' (মহাকাশ-জাহাজের রাশিয়ান্ নাম) থেকে বেরিয়ে কোমরে প্যারাসুট বেঁধে ঝাঁপ দেন আর ভাসতে ভাসতে নেমে পড়েন এক চাষীর ক্ষেতে। চাষীরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ছুটে এলে তিনি বলে ওঠেন, "অভি-নন্দন পরে হবে, তার আগে আমাকে কিছু খেতে দাও তো! কিছু আলু আর পেঁয়াজ—কাঁচা পেঁয়াজ চাই কিন্তু। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।"

সূর্যোদয়

এ পর্যন্ত মহাকাশযাত্রীরা সকলেই একা একা মহাকাশে ঘুরছিলেন। ১৯৬৪ সালের ১২ই অক্টোবর রাশিয়ার বুক থেকে ছুটে বেরোল আর একটি বিপুল আয়তনের মহাকাশ-জাহাজ, আর তার নাম দেওয়া হ'ল 'ভোস্খদ্' অর্থাৎ 'সূর্যোদয়'। এর মধ্যে ছিলেন তিনজন মহাকাশ-যাত্রী—যাঁদের কথা আগেই বলা হয়েছে। এঁদের মধ্যে কোমারোভ হচ্ছেন এঞ্জিনীয়ার, ফিওক্তি-স্তোভ হচ্ছেন টেক্নোলজিস্ট আর ইয়েগোরোভ হচ্ছেন ডাক্তার। এঁরা প্রধানতঃ নিজের নিজের বিষয়ে নানা ধরনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আগে অত বড় আর অত ভারী মহাকাশ-জাহাজের কথা কেউ ভাবতে পারে নি। এঁরা মহাকাশে ছিলেন ২৪ ঘণ্টা। ঐ সময়ে টোকিও শহরে অলিম্পিক্ খেলা চলছিল। টোকিওর ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়ে ওঁরা টেলিভিশনের সাহায্যে রুশ খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়ে যেতে ভোলেন নি।

মহাশূন্যে দুই মহাকাশ-জাহাজের মিলন

এদিকে আমেরিকান্রাও চুপ করে থাকার পাত্র ন'ন। ১৯৬৫ সালে তাঁরা অল্পক্ষণ পর পর দু'টি মহাকাশ-জাহাজ ছুঁড়লেন মহাশূন্যে—জেমিনি-৬ ও জেমিনি-৭। জেমিনি-৬ যখন শূন্য পথে ওঠে তখন তার অক্ষপথ ছিল হাঁসের ডিমের মত চ্যাপ্টা, কিন্তু ঘণ্টা ৫।৬ পরেই সে তার অক্ষপথ বদ্লে বৃত্তাকার করে ফেলল। ফলে এক সময়ে জেমিনি ৭-এর সঙ্গে তার ব্যবধান রইল মাত্র এক ফুট। এর পরের ধাপ হচ্ছে দু'টি মহাকাশ-জাহাজকে শূন্যপথে একত্র করা—অর্থাৎ একটার সঙ্গে একটা যুড়ে দেওয়া,—যেমন করে ষ্টীমারের গায়ে গিয়ে নৌকো ভিড়ানো হয়। জেমিনি-৮, জেমিনি-৯ এবং জেমিনি-১০ তাও করল। একটির সঙ্গে আর একটিকে যুড়ে তো দিলই, উপরন্তু একটার জ্বালানী আর একটায় টেনে এনে সেই যোড়া জাহাজ আরও উঁচু অক্ষ-পথে ঠেলে তুলল। এর পর ইচ্ছেমত অক্ষপথ পরিবর্তন করাও চলল সঙ্গে সঙ্গে।

মহাশূন্যে হেঁটে বেড়ানো

এর পর যা ঘটল তা আরও আশ্চর্য বলতে হবে। মহাশূন্যে ছুটতে ছুটতে জাহাজের দরজা খুলে শূন্যে বেরিয়ে পড়লেন মহাকাশযাত্রী। জাহাজের বাইরে মহাশূন্যে পা ফেলে ফেলে হাঁটতে সুরু করে দিলেন। 'হাঁটা' না বলে 'ভাসা' বলা যেতে পারে সেই সীমাহীন মহা-শূন্যে। জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ রইল শুধু
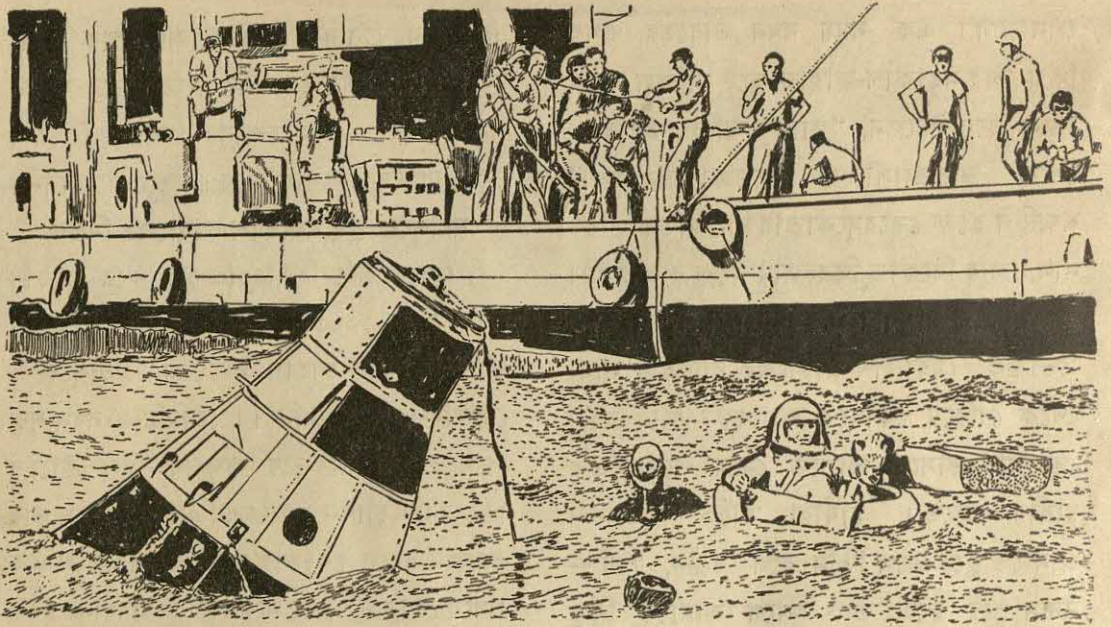
মহাশূন্যে ঘুরে এসে অভিযাত্রী নেমে এসেছেন সমুদ্রে—সেখান থেকে তাঁকে তুলে নেওয়া হচ্ছে।

একটা সরু নল দিয়ে। ঐ নল তাঁদের পোশাকের সঙ্গে লাগানো ছিল—প্রয়োজন মত অক্সিজেন পাবার আর নিজের কামরায় ফিরে আসবার জন্য। ভাবতে কেমন অবাক্ লাগে না? অনন্ত মহাকাশে মহাশূন্যের ওপর কয়েকটি মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে। নীচে থেকে কেউ টানছে না তাদের, নেই কোন মাধ্যাকর্ষণ; তাই পড়ে যাবারও কোন ভয় নেই। কোথায় পড়বে বল? সেরনান্ নামে একজন আমেরিকান্ দু' ঘণ্টারও বেশী এই রকম মহাশূন্যে হেঁটে বেড়িয়েছেন। শুধু তাই নয়, শূন্যে ভেসে ভেসে এক মহাকাশ-জাহাজ থেকে আর এক মহাকাশ-জাহাজে গিয়ে উঠতেও ছাড়েন নি তাঁরা। এ রকম কৃতিত্ব কেবল আমেরিকান্‌রাই দেখান নি, রুশরাও দেখিয়েছেন। রুশ মহাকাশযাত্রীদের মধ্যে আবার লিওনোভ ছিলেন চিত্রশিল্পী। তিনি মহাকাশে ছুটতে ছুটতে সেখানে বসেই রং দিয়ে আশ-পাশের ছবি এঁকে এনেছেন, আবার তারই সঙ্গে কল্পনার রং মিশিয়ে আরও ছবি তৈরী করেছেন।

শুধু এই-ই নয়, মহাকাশে যে সব ধূলো বা গুঁড়ো,—যা হয়তো কোন উল্কার টুকরো,—ভেসে বেড়ায়, মহাশূন্যে হাঁটবার সময় তারও খানিকটা সংগ্রহ করে এনেছেন তাঁরা। এগুলিকে বলা হয় মাইক্রো-মিটিওরয়েড্‌স্। বাংলায় বলা যায় উল্কাণু। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন এগুলি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করলে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা জানা যাবে।

এর পর? এর পর মানুষের চেষ্টা হবে সোজা চাঁদে গিয়ে নামা। আমেরিকান্ বিজ্ঞানীরা বলছেন, তার একটা পূরোপূরি পরিকল্পনা তাঁরা খাড়া করে ফেলেছেন। ১৯৬৯ কি ১৯৭০ সালেই তাঁরা চাঁদের ওপর মানুষ নামিয়ে দিতে পারবেন এবং তারা অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে।